সমাজ বিজ্ঞান বই

WBCS এবং অনার্স স্পেশাল

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমন্বয়

www.swapno.in

সূচিপত্র

ইউনিট ১ ঃ সমাজবিজ্ঞান ১
পাঠ ১ ঃ সমাজবিজ্ঞান ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা ৩
পাঠ ২ ঃ সমাজবিজ্ঞান ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ ৭
পাঠ ৩ ঃ সমাজবিজ্ঞান ঃ পরিধি ও বিষয়বস্তু ১৪
পাঠ ৪ ঃ সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ১৮

ইউনিট ২ ঃ সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক ২৩
পাঠ ১ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান ২৫
পাঠ ২ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ২৮
পাঠ ৩ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি ৩১
পাঠ ৪ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস ৩৪
পাঠ ৫ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ৩৭
পাঠ ৬ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ ৩৯

ইউনিট ৩ ঃ সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহ ৪২
পাঠ ১ ঃ সমাজ ৪৩
পাঠ ২ ঃ সম্প্রদায় ৫০
পাঠ ৩ ঃ সংঘ ৫৮
পাঠ ৪ ঃ প্রতিষ্ঠান; সংজ্ঞা ও ধারণা ৬২
পাঠ ৫ঃ দল ৬৭

ইউনিট ৪ ঃ সমাজের মৌলিক উপাদান ৭৪
পাঠ ১ ঃ সমাজ জীবনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব ৭৬
পাঠ ২ ঃ সমাজ জীবনে জৈবিক উপাদান তথা বংশগতির প্রভাব ৮১
পাঠ ৩ ঃ সমাজ জীবনে সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশলের প্রভাব ৮৫
পাঠ ৪ ঃ সামাজিক উপাদানের প্রভাব ৯০

ইউনিট ৫ ঃ মানুষের উৎপত্তি, বিবর্তন ও নরগোষ্ঠী ৯৫
পাঠ ১ ঃ মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তন ৯৭
পাঠ ২ ঃ নরগোষ্ঠীর ধারণা ও শ্রেণীবিভাগ ১১৫
পাঠ ৩ ঃ ককেশীয় নরগোষ্ঠী ১২৮
পাঠ ৪ ঃ মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী ১৩৬
পাঠ ৫ ঃ নিগ্রো নরগোষ্ঠী ১৪৩

ইউনিট ৬ ঃ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহ ঃ সমুদ্রতীরবর্তী ও নদী তীরবর্তী ১৫৪
পাঠ ১ ঃ সমুদ্র তীরবর্তী গ্রীক সভ্যতা ১৫৬
পাঠ ২ ঃ সমুদ্র তীরবর্তী রোমান সভ্যতা ১৬২
পাঠ ৩ ঃ মেসোপটেমীয় নদী তীরবর্তী সভ্যতা ১৬৮
পাঠ ৪ ঃ নদী তীরবর্তী মিশরীয় সভ্যতা ১৭১
পাঠ ৫ ঃ নদী তীরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ১৮০
পাঠ ৬ ঃ নদী তীরবর্তী চৈনিক সভ্যতা ১৮৫

www.swapno.in

ইউনিট ৭ ঃ পরিবার **১৯৩**
পাঠ ১ ঃ পরিবারের ধারণা ও সংজ্ঞা ১৯৪
পাঠ ২ ঃ পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ১৯৮
পাঠ ৩ ঃ মর্গান ও ওয়েষ্টার মার্কের তত্ত্ব ২০৩
পাঠ ৪ ঃ পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলী ২১১
পাঠ ৫ ঃ বিবাহের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ২২৯
পাঠ ৬ ঃ পরিবারের সাথে বিবাহের সম্পর্ক ২৩৭
ইউনিট ৮ ঃ সম্পত্তি **২৪৬**
পাঠ ১ ঃ সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও বিবর্তন ২৪৭
পাঠ ২ ঃ সম্পত্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ ২৬৪
পাঠ ৩ ঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার ২৭০

ইউনিট ৯ ঃ রাষ্ট্র **২৭৫**
পাঠ ১ ঃ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও ধারণা ২৭৬
পাঠ ২ ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ২৮৩
পাঠ ৩ ঃ সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র ২৯৫

ইউনিট ১০ ঃ সংস্কৃতি **২৯৯**
পাঠ ১ ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা ৩০০
পাঠ ২ ঃ উপাদানসমূহ ৩১০
পাঠ ৩ ঃ লোকসংস্কৃতি, বিশ্বাস ও লোকাচার ৩১৭
পাঠ ৪ ঃ সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব ৩২৮
পাঠ ৫ঃ সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক ৩৪১

ইউনিট ১১ ঃ সামাজিক স্তর বিন্যাস ও সমাজ কাঠামো **৩৫২**
পাঠ ১ ঃ সামাজিক স্তরবিন্যাস ঃ সংজ্ঞা, ধারণা ও উপাদান ৩৫৩
পাঠ ২ ঃ ক) দাসপ্রথা ৩৫৯
খ) এস্টেট ৩৬৪
গ) জাতি-বর্ণ ৩৬৮
ঘ) সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদা ৩৭৩
পাঠ ৩ ঃ সমাজ কাঠামো ৩৭৮

ইউনিট ১২ ঃ সামাজিক বিবর্তন **৩৮৪**
পাঠ ১ ঃ সমাজের ক্রমবিকাশ ঃ মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ধারণা ৩৮৫
পাঠ ২ ঃ আদিম সাম্যবাদ ও দাস সমাজ ৩৮৮
পাঠ ৩ ঃ সামন্তবাদ ৩৯২
পাঠ ৪ ঃ পুঁজিবাদ ৩৯৭
পাঠ ৫ ঃ সমাজতন্ত্র ৪০৩

ইউনিট ১৩ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ **৪১০**
পাঠ ১ ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা ৪১১
পাঠ ২ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ ৪১৮

ইউনিট ১৪ ঃ সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ **৪২৯**
পাঠ ১ ঃ সামাজিক প্রক্রিয়া ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা ৪৩০
পাঠ ২ ঃ সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ ৪৩৪

ইউনিট ১৫ ঃ সামাজিক পরিবর্তন **৪৪৯**
পাঠ ১ ঃ সামাজিক পরিবর্তন ঃ সংজ্ঞা, ধারণা ও কারণ ৪৫০
পাঠ ২ ঃ সামাজিক বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতি ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা ৪৫৬

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান

Fundamental Concepts in Sociology

ইউনিট ১

ভূমিকা ঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজেই মানুষের জন্ম, সমাজেই তার লালন-পালন, তার শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম কর্ম, ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়। মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সমাজবিহীন মানুষ হয় পশু, না হয় দেবতা। তাই সমাজ সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। কারণ সমাজ এবং মানুষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানুষবিহীন সমাজের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না- আবার সমাজবিহীন মানুষের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই প্রথমত পারিবারিক, দ্বিতীয়ত সামাজিক ও তৃতীয়ত রাজনৈতিক জীব। আর সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে মূলত মানুষের সামাজিক কর্ম-কান্ডের বিজ্ঞান। আমরা জানি যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science)। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের পরিচয় আমাদের সমাজে অতি অল্প দিনের। বস্তুত, আমাদের বুঝতে হবে যে, সমাজবিজ্ঞান মূলত সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা করে।

সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ জীবনকে সম্পূর্ণভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে পর্যালোচনা করা। সমাজবিজ্ঞানকে 'সমাজের বিজ্ঞান' বলা হয়। কারণ আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের একটি বা দু'টি বিষয়কে অধ্যয়ন না করে সম্পূর্ণ সমাজকে একক হিসেবে ধরে নিয়ে অধ্যয়ন করে। তাই ফ্রাঙ্ক ওয়ার্ড এবং উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বুৎপত্তিগত অর্থে সমাজবিজ্ঞান বলতে 'সমাজ সম্পর্কিত' জ্ঞানকে বোঝায়। আমরা জানি যে, সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে নানাধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই নানা ধরনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার তাগিদ থেকে সমাজবিজ্ঞানের সূত্রপাত। এই ইউনিটটি পাঠ করে আমরা সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও ধারণা সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ, পরিধি ও বিষয়বস্তু এবং সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারব।

www.swapno.in

www.swapno.in

শিক্ষাসূচী

এই ইউনিটে ৪টি পাঠ রয়েছে। প্রতিটি পাঠ ৪৫ মিনিটের। চারটি পাঠ সম্পন্ন করার জন্য আপনার ১৮০ মিনিট সময় লাগবে। এছাড়া ৪টি পাঠে মোট ৮টি অনুশীলন (Activity) দেওয়া হয়েছে। এ অনুশীলনগুলোর (Activities) এর জন্য অতিরিক্ত ৪০ মিনিট সময় লাগবে। নিম্নের সারণীর মাধ্যমে আপনি পড়ার সময়কে ভাগ করে নিতে পারবেন।

দিন	নির্ধারিত সময়	পাঠ/পাঠের অংশ বিশেষ	অনুশীলন	মন্তব্য
শুক্রবার				
শনিবার				
রবিবার				
সোমবার				
মঙ্গলবার				
বুধবার				
বৃহস্পতিবার				

কখন পড়বেন ঃ

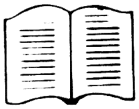

একটু ভাবুনতো আপনার হাতে পড়ার মত সময় কতটুকু এবং কখন আছে? – ভেবেছেন। আপনি যদি চাকুরীজীবী, শ্রমজীবী, পরিবারের দায়িত্বশীল বা কর্তা ব্যক্তি হন তাহলে দেখা যাবে প্রতিদিন বিকেলের পর হতে রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আপনি পড়াশুনা করার সময় পেয়ে থাকেন। এ সময়টুকু আপনি আপনার পড়াশুনার জন্য ব্যয় করে ভাল ফলাফলের অধিকারী হতে পারবেন। মনে রাখবেন, প্রতিদিন যা পড়বেন তা ঘুমানোর সময় একটু মনে করার চেষ্টা করুন। অনুশীলনগুলো করার পর বুঝতে পারবেন যে, আপনি পাঠটি ভালভাবে শিখেছেন কিনা। ইউনিট শেষে রচনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হতে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা, এসাইনমেন্ট ইত্যাদি দেওয়া হবে। তাই পুরো ইউনিটটি খুব ভাল করে পড়বেন।

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা

পাঠ ১

মূল ধারণা

- সমাজবিজ্ঞান শব্দের উদ্ভব
- সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা
- বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর দেওয়া সংজ্ঞা
- সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. সমাজবিজ্ঞান বিষয়টি কি তা জানতে পারবেন।

২. সমাজবিজ্ঞান শব্দের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে তা জানতে পারবেন।

৩. সমাজ জীবনে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান শব্দের উদ্ভব (Origin of the Word 'Sociology')

> সমাজবিজ্ঞানে মানুষের বিভিন্ন পারস্পরিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পাঠ করা হয়। মানুষের জীবন যাত্রার উন্নতি বিধান হল সমাজবিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী অগাষ্ট কোঁৎ ১৮৩৯ সালে সর্বপ্রথম Sociology শব্দটি উদ্ভাবন করেন। Sociology শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Socius, যার অর্থ সমাজ ও গ্রীক শব্দ Logos, যার অর্থ বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান- এই দুই শব্দ থেকে উদ্ভুত। তাহলে শব্দগত অর্থে বলা যায় সমাজ সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান যে বিজ্ঞানের মূল বিবেচ্য বিষয় তাকেই বলা হয় সমাজবিজ্ঞান। Sociology-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে সমাজবিজ্ঞানকে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার। অধ্যাপক সরকারও Sociology-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'সমাজবিজ্ঞান' ব্যবহার করেছেন। তবে Sociology -র বাংলা 'সমাজতত্ত্ব' ও 'সমাজবিদ্যা'ও করা হয়েছে। কিন্তু আক্ষরিক দিক থেকে বিবেচনা করলে Sociology-র বাংলা 'সমাজবিজ্ঞান'-ই অধিকার গ্রহণযোগ্য।

সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা (Preliminary Idea of Sociology) ঃ

সমাজবিজ্ঞানে প্রধানত মানুষের দলগত আচরণ ও পারস্পরিক কার্য কলাপ সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে পাঠ করা হয়। মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন যাত্রার উদ্দেশ্য ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও এক্ষেত্রে আলোচিত হয়। কিভাবে মানুষের সমাজে নানা ধরনের সংঘের (Association) বিকাশ ঘটেছে এবং কিভাবে এ সবের ভেতর পরিবর্তন এসেছে তাও সমাজবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

www.swapno.in

বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের গঠন প্রণালী এবং পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো সম্পর্কে পাঠ কিংবা বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এসবের ব্যাখ্যা করাই সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য মানুষের জীবন যাত্রার উন্নতি বিধান হল সমাজবিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সে কারণে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করার উপর সমাজবিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কেননা সামাজিক সমস্যাকে সার্থকভাবে মোকাবিলা করতে হলে সমস্যা সম্পর্কে আগে ভালভাবে জানতে হবে।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর দেওয়া সংজ্ঞা

মূলত সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ এবং মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন- সমাজবিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ওয়ার্ড সমাজবিজ্ঞানকে 'সমাজের বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছেন। (Sociology is the Science of Society)।

সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করে। জীবনের মূল্যবোধকে ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হলে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সামনার সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক প্রপঞ্চের বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করেছেন। "Sociology is the Science of social phenomena"

সমাজবিজ্ঞানী ভুর্খীম বলেন যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান। "Sociology is the Science of institution"।

সমাজবিজ্ঞানী কোভালেভস্কির মতে সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক সংগঠন এবং সমাজ পরিবর্তনের বিজ্ঞান। "Sociology is the science of social organization and social change."।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী যিমেল বলেন সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা মানব সম্পর্ক অধ্যয়ন করে। "Sociology is the science that studies human relationships."। সমাজবিজ্ঞানী পার্ক এর মতে সমাজবিজ্ঞান হলো মানবগোষ্ঠী বা সমষ্টির আচরণ সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞান। "Sociology is the science of collective behaviour."।

ম্যাকস ওয়েবার সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক কর্মকান্ড সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। "Sociology is the study of social action".

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের Society নামক গ্রন্থে বলেন যে, সমাজবিজ্ঞান এমনই একটি বিজ্ঞান, যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে এককভাবে পাঠ করে। "Sociology alone studies social relationships themselves and society itself."।

উল্লিখিত সংজ্ঞা সমূহের প্রত্যেকটিই সমাজের এক একটি বিশেষ দিকের উপর জোর দিয়েছে এবং প্রতিটি সংজ্ঞাই কমবেশি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের গঠন প্রণালী এবং পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ।

সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কারণ সমাজের লোকেরা কিভাবে জীবন-যাপন করে তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যদি সমাজের মানুষের রীতিনীতি, সামাজিক কার্যাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে চাই, তবে সমাজবিজ্ঞান থেকে আমাদের সাহায্য নিতে হবে। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে। তাছাড়া, নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলেও

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমরা মনে করি যে, ভবিষ্যতে যে কোন দেশ বা জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিহার্য। এছাড়া, যে কোন সমাজকে উন্নত করতে হলে এবং মানব জীবনের মূল্যবোধকে ব্যক্তিচরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হলে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক।

অনুশীলন ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

পাঁচটি বাক্যের সমন্বয়ে সমাজবিজ্ঞান শব্দের উদ্ভব ব্যাখ্যা করুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

www.swapno.in

অনুশীলন ২ (Activity) সময় ঃ ৫ মিনিট

সমাজকে উন্মত করার জন্য সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

সমাজবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ Sociology । Sociology শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Socius -যার অর্থ সমাজ ও গ্রীক শব্দ logos -যার অর্থ বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। এদু'টো শব্দ হতে উদ্ভুত। এভাবেই এর শব্দগত অর্থ হয়েছে সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান মূলত সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিজ্ঞান। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এসব সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের গঠন প্রণালী এবং পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। তাই যে কোন সমাজকে উন্নত করতে হলে এবং মানব জীবনের মূল্যবোধকে ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হলে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন অত্যাবশক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

www.swapno.in

১। সর্বপ্রথম কে Sociology শব্দটি ব্যবহার করেন?

ক) অগাষ্ট কোঁৎ

খ) ম্যাকাইভার

গ) ম্যাক্স ওয়েবার

ঘ) যিমেল

২। সমাজবিজ্ঞান কাদের পারস্পরিক কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করে?

ক) মা-বাবার

খ) আত্মীয়-স্বজনের

গ) মানুষের

ঘ) জীবজন্তুর

৩। সমাজবিজ্ঞানকে কে প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন?

ক) ফ্রাংক ওয়ার্ড

খ) সামনার

গ) যিমেল

ঘ) ডুর্খীম

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ

পাঠ ২

মূলধারণা

- সমাজবিজ্ঞানের সূচনা
- সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি : বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ
- বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

২. বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ সম্পর্কে অবগত হবেন।

৩. সমাজবিজ্ঞান কি একটি সম্ভাব্য বিজ্ঞান, না একটি নিশ্চিত বিজ্ঞান সে সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করবেন।

২.১ ঃ সমাজবিজ্ঞানের সূচনা

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে বিকাশ লাভ করেনি। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের পরিচয় আমাদের সমাজে অতি অল্প দিনের। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবিহীন মানুষ হয় না। মানুষের আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সমাজ ও মানুষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আর সমাজবিজ্ঞান মূলত নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজকে জানতে চায়। যার ফলে সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে সার্বিক ধারণা লাভ করা যায়।

> মানুষের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক বিজ্ঞানকে দর্শন শাস্ত্রের আওতাভুক্ত বলে মনে করা হতো।

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁত (Auguste comte) ১৮৩৯ সালে সর্ব প্রথম Sociology বা সমাজবিজ্ঞান শব্দটি উদ্ভাবন করেন। Auguste Comte এই বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দেবার জন্য প্রথমে এর নামকরণ করেন Social physics বা সামাজিক পদার্থবিদ্যা। অবশ্য তিনি পরে এই বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান বলেই অভিহিত করেন। এভাবেই সমাজবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল। বস্তুত সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিশেষ বিজ্ঞান যা নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া, সমাজবিজ্ঞান মানব সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করে থাকে। একটি গতিশীল সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তার পঠন-পাঠন এবং গবেষণা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী। তাই ম্যাকাইভার পেজ Maciver ও Page তাঁদের Society নাম গ্রন্থে বলেন- "সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি সামাজিক বিদ্যা, যা মানুষ এবং মানুষের সামাজিক সম্পর্ক নিরূপণ করে।"

২.২ ঃ সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ঃ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ

www.swapno.in

জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসেবে আমাদের সমাজে সমাজবিজ্ঞানের পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়। সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান সর্বকনিষ্ঠ। কেননা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে-এর আবির্ভাব ঘটে।।

প্রাচীন ভারতে কৌটিল্য-রচিত অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থে সমাজের বিভিন্ন দিকের নির্ভরযোগ্য পর্যালোচনা বিদ্যমান।

মূলত, মানুষের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় মানব জীবন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতির অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশেই মানব চিন্তা বিকশিত হতে থাকে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাবনা আদিকাল থেকে চলে আসছে। আদিতে সকল রকম চিন্তা চেতনা দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু মানবচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারায় দর্শনশাস্ত্রের সীমানা পেরিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে। এভাবে মানুষের বিচিত্র জ্ঞানের শাখা হিসেবে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। তাই জ্ঞান চর্চার ইতিহাস ও তার উৎস খুঁজতে গিয়ে বার বার আমাদের ফিরে তাকাতে হয় সুদূর অতীতের দিকে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পন্ডিতদের লেখায় সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা সমৃদ্ধি লাভ করে। গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো এবং এরিষ্টটল এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মূলত, প্লেটো, এরিষ্টটল ও পিথাগোরাস প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানকে দর্শনশাস্ত্রের আওতাভুক্ত বলে মনে করতেন। দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গ হিসেবেই তাঁরা সামাজিক বিজ্ঞানকে পর্যালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা সর্বপ্রথম প্লেটোর নাম উল্লেখ করতে পারি। আমরা এখন ধারাবাহিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ আলোচনা করব।

প্লেটো

প্লেটো তাঁর Republic নামক গ্রন্থে সমাজ সম্পর্কে যে সব তত্ত্বের অবতারণা করেছেন সেসব মূলত যুক্তি নির্ভর হলেও অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতা বর্জিত। কেননা, তিনি তাঁর গ্রন্থে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন, যেখানে শান্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। মূলত প্লেটোর Republic নামক গ্রন্থে সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও প্রশ্নের পর্যালোচনা দেখা যায়। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রকে প্রাচীন কালের সাম্যবাদ বলেও অভিহিত করা হয়।

প্লেটোর Republic নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। সমাজ সম্পর্কে প্লেটোর চিন্তা ছিল সমাজ মনস্তাত্ত্বিক।

এরিস্টটল

প্লেটোর প্রিয় ছাত্র এরিস্টটল সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। রাষ্ট্রের গড়ন, শ্রেণী-নির্ভর সমাজের দাস-মনিব সম্পর্ক এবং সামাজিক বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধানে তাঁর মতবাদ অনেকটা সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্লেটোর চেয়ে এরিস্টটল বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিলেও তিনি মূলত যুক্তিতর্কের মাধ্যমেই একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তাঁরা কেউই প্রাচীন গ্রীসের সমাজে দাসপ্রথার বিলোপের কথা বলেননি। বরং তাঁদের মতে উক্ত সমাজের অস্তিত্বের জন্য দাসপ্রথা ছিল অপরিহার্য।

প্লেটোর চেয়ে এরিস্টটল ছিলেন বাস্তববাদী। এরিষ্টটল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে একটি আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থা রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন।

কৌটিল্য

প্রাচীন ভারতের কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থে তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে যে পর্যালোচনা দেখতে পাওয়া যায় তা খুবই নির্ভরযোগ্য। কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে সে সময়ে ভারতের রাজনীতি,

www.swapno.in

অর্থনীতি, সমাজনীতি ও আইন-কানুন কি ছিল সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ফলিত ধ্যান-ধারণা রয়েছে। উল্লেখ, কৌটিল্যের আরও দুটি নাম রয়েছে, যথা- চাণক্য ও বিষ্ণুগুপ্ত। তবে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে রচিত অর্থশাস্ত্রের লেখক হিসাবে কৌটিল্য নামটিই বিজ্ঞ সমাজে অধিকতর পরিচিত। কৌটিল্য ছিলেন প্রাচীন ভারতের প্রথম সম্রাট মৌর্যবংশীয় চন্দ্র গুপ্তের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থটি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য শাসনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত। ঐ গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের সমাজ কাঠামো। (যে 'সমাজ কাঠামো' সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়) অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে নিধৃত হয়েছে।

> সেন্ট-সাইমন সমাজের মানুষের মাঝে সামাজিক অসাম্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে বলেন "উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যদি আর্থিক কল্যাণ বাড়ানো যায়, তবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক কল্যাণ বাড়ানো যাবে"।

ইবনে খালদুন

তিউনিসিয়ার অধিবাসী মধ্যযুগের বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) সমাজচিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি ঐতিহাসিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুকাদ্দিমায়' সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং সমাজ জীবনে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের প্রভাব পর্যালোচনা করেছেন। ইবনে খালদুন সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সামাজিক সংহতি সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য Social Solidarity বা সামাজিক সংহতির গুরুত্ব রয়েছে। মধ্যযুগে জন্মগ্রহণকারী এই মনীষী তাঁর চিন্তা-চেতনা এবং জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে গেছেন। তিনি সামাজিক সংহতিকে 'আসাবিহা' বলে অভিহিত করেছেন। অনেক বস্তুবাদী লেখক খালদুনকে জার্মান সমাজচিন্তাবিদ কার্ল মার্কসের পূর্বসূরি বলে গণ্য করেছেন।

> ইবনে খালদুন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের গতি প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেন। ইবনে খালদুন মনে করেন যে, সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সামাজিক সংহতির (Social Solidarity)-র গুরুত্ব রয়েছে।

ম্যাকিয়াভেলী

ইটালীর সমাজ দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলী তাঁর 'The Prince' নামক গ্রন্থে একজন শাসকের গুণাবলী এবং রাষ্ট্রের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী শাসকের যে কার্যাবলীর সুপারিশ করেন তা খুবই বাস্তবধর্মী। তিনি মানব চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বস্তনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। বস্তুত, সমাজ এবং মানব চরিত্র সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ম্যাকিয়াভেলীকে আধুনিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সম্ভবত তিনিই পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতে রাষ্ট্রকে চার্চের প্রভাবমুক্ত রাখার পক্ষে প্রথম প্রস্তাব করেন। উল্লেখ্য, তাঁর এ প্রস্তাবটিই আধুনিক লোকায়ত রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

> ম্যাকিয়াভেলী তাঁর 'The Prince' নামক গ্রন্থে একজন শাসকের গুণাবলী এবং রাষ্ট্রের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী শাসকের যে কার্যাবলী সুপারিশ করেন তা খুবই বাস্তবধর্মী।

ভিকো

ইটালীয় মনীষী ভিকো সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছেন। ভিকো তাঁর The New Science নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বির্বতিত হয়। ভিকো সমাজ বিবর্তনের ধারায় তিনটি যুগ লক্ষ করেন। এগুলো হচ্ছে :

১। দেবতাদের যুগ (Age of Gods);
২। বীর যোদ্ধাদের যুগ (Age of Heros); এবং
৩। মানুষের যুগ (Age of men)।

> ইটালীয় পন্ডিত ভিকো তাঁর The New Science নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বিবর্তিত হয়।

সেন্ট-সাইমন

ফঁরাসী সমাজবিজ্ঞানী সেন্ট সাইমন মানুষের মাঝে সামাজিক অসাম্যের প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে বলেন "উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যদি Economic বা আর্থিক কল্যাণ বাড়ানো যায়, তবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে Social good বা সামাজিক কল্যাণ বাড়ানো যাবে না

www.swapno.in

কেন? সেন্ট সাইমন মনে করেন যে, বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে যদি Technological progress বা প্রাযুক্তিক প্রগতি হতে পারে তাহলে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে নিশ্চয়ই Social progress বা সামাজিক প্রগতি অর্জন করা যাবে।

এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই সেন্ট সাইমন মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য এক নতুন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন এবং সমাজবিকাশ ও সমাজ পরিবর্তনের সূত্রের একটি রূপরেখা প্রদান করেন। সেই সূত্র অনুসরণ করে তাঁরই ছাত্র ও অনুগামী অগাষ্ট কোঁৎ সমাজ - সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৮৩৯ সালে। উল্লেখ্য, সেন্ট-সাইমন সমাজ চিন্তা বিশ্লেষণ করলে তাঁকে 'সমাজবিজ্ঞান' ও 'সমাজতন্ত্রের অন্যতম আদি প্রবক্তা বলে গণ্য করা যায়।

অগাষ্ট কোঁৎ

বিশেষভাবে সমাজবিজ্ঞানের নামকরণের জন্য ফরাসী সমাজচিন্তাবিদ অগাষ্ট কোঁৎকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়। সমাজকে জানার জন্য একটি অনন্য সাধারণ বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তিনিই আন্তরিকভাবে অনুভব করেছিলেন। সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে প্রথমে কোঁৎ 'Social physics' বা সামাজিক পদার্থ বিদ্যা নামে আখ্যা দেন। পরবর্তীতে অবশ্য তিনি এই বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। অগাষ্ট কোঁৎ মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞান হবে এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে এককভাবে সামাজিক সমস্যা, ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যাবে। ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে ছয় খন্ডে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Positive philosophy প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি মানব চিন্তা ও সমাজ বিকাশের তিনটি পর্যায়ের (Three Stages) নাম উল্লেখ করেন যেসবের মাধ্যমে মানব জ্ঞান তথা সমাজের বিবর্তন ঘটে। বস্তুত, তিনি মানব জ্ঞানের তিনটি স্তর এবং প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা দেন। অগাষ্ট কোঁৎ এর মতে মানব জ্ঞান বিকাশের তিনটি স্তর হল ঃ

> অগাষ্ট কোঁৎকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। অগাষ্ট কোঁৎ এর মতে সমাজবিজ্ঞান হবে এমন একটি বিজ্ঞান, যেখানে এককভাবে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে কোঁৎ এর প্রধান গ্রন্থ Positive philosophy ফরাসী ভাষায় ৬ খন্ডে প্রকাশিত হয়।

১। ধর্মতাত্ত্বিক স্তর (Theological Stage);

২। অধিবিদ্যার স্তর (Metaphysical Stage)

৩। দৃষ্টবাদী স্তর (Positive Stage)

অগাস্ট কোঁৎ এর সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ধারণা হচ্ছে উপরে বর্ণিত তাঁর প্রদত্ত সমাজবিকাশের তিনটি পর্যায়ের সূত্র (Law of three Stages)। তাঁর মতে মানবচিন্তা ঐতিহাসিকভাবে ধর্মতাত্ত্বিক স্তর তেকে অধিবিদ্যার স্তর অতিক্রম করে দৃষ্টিবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে। কোঁৎ মানবচিন্তার বিকাশের উক্ত তিনটি স্তরকে যথাক্রমে আদিম (Primitive) ও প্রাচীন (Ancient) সমাজ, মধ্যযুগীয় সমাজ তথা সামন্তবাদ (Feudalism) এবং উনিশ শতকের আধুনিক পুজিবাদী সমাজ তিনটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতানুসারে মানবজ্ঞানের ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে মানুষ সর্বপ্রাণবাদ (Animism) থেকে ক্রমান্বয়ে একেশ্বরবাদে (Monotheism) বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। উক্ত চিন্তার বশবর্তী হয়েই তিনি মানবতার ধর্মের (Religion of Humanity) ধারণাটির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা সবজনগ্রাহ্য হয়নি। আসলে কোঁৎ-এর মানবজ্ঞানের বিবর্তন ভিত্তিক সমাজবিকাশের তিনটি পর্যায় পার হয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার স্তরে মানুষের পদযাত্রা এক অপরিহার্য পরিণতি। অর্থাৎ কোঁৎ এর সমাজবিজ্ঞানের ধারণার মূলে রয়েছে প্রথমে ধর্ম, দ্বিতীয় পর্যায়ে দর্শন (তথা অধিবিদ্যা) এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজ্ঞানের অবদান। আর এভাবেই তিনি সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছেন।

www.swapno.in

সুতরাং পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, উপরিউক্ত চিন্তাবিদদের রচনা এবং চিন্তাধারা সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজও অনেকে মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞান তার শৈশবকাল অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত স্পষ্ট নির্ভরযোগ্যকোন তত্ত্ব হয়ত সমাজবিজ্ঞান দিতে পারেনি, কিন্তু তাই বলে সমাজবিজ্ঞান সম্পূর্ণ মূল্যহীন নয়। সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্বন্ধে যদি কোন বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান দান করতে না পারত তাহলে এত অল্প দিনে এই বিষয়ের এত প্রসার ঘটত না। বস্তুত, সম্পূর্ণ শূন্য হতে সমাজবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়নি। কতক রাজনৈতিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, জৈবিক ও সংস্কারমূলক ধ্যান-ধারণার অবদানই সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী জিনস্বার্গ তাঁর Reason and Unreason in Society নামক গ্রন্থে সমাজতত্ত্বের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, 'সুস্পষ্টভাবে সমাজবিজ্ঞানের রয়েছে চারটি উৎপত্তিসূত্র, যথা রাজনৈতিক দর্শন, ইতিহাসের দর্শন, বিবর্তনের জৈবিকতত্ত্ব এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগতি ক্রমান্বয়ে ঘটে চলেছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, ভবিষ্যতে যে কোন দেশ বা জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত ও সুগম করতে হলে সমাজবিজ্ঞানের অবদানকে কখনই অস্বীকার করা যাবে না।

> বিশিষ্ট বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী জিনস্বার্গ তাঁর Reason and Unreason in Society নামক গ্রন্থে
>
> সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস মনে করেন অন্যান্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোকে সুষ্ঠু যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব যে, সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান একেবারে নিশ্চিত বিজ্ঞান না হলেও এই বিষয়টি অন্তত: একটি সম্ভাব্য বিজ্ঞান।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তির কথা বলতে গেলে আমাদেরকে সমাজবিজ্ঞান 'বিজ্ঞান' হিসেবে কতটুকু গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে একথাটিও বলা মোটেই অসঙ্গত হবে না যে, জিনস্বার্গ কর্তৃক চিহ্নিত সমাজবিজ্ঞানের উক্ত চারটি উৎপত্তি সূত্রের মধ্যে শেষোক্তটি(সংস্কার আন্দোলন) সামাজিক জরীপকে (Soial Servey) সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২.৩ ঃ বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা

সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা সেটা বিশ্লেষণ করার আগে জানতে হবে 'বিজ্ঞান' কি?

বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান। যে জ্ঞান কোন বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জন করতে হয়, যা সুসংবদ্ধ অনুশীলনের বিষয় বস্তু, তাকেই বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

সমাজবিজ্ঞান সমাজ গবেষণায় বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। সমাজ গবেষণায় সমাজবিজ্ঞান যেসব বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলো হচ্ছে ঃ

১। সমস্যা নির্বাচন (Selection of Problem);

২। পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ (Observation and data collection);

৩। তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of data);

৪। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন (Formulation hypothesis on the basis of collected data);

৫। ভবিষদ্বানী (Prediction)।

> 'বিজ্ঞান' অর্থ বিশেষ জ্ঞান। যে জ্ঞান কোন বিশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জন করতে হয়, যা সুসংবদ্ধ অনুশীলনের বিষয়বস্তু, তাকেই বিজ্ঞান বলা যেতে পারে।

বস্তুত: সমাজবিজ্ঞান অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ অনুসরণ করে থাকে। যদিও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের মতো সমাজকে অধ্যয়ন করার জন্য সমাজবিজ্ঞানীদের কোন গবেষণাগার নেই তবু সমাজবিজ্ঞান কখনো সমাজকে বিশৃংখলভাবে জানতে পারেনা। সমাজবিজ্ঞানীগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই মূলত সমাজকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। তাই সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলার পেছনে কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। সমাজবিজ্ঞান প্রথমত গবেষণার বিষয় নির্বাচন করে, নির্বাচিত বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্যগুলোর যুক্তিসংগত শ্রেণীবিভাগ করে যে অনুমিত সিদ্ধান্ত বা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়, তা যাচাই করে দেখার পরেই সমাজবিজ্ঞানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সমাজবিজ্ঞান

www.swapno.in

পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে এমন সুসংহত জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা চালায় যা মূলত বিজ্ঞানভিত্তিক। কাজেই এদিক থেকে চিন্তা করে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যায়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে ঃ

প্রথমতঃ সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান দান করে।

দ্বিতীয়তঃ সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত বাস্তবধর্মী।

তৃতীয়তঃ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

এসব কারণেই সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস মনে করেন অন্যান্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোকে সুষ্ঠু যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব যে, সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানীদের অনুশীলন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান সম্মত। এদিক থেকে চিন্তা করে বলা চলে সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞানের সমমর্যাদা সম্পন্ন। তাই একথা বললে অন্যায় হবে না যে সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞান অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে আপন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তবে পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞান একেবারে নিশ্চিত বিজ্ঞান না হলেও এই বিষয়টি অন্তত: একটি সম্ভাব্য বিজ্ঞান। কারণ রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মত সমাজবিজ্ঞানও সমাজের জন্য গঠনমূলক কাজ করছে। সমাজবিজ্ঞানীদের সংগৃহীত জ্ঞান প্রতিনিয়ত সমাজের কাজে লাগছে। এসব বিবেচনা করেই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের পর্যায়ে স্থান লাভের দুই একটি শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলেও সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান না বলে পারা যায় না।

সারাংশ

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী Anguste Comte ১৮৩৯ সালে সর্বপ্রথম Sociology বা সমাজবিজ্ঞান শব্দটি উদ্ভাবন করেন। Anguste Comte এই বিষয়টিকে সামাজিক মর্যাদা দেবার জন্য প্রথমে এর নামকরণ করেন Social Physics বা সামাজিক পদার্থবিদ্যা। সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এঁদের মধ্যে প্লেটো, এরিষ্টটল, কৌটিল্য, ইবনে খালদুন, ম্যাকিয়াভেলী, ভিকো, সেন্ট সাইমন, অগাষ্ট কোঁৎ এর মতবাদ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত সমাজবিজ্ঞানীদের অবদানে সমাজবিজ্ঞান উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান সমাজ গবেষণায় বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছে।

www.swapno.in

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সমাজবিজ্ঞান সমাজের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন- উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

অনুশীলনী ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে সেন্ট সাইমন এর মতবাদ সংক্ষেপে লিখুন।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সমাজ সম্পর্কে প্লেটোর চিন্তা কি ধরনের ছিল?

ক) সমাজ মনস্তাত্তিক খ) সমাজতাত্ত্বিক
গ) দার্শনিক ঘ) নৈতিক

২। সমাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বিবর্তিত হয় এ উক্তিটি কে করেছেন?

ক) প্লেটো খ) অগাষ্ট কোঁৎ
গ) ভিকো ঘ) সেন্ট সাইমন

৩। আর্থিক কল্যাণের সাথে সামাজিক কল্যাণের কথা কে বলেছেন?

ক) এরিষ্টটল খ) অগাষ্ট কোঁৎ
গ) ভিকো ঘ) সেন্ট সাইমন

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান পরিধি ও বিষয়বস্তু (Sociology)

পাঠ
৩

মূল ধারণা

- সমাজবিজ্ঞানের পরিধি
- সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

১. সমাজবিজ্ঞান কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা জানতে পারবেন।
২. সমাজবিজ্ঞানের পরিধি কত ব্যাপক- সে সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন।
৩. সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলোকে আপনি চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১.৩ পরিধি ও বিষয়বস্তু

সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে সে সম্পর্কে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ। বস্তুত গোটা সমাজের নিখুঁত বিশ্লেষণই সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এবং সে অর্থে বলা যায় যে, গোটা সমাজই সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। তাহলে এটা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারছেন যে, সমাজবিজ্ঞানের পরিধি কত ব্যাপক ও বিস্তৃত। অধিকাংশ মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর আলোকে বর্ণনা করেছেন ঃ

> সমাজবিজ্ঞানের পরিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সামাজিক কর্মকান্ড। সামাজিক কর্মকান্ডের সমাস্থ মানুষের ভাল-মন্দ বিবেচিত হয়।

১. **সামাজিক কর্মকান্ড** ঃ সমাজবিজ্ঞানের পরিধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সামাজিক কর্মকান্ড। সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাস্থ মানুষের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়।

২. **সামাজিক ধারণা** ঃ সামাজিক ধারণাসমূহ নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে। মরিস জিন্সবার্গের মতে, মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং এর ফলাফল সম্পর্কিত আলোচনাই হল সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

৩. **সামাজিক পরিবর্তন** ঃ সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে সমাজের রূপান্তর একটি সাবলীল সত্য। মানব জাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি জীবন যাত্রার সকল বিষয়ের আলোচনা করাই সমাজবিজ্ঞানের কাজ।

৪. **সামাজিক প্রতিষ্ঠান** ঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তি ও দলের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়। কিভাবে মানুষের সমাজে নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটেছে এবং কিভাবে এসবের ভেতর পরিবর্তন এসেছে এগুলোর বিচার বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

www.swapno.in

৫. **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ** ঃ সমাজকে কতিপয় সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনা করাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে। সমাজবিজ্ঞানীগণের মতে, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধের দ্বারা নির্ধারিত।

৬. **সামাজিক সমস্যা** ঃ সমাজবিজ্ঞান নৈতিকতার প্রশ্নে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। কাজেই সমাজবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সামাজিক সমস্যার বিশ্লেষণ করতে চায়।

৭. **সামাজিক আদর্শ** ঃ সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু হিসেবে সামাজিক আদর্শের অবদান রয়েছে। সামাজিক আদর্শছাড়া কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে পারে না।

৮. **সমাজের সামগ্রিক বিষয়ে আলোচনা** ঃ মানুষের কার্যকলাপ এবং মানুষের সাংগঠনিক প্রতিভা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলো সমাজবিজ্ঞানের পরিধিকে অত্যন্ত ব্যাপকতর করে তুলেছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত অধ্যয়নের একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞান, যার পরিসর বা পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের এমন কোন দিক নেই যা সমাজবিজ্ঞানের আওতায় আসে না। তাই বলা যায় যে, সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তথা সমগ্র মানবিক সম্পর্ক সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

অতএব এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, যত প্রকার সামাজিক ঘটনা আছে, অর্থাৎ সমাজে যা কিছু ঘটেছে, সবই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে সেই জটিল সমাজ যেখানে মানুষ তার জীবন সম্পূর্ণভাবে অতিবাহিত করে। তাই আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞানের পরিধির মতো এর বিষয়বস্তুও বেশ ব্যাপক। কারণ মানব ইতিহাসের অনুসন্ধান করা এবং মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব পরিধি। সমাজবিজ্ঞানের মূল কর্তব্য হচ্ছে, মানব সমাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করে তা সমাজের সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরো বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করতে চায় কিভাবে সমাজের প্রকৃতি, সমাজ জীবনের বৃহত্তর দিক তথা পরিবার, রাষ্ট্র, শ্রমিক সংগঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সমাজ বিকশিত হয়ে উঠে। এক কথায় বলা যায়, যে সমাজে মানুষে মানুষে পরস্পর সম্পর্কের মাধ্যমে দল গড়ে উঠে আর কতকগুলো কার্যপ্রণালী বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমের মানুষ আপন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে সে সমাজই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমাজের বিভিন্ন দিক পঠন-পাঠন এবং গবেষণার জন্য সমাজবিজ্ঞানে যেসব শাখা-প্রশাখার বিকাশ সেসবই বৃহত্তর সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তগর্ত, যেমন ঃ

যত প্রকার সামাজিক ঘটনা আছে সবই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

১. সমাজবিজ্ঞানে তত্ত্ব (Sociological theory)-এই শাখাটি সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রত্যয়, গবেষণা পদ্ধতি ও সাধারণীকরণ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

২. ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান (Historical Sociology)-এ শাখা সমাজের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক বিকাশ তথা আদিষ্ট সমাজ থেকে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত মানুষের জীবন যাত্রা সম্পর্কে গবেষণা করে থাকে।

৩. পরিবারের সমাজতত্ত্ব (Sociology of Family)-পরিবারের উৎপত্তি, বিকাশ এবং পরিবর্তনশীল পরিবারের কার্যাবলী এবং পরিবারের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে।

৪. সামাজিক জনবিজ্ঞান (Social Demography)-জনসংখ্যাতত্ত্ব, জনসংখ্যার কাঠামো, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং তার উপর সামাজিক প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে।

www.swapno.in

৫. গ্রামীণ এবং নগর সমাজতত্ত্ব (Rural and Urban Sociology) যথাক্রমে গ্রামীণ সমাজ এবং নগর সমাজ সম্পর্কে অধ্যয়ন করে।

৬. ধর্মের সমাজতত্ত্ব(Sociology of Religion) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও প্রথা ও লোকাচারসহ, ধর্মের সামাজিক গুরুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পায়।

৭. শিক্ষার সমাজতত্ত্ব (Sociology of Education) সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক সম্বন্ধে পঠন, পাঠন এবং গবেষণা চালায়।

৮. সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব (Cultural Sociology) বস্তুগত এবং অবস্তুগত সংস্কৃতির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং সমাজ জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

৯. রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব (Political Sociology) রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয়াদির সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী তথা নাগরিকের সম্পর্ক নিরূপণ করে। একটি বিশেষ করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার বিভিন্ন মাত্রা ব্যাখ্যা করে।

১০. সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology) সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে।

উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও শিল্প-কলা সমাজতত্ত্ব (Sociology of Art), লোক সমাজতত্ত্ব (Folk Sociology), গোষ্ঠীর সমাজতত্ত্ব (Sociology of Group) ইত্যাদি শাখা-প্রশাখা সমাজবিজ্ঞানের পাঠকে গতিশীল করে চলেছে। আর সে কারণেই ঐ সব শাখা প্রশাখার বিষয়বস্তু সমাজবিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, সমাজবিজ্ঞানের পরিধি এবং বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ ব্যক্তি বা সমাজজীবনের এমন কোন দিক নেই যা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আওতায় আনা যায় না। এভাবে দেখা যায় যে, ব্যক্তির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রায় সম্পূর্ণ মানবিক আচরণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী কৌতূহল দেখান। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, মানুষের জীবনের প্রধান বিষয়গুলোই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। তাই একথা বলা যায় যে, বস্তুত: সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির অন্য নাম। উক্ত পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলীর যথারীতি বিশ্লেষণ অবশ্যই সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। মূলতঃ মানুষের আচরণ বলতে যা কিছু বুঝায় সে সবই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান বর্তমানে গতিশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে।

> মানুষের আচরণ বলতে যা কিছু বুঝায় সে সবই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

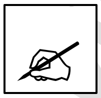

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

"যতপ্রকার সামাজিক ঘটনা আছে সবই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু" —এ উক্তিটির ব্যাখ্যা দিন (১৫০ শব্দ দ্বারা)।

www.swapno.in

অনুশীলনী ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর আলোকে উহার ১০টি শাখা প্রশাখার নাম উল্লেখ করুন ঃ

১. ২. ৩. ৪. ৫.

৬. ৭. ৮. ৯. ১০.

সারাংশ ঃ

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। বলা যায়, সমগ্র সমাজই সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত মুখ্য বিষয়বস্তুগুলো হল সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক ধারণা, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক নিয়ন্ত্রন, সামাজিক সমন্বয়, সামাজিক আদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত বিষয়সমূহ হল সামাজিক তত্ত্ব, ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান, পরিবারের সমাজতত্ত্ব, সামাজিক জনবিজ্ঞান, গ্রামীণ ও নগর সমাজতত্ত্ব, ধর্মীয় সমাজতত্ত্ব, শিক্ষার সমাজতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানের এসব মূল শাখা আবার কতক প্রশাখার বিভক্ত; এসব শাখা ও প্রশাখার বিষয়সমূহ সমাজবিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মানুষের আচরণ ও কার্যাবলীর বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা ও বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয়বস্তুটি কি?

ক) সামাজিক ধারণা খ) সামাজিক পরিবর্তন

গ) সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান

২। একটি জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে উঠতে হলে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন?

ক) সামাজিক আদর্শ খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

গ) কঠোর পরিশ্রম ঘ) সামাজিক মূল্যবোধ

৩। ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানের কোন শাখায় বেশী আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়?

ক) শিক্ষার সমাজতত্ত্ব খ) সামাজিক মনোবিজ্ঞান

গ) সাংস্কৃতিক সমাজতত্ত্ব ঘ) সামাজিক জনবিজ্ঞান

৪। সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় কি?

ক) সমাজ ও সংস্কৃতি খ) শিক্ষা ও সমাজ

গ) সমাজ ঘ) মানুষের আচরণ ও সমাজ

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব
(Importance of the Study of Sociology)

পাঠ
৪

মূল ধারণা

- মানব সমাজে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা
- সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা
- সামাজিক উন্নতি বিধানে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব
- অনুশীলন
- স্ব-মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

১. মানব সমাজে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

২. সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এ বিষয়েও জানতে পারবেন।

৩. সামাজিক উন্নতি বিধানে সমাজবিজ্ঞান পাঠের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যামান সে সম্পর্কেও জানতে পারবেন।

সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব

সমাজের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অপরিহার্য।

একটি স্বতন্ত্র ও সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অপরিসীম। কেননা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। আর যে সমাজে মানুষ বসবাস করবে সে সমাজের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানা তার একান্ত প্রয়োজন। তাই সমাজের সার্বিক দিক জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অপরিহার্য। নিম্নে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল :

তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব সমাজে কতটুকু। প্রথমত:

(১) সমাজ সম্পর্কে জানা ঃ সমাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। সমাজ কি, সমাজ কেন এবং কিভাবে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে সমাজের কাঠামো পরিবর্তন ঘটেছে এসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যথায় কিছুতেই সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়।

সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

(২) সমাজের মানুষ সম্পর্কে জানা ঃ কেবলমাত্র সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলেই চলবে না, সমাজে বসবাস করতে হলে সমাজের মানুষ তথা তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, জীবন-যাপন প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। আর সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, জীবন প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

যে কোন সামাজিক সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ আবশ্যক।

(৩) সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা ঃ সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও সমাজবিজ্ঞান প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনা প্রদান করে। বস্তুতঃ সমাজবিজ্ঞান পাঠ করলে সামাজিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করার অবকাশ ঘটে। তাই যে কোন সামাজিক সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ অত্যাবশ্যক।

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান পাঠ করলে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী সম্পর্কে জানা যায়।

(৪) সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা ঃ সভ্যতার ক্রমবিকাশের মধ্যদিয়ে সমাজ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পরিবর্তনশীল সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে অবগত হয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অপরিহার্য।

(৫) বিভিন্ন দেশের সমাজ সম্পর্কে জানা ঃ সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে পারি। এতে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান বাড়ে। ব্যবহারিক জীবনে জ্ঞানের লেনদেন বৃদ্ধি পায় এবং মানবিক সম্পর্কের উন্নতি হয়।

সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

(৬) সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা ঃ বর্তমানে রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন সামাজিক ও সরকারী কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষ সাহায্য করে। তাই সমাজের যে কোন কাজ সার্থকতার সাথে সমাধা করতে হলে সমাজকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা আবশ্যক। আর সমাজকে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

(৭) সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে জানা ঃ সমাজ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল সমাজের গতি-প্রকৃতি ও পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে ধারণা থাকলে আমরা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জীবনে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

আধুনিক কালে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগছে।

(৮) সামাজিক উন্নতি বিধান ঃ সামাজিক উন্নতি বিধানে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। কেননা সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন ব্যতীত সমাজস্থ মানুষের চাহিদা, উপভোগ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশে সামাজিক অগ্রগতিকে তরান্বিত করতে নানাবিধ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের সমাজে দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া, কিভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায় এসব বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে চাই সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য। আধুনিক কালে তাই সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সামজবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগছে।

উপরিউক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, সামজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ভিত্তিক অধ্যয়ন। তাই সমাজ ও সমাজ জীবনের সার্বিক দিক সম্পর্কে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। সর্বোপরি, সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় তথা মানুষের যাবতীয় মানবিক আচরণ সম্পর্কে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

একমাত্র সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই সমাজের নানাবিধ সমস্যা, জটিলতা ও সমাজ ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা যেতে পারে। সুতরাং সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অপরিসীম।

আপনাদের একথা বুঝতে হবে যে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের জটিলতাকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে সুষ্ঠু জ্ঞান দান করতে সাহায্য করে। তাছাড়া, আমরা জানি যে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের সকল দিক সাধারণভাবে পর্যালোচনা করে এবং সমাজের মৌলিক দিক বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করে। সুতরাং সমাজবিজ্ঞান পাঠের ভূমিকা মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমরা জানি যে, সমাজকে বুঝতে এবং সমাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করাই সামজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সামাজিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সমাজের সকল বিষয় সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা থাকা প্রয়োজন। সে কারণে প্রায় প্রত্যেক মানুষেরই সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ সব কারণেই সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব সমাজে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এসব ছাড়াও মূলত: সমাজবিজ্ঞান পাঠে সমাজ কাঠামো, শ্রেণীবিন্যাস, শ্রেণীগুলির মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজের উৎপাদন যন্ত্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, তাদের ভূমিকা এবং অধিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সম্ভব। একমাত্র সমাজবিজ্ঞানের মাধ্যমেই সমাজের নানাবিধ সমস্যা, জটিলতা ও সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ জানা যেতে পারে। সুতরাং সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে

www.swapno.in

ভবিষ্যতে যে কোন দেশ বা জাতিকে উন্নতির ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে সমাজবিজ্ঞান পাঠের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

জানার যেমন গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি সমাজবিজ্ঞান পাঠের উপযোগিতাও রয়েছে। উন্নয়নকামী দেশগুলোতে সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব অত্যধিক। এর মূল কারণ হলো এই যে, সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের জটিলতাকে সহজ ও সরলভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন এবং সামাজিক সমস্যার কারণগুলো নির্ণয় করেন। সে কারণে বলা যায় সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব বিশ্বের সব সমাজেই বিদ্যমান।

তাহলে এটা আপনাদের বুঝতে হবে যে, বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ভবিষ্যতে যে কোন দেশ বা জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর সাথে আপনাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, কোনও সমাজকে উন্নত করতে হলে, জীবনের মূল্যবোধকে ব্যক্তি চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব আলোচনা করুন (অনূর্ধ ৭৫টি শব্দ দ্বারা)।

অনুশীলনী ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামাজিক উন্নতি বিধানে সমাজবিজ্ঞান পাঠ কিভাবে সাহায্য করে- আলোচনা করুন (অনূর্ধ ৭৫টি শব্দ দ্বারা)।

সারাংশ

সমাজ ও সামাজিক ঘটনাবলীকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। সমগ্র মানব সমাজ, সমাজস্থ মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, সামাজিক, দায়িত্ব ও

www.swapno.in

কর্তব্য, সমাজের গতি-প্রকৃতি, বিভিন্ন দেশের সমাজ, সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা, সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক উন্নতিবিধানে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও জ্ঞান অর্জন করার জন্য অবশ্যই সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা উচিত। সমাজবিজ্ঞান সমাজের জটিলতাকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে সুষ্ঠুজ্ঞান দান করতে সাহায্য করে। অতএব সমাজবিজ্ঞান পাঠের ভূমিকা মানবজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব অপরিহার্য কেন?

ক) বিভিন্ন সমাজের তুলনামূলক চিত্র পাওয়ার জন্য

খ) সমাজের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য

গ) সমাজস্থ মানুষকে জানার জন্য

ঘ) সমাজের উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য

২। সমাজবিজ্ঞান সমাজের কোন তিনটি প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা প্রদান করে?

ক) সমস্যা, জটিলতা ও প্রকৃতি   খ) সমাধান, জটিলতা ও প্রকৃতি

গ) সংস্কৃতি, সমস্যা ও সমাধান   ঘ) সমস্যা, সমাধান, প্রকৃতি

৩। সামাজিক পরিবর্তনের কোন দুটি বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন?

ক) সামাজিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

খ) সামাজিক পরিবর্তনের আর্থ-সামাজিক নিয়ামক

গ) সমাজের গতিপ্রকৃতি ও পরিবর্তনের কারণ

ঘ) সামাজিক পরিবর্তনের গতিধারা

www.swapno.in

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে? সামজবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিন। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা আলোচনা করুন।
২. সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন। সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
৩. 'সমাজবিজ্ঞান' হচ্ছে সমাজের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন'-এ উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
৪. সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতবাদ উল্লেখ করুন।
৫. সমাজবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান ? ব্যাখ্যা করুন।
৬. সমাজবিজ্ঞান কি? সমাজবিজ্ঞানের পরিধি কি? আলোচনা করুন।
৭. সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
৮. মানব সমাজে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৯. সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন। সামাজিক উন্নতি বিধানে সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব পর্যালোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২ ঃ ১। ২। ৩।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক

ইউনিট ২

ভূমিকা ঃ

সমাজবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান। মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের যে জটিল জাল তাই হল সমাজ, আর এই সমাজকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করে সমাজবিজ্ঞান। তাই সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান যেহেতু গোটা সমাজকে নিয়ে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করে সেহেতু অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানগুলোকে যেমন - নৃবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলোকে সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞানই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ও পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য তাদের অনুশীলনের ক্ষেত্রকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করছে। তথাপি অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞানের যোগসূত্রতা এতই গভীর যে অনেক সময় এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাও কঠিন।

তবে সমাজবিজ্ঞানী অগাষ্ট কোঁৎ এসব সামাজিক বিজ্ঞানকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাষ্ট কোঁৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবস্থানগত যে ছক প্রণয়ন করেছেন তাতে তিনি সমাজবিজ্ঞানকে সকল বিজ্ঞানের যুবরাজ (Prince of all science) বলেছেন। তাঁর মতে সমাজ একটি সামগ্রিক সত্তা, তাকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা, গবেষণা, ও বিশ্লেষণ করা যায় না। তবে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা কোঁৎ এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেননি। কারণ বর্তমান সমাজের আয়তন এত বিশাল এবং জটিল যে তাকে সামগ্রিক ভাবে দেখার জন্য যেমন একটি সাধারণ সমাজবিদ্যার প্রয়োজন তেমনি সমাজের মানুষের কর্মের এক একটি দিককে পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখারও দরকার আছে।

প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞানই তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অনুসারে এবং তার বিষয়বস্তুকে আপন আঙ্গিকে সাজিয়ে অধ্যয়ন করে। এ জন্যই অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। অতএব অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পরিধি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

www.swapno.in

শিক্ষাসূচী

এই ইউনিটে ৬টি পাঠ রয়েছে। প্রতিটি পাঠ ৪৫ মিনিটের। ছয়টি পাঠ সম্পন্ন করার জন্য আপনার ২৭০ মিনিট সময় লাগবে। এছাড়া ছয়টি পাঠে মোট ৬টি অনুশীলন (Activity) দেওয়া হয়েছে। এ অনুশীলনগুলোর (Activities) এর জন্য অতিরিক্ত ৩৯মিনিট সময় লাগবে। নিম্নের সারণীর মাধ্যমে আপনি পড়ার সময়কে ভাগ করে নিতে পারবেন।

দিন	নির্ধারিত সময়	পাঠ/পাঠের অংশ বিশেষ	অনুশীলন	মন্তব্য
শুক্রবার				
শনিবার				
রবিবার				
সোমবার				
মঙ্গলবার				
বুধবার				
বৃহস্পতিবার				

কখন পড়বেন ঃ

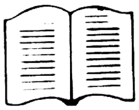

একটু ভাবুনতো আপনার হাতে পড়ার মত সময় কতটুকু এবং কখন আছে? – ভেবেছেন। আপনি যদি চাকুরীজীবী, শ্রমজীবী, পরিবারের দায়িত্বশীল বা কর্তা ব্যক্তি হন তাহলে দেখা যাবে প্রতিদিন বিকেলের পর হতে রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আপনি পড়াশুনা করার সময় পেয়ে থাকেন। এ সময়টুকু আপনি আপনার পড়াশুনার জন্য ব্যয় করে ভাল ফলাফলের অধিকারী হতে পারবেন। মনে রাখবেন, প্রতিদিন যা পড়বেন তা ঘুমানোর সময় একটু মনে করার চেষ্টা করুন। অনুশীলনগুলো করার পর বুঝতে পারবেন যে, আপনি পাঠটি ভালভাবে শিখেছেন কিনা। ইউনিট শেষে রচনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হতে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা, এসাইনমেন্ট ইত্যাদি দেওয়া হবে। তাই পুরো ইউনিটটি খুব ভাল করে পড়বেন।

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান

পাঠ
১

মূলধারণা

- নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও ধারণা
- সমাজ বিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১। নৃ-বিজ্ঞান কি তা বলতে পারবেন;
২। সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে পারবেন;
২। সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান ঃ -

নৃবিজ্ঞান মানুষের উদ্ভব ক্রমবিকাশ, দৈহিক গঠন প্রণালী ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

নৃবিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনার আগে নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মত নৃবিজ্ঞানের সাথেও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। নৃবিজ্ঞান হল মানুষ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। মানুষের সামগ্রিক অধ্যয়ন বিষয়ক বিজ্ঞানকেই বলা হয় নৃবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মত নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুও অত্যন্ত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। নৃবিজ্ঞানকে প্রধানত দৈহিক নৃবিজ্ঞান ও সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান এই দুই শাখায় বিভক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে যাকে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বলা হয় তাকেই যুক্তরাজ্যে সামাজিক নৃবিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রথমটিতে সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, আর দ্বিতীয়টিতে সামাজিক সংগঠনের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়। দৈহিক নৃবিজ্ঞান বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য, তাদের জৈবিক দিক এবং তাদের উপর পরিবেশগত উপাদানের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান উভয়ই আধুনিক বিজ্ঞান এবং দুই বিজ্ঞানই উনবিংশ শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করে। উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট।

সামাজিক নৃবিজ্ঞান আদিম মানব সমাজের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাদের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং তাদের আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় জীবন এবং সামাজিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানও আধুনিক সমাজের নানাবিধ সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি মানব সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব নিরূপণ করে। এ দুই বিজ্ঞানের মধ্যে বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য এতবেশী যে, এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুঁজে বের করা দুরূহ ব্যাপার।

যে মানুষকে নিয়েই যে সমাজ সেই সমাজের মানুষই হলো নৃবিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয়।

নৃবিজ্ঞান মানুষের সামগ্রিক অধ্যয়ন বিষয়ক একটি বিজ্ঞান। মানুষের এমন কোন দিক নেই যা নৃবিজ্ঞানে আলোচিত হয় না।

www.swapno.in

দৈহিক নৃবিজ্ঞান ছাড়া সমাজবিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কিংবা সামাজিক নৃবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন। সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিকাশধারা আলোচনা করতে গিয়ে মানুষ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করে। অপরদিকে সামাজিক নৃবিজ্ঞান আদিম মানুষ ও তাদের জীবনপ্রণালী নিয়েই আলোচনা ও গবেষণা করে।

সামাজিক নৃবিজ্ঞান সহজ-সরল ও অনগ্রসর আদিম সমাজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করে। সমাজ বিজ্ঞান আধুনিক কালের নগর জীবন ও গ্রামীণ সমাজসম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। মানুষের আদিম জীবনযাত্রার ইতিহাসই নৃবিজ্ঞানের আসল বিষয়বস্তু। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে মানুষের অতীত ও বর্তমানের ঐতিহাসিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। জীবের ক্রমবিকাশ এবং প্রাণীরাজ্যে মানুষের অবস্থান নিয়ে নৃবিজ্ঞান সমীক্ষা চালায়। সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয় হল সমাজ, অপরদিকে নৃবিজ্ঞানের মূল বিষয় হল মানুষ।

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান উভয়েই মূল লক্ষ্য হল মানবসংস্কৃতির অনুশীলন। ক্ষেত্রের দিক থেকে শুধু পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য ক্ষেত্র সমকালীন সমাজ, আর নৃবিজ্ঞানের হল আদিম প্রাক্ আক্ষরিক যুগের মানুষ ও তার সংস্কৃতি। মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তন উভয় বিজ্ঞানেরই অভিন্ন আগ্রহের বিষয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে নৃবিজ্ঞান প্রাণী হিসাবে মানুষের শুধু পর্যালোচনা নয়, সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের সংস্কৃতি নিয়েও গবেষণা করে। তাই নৃবিজ্ঞান হল মানুষের গবেষণামূলক বিজ্ঞান, আর সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত বিশ্লেষাণাত্বক বিজ্ঞান।

অনুশীলনী ১ (Activity : 1) **সময় : ৭ মিনিট**

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান উভয়ই মানব সংস্কৃতির অনুশীলন করে; এ উক্তিটি ৫টি বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

সরাংশ ঃ
সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান জ্ঞান জগতের দু'টি ভিন্ন শাখা হলেও মূলত এদের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রায় অভিন্ন। সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিকাশ ধারা আলোচনা করতে গিয়ে মানুষ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করে, আর নৃবিজ্ঞান আদিম মানুষের উৎপত্তি, বিবর্তন, সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করে। তবে নৃবিজ্ঞান মূলত সমাজবিজ্ঞানেরই একটি অংশ। মানব বিবর্তন উভয় বিজ্ঞানেরই অভিন্ন আগ্রহের বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

www.swapno.in

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। নৃবিজ্ঞানকে মূলত কয়টি শাখায় ভাগ করা যায়।
ক) তিনটি　　খ) দুটি
গ) চারটি　　ঘ) পাঁচটি

২। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে সাধারণ মিল কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়?
ক) মানুষ সংক্রান্ত অধ্যয়নে　　খ) সমাজ ও জীবন প্রণালী অধ্যয়নে।
গ) মানব বিবর্তন অধ্যয়নে　　ঘ) সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়নে।

৩। নৃবিজ্ঞান কোন শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করে?
ক) বিংশ শতাব্দী　　খ) উনবিংশ শতাব্দী
খ) অষ্টাদশ শতাব্দী　　ঘ) সপ্তদশ শতাব্দী

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পাঠ ২

মূলধারণা

- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও ধারণা
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন;
৩। সমাজবিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে পারবেন।

> রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বরূপ, সংগঠন, শ্রেণীবিভাগ, সরকারের রূপ, কাঠামো, সংবিধান এবং নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এক কথায় বলা যায়, রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্মকান্ডকে নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে- রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে পূর্বে কোন পার্থক্য করা হতো না। রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন ভাবা হত। কিন্তু আধুনিক কালে সমাজ ও রাষ্ট্র দু'টি ভিন্ন সত্তা হিসাবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্ট্র-সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। রাষ্ট্রের উৎপত্তি স্বরূপ, সংগঠন, শ্রেণীবিভাগ, সরকারের রূপ, কাঠামো, সংবিধান এবং নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এক কথায় বলা যায়, রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্মকান্ডকে নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে- রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি বিকাশ, সামাজিক পরিবর্তন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে।

সমাজ বিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হল মানুষের সমগ্র জীবন প্রণালী। মানুষ শুধু সমাজের একজন সদস্যই নয়, সে রাষ্ট্রের নাগরিকও বটে।

প্রাচীন কালে গ্রীক চিন্তাবিদরা রাষ্ট্র ও সমাজ এই প্রত্যয় দু'টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেননি। শুধু তাই নয়, দাসত্বপ্রথা ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার অধীন বিদ্যমান প্রাচীন গ্রীক নগর–রাষ্ট্রের সাথে আধুনিক 'সরকার' নামক প্রতিষ্ঠানেরও কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। সেজন্য গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটলের রচনায় রাষ্ট্র ও সরকারের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত নয়। সীমিত গন্ডীর মধ্যে সীমিত জনগণের যাবতীয় প্রয়োজন রাষ্ট্রই তখন মিটাতে পারত। কিন্তু ক্রমশ লোকসংখ্যা ও রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের পক্ষে মানুষের সার্বিক চাহিদা ও প্রত্যাশা মিটানো অসম্ভব হয়ে উঠলো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন চাহিদা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিভিন্ন সামাজিকবিজ্ঞানের উদ্ভব হল। পরবর্তীতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি যখন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল তখনই সেগুলির যথার্থ বিচার–বিশ্লেষণের জন্য সমাজবিদ্যার বিকাশ ঘটল। এদিক থেকে বলা যায় সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক পরে ঘটে।

www.swapno.in

কিন্তু অধ্যাপক ডানিং এর মতে “জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়েছে সমাজবিজ্ঞানের অনেক পরে।”

ঐহিতাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমাবিজ্ঞানের অনেক পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে। মানুষ প্রথমে সমাজবদ্ধ হয়েছিল। সমাজবদ্ধ জীবনে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকূলতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনে রাজনৈতিক চিন্তা ধারার সূত্রপাত ঘটে। অর্থাৎ মানুষের সমাজবদ্ধতা এবং সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং শৃংখলা প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে সমাজবিজ্ঞান এবং সেই সমাজবদ্ধ মানুষের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের সূত্র থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটেছে।

তবে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশের পরও উভয় শাস্ত্রই পারস্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ।

সমাজবিজ্ঞান একটি মৌলিক সামাজিকবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের সার্বিক দিক নিয়ে বস্তুনিষ্ট আলোচনা করে, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই সমাজস্থ মানুযের কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিককে নিয়ে আলোচনা করে। সেজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের শাখা বিজ্ঞান বলা হয়। একথা বলাই বাহুল্য, সমাজ বিজ্ঞানের পরিধিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধির চেয়ে ব্যাপক।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব আলোচ্য বিষয় থাকলেও কতকগুলি মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নে- যেমন আইন, শাসনতন্ত্র, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, সামাজিক অনুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই বলা হয় এই দুই বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত নয়, একে অপরের পরিপূরকও বটে। কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে যেকোন রাজনৈতিক সফলতা কিংবা বিফলতা সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

সমাজবিজ্ঞান সমাজ জগৎ বিশ্লেষণে মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ (Value free) থাকার প্রয়াস পায়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাস্তব জগৎ সম্পর্কে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি আদর্শনিষ্ঠ আর সমাজবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ।

সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা, গবেষণা এবং বিশ্লেষণ করে। সমস্যাগুলি একদিকে যেমন রাজনৈতিক, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক সমস্যাও বটে। অতএব সমস্যাগুলিকে যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝতে হলে এবং সেগুলির সমাধানের সঠিক পথ খুঁজে পেতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে যেমন সমাজবিজ্ঞানীর সাহায্য নিতে হয়, তেমনি সমাজবিজ্ঞানীকেও সমস্যাগুলির রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মৌলিক ধারণাগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানী পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কিংবা সর্বসাধারণের উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রণয়নে সাহায্য নিয়ে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক এতই গভীর যে, সমাজবিজ্ঞানীকে যেমন বিভিন্ন তথ্যের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হতে হয় তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকেও বিভিন্ন তথ্যের জন্য সমাজবিজ্ঞানীর মুখাপেক্ষী হতে হয়। তাই অধ্যাপক গিডিংস বলেন- “সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলো সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়”।

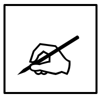

অনুশীলনী ১ (Activity : 1) **সময় : ৫ মিনিট**

www.swapno.in

প্রাচীনকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না - কখন, কেন এ দু'টি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল।

সারাংশ ঃ

পূর্বে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যেতো না। রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন অর্থে বুঝানো হত। আধুনিককালে সমাজ ও রাষ্ট্র দুটি ভিন্ন সত্তায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে উভয় শাস্ত্র পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সমাজবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের সম্পূর্ণ দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে, আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই সমাজস্থ মানুষের কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিককে নিয়ে আলোচনা করে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজ বিজ্ঞানের শাখা বিজ্ঞান বলা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় কি?

ক) মানুষের সম্পূর্ণ জীবন প্রণালী   খ) রাষ্ট্রীয় বিধি–বিধান
গ) সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি   ঘ) সমাজ বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি কি?

ক) বস্তুনিষ্ঠ   খ) আদর্শনিষ্ঠ
গ) দার্শনিক   ঘ) নৈতিক

৩। সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরস্পরিক সম্পর্ক কি ধরনের?

ক) পরিপূরক   খ) বৈরীমূলক
গ) ঘনিষ্ঠ   ঘ) অগভীর

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি

পাঠ
৩

মূলধারণা

- অর্থনীতির সংজ্ঞা ও ধারণা
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক
- সামাজিক কার্যাবলীর সাথে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সম্পর্ক
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১। অর্থনীতির সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
২। অর্থনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণালাভ করতে পারবেন;
৩। অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও সামাজিক কার্যাবলীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা খঁজে বের করতে পারবেন;
৪। সমাজবিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক সমন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

সমাজস্থ মানুষের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক কান্ড অন্যতম। মানুষের জীবনের যে দিকটি বাস্তব জগৎ তথা উৎপাদন, বন্টন ও উপভোগের সাথে জড়িত সেটিই তার অর্থনৈতিক দিক। অর্থনীতি মানুষের জীবন যাত্রার ঐ ক্ষেত্র নিয়েই আলোচনা করে।
প্রাচীন কাল থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকে জানতে গিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বিশ্লেষণ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মূলত সমাজের পারিপাশ্বিকতা, সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সমাজ থেকে আলাদা করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।
প্রাচীন ও আধুনিক কালের সকল অর্থনীতিবিদই এবিষয়ে সম্যক অবগত আছেন যে, অন্যান্য সামাজিক তথা আচরণমূলক বিজ্ঞান (Bhaviourial Science) এর ভিত্তি হচ্ছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের বিভিন্ন আচারণমূলক কর্মকান্ড। তাঁরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের অর্থনৈতিক চিন্তা – ভাবনা ও কর্মকান্ড সবকিছুই মূলত সামাজিক কাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে।
অতএব কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে জানতে হলে বুঝতে হলে আগে সামাজিক অবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা প্রয়োজন।

মানুষের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক আলোচনা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ অর্থহীন ও অবাস্তব হতে বাধ্য। তাছাড়া, যেহেতু সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সমাজস্থ মানুষকে ঘিরেই আবর্তিত সেহেতু সমাজ ও উহার কাঠামো অনুধাবন করা ছাড়া অর্থনৈতিক আলোচনা অবান্তর।

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক আচরণকে বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সমাজস্থ মানুষের জীবন যাত্রার মান বিশেষভাবে নির্ভর করে সেই সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর। মানুষের জীবন ধারা অর্থনৈতিক গতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক আচরণকে বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সমাজস্থ মানুষের জীবনযাত্রার মান সংশ্লিষ্ট সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে । মানুষের জীবন ধারা অর্থনৈতিক গতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া অর্থনীতির আলোচনা যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি অর্থনৈতিক ধারণা ব্যতীত সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাও অর্থপূর্ণ হয় না।

সমাজ ও অর্থনীতির মধ্যে এত গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান। যেমন, সমাজবিজ্ঞান মানুষের জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু অর্থনীতি শুধু মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে ব্যাপৃত থাকে।

অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় হল মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন, সেসবের বন্টন ও উপভোগ, এবং সম্পদ সঞ্চয় ও লগ্নি ইত্যাদি। আর সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হল সমাজ ও মানুষ।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি থেকে অর্থনীতির পরিধি অনেক ক্ষুদ্র। কারণ অর্থনীতি সমাজ জীবনের মাত্র একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে সমাজবিজ্ঞান সমগ্র সমাজ ও সমাজস্থ মানুষকে নিয়ে আলোচনা করে।

অর্থনীতির পরিধির চেয়ে সমাজবিজ্ঞানের পরিধি তাই অনেক ব্যাপক। অর্থনীতিকে সামজবিজ্ঞানের একটি শাখা বিজ্ঞানও বলা যেতে পারে।

অতএব আমরা উপরের আলোচনা থেকে বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের দু'টি পৃথক শাখা হলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। বলা যায় সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি পরস্পর দু'টি সম্পূরক বিজ্ঞান। কারণ সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া যেমন অর্থনীতি কে জানা যায় না তেমনি অর্থনৈতিক জ্ঞান ছাড়া সমাজবিজ্ঞানকেও সম্যকভাবে উপলব্দি করা যায় না।

অনুশীলনী ১ (Activity : 1) **সময় : ৫ মিনিট**

সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয়গুলো আলাদাভাবে লিখুন -

সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় -

অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় -

সারাংশ ঃ
সমাজের বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অন্যতম। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মূলত সমাজের পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। তাই সমাজবিজ্ঞানের সাথে অর্থনীতির একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং এ জন্য এ দু'টি সামাজিক বিজ্ঞান একে অন্যের সম্পূরক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

www.swapno.in

১। অর্থনৈতিক আলোচনা কখন অবান্তর হয়ে পড়ে?
ক) যখন সামাজিক সংগঠন পর্যালোচনা করা হয় না।
খ) যখন-মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় না।
গ) যখন মানুষের জীবন প্রণালী আলোচনা করা যায় না।
ঘ) যখন সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

২। মানুষের জীবন ধারা কোন নিয়ামকটি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত?
ক) জৈবিক খ) অর্থনৈতিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) প্রাকৃতিক

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস

পাঠ ৪

মূলধারণা

- ইতিহাসের সংজ্ঞা ও ধারণা
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক
- ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু
- ঐতিহাসিক ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষাপট
- অনুশীলনী
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objective)

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১। ইতিহাসের সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
২। ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন;
৩। ঐতিহাসিক ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন;
৪। সমাজবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক উপলব্ধি করতেপারবেন।

> ইতিহাস সকল ঘটনাকে স্থান, কাল ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করে এবং এভাবে মানব সমাজের ক্রমবিকাশের একটা সুস্পষ্ট রূপ তুলে ধরে।

ইতিহাসের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। উভয়ের পটভূমি মানুষের সমাজ এবং উভয়ের অভিন্ন আলোচ্য বিষয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংঘটিত সকল ঐতিহাসিক ঘটনা।
সমাজবিজ্ঞান সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাসও সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে। তবে ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীকে বেশী প্রাধান্য দেয়।
ইতিহাস হচ্ছে অতীতের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ। ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে অতীতকে বর্তমানের কাছে অর্থবহ করে তোলে। আর অতীতের ঘটনা বস্তুত মানুষ এবং তার সমাজের ক্রম বিবর্তনের ঘটনা।
সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাস উভয়ই তথ্যভিত্তিক। ইতিহাসে যেভাবে ধারাবাহিকভাবে অতীতের ঘটনাবলী সন্নিবেশিত থাকে তেমনি সমাজবিজ্ঞানেও মানুষের সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের বিবরণ ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত থাকে।
সাধারণত ইতিহাস অতীতের ঘটনা আলোচনায় রাজ্যের উত্থান, পতন, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তিসন ও শতাব্দী ইত্যাদি বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অপরদিকে, সমাজবিজ্ঞান মানব সমাজের অতীত এবং বর্তমান ঘটনাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে ঘটনার কার্যকারণ নির্ণয় করে।
ইতিহাস যুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরে। পক্ষান্তরে সমাজবিজ্ঞানীগণ যুদ্ধের সামাজিক প্রতিক্রিয়া আলোচনা করেন।
ইতিহাস চর্চায় তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন -
ক) ঘটনার যথাযথ বর্ণনা (খ) বর্ণিত ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা, এবং (গ) ঘটনার কার্যকারণ নির্ণয় করা।

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞানীরা ইতিহাসের আলোচনায় এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে সংঘটিত ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করেন। অর্থাৎ কোন পরিবেশে ঘটনাটি ঘটছে তার সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেন। আধুনিক কালে মূল তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে পর্যালোচনা করা হয়।

ইতিহাস শুধু অতীতের ঘটনা নিয়েই পর্যালোচনা করেনা, ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনাও দিয়ে থাকে। ইতিহাস অতীতের অনুবীক্ষণ, বর্তমানের জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। বর্তমানকে বিশ্লেষণ করতে হলে সমাজবিজ্ঞানীদের অতীতের ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতাকে জানতে হয়। এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান ইতিহাসের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধশালী করে। অতএব ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ই ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ।

উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এ দু'টি শাস্ত্র স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃত পেয়েছে। যেমন, ইতিহাস অতীতের ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা দিয়ে থাকে, আর সমাজবিজ্ঞান অতীতের তথ্য সংগ্রহ করে সেই তথ্যকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আলোচনা করে। এদিক থেকে বলা যায়, ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানকে অতীত জীবনের বিভিন্ন দিক তথা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণ দিয়ে সাহায্য করে।

নিম্নে আমরা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যগুলি আলোচনা করছি।

ইতিহাস স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাসমূহের পর্যালোচনা করে। আর সমাজবিজ্ঞান সেই ঘটনাসমূহের সামাজিক ও মানবিক প্রভাব বিশ্লেষণ করে।

সমাজবিজ্ঞান একটি অন্যতম সামাজিক বিজ্ঞান। ইতিহাসকেও সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত করা যায়। সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা তথা পদ্ধতির নাম ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান। যে সামাজিক ইতিহাস আসলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শ্রেণী সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় করে সে-সামাজিক ইতিহাসই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান ও সাধারণ ইতিহাসের মধ্যে সেতুবন্ধন স্বরূপ।

ইতিহাস বর্ণনামূলক কিন্তু সমাজবিজ্ঞান বিশ্লেষণধর্মী বিষয়।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, ঐতিহাসিকগণ যখন ইতিহাস লিখেন তখন সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার ফলাফল গ্রহণ করে থাকেন। আবার সমাজবিজ্ঞানও অনেকাংশে ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বলা যায় ইতিহাস ও সামজবিজ্ঞান গভীরভাবে সম্পর্কিত।

অনুশীলনী ১ (Activity : 1) **সময় : ১০ মিনিট**

আপনার জানা যে কোন একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষাপট ১০ টি বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

সারাংশ ঃ

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস উভয়ই মানুষের সমাজ ও সামাজিক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাস মূলত অতীত ও বর্তমান ঘটনার যথাযথ বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও কার্যকারণ নির্ণয় করে - আর সমাজবিজ্ঞান ঐসব ঘটনার সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রতিক্রিয়া আলোচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীকে কি করে?
- ক) বিশ্লেষণ করে
- খ) সংশ্লেষণ করে
- গ) ধারাবাহিকভাবে তথ্য সন্নিবেশিত করে
- ঘ) ব্যাখ্যা করে।

২। ইতিহাস চর্চায় কোন বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
- ক) ঘটনার কাল ও কার্যকারণ
- খ) ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কার্যকারণ
- গ) ঘটনার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট
- ঘ) ঘটনার পুনারাবৃত্তি, সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

পাঠ ৫

মূলধারণা

- মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও ধারণা
- সমাজবিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক
- মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি -

১. মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. সমাজবিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে পারবেন।
৩. মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

মানুষের পারস্পরিক বন্ধনের যৌগিক রূপই হচ্ছে সমাজ। স্বয়ং মানুষই হচ্ছে এর রূপকার। আবার মানুষ নিজেই তার সমাজের ফল। মানুষ যেসব বন্ধনের বশবর্তী হয়ে সমাজবদ্ধভাবে বাস করে সেসব অনেক ক্ষেত্রেই মানসিক।

মনোবিজ্ঞানকে বলা হয় ব্যক্তির আচরণের বিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির আচার–ব্যবহার, তার মনোভাব, তার শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে। মানুষ যা কিছু চিন্তা করে এবং যেরূপ আচরণ করে তা পরিনামে সমাজের উপরই বর্তায়।

সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজস্থ মানুষ। আর মনোবিজ্ঞান সেই সমাজস্থ মানুষের মনোজগত ও মানবিক আচরণ বিধি নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে।

> মানুষের স্নেহ, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ও মূল্যবোধ সংরক্ষণ এসবই হচ্ছে মনোজগতের বিষয়। মনোবিজ্ঞান মানুষের উক্ত মনোজগত নিয়েই আলোচনা করে।

সমাজ হল মানুষের পারস্পরিক বন্ধনের যৌগিক রূপ। অর্থাৎ মানুষের স্নেহ, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ও মূল্যবোধ সংরক্ষণ-এ সবই হচ্ছে মনোজগতের বিষয়। মনোবিজ্ঞান উক্ত মনোজগত নিয়েই আলোচনা করে।

মানুষের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে সমাজ। আর মানবিক বন্ধনের মূলে রয়েছে মানুষের এক বিশেষ ধরনের মানসিকতা, তাকে মনোবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে।

মনোবিজ্ঞানকে মানুষের আচরণের বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে, যা স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকইভারের মতে সমাজজীবনে যা কিছু একজন জীবিত মানুষ করে কিংবা যা কিছু ইতিহাস ও অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় তার সবই হল মানসিক ঘটনা। তাই বলা হয় মনোবিজ্ঞান মানুষের মানসিক শক্তির ভারসাম্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে।

তবে মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের মন, মানুষ নয়। আর সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল মানুষের সামগ্রিক সত্তা, অর্থাৎ মানুষের সম্পূর্ণ জীবন প্রণালী। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি মানোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা।

মানুষের মনোজগত বিচিত্র ও গতিশীল। মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়ে সমাজের সৃষ্টি করেছে। তাই মানুষের মায়া–মমতা, ভালবাসা ও সহানুভূতির বন্ধনের মাধ্যমেই পরিবার তথা সমাজের সৃষ্টি ও স্থায়িত্বলাভ করেছে। এসবই মানুষের মনের ব্যাপার। মানুষ যেখানেই দলবদ্ধ হয়েছে, সমাজবদ্ধ হয়েছে সেখানেই মানুষের মনের দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছে। পারস্পরিক

www.swapno.in

পাঠ ৬

বন্ধন, ভালবাসা তথা সমাজকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মানুষকে তার ম... বিরুদ্ধে অনেক সময় আপোষ করতে হয়। এর ফলে গড়ে উঠে সভ্যতা ও সংস্কৃ... মাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও গবেষণা করতে হলে সমাজবিজ্ঞা... জ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের উপর কতকাংশে নির্ভরশীল।

মনোবিজ্ঞান শুধুমাত্র মানুষের আচার আচরণ তথা মনোজগতকে নিয়ে আলোচনা করে। আর সমাজবিজ্ঞান সেই আচরণের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করে। সমাজবিজ্ঞান মানুষের আচরণের শুধু সামাজিক প্রেক্ষপটকেই বিশ্লেষণ করেনা - সমাজবিজ্ঞান মানুষের আচরণের অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটকেও আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। মনোবিজ্ঞানও মানুষের আচরণ নিয়ে গবেষণা করে, তবে সমাজবিজ্ঞানের মত এত গভীর এবং ব্যাপক নয়।

তাই এটা সুস্পষ্ট যে, সমাজবিজ্ঞানের পরিধি মনোবিজ্ঞানের পরিধির চেয়ে অনেক ব্যাপক। তবে উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে পদ্ধতিগত ও বিষয় বস্তুর দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে বেশ সাদৃশ্যও রয়েছে।

পরিশেষে আমরা উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান উভয়ই মানুষকে নিয়েই আলোচনা করে। তবে সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশকে নিয়ে আলোচনা করে। আর মনোবিজ্ঞান মূলত মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে নিয়ে আলোচনা করে। অতএব উভয়ের আলোচ্য বিষয় এক অর্থে অভিন্ন।

অনুশীলনী ১ (Activity : 1) **সময় : ৫ মিনিট**

"মানুষের মানসিকতার বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে সমাজ" - ৫টি বাক্যদ্বারা একথাটি ব্যাখ্যা করুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

সারাংশ ঃ

সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজ বিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজস্থ মানুষ আর মনোবিজ্ঞান সেই মানুষের মনোজগত এবং মানবিক আচরণ নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। মনোবিজ্ঞানকে কিসের বিজ্ঞান বলা হয়?
- ক) সামাজিক বিজ্ঞান খ) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান
- গ) আচরণের বিজ্ঞান ঘ) মানবিক বিজ্ঞান

২। মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় কি ?
- ক) মানুষের মন খ) মানুষের আত্মা
- গ) মানুষের দেহ ঘ) সমাজের কার্যকলাপ

www.swapno.in

মূলধারণা

- সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা ও ধারণা।
- সমাজবিজ্ঞানে সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক।
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objective)

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. সমাজকল্যাণের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. সমাজবিজ্ঞানের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক জানতে পারবেন।
৩. সমাজকল্যাণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ

সমাজস্থ মানুষের সমস্যা সমাধান করে মানুষের আর্থ সামাজিক সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা সমাজকল্যাণের মূল উদ্দেশ্য।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের 'সমাজবিজ্ঞান' ও 'সমাজকল্যাণ' এই দুটি বিষয় সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

সমাজবিজ্ঞান হল সমাজের বিজ্ঞান, যা সমগ্র সমাজকে নিয়ে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, অনুষ্ঠান–প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ আস্থা–বিশ্বাস এক কথায় সমগ্র সমাজকে বিশ্লেষণ করে।

অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ সমাজসেবার সংগঠিত ব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনা করে। সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে ও মানুষের জীবনে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা সমাজকল্যাণের মূল উদ্দেশ্য। সমাজস্থ মানুষের জীবন মান ও স্বাস্থ্যের মান উন্নতি এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মঙ্গল সাধনের জন্য সমাজকল্যাণ ব্যাপৃত থাকে। সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ উভয়ই মানব সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে। সমাজকল্যাণ সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে কিভাবে মানুষের মঙ্গল সাধন তা নিয়ে আলোচনা করে।

সমাজকল্যাণ সামাজিক সমস্যার আশু সমাধানে অধিকতর তৎপর। সমাজ কল্যাণ সামাজিক সমস্যা দূর করে মানুষের আর্থ–সামাজিক সুখ ও সমৃদ্ধি প্রদানে নিয়োজিক থাকে। অর্থাৎ মানুষের মঙ্গল সাধনই হচ্ছে সমাজকল্যাণ নামক বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য।

সমাজবিজ্ঞান তার গবেষণার মাধ্যমে সমাজের সমস্যাকে সুচিহ্নিত করে। আর সংশ্লিষ্ট সমাজের কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই সামাজিক সমস্যার স্বরূপ সমাজবিজ্ঞানে নির্বাচিত হয়। কিন্তু সমাজকল্যান শুধু সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রায়োগিক দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

তবে সমাজের সমস্যা দূর করে সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজকল্যাণকে সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। যদিও সমাজবিজ্ঞান কোন সামাজিক সমস্যার আশু সমাধান করেনা- কিন্তু সামাজিক সমস্যা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে কোন সমস্যাকে সুষ্ঠুভাবে মোকাবেলা করা যায় না। সমাজবিজ্ঞান যেভাবে সমাজ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করে তা সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয়।

উপরের আলোচনা হতে আমরা বুঝতে পারি যে, সামাজিক সমস্যাবলী দূর করতে হলে সমাজকল্যাণের ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই সামাজিক সমস্যার কারণ ও সংশ্লিষ্ট সমাজ কাঠামো

www.swapno.in

সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আর সে জ্ঞান অর্জন করতে হলে সমাজ কল্যাণকে সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে হয়।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিজ্ঞান তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করে, কিন্তু সমাজকল্যাণ সেই জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সক্রিয় ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান যেহেতু সমাজ তথা সমাজস্থ মানুষের সার্বিক জীবনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে সেহেতু সেই সমাজস্থ মানুষের কল্যাণ করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনাবিদদেরকে তাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সমাজবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। আর সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিক থেকে সমাজবিজ্ঞানীকে সমাজের ডাক্তার এবং সমাজকল্যাণকর্মীকে নার্স বলা যায়।

অনুশীলনী ১ (Activity : 1) **সময় : ৭ মিনিট**

সমাজকল্যাণকর্মীকে সমাজের নার্স বলা হয় একথাটি ৫টি বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

১।
২।
৩।
৪।
৫।

সারাংশ

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ নামক বিষয় দুটোর মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, অনুষ্ঠান– প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আস্থা–বিশ্বাস এককথায় সমগ্র সমাজকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করে। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ সমাজসেবার সংগঠিত ব্যবস্থাকে নিয়ে আলোচনা করে। এককথায় সমাজবিজ্ঞানীকে সমাজের ডাক্তার ও সমাজকল্যাণকর্মীকে সমাজের নার্স বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। সমাজকল্যাণের মূল লক্ষ্য কি?
   ক) সমাজের সমস্যার সমাধান করা।
   খ) সমাজের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা।
   গ) সমাজের মানুষের কল্যাণ করা।
   ঘ) সমাজকে সেবা করা।

২। সমাজকল্যাণ কি ধরনের জ্ঞান দান করে?
   ক) তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করে।
   খ) ফলিত জ্ঞান দান করে।
   গ) রুটিন–মাফিক জ্ঞান দান করে।
   ঘ) বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায়োগিক জ্ঞান দান করে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন? সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
২। ক) নৃবিজ্ঞানকে কয়টি শাখায় ভাগ করা হয়?

www.swapno.in

খ) নৃবিজ্ঞানের শাখাসমূহের আলোচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।
গ) নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান কিভাবে কোন শতকে বিকাশ লাভ করে আলোচনা করুন।

৩। সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে? সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৪। ক) সমাজকল্যাণের মূল উদ্দেশ্য কি? আলোচনা করুন।

৫। সমাজবিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৬। ক) প্রাচীনকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হতো না কেন? এর সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।
খ) 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টি আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আলোচনা করুন।
গ) সমাজবিজ্ঞান যে মানুষের সমগ্র জীবন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সেই মানুষের স্থান কোথায়? আলোচনা করুন।

৭। সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৮। ক) কোন দেশের অর্থনীতিকে জানতে হলে আগে সেই দেশের কোন অবস্থাকে বুঝতে হয়? আলোচনা করুন।
খ) অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয় কি? উল্লেখ করুন।

৯। সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন। সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন।

১০। ক) ইতিহাস বলতে আপনি কি বুঝেন?
খ) ইতিহাস চর্চায় কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়? আলোচনা করুন।

১১। সমাজবিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১ ঃ (১) ক, (২) খ, (৩) গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২ ঃ (১) ক, (২) খ, (৩) গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩ ঃ (১) ক, (২) খ,।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪ ঃ (১) ক, (২) ক,।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫ ঃ (১) ক, (২) ঘ,।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬ ঃ (১) গ, (২) ক।

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহ

পাঠ ১

ভূমিকা ঃ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। প্রাচীনকালে মানুষ আধুনিক কালের ন্যায় সুশৃঙ্খল সমাজে বাস করতো না। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ সমাজের উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে পরস্পর নির্ভরশীল হয়েছে। এই নির্ভরশীলতার সমাজের কতগুলো অলিখিত নিয়ম কানুন রয়েছে। সমাজবদ্ধ মানুষ জীবনকে আরো উন্নত করার জন্য প্রতিনিয়ত প্রয়াস চালাচ্ছে। তাই মানুষ সমাজ সৃষ্টির সাথে সাথে কতগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে সমাজবিজ্ঞানীরা কতগুলো প্রাথমিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছেন। এসবের মধ্যে সমাজ, সম্প্রদায়, সংঘ বা সমিতি, প্রতিষ্ঠান ও দল অন্তর্ভুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের এই প্রাথমিক প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষাসূচী ঃ

এই ইউনিটে ৫ টি পাঠ রয়েছে। প্রতিটি পাঠ ৪৫ মিনিটের। পাঁচটি পাঠ সম্পন্ন করার জন্য আপনার ২২৫ মিনিট সময় লাগবে। এছাড়া, পাঁচটি পাঠে মোট ৯টি অনুশীলন (Activity) দেওয়া হয়েছে। এ অনুশীলনগুলোর (Activities) এর জন্য অতিরিক্ত ৫৫ মিনিট সময় লাগবে। নিম্নের সারণীর মাধ্যমে আপনি পড়ার সময়কে ভাগ করে নিতে পারবেন।

দিন	নির্ধারিত সময়	পাঠ/পাঠের অংশ বিশেষ	অনুশীলন	মন্তব্য
শুক্রবার				
শনিবার				
রবিবার				
সোমবার				
মঙ্গলবার				
বুধবার				
বৃহস্পতিবার				

কখন পড়বেন ঃ

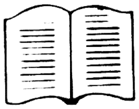

একটু ভাবুনতো আপনার হাতে লেখাপড়ার সময় কতটুকু এবং কখন আছে? – ভেবেছেন। আপনি যদি চাকুরীজীবী, শ্রমজীবী, পরিবারের দায়িত্বশীল বা কর্তা ব্যক্তি হন তাহলে দেখা যাবে প্রতিদিন বিকেলের পর হতে রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আপনি পড়াশুনা করার সময় পেয়ে থাকেন। এ সময়টুকু আপনি আপনার পড়াশুনার জন্য ব্যয় করে ভাল ফলাফলের অধিকারী হতে পারবেন। মনে রাখবেন প্রতিদিন যা পড়বেন তা ঘুমানোর সময় একটু মনে করার চেষ্টা করুন। অনুশীলন গুলো করার পর বুঝতে পারবেন যে, আপনি পাঠটি ভালভাবে শিখেছেন কিনা। ইউনিট শেষে রচনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হতে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা, এসাইনমেন্ট ইত্যাদি দেওয়া হবে। তাই পুরো ইউনিটটি খুব ভাল করে পড়বেন।

সমাজ

www.swapno.in

মূলধারণা

- সমাজের সংজ্ঞা
- সমাজের উপাদান
- সমাজের বৈশিষ্ট্য
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

১। সমাজ বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন।

২। মানুষ কেন সমাজবদ্ধ হয়েছিল তা জানতে পারবেন।

৩। সমাজের বৈশিষ্ট্য সমূহ জানতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ

'সমাজ' সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়। তাই সমাজ বলতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীদের সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে গিয়ে সমাজ সৃষ্টি করেছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি করছে। তাই সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। মানুষ যখনই সমাজের আইন—কানুন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস মেনে চলেনা তখনই সে সমাজের কাজে হেয় প্রতিপন্ন হয়। সমাজের মূল্যবোধগুলোর ভেতর দেশ ভেদে পার্থক্য থাকতে পারে। তাছাড়া, প্রতিটি সমাজে কতগুলো সাধারণ নিয়মকানুন রয়েছে, যা সবাইকে মেনে চলতে হয়। সমাজ সম্পর্কে আমাদের সকলেরই একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে। তবে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

সাধারণত সমাজ বলতে আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝি। শুরুতে সমাজ বলতে মানুষের সব রকম পারস্পরিক সম্পর্ককেই বুঝাত, যেমন ম্যাকাইভার বলেন, "সামাজিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ রূপই হল সমাজ।" সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস বলেন মানুষকে নিয়েই সমাজ, মানুষ পরস্পরের সাথে যৌথভাবে মিলেমিশে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি একত্রিত হয় বা কোন সংগঠন গড়ে তোলে তবে তাকে সমাজ বলে। কিন্তু আমরা মানুষের সাথে মানুষের সবরকম সম্পর্ককে সামাজিক সম্পর্ক বলতে পারিনা। কারণ সে সম্পর্ক যদি পারস্পরিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গড়ে না উঠে তবে তাকে 'সমাজ' বলা যায় না। সমাজজ্ঞানী ম্যাকাইভার সমাজ বলতে সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিককে বুঝিয়েছেন - যার মধ্যে আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। এরিষ্টটল বলেছেন 'মানুষ সামাজিক জীব', সমাজবিহীন মানুষ হয় দেবতা, না হয় পশু।

সুপ্রাচীনকাল থেকে মানুষ সমাজে বাস করে আসছে। সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে সমাজে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান।

সমাজবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজ। কাজেই সমাজ বলতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিশু জন্ম থেকে আমৃত্যু সমাজেই বাস করে, সমাজই শিশুকে সামাজিকতা শিক্ষা দেয়। সমাজের সৃষ্টিও মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও অভাব পূরনের

www.swapno.in

জন্য হয়েছে। সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের মাঝেই মানুষ তার কর্মদক্ষতাকে প্রকাশ করে ও প্রয়োজনাদি মিটিয়ে থাকে। আবার প্রয়োজনে সমাজকে নিয়ন্ত্রণও করে। কেননা নিয়ন্ত্রণহীন সমাজ মানুষের কাম্য নয়।

মানুষের যে কোন সমষ্টি বা সমাবেশকে সমাজ বলা যায় না। সমাজ হচেছ পরস্পর সম্পর্কিত একটি সামাজিক সত্তা। সমাজ বলতে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত জনসমষ্টিকে বুঝায়। এদিক থেকে সমাজ, সংঘ বা সমিতির সমতুল্য।

ম্যাকাইভার সমাজ বলতে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যখন একাধিক ব্যক্তি একত্রে বসবাস করে তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ঐক্য বোধ না থাকলে সমাজ গঠিত হতে পারেনা। ম্যাকাইভার সমাজের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেনঃ "সমাজ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে প্রথা-প্রণালী, কর্তৃত্ব, ও পারস্পরিক সাহায্য, বিভিন্ন দল ও শ্রেণী, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকে ও রক্ষিত হয়। তাঁর মতে এ ব্যবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল ও জটিল। আর ঐ জটিল পরিবর্তনশীল ও জটিল ব্যবস্থারই অপর নাম 'সমাজ'।

তাহলে সমাজ বলতে মানুষের সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিককে বুঝায় - যার মাধ্যমে তাদের সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়। অর্থাৎ যে সম্পর্কের মধ্যে তারা জন্মগ্রহণ করে ও জীবন যাপন করে - তার সংগঠিত রূপই হল সমাজ।

জিন্সবার্গ সমাজের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন - সমাজ হলো ব্যক্তির সমষ্টি - যারা, বিশেষ করে, সামাজিক সম্পর্ক ও আচার আচরণের মাধ্যমে একত্রীভূত - যা তাদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে পৃথক করে রাখে, যারা এ সম্পর্কে আবদ্ধ নয় অথবা আচার আচরণের দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সমাজবিজ্ঞানের মূল এবং প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সমাজ। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে ধারণা করা অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন কাজ।

সমাজকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে জানতে হলে সর্বপ্রথম জানতে হবে সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কিংবা সমাজ বলতে কি বুঝিয়েছেন।

সমাজবিজ্ঞানীগণ ব্যাপক অর্থে সমাজকে বলেছেন সামাজিক সম্পর্ক। অর্থাৎ সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সমাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট (Jisbert) বলেছেন সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল— যে সম্পর্কের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে।

মানুষের ইতিহাস আলোচনা থেকে জানা যায়, মানুষ সর্বদাই দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করত। কেননা দলবদ্ধ জীবন যাপন ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভবনা ছিল। তাই দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের একটা সহজাত ধর্ম। তাই তো এ্যারিস্টটল বলেছেন " যে সমাজে বসবাস করে না সে হয় পশু, না হয় দেবতা।"

> সাধারণত দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে কোন জন সমষ্টিকে সমাজ বলা যায়। তা-হলো-
> ১) বহুলোকের সংঘবদ্ধ ভাবে বসবাস।
> ২) এই সংঘবদ্ধতার পিছনে কোন একটি উদ্দেশ্য থাকা।

সমাজবিজ্ঞানে 'সমাজ' নামক প্রাথমিক প্রত্যয়টির একক এবং সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা নাই। বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ব্যাপক অর্থে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সামাজিক রূপকে সমাজ বলে। সমাজ বলতে কতিপয় অনুভূতিক্ষম একই জাতীয় জীবের সমষ্টিকেও বুঝায়। আবার কখনও বা একই মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মানসিক ঐক্য ও অনুভূতিকে বুঝায়। সাধারণত দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে কোন জন সমষ্টিকে সমাজ বলা যায়। তা-হলো-

১) বহুলোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস
২) এই সংঘবদ্ধতার পিছনে কোন একটি উদ্দেশ্য থাকা।

www.swapno.in

সমাজের অস্তিত্বের এ দুটি শর্ত পূরণ করতে হলে সংঘবদ্ধ মানুষের মধ্যে পরস্পরিক স্বীকৃতি ও অভিন্ন অনুভূতি থাকা আবশ্যক।

অর্থাৎ যখন বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখনই তাকে সমাজ বলা হয়। মানব সমাজের উৎপত্তির ধারণা করা বেশ কঠিন কাজ। সমাজবিজ্ঞানী মূলত সমাজের কার্যকারণ সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করে সমাজ ও মানুষের সমাজ জীবনের বিকাশ সম্পর্কে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন।

মানব সমাজের উৎপত্তি কখন কি ভাবে হয়েছিল তা আজও অস্পষ্ট। কারণ এর সূত্রগুলিকে সঠিকভাবে আবিষ্কার করা আজও সম্ভব হয়নি। এজন্য সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী অভিন্ন মত পোষণ করতে পারেননি।

সে যা হোক বিভিন্ন বিজ্ঞানী সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেও মানুষ যে সামাজিক জীব এই সত্যকে কেউই অস্বীকার করেননি, বরং এই সত্যের উপর ভিত্তি করে সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মানব সমাজের উৎপত্তির কথা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন কাল থেকেই মানব সমাজের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিষ্টটল থেকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী -সকলেই মনে করেন যে, সমাজের উৎপত্তির কারণ মানুষ এবং তার আপন প্রয়োজন মেটানোর অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা।

আদিম যুগে মানুষ ছিল অসহায় ও নিঃস্ব। তখন মানুষের জীবনে ছিল নানাবিধ সমস্যা। টিকে থাকাই ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঋতুচক্রের আবর্তন, খরা, প্লাবন ইত্যাদি বহুবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে একক ভাবে জীবন রক্ষাকরা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মানুষ এক পর্যায়ে সংঘবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল।

মানব সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের কারণ খুঁজতে গিয়ে পাশ্চাত্যের কয়েকজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অভিন্ন মত পোষণ করে বলেন মানুষ সর্বপ্রথম দলবদ্ধভাবে বাস করত; পরে মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

যেমন, প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মন্টেস্কু মনে করেন যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ে, বন্যজন্তুর আক্রমণের আশংকায় মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস আরম্ভ করে এবং পরে ধাপে ধাপে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তথা মানুষের সমাজ গড়ে ওঠে।

সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁতের মতে মানব সমাজ হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে এবং প্রয়োজন মিটানোর তাগিদে ক্রম বিবর্তনের ধারায় সমাজ নতুন নতুন রূপ ধারণ করে। অন্যদিকে, আবার অনেক সমাজবিজ্ঞানীই সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে ডারউইনের বিবর্তনবাদের মিল খুঁজে পান, যেমন - সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসার এবং সামাজিক নৃবিজ্ঞানী মরগান ও টাইলরের বিশ্লেষণে বিবর্তনবাদের প্রভাব লক্ষণীয়।

> মানুষের আপন জীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। তবে সমাজের সৃষ্টি এক দিনে কিংবা হঠাৎ করে হয়নি। ধাপে ধাপে মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তন ঘটেছে।

প্রকৃত পক্ষে উপরে উল্লিখিত সমাজবিজ্ঞানীও সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা এবং বিশ্লেষণ হতে বুঝা যায় যে - মানুষের আপন জীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। তবে সমাজের সৃষ্টি এক দিনে এবং হঠাৎ করে হয়নি। ধাপে ধাপে মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তন ঘটেছে। সেজন্য বলা হয়, সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশের সঠিক ইতিহাস উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করা খুবই দুষ্কর।

তবে উক্ত আলোচনা থেকে আমরা এটুকু বলতে পারি যে - মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির চরিতার্থের জন্য, আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহের প্রয়োজনে, জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এবং শিক্ষা ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষেরই সৃষ্ট সমাজেই স্বাভাবিকভাবে সামাজিক জীবন যাপন করে।

www.swapno.in

আদিম যুগে মানুষ যেমন দলবদ্ধভাবে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেছিল তেমনি বর্তমানে তার প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রয়োজন যেমন বেড়েছে তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জটিলতাও বেড়েছে।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, সমাজের অর্থ হচ্ছে সুদৃঢ় মানসিক বন্ধন। কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের সকল সম্পর্ককে আমরা 'সমাজ' বলে গণ্য করতে পারিনা।

এছাড়া মানুষের যেকোন সমষ্টি কিংবা সমাবেশকে সমাজ বলা যায় না। যেমন, ট্রেনের একদল যাত্রী ঢাকার যাওয়ার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে ট্রেনে উঠেছে – তাদেরকে সমাজ বলা যায় না, যদিও তাদের সকলেরই অভিন্ন গন্তব্য স্থল ঢাকা। কারণ সমাজ বলতে আমরা বুঝি সমাজভুক্ত সদস্যদের পরস্পরিক সম্পর্কের সচেতনতা এবং তাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত প্রয়াস। অর্থাৎ সমাজ হল পরস্পর সম্পর্কিত একটি জনসমষ্টি যেখানে সবাই পরস্পরের যোগাযোগ সম্পর্কে সচেতন। সুতরাং সমাজ বলতে আমরা বুঝি সমাজভুক্ত সদস্যদের পরস্পরিক সম্পর্কের সচেতনতা এবং তাদের আচার আচরণ ও স্বার্থের সাদৃশ্য।

যদিও সমাজের একটিমাত্র এবং সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা দেওয়া খুবই দুরূহ কাজ, তবু বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে সমাজকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

জিসবার্ট বলেন : (Gisbert) "Society in general consists in the complicated network of social relationship by which every human being is interconneted with his fellowmen."

অর্থাৎ " সাধারণভাবে সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের এমন একটি জটিল জাল বিশেষ, যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ।

গিডিংস (Giddings) বলেনঃ- "A Society is a naturally developing group of conscious being in which conversation passes into difinite relationship that in course of time are wrought into complex and enduring organization."

অর্থাৎ "সমাজ হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত একটি সচেতন মানবগোষ্ঠী যেখানে তাদের পারস্পরিক সচেতন আলোচনা একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে পর্যবসিত হয় এবং কালক্রমে উহা একটি স্থায়ী ও জঠিল সংগঠনে দৃঢ়বদ্ধ হয়।"

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট(Gisbert) বলেন, "পরোক্ষ সম্পর্ক এবং যেসব সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা সচেতন নই সেগুলোও সমাজ জীবনে মূল্যবান। সুতরাং মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোন আচরণের বেলাই ক্ষেত্রেই সমাজ কথাটাকে ব্যবহার করা যায়। মানুষের সে আচরণ প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক, সংগঠিত হোক বা অসংগঠিত হোক, সচেতন হোক বা অসচেতন হোক, সহযোগিতামূলক হোক বা শত্রুতামূলক হোক না কেন। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ তাদের Society নামক গ্রন্থে বলেছেন "Society is a system of social relationships in and through which we live." অর্থাৎ সমাজ হচ্ছে এমন সব সামাজিক সম্পর্কের একটি ব্যবস্থা যার মধ্যে আমরা জীবন যাপন করি।

ম্যাকাইভার ও পেজের মতে সমাজের অর্থ হচ্ছে সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা তথা যুদ্ধ–বিগ্রহের বিপরীত অবস্থা। কারণ যুদ্ধ–বিগ্রহ মানুষের ধ্বংস সাধন করে। অপরপক্ষে, সমাজ হচ্ছে পারস্পরিক সৃজনশীলতা তথা সহযোগিতা।

কিন্তু " সমাজের অর্থ সহযোগিতা" – ম্যাকাইভার ও পেজের এই ধারণাটি সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। মার্কসীয় ধারণায় এর সমালোচনা করা হয়েছে। মার্কসীয় মতবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে সহযোগিতার বিপরীত অবস্থা বিদ্যমান। সমাজে শ্রেণী সংঘাত রয়েছে। অতএব সমাজে সহযোগিতা এবং সংঘাত নামক উভয় সামাজিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বাভাবিক। কেননা সমাজের মধ্যে যুগপৎ সহযোগিতা ও সংঘাত বিদ্যামন থাকতে পারে।

www.swapno.in

উল্লিখিত দুজন সমাজবিজ্ঞানী আরো বলেন - "সমাজ হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল, যা পরিবর্তনশীল,"। তাই বলে টাইপরাইটারের সংগে টাইপিষ্টের এবং অগ্নির সংগে ধোয়ার সম্পর্ককে সামাজিক সম্পর্ক বলে আখ্যায়িত করা যায়না। কেননা এর একটির সংগে অন্যটির প্রতিক্রিয়া বুঝা যায় না। আসল কথা হচ্ছে যে, উক্ত দুটো ক্ষেত্রেই সামাজিক দিক অনুপস্থিত।

মূলত, সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। তাই আজ পর্যন্ত সমাজের কোন সংজ্ঞাই সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু সমাজ বলতে তারা অন্য কোন ব্যবস্থার কথা ভাবেননি। বরং বলা যায় যে, একই ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করার কারণ থেকেই তাদের মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

সমাজ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাই ঃ -

> সমাজ শব্দটি এমন একটি বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ করে যাকে অনুভব করা যায়।

১। সমাজ শব্দটি এমন একটি বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ করে যাকে অনুভব করা যায়।
২। সমাজে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংঘবদ্ধতা ।
৩। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই 'সমাজ' গড়ে ওঠে।
৪। সমাজ বলতে সমাজে বসবাসরত মানুষের পারস্পরিক কার্যাবলীকে বুঝায়।
৫। সমাজ অভিন্ন অনুভূতিক্ষম সমজাতীয় প্রাণীর সমষ্টি।
৬। সমাজ বলতে সহযোগিতাকে বুঝায়। সহযোগিতা ব্যতীত সমাজ টিকে থাকতে পারেনা।
৭। সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সমাজস্থ লোকদের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব কিংবা বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে।
৮। সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতা সব সমাজেই দেখা যায়। তবে দ্বন্দ্ব ক্ষণস্থায়ী। কেননা সহযোগিতার প্রাধান্য সব সমাজেই বেশী যে জন্য বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনা।
৯। সমাজ মানুষের সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল।
১০। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক সর্বদা পরিবর্তনশীল।
১১। সমাজে বসবাসরত মানুষের একটি অতীত ঐতিহ্য রয়েছে ।
১২। সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি, ধর্ম এবং জীবন প্রণালী ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সমাজে একত্রে বাস করার ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।
১৩। সমাজ একটি ব্যাপক প্রত্যয়। সমাজ বলতে সম্পূর্ণ মানব সমাজকে বুঝায়। আবার সীমিত অর্থে গ্রাম সমাজ, নারীসমাজ, লেখক সমাজ, পেশাজীবী সমাজ, শিক্ষিত সমাজ ইত্যাদি বুঝায়। শেযোক্ত অর্থে সমাজ আসলে একটি সমিতির (Association) সমতুল্য।

> মানুষ বেঁচে থাকার জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতা থেকে সৃষ্টি হয় মিথস্ক্রিয়া। মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক সম্পর্ক এবং পরিশেষে গড়ে উঠে সমাজ।

সে যা হোক, এসব হল সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সবসমাজেই এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে এমন কোন কথা বলা যায়না। সাধারণত, সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে সুনির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যবোধ, আদর্শ এবং নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। মানুষ সমাজে জন্মগ্রহণ করে উন্নত জীবন যাপনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সেজন্য তাকে এমন কতক রীতিনীতি ও আদর্শ মেনে চলতে হয় যার ফলে সৃষ্টি হয় সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক - যার অপর নাম 'সমাজ'।

অবশেষে উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, মানুষ বেঁচে থাকার জন্য একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতা থেকেই সৃষ্টি হয় মিথস্ক্রিয়া। মিথস্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় সামাজিক সম্পর্ক এবং পরিশেষে গড়ে উঠে সমাজ।

সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া

www.swapno.in

নির্ভরশীলতা → মিথস্ক্রিয়া → সামাজিক সম্পর্ক → সমাজ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সমাজের একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারি। মানুষ বেঁচে থাকার এবং জীবনকে উন্নত করার জন্য সর্বদা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যকথায় বলা যায় পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ এবং ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ারত এমন এক জনগোষ্ঠীর নাম হচ্ছে সমাজ। যে জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে তার নিজস্ব জীবন যাত্রা প্রণালী। অতএব সমাজ গঠিত হয় সেসব ব্যক্তি নিয়ে যাদের মধ্যে থাকে ভাবের আদান প্রদান পারস্পরিক মেলা মেশার সুগভীর সম্পর্ক।

www.swapno.in

অনুশীলনী - ১ (Activity - 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সমাজের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.

সারাংশ ঃ
সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক প্রত্যয়। সমাজ হলো অভিন্ন মনোভাব সম্পন্ন কতকগুলো ব্যক্তির সমষ্টি যেখানে প্রত্যেকে পরস্পরের অনুভূতির অংশীদার এবং সে কারণে তারা অভিন্ন লক্ষ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমবেতভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। অতএব আমরা বলতে পারি যে, সমাজ হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং যার ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক। অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের এক জটিল জালে আবদ্ধ জন গোষ্ঠীকেই সমাজ বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। সমাজের সৃষ্টি হয় -
ক) মানুষের নিজের জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে
খ) মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে
গ) বন্যজন্তুর আক্রমণের আশংকা থেকে দলবদ্ধ হয়ে
ঘ) প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে

২। 'সমাজ' সৃষ্টির প্রক্রিয়া কোনটি?
ক) সমাজ-সামাজিক সম্পর্ক - নির্ভরশীলতা মিথস্ক্রিয়া।
খ) মিথস্ক্রিয়া - নির্ভরশীলতা সামাজিক সম্পর্ক সমাজ।
গ) নির্ভরশীলতা - মিথস্ক্রিয়া সামাজিক সম্পর্ক সমাজ।
ঘ) সামাজিক সম্পর্ক - নির্ভরশীলতা- মিথস্ক্রিয়া - সমাজ।

৩। সমাজ শব্দটি কি ধরনের ধারণা প্রকাশ করে?
ক) বিমূর্ত ধারণা
খ) বাস্তব ধারণা
গ) অলৌকিক ধারণা
ঘ) লোকায়ত ধারণা

www.swapno.in

সম্প্রদায়

পাঠ ২

মূলধারণা

- সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা
- সম্প্রদায়ের ভিত্তি
- গ্রামীণ ও শহুরে সম্প্রদায়ের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য
- সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objective)

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১। সম্প্রদায় বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন;
২। সম্প্রদায়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্ক অবগত হবেন;
৩। সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উলবদ্ধি করতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ

সমাজবিজ্ঞানে সমাজের পরেই যে প্রাথমিক প্রত্যয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয় তা হলো 'সম্প্রদায়'। 'সম্প্রদায়' হচ্ছে অভিন্ন সামাজিক রীতিনীতির পালনে অভ্যস্ত জনসমষ্টি যেখানে জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজন মিটান সম্ভব। মানুষ আপন প্রয়োজনেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে শিখেছে। আর সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। তাই সম্প্রদায় বলতে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা অভিন্ন রীতিনীতি অনুসারী। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সুনির্দিষ্ট আচরণের ভিত্তিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে সমাজের একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে অভিন্ন মানসিকতা কে বিকশিত করে। সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন সম্ভব। সম্প্রদায়ের সদস্যরা সুস্পষ্ট সামাজিক সংহতি অনুভব করে এবং অভিন্ন জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়। তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে, আদিম সম্প্রদায়ে মধ্যে সংহতি বোধ খুবই প্রবল ছিল। গ্রামীণ ও শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই বিদ্যমান। সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খীসের মতে সংহতির দিক থেকে মানব সমাজ যান্ত্রিক সংহতি থেকে জৈবিক সংহতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন সমষ্টির সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় যখন সাদৃশ্য ও সহমর্মিতা বিকশিত হয় তখনই তা সম্প্রদায় (Community) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

অতএব 'সম্প্রদায়' বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা কোন বিশেষ স্বার্থের জন্য কাজ না করে বরং একটি অভিন্ন জীবন যাত্রার অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সুনির্দিষ্ট আচার আচরণের ভিত্তিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

www.swapno.in

সম্প্রদায়ের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, উহার সদস্যদের থাকে মধ্যে অভিন্ন জীবন ধারা (Common way of living) - একথাটি ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, যখন একদল লোক কতিপয় সাধারণ স্বার্থ ও অনুভূতি এবং আচার আচরণও রীতিনীতি অনুসারী হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে - তখনই গড়ে ওঠে সম্প্রদায় ।

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন ও নিম্‌কফ্ সম্প্রদায় বলতে এক বা একাধিক গোষ্ঠীর সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন- যারা একই এলাকায় বাস করে। (Community is a group or a collection of groups that inhabits a locality.) অগবার্ণ ও নিমকফের মতে, অভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী জনসমষ্টি সমন্বিত সম্প্রদায়কে অন্য একটি জনসমষ্টি পৃথক করে রাখে। তদুপরি সম্প্রদায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, অভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সংগঠিত জীবন প্রণালী।

সমাজবিজ্ঞানী কিংস্‌লী-ডেভিস (Kingsly Davis) তাঁর Human Society নামক গ্রন্থে সম্প্রদায়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন "সম্প্রদ্রায় হল -একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বা স্থানের জনগোষ্ঠী যারা সকলেই একই সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলে"।

সমাজবিজ্ঞানী পার্ক ও বার্জেস বলেন " সম্প্রদায় বলতে এমন একটি আঞ্চলিক জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, ভাবধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

সমাজবিজ্ঞানী পার্ক ও বার্জেসের মতে সম্প্রদায় বলতে এমন একটি আঞ্চলিক জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, ভাবধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজের মতে "যেখানেই কোন ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর লোকেরা এমনভাবে একত্রে বসবাস করে তারা বিশেষ কোন স্বার্থের অনুসারী না হয়ে বরং অভিন্ন জীবনের অংশীদার হয়ে বসবাস করে আমরা তখনই ঐ জনগোষ্ঠীকে একটি সম্প্রদায় বলি।"

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের Society নামক গ্রন্থে বলেন " Whenever the members of any group, Small or Large, live together in such a way that they share, not this or that particular interest but the basic conditions of common life are call that group a community." যেখানেই কোন ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর লোকেরা এমনভাবে একত্রে বসবাস করে তারা বিশেষ কোন স্বার্থের অনুসারী না হয়ে বরং অভিন্ন জীবনের অংশীদার হয়ে বসবাস করে আমরা তখনই ঐ জনগোষ্ঠীকে একটি সম্প্রদায় বলি।" সম্প্রদায়ের লক্ষণ হচ্ছে, একজন মানুষের সমগ্র জীবন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই অতিবাহিত হবে। তাঁদের মতে গ্রাম, শহর, জাতি, উপজাতি হলো সম্প্রদায়ের এক একটি উদাহরণ। কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীর সদস্যরা যেখানেই বসবাস করুক না কেন একত্রে বসবাস করতে গিয়ে যদি জীবনের মৌল এবং সাধারণ স্বার্থগুলি একই সাথে ভোগ করে তবেই তারা সম্প্রদায় গঠন করেছে বলা যায়। সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে একজন ব্যক্তির পরিপূর্ণ সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হবে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে একটি ব্যবসায়ী সংগঠন ও চার্চ কোন সম্প্রদায় নয়।

ম্যাকাইভার ও পেজের মতে সম্প্রদায়ের ভিত্তি হল দুটি যথা ঃ-

১। **অঞ্চল (Locality)**
২। **সম্প্রদায়গত অনুভূতি (Community sentiment)**

১। **অঞ্চল (Locality)** - যে কোন সম্প্রদায় সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা অধিকার করে থাকে। সম্প্রদায়ের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গুরুত্ব লক্ষণীয়। ভৌগোলিক পরিবেশের ক্ষেত্রে তারতম্যের জন্য মানুষের জীবন যাত্রায়ও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় দীর্ঘকাল বসবাসকালে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আচার আচরণ রীতিনীতি ইত্যাদিতে একটা সামঞ্জস্য গড়ে উঠে। এই সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, যেমন - এস্কিমো সম্প্রদায়, গ্রাম সম্প্রদায়, পাহাড়ী সম্প্রদায় ইত্যাদি আপন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় একত্রে বসবাস করার ফলে সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি একটি নিবিড় সমাজ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এর ফলে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক

www.swapno.in

সম্প্রদায়ের ভিত্তি হল দুটি যথা ঃ-
১। অঞ্চল (Locality)
২। সম্প্রদায়গত অনুভূতি (Community sentiment)

পরিমন্ডল গড়ে উঠে। এই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলই তাদেরকে অপরাপর জনগোষ্ঠী থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ।

২। **সম্প্রদায়গত অনুভূতি (Community Sentiment)** - একটি সম্প্রদায়ভুক্ত সকল সদস্যের এক সংগে বসবাস করা মানসিকতা থাকতে হবে। একই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সংহতিবোধ খুবই প্রবল এবং তারা সবাই পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সচেতন। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সম্প্রদায়গত অনুভূতিই একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি পারস্পরিক সম্পর্ক ও সচেতনতার পরিচায়ক। বস্তুত, একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাবগত, আচরণগত, রীতিনীতিগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ম্যাকাইভার ও পেজের মতে সম্প্রদায় হচ্ছে অভিন্ন জীবনের একটি ক্ষেত্র (area of common living)। আর ঐ অভিন্ন জীবনের সাথে থাকবে একটি জীবন ধারার (a way of life) অংশীদারত্ব ও অভিন্ন জগতের (common earth) বাসিন্দা হিসাবে সচেতনতা (awarness)।

সম্প্রদায় ছোটও হতে পারে, আবার বড়ও হতে পারে। উভয় ধরনের সম্প্রদায়ই মানুষের প্রয়োজন। তবে বৃহত্তর সম্প্রদায় ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে কখনও বিলীন করে দিতে পারে।

সে যা হোক, সাধারণভাবে সম্প্রদায়ের প্রকারভেদ করতে গেলে আমারা দু' ধরনের সম্প্রদায় চিহ্নিত করতে পারিঃ যথা –

১। গ্রামীণ সম্প্রদায়

২। শহুরে সম্প্রদায়

২.৪ গ্রামীণ সম্প্রদায় ঃ

গ্রামীণ সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠি যারা একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও নিবিড়।

আদিম যুগে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার পাশাপাশি এক পর্যায়ে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে কৃষি ভিত্তিক সমাজ জীবন বিকাশ লাভ করে। আর এ কৃষিভিত্তিক জীবন যাপনের অপূর্ব পরিণতি হল গ্রামীণ বসতি। গ্রামীণ বসতিতেই গড়ে উঠেছে গ্রামীণ সম্প্রদায়। গ্রামীণ সম্প্রদায়কে আমরা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দু'ভাবেই দেখতে পারি। যেমন ঃ বিশ্বব্যপী রয়েছে একটি বৃহৎ গ্রামীণ সম্প্রদায়, আবার বড় বড় শহরের আশে পাশে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামীণ সম্প্রদায়।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে গ্রামীণ সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। আদিম কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা থেকেই পৃথিবীর সকল দেশে গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠেছে। যেসব এলাকায় গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠেছে সেসব এলাকার সুনির্দিষ্ট নাম ও সীমারেখা রয়েছে। তবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আচার–আচরণ ও জীবনব্যবস্থা নগরের জনগোষ্ঠীর আচার আচরণ ও জীবনধারা থেকে ভিন্ন। নিম্নে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হল।

বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

ক) গ্রামীণ সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রকায়। গ্রামগুলোর ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলো ক্ষুদ্র হয়।

খ) গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রায় সকলই সকলকে চিনে এবং পরস্পরেরর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে।

www.swapno.in

গ) ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত মানুষ বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাদের মধ্যে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব এবং পশ্চাৎপদতা লক্ষ্য করা যায়।

ঘ) গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা সাধারণত কৃষি। এ সম্প্রদায়ের লোকজন কৃষি কাজের পাশাপাশি আরো অনেক আনুষঙ্গিক কাজ করে থাকে; যেমন, পশু পালন, কাঠের কাজ, ঘরবাড়ি তৈরি, তাঁতের কাজ ইত্যাদি।

ঙ) গ্রামীণ সম্প্রদায়ের লোকজন সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির প্রতি গভীর আস্থাশীল।

চ) সাধারণত গ্রামীণ সম্প্রদায়ের লোকজন রক্ষণশীল থাকে এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের প্রতি অধিকার শ্রদ্ধাশীল।

ছ) গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অত্যন্ত সীমিত।

জ) বেশীরভাগ গ্রামীণ সম্প্রদায়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত এবং সেখানে মহিলাদের শ্রমের সার্বিক মূল্যায়ন হয় না।

ঝ) গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভেতর সামাজিক সচলতা কম। এখানে সামাজিক পদমর্যাদার গুরুত্ব অধিকতর।

ঞ) গ্রামীণ সম্প্রদায়ে অনানাষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কঠোর এবং এ কারণে সেখানে ধর্মের প্রভাবও বেশী।

২.৫ শহুরে সম্প্রদায়

> যে সম্প্রদায় প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং অধিকতর অবকাঠামোগত সুযোগ–সুবিধা পেয়ে থাকে, তাকে শহুরে সম্প্রদায় বলে।

সংজ্ঞা ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে এবং প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তন করে মানুষ শহুরে বসতি স্থাপন করে। শহর জীবনে রয়েছে বৈচিত্র্য। এখানে সাধারণত কৃষিকাজ, পশুপালন ও শিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম হয় না। যে সম্প্রদায় উৎপাদনমুখী ও সেবামুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের (যেমন কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি ব্যতীত অন্যান্য সকল কর্মকান্ড) সাথে সংযুক্ত এবং অধিকতর আবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অধিকারী তাকেই শহুরে সম্প্রদায় বলে। সমাজবিজ্ঞানী জিস্ট ও হালবার্ট শহুরে সম্প্রদায়কে ছয়টি ভাগে ভাগ করেন, যথা ঃ-

১। শিল্প –উৎপাদন কেন্দ্র;
২। ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র;
৩। প্রশাসনিক কেন্দ্র;
৪। সাংস্কৃতিক কেন্দ্র;
৫। স্বাস্থ্য ও অবসর বিনোদন কেন্দ; এবং
৬। বিচিত্র কর্মকেন্দ্র।

বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ নগরায়নের ফলে শহুরে সম্প্রদায়ে বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. শহুরে সম্প্রদায়ের লোকজন বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকে, যেমন - আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক ও করিগর ইত্যাদি।

খ. শহুরে শিক্ষার সুযোগ বেশী। এখানে বিচিত্র সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়।

গ. মানসিক দিক থেকে শহুরে সম্প্রদায়ের লোকজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী হওয়া স্বাভাবিক এবং তারা অনেকটা কুসংস্কার মুক্ত ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী।

www.swapno.in

ঘ. শহুরে সম্প্রদায়ের সামাজিক পরিবেশ উন্নত এবং আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতির সাথে তাদের জীবন ধারা সম্পৃক্ত।
ঙ. শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে একক পরিবারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।
চ. শহুরে সম্প্রদায়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসাবে আইনের গুরুত্ব বেশী। শহরে রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক বিধি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
ছ. শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতা অধিক ক্রিয়াশীল।
জ. শহুরে সম্প্রদায়ের ভেতর গৌণ সম্পর্কই প্রধান্য লাভ করে। কারণ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শহুরে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।
ঝ. শহুরে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যভুক্ত হয়ে তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করার সুযোগ লাভ করে।
ঞ. শহুরে সম্প্রদায়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলী অত্যন্ত গতিশীল হয়।

মানুষ আদিম যুগ থেকে সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে জীবন যাপন করে আসছে। শিকারী জীবন এবং খাদ্য সংগ্রহের যুগেও মানুষের সম্প্রদায় ছিল। তবে সম্প্রদায়ের আকার ছিল ছোট এবং অস্থায়ী। কৃষি উৎপাদন শুরু হবার পর থেকে সম্প্রদায় আস্তে আস্তে স্থায়ী ও বর্ধিত হতে থাকে এবং কালক্রমে এরই ধারাবাহিকতায় শহুরে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।
উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্প্রদায়গত মন–মানসিকতা নিয়ে কোন একটি বিশেষ এলাকায় সম্প্রদায় গড়ে উঠে। সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন সম্ভব হতে পারে।

সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য

সমাজ এবং সম্প্রদায় এই শব্দ দু'টোকে অনেকে সমার্থক বলে মনে করে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার তাঁর Community গ্রন্থে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে 'সমাজ' কথাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলে মানুষের ইচ্ছাকৃত যেকোন পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝায়। আর 'সম্প্রদায়' বলতে তিনি বোঝান সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চল, যেখানে বসবাসরত জনসমষ্টির মধ্যে থাকবে কতকগুলি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

নিম্নে সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য সূচক কতকগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল ঃ

১। **অঞ্চল ঃ** - 'সমাজ' এর জন্য জনসমষ্টির একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের প্রয়োজন নাই। যেমন ঃ- ছাত্র সমাজ, কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে জনসমষ্টিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের বাসিন্দা হতে হবে। যেমন ঃ - একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়, শহুরে সম্প্রদায়, উপজাতীয় সম্প্রদায়, পাহাড়ী সম্প্রদায় ইত্যাদি।

২। **উদ্দেশ্য ঃ** - সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করা, যেমন ঃ ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানার্জন।
পক্ষান্তরে সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বিভিন্ন পেশা ও জীবন যাত্রার অধিকারী, যেমন ঃ একটি গ্রামে বিভিন্ন পেশা ও জীবন যাত্রার লোক থাকতে পারে। তবু তারা একটি সম্প্রদায়।

৩। **আদর্শ ঃ** - সমাজস্থ মানুষ বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী হতে পারে। যেমন - শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কেউ ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে পারে, আবার কেউ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায় গত জীবন ধারনের আদর্শ ও রীতিনীতি এক ও অভিন্ন।

www.swapno.in

৪। **সাম্প্রদায়গত মনোভাব** ঃ - সমাজের জন্য সাম্প্রদায়গত মনোভাব কিংবা ঐক্য অপরিহার্য নয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের জন্য এটি একটি অপরিহার্য দিক।

৫। **সীমানা** ঃ - সমাজ হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল। সমাজের কোন সুনিদিষ্ট সীমানা নাও থাকতে পারে। অন্যদিকে, সম্প্রদায় বলতে এমন একটি জন সমষ্টিকে বুঝায় যার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান থাকবে।

৬। **গঠন প্রকৃতি** ঃ - সমাজ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা গড়ে উঠে। আর সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে উঠে।

৭। **পরিসর** ঃ - সমাজ একটা বৃহৎ একক। যেমন, বুর্জোয়া সমাজ বলতে পৃথিবীর সমস্ত বুর্জোয়াদের বুঝায়।

পক্ষান্তরে, সম্প্রদায় সমাজ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, যেমন ঃ - গ্রামীণ সম্প্রদায় বলতে শুধু সংশ্লিষ্ট গ্রাম কিংবা শহরকেই বুঝায়।

৮। **গতিশীলতা** ঃ - সমাজ ক্রম বিবর্তনশীল। মানব সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সমাজের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অধিকতর স্থায়ী। যেমন গ্রামীণ ও শহুরে সম্প্রদায়।

৯। **স্বার্থ** ঃ - সমাজস্থ মানুষের স্বার্থ সাধারণত বহুমাত্রিক। কিন্তু একই সম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থের মধ্যে বিভিন্নতা কম।

১০। **অংশীদারত্ব** ঃ - একটি সমাজে দুই বা ততোধিক সম্প্রদায় থাকতে পারে, কিন্তু একটি সম্প্রদায়ে দুই বা ততোধিক সমাজ থাকতে পারে না।

১১। **ব্যাপকতা** ঃ - সমাজের সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাপক। সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য অপেক্ষাকৃত সীমিত।

১২। **রীতিনীতি** ঃ - সমাজ হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট কতকগুলি রীতিনীতি দ্বারা গড়ে উঠা একটি ব্যবস্থা - যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষ পারস্পরিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। আর সম্প্রদায় হচ্ছে অভিন্ন রীতিনীতি সমন্বিত একটি জনসমষ্টি, যারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ হতে পারে।

১৩। **অধিকার** ঃ - একটি সমাজে সব ধরনের মানুষ বসবাস করতে পারে। কিন্তু একটি সম্প্রদায়ে সব ধরনের মানুষ সাধারণত বাস করতে পারে না। কারণ সমাজের চেয়ে সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে কঠোর রীতিনীতি ও প্রথা—পদ্ধতি বিদ্যমান থাকে।

১৪। **পারস্পরিক সম্পর্ক** ঃ - সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্পর্ক অপরিহার্য। সমাজে প্রত্যেকেই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, সম্প্রদায় হচ্ছে জীবন যাপনের একটি বৃত্ত বিশেষ। এখানে সকল সদস্যকে অভিন্ন রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। এখানে সুষ্ঠু জীবন যাত্রার সব কিছুই সমষ্টির উপর নির্ভরশীল।

১৫। **প্রয়োজনীয়তা** ঃ সমাজ হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সুদৃঢ় সংগঠন, যার মাধ্যমে সকল সদস্যই একটি পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। সমাজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার কার্যকারিতা মুখ্যভাবে বিবেচ্য। অন্যদিকে সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সম্পর্কের চেয়ে ভৌগোলিক নৈকট্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

১৬। **ভৌগোলিক অবস্থান** ঃ - সমাজ হচ্ছে এমনএকটি জনসমষ্টি, যার একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল থাকবে। সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল ও সম্প্রদায়গত অনুভূতি অপরিহার্য।

১৭। **নির্ভরশীলতা** ঃ - সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপনের কোন সংস্থা নয়। কিন্তু সম্প্রদায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। যেমন, প্রাক—ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র বলে গণ্য করা হত।

www.swapno.in

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কতক বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ উভয়ের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান ধারণা, কর্মপদ্ধতি ও গঠন প্রণালী ভিন্ন প্রকৃতির। বহুবিধ সংঘ ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠে সমাজ, আর বৃহত্তর সমাজের অভ্যন্তরে একটি স্থিতিশীল সংস্থা হলো সম্প্রদায়। মূলত, মানব জীবনে সমাজ এবং সম্প্রদায় উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এ জন্য সমাজবিজ্ঞানে এদুটি প্রাথমিক প্রত্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

কক্সবাজারের জেলেদেরকে কেন সম্প্রদায় বলা হয়? এর পেছনে পাঁচটি যুক্তি দেখাও ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

অনুশীলনী ২ (Activity 2) ঃ **সময় : ১০ মিনিট**

ঢাকা শহরের ধানমন্ডি থানার লোকজন কেন শহুরে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত? এর পিছনে ৭টি কারণ উল্লেখ করুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সারাংশ ঃ

সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রত্যয় সমূহের মধ্যে সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। যখন একটি জনসমষ্টি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে অভিন্ন স্বার্থ ও অনুভূতি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি অনুসরণ করে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে তখন তাকে সম্প্রদায় বলা হয়। সম্প্রদায়গত মনোভাবের গভীরতার ভিত্তিতে সম্প্রদায় ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হতে পারে। এলাকা ও উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সম্প্রদায় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে - যেমন গ্রমীণ সম্প্রদায়, শহুরে সম্প্রদায়, উপজাতীয় সম্প্রদায় ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। সম্প্রদায়ের মৌলিক দুটি ভিত্তি কি কি?

ক) সুনির্দিষ্ট এলাকা ও জনগোষ্ঠী,

www.swapno.in

খ) মানুষ ও সমাজ
গ) এলাকা ও সম্প্রদায়গত মনোভাব
ঘ) অভিন্ন সংস্কৃতি ও অঞ্চল ।

২। কোন সম্প্রদায়ের মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি রক্ষণশীল?
ক) শহুরে সম্প্রদায়
খ) গ্রামীণ সম্প্রদায়
গ) উপজাতীয় সম্প্রদায়
ঘ) একটি জাতি (Nation)

৩। শহুরে সম্প্রদায়কে কারা ছয়ভাগে ভাগ করেছেন?
ক) এরিস্টটল ও হালবার্ট
খ) জিস্ট ও হালবার্ট
গ) ম্যাকাইভার ও পেজ
ঘ) ম্যাকইভার ও নটোমোর

www.swapno.in

www.swapno.in

সংঘ

পাঠ ৩

মূল ধারণা

- সংঘ এর সংজ্ঞা
- সংঘের বৈশিষ্ট্যাবলী
- সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি -

১. সংঘ কি তা জানতে পারবেন;
২. সংঘের বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে পারবেন;
৩. সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য কি তা জানতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ

কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধানে জন্য যখন কিছু সংখ্যক লোক ঐক্যবদ্ধ হয় তখন তাকে সংঘ বলে। সাধারণ অর্থে সংঘ বলতে বুঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যারা সংগঠিত হয়ে কোন বিশেষ কাজ সম্পাদন করার জন্য তৎপর হবে। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের সংঘ প্রত্যক্ষ করেছেন। একাধিক সংঘ একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সংঘ ঃ সংজ্ঞা ও ধারনা

সংঘ বলতে আমরা বুঝি যখন কিছু সংখ্যক লোক, যারা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করে। সংঘ গঠনের পিছনে দু'টি উপাদান ক্রিয়াশীল, যথা - অভিন্ন উদ্দেশ্য এবং সংগঠিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা। যেমন, ফুটবল ক্লাব, শিক্ষক সমিতি, বণিক সমিতি ইত্যাদি।

সংঘের দু'টি থাকে বৈশিষ্ট্য, যথা - (ক) সদস্য (Membership) এবং (খ) অভিন্ন উদ্দেশ্য (Common object)

সংঘের সদস্য হতে হয়, এর ঘোষণা পত্র মেনে চলতে হয়, নিয়মিত চাঁদা দিতে হয় এবং সভায় উপস্থিত থাকতে হয়। একটা সমাজে অনেক সংঘ থাকতে পারে।

> এক বা একাধিক উদ্দেশ্যে যখন কোন গোষ্ঠী ঐক্য হয় তখন তাকে আমরা সংঘ বলতে পারি।

ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন গোষ্ঠী যখন সংগঠিত হয় তখন তাকে সংঘ বলে।

ম্যাকাইভার ও পেজের মতে মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

www.swapno.in

১। মানুষ সমাজের অন্য কারোর সাথে যোগাযোগ না করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নিন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্যোগ নিতে পারে। তবে এ ধরনের চেষ্টা অসামাজিক বলে বিবেচিত হয় এবং তা কদাচিৎ সফল হয়।
২। অনেক সময় মানুষ অন্যের সঙ্গে সংঘাত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্যোগ নিতে পারে। কিন্তু এতে অনেক সময় সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে, যদিও সংঘাত ও প্রতিযোগিতা সমাজ জীবনের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

৩। উদ্দেশ্য অর্জনে তৃতীয় পন্থাটি হলো সংঘবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ অনুসরণ করা। অর্থাৎ মানুষ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয় এবং সংঘ গড়ে তুলে তখনই তা সমাজের কল্যাণ সাধনে সহায়ক হয়।

ম্যাকাইভার ও পেজ এর মতে সংঘ হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠী যা অভিন্ন গোষ্ঠী স্বাথ চরিতার্থ করার জন্য গঠিত হয়। এ অর্থে আমরা কোন রাজনৈতিক দল এবং রাষ্ট্রকে সংঘ বলতে পারি। জিসবার্টের এর মতে "সংঘ হলো একটি মুখ্য গোষ্ঠী যা কোন বিশেষ বা কতক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত হয়।"
সংঘ সাময়িকভাবে সম্প্রদায় হতে পারে। পরিবার ও রাষ্ট্রকে সংঘ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সংঘকে কোন কর্ম সম্পাদনের বাহনও (agency) বলা যায়। সে ক্ষেত্রে সংঘ একটি করপোরেশন সমতুল্য।
সমাজ জীবনে মানুষের চাহিদা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিচিত্র ধরনের। একক প্রচেষ্টায় মানুষের পক্ষে তার সব চাহিদা ও লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই মানুষ সমবেত ভাবে এবং সহজে সমাজজীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গুলিকে বাস্তবায়িত করতে চায়।
অতএব আমরা উপরের আলোচনা থেকে বলতে পারি যে, মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই এবং বিচিত্র ধরনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই সংঘ গঠন করে।

সংঘের সদস্যদের উদ্দেশ্য অভিন্ন হতে হবে। উদ্দেশ্য এক বা একাধিক হতে পারে। প্রয়োজনে নতুন নতুন উদ্দেশ্যকে সমন্বিত করেও কার্যপরিচালনা করতে পারে।

নিম্নে সংঘের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হলো ঃ –

১। সংঘের সদস্যদের উদ্দেশ্য অভিন্ন হতে হবে। উদ্দেশ্য এক বা একাধিক হতে পারে। প্রয়োজনে নতুন নতুন উদ্দেশ্যকে সমন্বিত করেও কার্যপরিচালনা করতে পারে।
২। সংঘের একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে। ফলে সদস্যদের গঠনতন্ত্র ও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।
৩। যে কোন ব্যক্তিকে কোন সংঘের সদস্য হতে হলে তাকে ঐ সংঘের বিধি বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করে এর সদস্য হতে হবে।
৪। যদি সংঘের কোন সদস্য সংঘের আইন–কানুন ও নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা সংঘ থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা যেতে পারে।
৫। সংঘের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণের বাস্তব প্রয়াস চালানো যায়।
৬। সংঘের সদস্য হওয়া বাধ্যতামুলক নয়।
৭। সংঘের সদস্যদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ থাকার প্রয়োজন নেই।
৮। সংঘ ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে, আবার দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে, তবে তা নির্ভর করে সংঘের সদস্যদের ইচ্ছা, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তার উপর।
৯। বিভিন্ন সংঘ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হতে পারে। যেমন, সমাজ কল্যাণমূলক, বিনোদনমূলক, এবং রাজনৈতিক অধিকারমূলক হতে পারে।
১০। সংঘ গঠন একটি ব্যক্তিগত উদ্দীপনার ব্যাপার। সংঘের মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি সমমনা সদস্যদের নিয়ে সহজেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে, যা অনেক ক্ষেত্রেই একা সম্ভব নয়।

www.swapno.in

১১। সংঘের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য একটি কর্মনির্বাহী পর্ষদ ও গঠনতন্ত্র অপরিহার্য।

সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য ঃ –

> সংঘ হচ্ছে একটি ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি, যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তৎপর। আর সম্প্রদায় হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টি যারা তাদের অভিন্ন জীবন ধারার অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে।

আমরা জানি যে, সংঘ হচ্ছে একটি ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তৎপর। আর সম্প্রদায় হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টি যারা তাদের অভিন্ন জীবন ধারার অংশীদার হয়ে একত্রে বসবাস করে।

নিচে সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো ঃ -

১। সংঘ কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে গঠিত হয়, যেমন ঃ - ক্রীড়াসংঘ
আর সম্প্রদায় হলো এমন একটি জনগোষ্ঠী যার সদস্যরা বিশেষ কোন স্বার্থের অনুসারী না হয়ে অভিন্ন জীবনের প্রয়োজন মিটানোর জন্য একই এলাকায় বসবাস করে।

২। সংঘ কোন সম্প্রদায় নয়, বরং সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি সংগঠন মাত্র। যেমন, একটি গ্রাম বা শহরে অনেকগুলি সংঘ গড়ে উঠতে পারে। তাই বলা হয় সম্প্রদায় ব্যাপক আর সংঘ সীমিত সংগঠন।

৩। যে কোন ব্যাক্তির সংঘের সদস্য হওয়া স্বেচ্ছামূলক, কিন্তু জন্মগতভাবে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কোন ব্যাক্তি সম্প্রদায়ের সদস্যবলে বিবেচিত। একজন ব্যক্তি সংঘের সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সদস্যপদ স্থায়ী।

৪। সম্প্রদায় হচ্ছে একটি স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী। উহার উদ্দেশ্য একাধিক বা সামগ্রিক হতে পারে। সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে।
কিন্তু সংঘ ক্ষণস্থায়ী,তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থের বাস্তবায়ন না হলে উহা নাও টিকতে পারে।

৫। সংঘের সদস্যরা উহার নীতি আদর্শ ও নিয়ম—কানুন মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা তাদের অভিন্ন স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে মনে রেখে সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য ও রীতিনীতির মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৬। সংঘের আইনগত অবস্থান রয়েছে। প্রয়োজনে সংঘের সদস্য বা সদস্যরা সংঘের কার্যক্রম বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

৭। সংঘের কোন আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করতেই হবে।

৮। একজন ব্যক্তি যুগপৎ অনেকগুলি সংঘের সদস্য হতে পারে, কিন্তু একজন ব্যক্তি কেবল মাত্র একটি সম্প্রদায়ভুক্ত।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করতে পরি যে, সংঘের কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রদায়ের তুলনায় সীমিত। সমাজের আংশিক কার্য সম্পাদনে সংঘ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অপরপক্ষে, সম্প্রদায় সুনির্দিষ্টি এলাকার জনসমষ্টির অভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট। আবার উভয়ের কার্যক্রমের মাধে কোন কোন সময় সহযোগিতামুলক সম্পর্কও লক্ষ্য করা যায়। সেটা সংশ্লিষ্ঠ সমাজকাঠামো ও সামাজ ব্যবস্থার ধরনের উপর নির্ভরশীল।

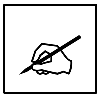

অনুশীলনী ঃ ১ (Activity - 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

ম্যাকাইভার ও জিসবার্টের সংজ্ঞা দ'ুটো লিখুন ঃ

ম্যাকাইভার ঃ

www.swapno.in

জিসবার্ট ঃ

অনুশীলনী ঃ ২ (Activity - 2) **সময় ঃ ১০ মিনিট**

সংঘের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ -

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সারাংশ ঃ

সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে সম্প্রদায়ের মত সংঘও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। একদল লোক যখন এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সংঘবদ্ধ হয় তখন তাকে সংঘ বলে। সমাজের মানুষ সাধারণত তিনটি উপায়ে তার জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। যেমন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে, অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সাথে সহযোগিতা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সংঘ গঠনের প্রধান দু'টি উপাদান কি কি ?

ক) সদস্যপদ ও অভিন্ন লক্ষ্য। খ) অভিন্ন উদ্দেশ্য ও সংগঠন।
গ) সামাজিক দায়িত্ব ও সংগঠন। ঘ) পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংগঠন।

২। কিভাবে সংঘের সদস্য হওয়া যায়?

ক) অপরের ইচ্ছায়। খ) জনগণের ইচ্ছায়।
গ) প্রচার মাধ্যমের প্রভাবে। ঘ) আপন ইচ্ছায়।

৩। একটি ব্যক্তি যুগপৎ কয়টি সংঘের সদস্য হতে পারে?

ক) একটি খ) দু'টি
গ) কয়েকটি ঘ) অসংখ্য

৪। সংঘের কি ধরনের ভিত্তি থাকা উচিত?

ক) আইনগত খ) প্রথাগত
গ) সম্প্রদায়গত ঘ) নীতিগত

www.swapno.in

প্রতিষ্ঠান, সংজ্ঞা ও ধারণা

পাঠ ৪

মূল ধারণা

- প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও ধারণা
- সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাথমিক ধারণা
- সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

১. প্রতিষ্ঠান কি তা জানতে পারবেন;
২. বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে জানতে পারবেন;
৩. সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য জানতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রাথমিক প্রত্যয়। সমাজজীবনের বৈচিত্র্য ও জটিলতা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্যই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠান শুধু মানুষের প্রয়োজনই পূরণ করে না, মানুষের কর্মকান্ডকেও নিয়ন্ত্রিত করে। প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত প্রথাপদ্ধতি, যা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত, কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালীকে বুঝায়। সমাজে যদি প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালী, রীতি-নীতি না থাকত, তাহলে মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে সমাজে বাস করতে পারতনা। কাজেই সমাজে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে পারে। তাই বলা যায় প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক কাঠামো এবং যন্ত্রবিশেষ যার মাধ্যমে মানব সমাজ মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সংগঠিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে ও বাস্তবায়িত করে।

প্রতিষ্ঠানকে ইংরেজীতে Institution বলা হয়। প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালীকে বুঝায়। মানুষ অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে থাকে।

> যে কোন ধরনের সংঘই হলো প্রতিষ্ঠান। এ অর্থে পরিবার স্কুল, রাষ্ট্র ও বিবাহ ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠান বলা হয়। কেননা এগুলি মানুষের দ্বারা তৈরী সামাজিক কাঠামোর এক একটি অংশ।

অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ সংঘ গঠন করে। এসব সংঘের মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী এবং কতকগুলি অস্থায়ী। পরিবার , রাষ্ট্র, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি হলো স্থায়ী সংঘ। স্থায়ী সংঘগুলি তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কতকগুলি কার্যপ্রণালীর উপর নির্ভর করে। এসব কার্যপ্রণালী স্থায়ীরূপ লাভ করলে - তা সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

ইংরেজি Institution কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। Institution কথাটির একটি অর্থ হলো প্রতিষ্ঠান। যে কোন ধরনের সংঘই হলো প্রতিষ্ঠান। এ অর্থে পরিবার স্কুল, রাষ্ট্র ও বিবাহ ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠান বলা হয়। কেননা এগুলি মানুষের দ্বারা তৈরী সামাজিক কাঠামোর এক একটি অংশ। এর প্রতিটিরই কাঠামোগত দিক রয়েছে। এই কাঠামোগত কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি।

দ্বিতীয় অর্থে Instution বলতে বুঝায় সেসব প্রচলিত কর্মপ্রণালী যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। এ অর্থে বিবাহ হল প্রতিষ্ঠান, আর রাষ্ট্র পরিবার ও চার্চ হল

www.swapno.in

সংঘ। ম্যাকাইভার, পেজ এবং জিসবার্ট প্রমুখ সমাজবিদরা এ অর্থে প্রতিষ্ঠান প্রত্যয়টিকে সমাজবিজ্ঞানে প্রয়োগ করেছেন।

সুসংবদ্ধ সমাজ জীবন মানুষের কাম্য। মানুষ তার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরনের জন্য সমাজে কতকগুলি নিয়ম কানুনের সৃষ্টি করে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠিত কর্মপ্রণালীকে প্রতিষ্ঠান বলে। কেননা প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালী ভিন্ন সমাজ জীবন কখনো সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হতে পারে না। যেমন বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পরিবার নামক সংঘের অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

যদি বিবাহ প্রথা সমাজে গড়ে না উঠতো তাহলে নারী পুরুষের যৌথ জীবন ব্যবস্থাকে শৃংখলা বা নিয়ন্ত্রণ করা যেত না, ফলে সমাজে দেখা দিত বিশৃংখলা ও অরাজকতা, যা সুষ্ঠু সমাজ জীবন গড়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতো।

মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই সমাজ জীবনের অত্যাবশ্যকীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া কলাপ, রীতিনীতি, লোকাচার এবং লোকরীতির সৃষ্টি করে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠিত কর্মব্যবস্থা তথা মানুষের কার্যাবলীর সংগঠিত রূপকে Institution বলে।

মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্যই সমাজ জীবনের অত্যাবশ্যকীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া কলাপ রীতিনীতি, লোকাচার এবং লোকরীতির সৃষ্টি করে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠিত কর্মব্যবস্থা তথা মানুষের কার্যাবলীর সংগঠিত রূপকে Institution বলে। মানুষের প্রয়োজন মিটানো এবং সমাজ জীবনে শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ -

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট প্রতিষ্ঠান বলতে "ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি স্থায়ী ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতিকে বুঝিয়েছেন"।

ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের Society নামক গ্রন্থে Institution এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, "প্রতিষ্ঠান হলো, সেই সব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যাবলীর বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।"

ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের Society নামক গ্রন্থে Institution এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, "প্রতিষ্ঠান হলো, সে সব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যাবলীর বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।"

সুতরাং উপরের সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমাজবিজ্ঞানীগণ প্রতিষ্ঠান বলতে প্রচলিত বিধি–বিধান ও কর্মপন্থাকে বুঝিয়েছেন।

মানুষ যখন থেকে সংঘবদ্ধ জীবন শুরু করে, তখন থেকেই নিত্যদিনের কার্মসম্পাদন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি আইন-কানুন ও আচার অনুষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে। আর এই সৃষ্ট আইন-কানুন ও কার্যপ্রণালী হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। এই অর্থে পরিবার, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, মসজিদ, গীর্জা, রাষ্ট্র ইত্যাদি প্রত্যেকটি এক একটি প্রতিষ্ঠান।

সমাজ জীবনের পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফলে মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। আদিম যুগে মানুষের জীবন ছিল সহজতর ও সরল, আর প্রয়োজন ছিল সীমিত। পরিবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ হলো জটিল থেকে জটিলতর এবং সেই সাথে মানুষের চাহিদার মাত্রাও গেল বেড়ে। ফলে সমাজে মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য গড়ে উঠলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষামূলক, ধর্মীয় ইত্যাদি।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ

পরিবার সমাজ জীবনের আদি ও সর্বজন স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠান।

১। **সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঃ** - পরিবার সমাজ জীবনের আদি ও সর্বজন স্বীকৃত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহ ও ব্যক্তিসম্পর্কের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রী, পিতা–মাতা, ভাই – বোন, সন্তান সন্ততি প্রভৃতি সহ যেখানে একত্রে বসবাস করে তাকেই পরিবার বলে। পরিবারের প্রধান কাজ হলো একজন স্ত্রী এবং একজন পুরুষ সমাজস্বীকৃত উপায়ে একত্রে বসবাস করা এবং বংশধারা অক্ষুণ্ন রাখা। সমাজজীবনে সুশৃংখল পরিবেশ এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য পরিবার অপরিহার্য। যখন প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ করব তখন তাকে সামাজিক জৈবিক প্রতিষ্ঠান বলব।

২। **অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঃ** - ম্যাক্স ওয়েভারের মতে " যেসব মৌলিক ব্যবস্থা ও নিয়মকানুন পণ্য উৎপাদান, ভোগ ও বন্টন সংক্রান্ত মানবিক আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে

যে সব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালীর সাথে জড়িত তাকে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা হয়।

www.swapno.in

থাকে - তাকেই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবন মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ আদিম যুগ থেকেই অর্থনৈতিক জীবন আরম্ভ করেছে। মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন ঘটেছে। সম্পত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে আধুনিক কালে ব্যাংক, বীমা, সমবায় ও ঋনদান সংস্থা ইত্যাদিকেও প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা যায়। কারণ সমাজস্থ মানুষের সম্পত্তি ও সম্পদ এসব সংগঠনের মাধ্যমেই সংরক্ষিত ও সাম্প্রসারিত হয়।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশ রাষ্ট্রকে কেন্দ্রকরে আবর্তিত হয়।

৩। **রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঃ** - রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদন করে। সমাজের সকলপ্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড অধিকাংশই রাষ্ট্রকে কেন্দ্রকরে আবর্তিত হয়। রাষ্ট্র তার বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে সমাজের আইন–শৃংখলা রক্ষা, শাসন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ, আইন–প্রণয়ন, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণসহ অনেক দায়িত্ব পালন করে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান হলে সরকার হবে তার বাহন। উল্লেখ্য, প্রাচী গ্রীক নগররাষ্ট্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে সংগত কারণেই আধুনিক কালের মতো পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি।

ধর্ম একটি অতি প্রাচীন, মৌলিক ও মানবিক সংগঠন। ধর্ম মানুষের সার্বজনীন ও আদি প্রতিষ্ঠান।

৪। **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান** ঃ অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম একটি অতি প্রাচীন, মৌলিক ও মানবিক সংগঠন। ধর্ম মানুষের সার্বজনীন ও আদি প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন কালথেকেই মানুষ নানা ভাবে ধর্মের সংগে সম্পৃক্ত। সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, কতকগুলো সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। মধ্যযুগে সমাজ ও রাষ্ট্র ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। আধুনিক কালে ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের রূপ নিয়েছে। তবুও আমাদের মতে সমাজে এখনও ধর্মের মাধ্যমে সমাজ জীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। প্রচলিত অর্থে মসজিদ, মন্দির, গির্জাকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠন বলা যায়।

৫। **শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ঃ** - ব্যাপক অর্থে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হলো ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত বুদ্ধি, মেধা ও নৈতিক ক্ষমতাগুলোকে বিকশিত করে তার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলা। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তির চরিত্র গঠন করে এবং সমাজ জীবনে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তাকে যোগ্য করে তোলে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হলো শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের এক একটি উদাহরণ।

৬। **সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান** ঃ- কলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের সৃজনশীল মেধার প্রকাশ ঘটে। সমাজ প্রবাহের সঙ্গে মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির সৃষ্টি হয় তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব হয়েছে এবং এসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষের সৃজনশীল কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়। সাহিত্য সংঘ, সঙ্গীত পর্ষদ ও নাট্য সংঘ হল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের এক একটি দৃষ্টান্ত।

অতএব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে, প্রতিষ্ঠান হলো এমন একটা সক্রিয় ব্যবস্থা যা সামাজিক লোকরীতি ও লোকাচারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মানুষের মৌলিক চাহিদাই পূরণ করে না, ইহা সমাজের যাবতীয় কর্মসম্পাদন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে বলেই সমাজ গতিশীল থাকে এবং এজন্যই সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়না। সুতরাং সমাজ জীবনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘ গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠান অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে উঠে।

সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য ঃ –

সংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ -

১। সংঘের সাথে সদস্যপদের প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক রূপ।

২। সংঘ গঠন করতে হয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠান সমাজ জীবনে ক্রমবিকশিত সংগঠন।

৩। সংঘ সংগঠিত দল, আর প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের রূপ বিশেষ।

www.swapno.in

৪। সংঘ বিভিন্ন সদস্যের নির্দেশক, আর প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্যপ্রণালীর নির্দেশক।

৫। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি আপন আগ্রহে সংঘের সদস্য হয়। কিন্তু ব্যক্তি সহজাতপ্রবৃত্তির গুণেই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়।

৬। মানুষ সংঘের সদস্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সদস্য নয়। তবে সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। সমাজের এমন কতক সংগঠন আছে যাদেরকে একদিকে সংঘও বলা যায়, আবার অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানও বলা যায়। যেমন একটি বিদ্যালয় সংঘও হতে পারে, আবার প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। যখন সদস্যপদের দিকে থেকে বিবেচনা করা হবে তখন বিদ্যালয় সংঘ বলে গণ্য হবে, আর যখন একটি সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থা হিসাবে দেখা হবে তখন এটি একটি প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হবে।

৭। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘ গড়ে উঠে কিন্তু প্রতিষ্ঠান অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদেই স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে।

অনুশীলনী ঃ ১ (Acivity : 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের ৫টি উদ্দেশ্য লিখুন

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলনী ঃ ২ (Acivity : 2) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি পার্থক্য লিখুন ঃ

১.
২.
৩.

সারাংশ ঃ
সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রত্যয় সমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। সুসংবদ্ধ সমাজ জীবন মানুষের কাম্য। মানুষ তার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে সমাজে কতকগুলো রীতিনীতি সৃস্টি করে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠিত কার্য প্রণালীকে প্রতিষ্ঠান বলে। প্রতিষ্ঠান এমন একটি প্রচলিত ব্যবস্থা, যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের সমাজ জীবনের পরিপূর্ন প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যে নূতন নূতন চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের সার্বিক কর্মনির্বাহী সংগঠন হিসাবে কাজ করে এবং সমাজের মানুষকে

www.swapno.in

সর্বদা ক্রিয়াশীল রাখে। সেজন্য সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রিয় প্রত্যয় সমাজকাঠামোকে প্রধান প্রধান গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের মিশ্র তথা যৌগিক রূপ বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। মানুষের চাহিদার পরিবর্তন কখন ঘটে?
ক) জাতীয় আদর্শের পরিবর্তনের সময়।
খ) সমাজ জীবনের পরিবর্তন ও বিবর্তনের সময়।
গ) প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের পরিবর্তনের সময়।
ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির সময়।

২। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য কি কি?
ক) মেধা ও নৈতিক ক্ষমতার বিকাশ।
খ) জীবন যাপনের নিয়ম কানুন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
গ) সাহিত্য শিল্প কলার চর্চা করা ও এর উৎপত্তি সাধন করা।
ঘ) শিশুর মানসিক বিকাশ সাধন।

৩। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।
ক) পরিবার খ) রাষ্ট্র
গ) সম্পত্তি ঘ) ধর্ম

৪। প্রতিষ্ঠান কি?
ক) বিভিন্ন সদস্য পদের নির্দেশক।
খ) বিভিন্ন কার্যপদ্ধতির নির্দেশক।
গ) সংগঠিত কর্মের ফলাফল।
ঘ) একটি সক্রিয় বিধি ব্যবস্থা।

www.swapno.in

দল

পাঠ ৫

মূল ধারণা

- দলের সংজ্ঞা
- দলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য
- দলের শ্রেণী বিভাগ
- মুখ্য ও গৌণ দলের মধ্যে পার্থক্য
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objective)

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. দল কি তা জানতে পারবেন;
২. দলের বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন;
৩. দলের শ্রেণী বিভাগ জানতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ

সাধারণ অর্থে দল বলতে কয়েকজন লোকের সমষ্টিকে বুঝায়। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীগণ দলের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কারণ সমাজবিজ্ঞানে ব্যক্তির অর্থহীন সমষ্টিকে দল বলে ধরে নেওয়া হয় না। মনোবিজ্ঞানীগণ একের সাথে অন্যের সংঘবদ্ধতাকে দল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আবার অনেক সমাজবিজ্ঞানী কিছু সংখ্যক ব্যক্তির অভিন্ন স্বার্থের কারণে যুক্ত হওয়াকে দল বলেছেন। সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে দলের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তবে সাধারণভাবে আমরা এমনভাবে দলের সংজ্ঞা দিতে পারি যে, যখন কিছু সংখ্যক মানুষ বিশেষ প্রয়োজনে একত্রিত হয় এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে তখনই তা দল হিসাবে গণ্য হয়। তবে যৌথ উদ্দেশ্য থাকতে হবে। উদ্দেশ্যবিহীন কোন জনগোষ্ঠীকে আমরা দল বলতে পারিনা। দলের সদস্যদের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক নির্ভরতা ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা।

মানুষ সামাজিক জীব। সংগঠিত জীবন যাপন করতে হলে প্রয়োজন দলগত জীবন বা গোষ্ঠী জীবন। পারস্পরিক ভাবের প্রদান, আবেগ ও সংবেদনশীলতা রয়েছে এমন কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টিকে গোষ্ঠী বলা হয়।

'দল' প্রত্যয়কে অনেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। কতগুলো লোকের একত্রে অবস্থানকেই অনেকে দল বলে থাকেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় দলকে কেবল একত্রে অবস্থানের মানদন্ডে বিচার করা হয়না। অর্থাৎ যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখনই ঐ সব ব্যক্তিকে গোষ্ঠী বলা হয়। একটি দল গঠন করেছে বলা যাবে।

www.swapno.in

> দল বলতে আমরা বুঝি একাধিক ব্যক্তির সমষ্টি, যারা একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। যথা, পরিবার, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক

দল বলতে আমরা বুঝি একাধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। যথা - পরিবার, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গোষ্ঠীর সংজ্ঞা প্রদান করছেন -

সমাজবিজ্ঞানী স্মল তাঁর "General Sociology" নামক গ্রন্থে দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, দল হচ্ছে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটি জনসমষ্টি যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে এমন একটি সম্পর্ক, যা দলের সদস্যদেরকে একই সূত্রে গ্রথিত করে।

সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট মার্টনের মতে দল হচ্ছে - এমন কিছু লোকের সমষ্টি যারা একে অপরের সঙ্গে স্বীকৃত ও নির্দিষ্ট ধারায় মিথস্ক্রিয়ায় রত হয়; যারা মনে করে যে, তারা একটি দলের অন্তর্ভুক্ত এবং যাদেরকে অন্যরা (ভিন্ন দল) মনে করে।

> দল হলো দুই বা তার অধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা দলে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে অভিন্ন ধারণা পোষণ করে এবং তাদের সামাজিক ভূমিকা পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল।

সমাজমনোবিজ্ঞানী শরীফ (Sherif) এর মতে দল হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট মর্যাদা ও ভূমিকা সম্পন্ন এমন কিছু লোকের সমষ্টি যাদের আচরণ ও বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করার মত অভিন্ন মূল্যবোধ ও রীতিনীতি রয়েছে।

উপরে উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে পারি যে, দল হলো দুই বা তার অধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা দলে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে অভিন্ন ধারণা পোষণ করে এবং তাদের সামাজিক ভূমিকা পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল।

> সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার দল বলতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝিয়েছেন যেখানে সামাজিক সম্পর্ক বিরাজমান।

অর্থাৎ দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যাক্তিবর্গের আপন দল সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কতকগুলি অভিন্ন স্বার্থ তাদেরকে পরিচালিত করবে - তখনই তাকে দল বলা যাবে। সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইভার দল বলতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝিয়েছেন যেখানে একটি সামাজিক সম্পর্ক বিরাজমান।

নিম্নে দলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর হলো।

> দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া।

১। দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের পারস্পরিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া। দলের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের মনেই নিজেকে ও অপরকে আপন দলের একজন সদস্য বলে গণ্য করার মনোভাব থাকবে।।

২। যখন একটি জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত হয় তখনই কেবল এটি একটি সামাজিক দল বলে গণ্য হতে পারে। দলের সদস্যদের মধ্যে আমরা মনোভাব (we feeling) এর অস্তিত্ব অপরিহার্য।

> দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে আদর্শগত মিল, আচরণ ও কর্মকান্ডে অভিন্নতা উহার অন্যতম

৩। দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে আদর্শগত মিল, আচরণ ও কর্মকান্ডে অভিন্নতা উহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

> দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে আদর্শগত মিল, আচরণ ও কর্মকান্ডে অভিন্নতা উহার অন্যতম

৪। দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানব জীবনের আদিম পর্যায় থেকেই মানুষ তার সমমনাদের সঙ্গে দল গঠন করে যৌথ জীবন যাপান আরম্ভ করে।

৫। দলবদ্ধ জীবনে স্থায়িত্ব এবং অবিচ্ছিন্নতার আবশ্যকতা রয়েছে। ব্যক্তিবর্গের অর্থহীন ও অস্থায়ী জনসমষ্টিকে দল বলা যায় না।

৬। ব্যক্তিবর্গের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যই দল গঠিত হয়। উদ্দেশ্যহীন জনসমষ্টিকে দল বলা যায় না।

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুধাবন করে বলা যায় যে, দল হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এমন একটি ব্যক্তিসমষ্টি যারা অভিন্ন স্বার্থে একটি সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং যারা একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম শৃংখলা দ্বারা পরিচালিত।

www.swapno.in

দলের শ্রেণী বিভাগ ঃ দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দলের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

সমাজবিজ্ঞানী সামনার তাঁর Folkways নামক গ্রন্থে দলের একটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তার মতে মানব সমাজে নিম্নলিখিত দু'ধরনের দল দেখা যায়।

১। অন্তর্দল (In-group)

২।বহির্দল (Out-group)

সমাজবিজ্ঞানী সামনার তাঁর Folkways নামক গ্রন্থে দলের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যেমন

১। অন্তর্দল (In-group)

২। বহির্দল (Out-group)

উক্ত দু'ধরনের দলকে কখনও কখনও 'আমাদের দল' (We group) এবং অন্য দল (Other group) ও বলা হয়ে থাকে। দলের এই শ্রেণী বিভাগ সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল।

সমাজবিজ্ঞানী কুলী তাঁর Social Organization নামক গ্রন্থে দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ

১। মুখ্য দল (Primary group)

২। গৌণ দল (Secondary group)

সমাজবিজ্ঞানী কুলী তাঁর Social Organization নামক গ্রন্থে দলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ

১। মুখ্য দল (Primary group)

২। গৌণ (Secondary group)

১। **মুখ্য দল ঃ** - মুখ্য দলের সদস্যদের মাঝে থাকবে গভীর সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। মুখ্য দলের সদস্যরা নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। এটাকেই সমাজবিজ্ঞানী কুলী বলেছেন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক (face to face relation)। তিনি কেবলমাত্র পরিবারকেই উহার সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সমন্বিত মুখ্য দল বলেছেন। আর অন্যান্য সকল দলকে তিনি বলেছেন গৌণ। তাঁর মতে রাষ্ট্র একটি গৌণ দল। মুখ্য দলের সদস্যদের মনের মধ্যে 'আমরা' (we feeling) মনোভাব বিদ্যমান থাকে। যেমন, মুখ্য দলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে পরিবারের সদস্যরা সবাই নিজেদের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' পোষণ করে। মুখ্য দল সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র বিন্দু। এই দলের মধ্যেই মানুষ সবচেয়ে বেশী ব্যক্তিগত জীবন যাপন করে থাকে এবং এক্ষেত্রেই মানুষের সামাজিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। মুখ্য দলকে সমষ্টিগত জীবনের প্রধান কেন্দ্র বললে অত্যুক্তি হবে না। মুখ্য দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা হলো প্রত্যক্ষ। সেজন্য পরিবার নামক মুখ্য দলকে 'অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দল' (face to face relationship) বলে অভিহিত করা হয়।
আমাদের দৈনন্দিন সমাজ জীবনে অনেকের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। তাই বলে আমরা সকলেই মুখ্য দলের সদস্য নই। যেমন, দোকানদার, রিক্সাওয়ালা, ধোপা, নাপিত ইত্যাদি লোকের সাথে আমাদের প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা হয়, অথচ এদের কেহই মুখ্য দলের সদস্য নয়। আবার অনেকের সাথে আমাদের সব দিন দেখা হয়না অথচ তারা মুখ্য দলের সদস্য। যেমন একই পরিবারের এক ভাই চাকুরী করে কুমিল্লাতে, আরেক ভাই সিলেটে এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে প্রত্যেক দিন তাদের দেখা হয় না। কিন্তু আমরা তাদেরকেও মুখ্য দলের সদস্য বলে গণ্য করি। কারণ তারা সকলেই অভিন্ন পরিবারের সদস্য এবং তারা প্রত্যেকেই পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে, মুখ্য দল হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের আন্তরিক সম্পর্কের একটি অপূর্ব সংগঠন।

গৌণদল ঃ গৌণ দল হল বৃহত্তর সংগঠনের অন্তভুক্ত একটি জনসমষ্টি যেখানে একে অপরের সাথে পরোক্ষভাবে সংযোগ রক্ষা করে চলে।

গৌণ দল হল বৃহত্তর সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত একটি জনসমষ্টি যেখানে একে অপরের সাথে পরোক্ষভাবে সংযোগ রক্ষা করে চলে।

www.swapno.in

গৌণ দল কতকগুলো রীতিনীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয়, যেমন ঃ- ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক সমিতি ও ছাত্র সংগঠন ইত্যাদি। গৌণদল কতকগুলি নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয় বলে সেখানে অধিকার ও কর্তব্যবোধ থাকে সংজ্ঞায়িত। যদিও এই দলের প্রতিটি ব্যক্তির দল সম্বন্ধে সচেতনতা ও ঐক্যবোধ রয়েছে তবুও এখানে সবকিছু প্রত্যক্ষ কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। এধরনের দলে আনুষ্ঠানিক তথা সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য বেশী থাকে।

তাই বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভূতপুর্ব অগ্রগতির কারণে আধুনিক সমাজে গৌণদলের আধিক্য দেখা যায়। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, মুখ্য দলের সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু গৌণ দলে সেটা প্রধানত পরোক্ষ ও আনুষ্ঠানিক। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই গৌণ দলের সংহতিকে অক্ষুন্ন রাখে। উল্লেখ্য বাংলাদেশের মতো বিকাশশীল দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি পাশ্চাত্যেরর শিল্পোন্নত দেশের মতো না হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এসব দেশে সাম্প্রতিক কালে মুখ্য দলের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ গৌণ দলের প্রভাব বাড়ছে।

মুখ্য দল ও গৌণ দলের মধ্যে পার্থক্য

নিম্নে মুখ্য দল এবং গৌণ দলের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো

মুখ্য দল	গৌণ দল
১. মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ট ও প্রত্যক্ষ।	১. গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক পরোক্ষ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ।
২. মুখ্য দলের সদস্যরা পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন।	২. গৌণ দলের সদস্যরা পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তত সচেতন নয়।
৩. সহজাত প্রবৃত্তির কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখ্য দলের জন্ম হয়।	৩. কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর ভিত্তিতে গৌণ দল জন্ম লাভ করে।
৪. মুখ্য দলের সদস্যদের সম্পর্ককে অধিকতর মানবিক ও সামাজিক বলা যায়।	৪. গৌণ দলের সদস্যদের সম্পর্ক যতটা না মানবিক তার চেয়ে এখানে চুক্তিই বড় কথা।
৫. মুখ্য দলের উপর ব্যক্তির সামাজিকীকরণ একান্তভাবে নির্ভরশীল।	৫. গৌণ দলের উপর ব্যক্তির সামাজিকীরণ কদাচিৎ নির্ভরশীল।
৬. মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা প্রবল।	৬. গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা দূর্বল।
৭. মুখ্য দল সার্বজনীন।	৭. গৌণ দল সার্বজনীন নয়।
৮. মুখ্য দল আকারে ছোট।	৮. গৌণ দল আকারে বড়।
৯. মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অভিন্নতা থাকে।	৯. গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বিদ্যমান।
১০. রক্তের সম্পর্ক কিংবা স্নেহ ভালবাসার ভিত্তিতে মুখ্য দল গড়ে উঠে।	১০. গৌণ দল সাধারণত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠে।
১১. মুখ্য দলের সদস্যদের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' অত্যন্ত প্রবল	১১. গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে 'আমরা মনোভাব' দেখা যায় না।
১২. কোন কারণে মুখ্য দলের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হলেও এর সদস্যদের মধ্যে	১২. গৌণ দল কখনও স্থায়িত্ব লাভ করলেও এর সদস্যদের মধ্যকার

www.swapno.in

বিদ্যমান সম্পর্ক সহজে নষ্ট হয় না।	সম্পর্ক খুব বেশী ঘনিষ্ট হয় না।
১৩. মুখ্য দলের সদস্যদের ভেতর দৈহিক নৈকট্য বিদ্যমান।	১৩. গৌণ দলের সদস্যদের মধ্যে দৈহিক দূরত্ব বেশী।

অনুশীলনী ঃ ১ (Acivity : 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

গৌণ দলের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলনী ঃ ২ (Acivity : 2) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

মুখ্য দলকে কোন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সনাক্ত করা যায়?

১.
২.
৩.
৪.
৫.

সারাংশ ঃ

সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের মধ্যে দল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। মানুষ সামাজিক জীব। সে সঙ্গপ্রিয় এবং দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে চায়। এ জন্যই মানুষ বিভিন্ন দল গঠন করে। দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দলের প্রকারভেদ করতে গিয়ে এক একজন সমাজবিজ্ঞানী এক একটি বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন বিধায় দলের শ্রেণীবিভাগ সবসময় একরূপ হয়নি। অতএব দল বলতে আমরা বুঝি একাধিক ব্যক্তির সমষ্টি যারা একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে। যথা - পরিবার, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। ম্যাকাইভার দল বলতে কি বুঝিয়েছেন?
ক) জনসমষ্টির পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক
খ) জনসমষ্টির পারস্পরিক আর্থ সামাজিক সম্পর্ক
গ) জনসমষ্টির পারস্পরিক পারিবারিক সম্পর্ক
ঘ) জনসমষ্টির পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্ক

২। মুখ্য দলের সদস্যদের সচেতনতা কেমন?
ক) পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অসচেতন
খ) পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন
গ) সমাজের সকল স্তরের মানুষ সম্পর্কে সচেতন

www.swapno.in

ঘ) রাজনৈতিকভাবে সচেতন

৩। গৌণ দলের সদস্য বা একে অন্যের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক বঝায় রাখেন ?
ক) তিক্ত সম্পর্ক
খ) পরোক্ষ সম্পর্ক
গ) ঘনিষ্ট সম্পর্ক
ঘ) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পর্ক

৪। "অন্তরঙ্গ দল" বলে সমাজবিজ্ঞানী কুলী কোনটিকে চিহ্নিত করেছেন ?
ক) রাষ্ট্র খ) পরিবার
গ) জাতিবর্ণ ঘ) জনতা

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক) সমাজ কাকে বলে? সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
খ) সমাজের সংজ্ঞা দিন। সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
২। সম্প্রদায় বলতে কি বুঝায়? সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৩। সংঘ এর সংজ্ঞা দিন। সংঘের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
৪। সামাজিক প্রতিষ্ঠান কি? প্রধান প্রধান পতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।
৫। সংঘ কি? সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন।
৬। দল কাকে বলে? মুখ্য ও গৌণদলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সমাজ কাকে বলে?
২। সম্প্রদায় কি?
৩। ম্যাকাইভারের মতে সম্প্রদায়ের ভিত্তি কয়টি ও কি কি?
৪। সাধারণত কয়টি বৈশিষ্ট্য থাকলে যেকোন জনসমষ্টিকে সমাজ বলা যায়? বৈশিষ্ট্যগুলি কি-কি?
৫। ক) অন্তর্দল বলতে কি বুঝায়?
খ) বহির্দল বলতে কি বুঝায়?

উত্তরমালা ঃ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠ - ১ ঃ (১) ক, (২) গ, (৩) ক
পাঠ - ২ ঃ (১) গ, (২) ঘ, (৩) খ
পাঠ - ৩ ঃ (১) খ, (২) ঘ, (৩) গ, (৪) খ
পাঠ - ৪ ঃ (১) খ, (২) ক, (৩) ক, (৪) খ
পাঠ - ৫ ঃ (১) ক, (২) খ, (৩) গ, (৪) ঘ

www.swapno.in

সমাজের মৌলিক উপাদান

ইউনিট ৪

ভূমিকা ঃ

মানুষের সঙ্গে প্রাকৃতিক তথা ভৌগোলিক পরিবেশের রয়েছে এক নিবিড় বন্ধন। সমাজ জীবনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন ভৌগোলিক উপাদান বলতে কি বুঝায়। সাধারণত অর্থে প্রাকৃতিক পরিবেশই হচ্ছে ভৌগোলিক উপাদান। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু, তাপমাত্রা, নদনদী, আবহাওয়া ইত্যাদি। বনাঞ্চল, পশুপাখী, ঋতুচক্র, ঝড়বৃষ্টি, বন্যা, প্রভৃতি সবকিছুই ভৌগোলিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্ন। এই কারণে জলবায়ু, আবহাওয়া ও তাপমাত্রা বিভিন্ন রকম পরিলক্ষিত হয়। ফলে মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালী আলাদা হয়ে থাকে। যেমন, মরু ও উষ্ণ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালী আলাদা হতে বাধ্য। ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণেই মানুষের জীবন অভিন্ন হতে পারে না। মূলত মানুষের সামগ্রিক জীবনের উপর ভৌগোলিক পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাবকে মানুষ কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না। এই পর্যায়ে আমরা ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবো।

মানব সমাজ হল সমাজবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ আধুনিক যুগে বিভিন্ন কলাকৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাণী জগতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষ এবং প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। প্রকৃতি নানাভাবে মানুষকে সম্পৃক্ত করে এবং অনেক সময় মানুষ অত্যন্ত গভীরভাবে প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষও কিন্তু তার বুদ্ধি ও কলাকৌশল দ্বারা প্রকৃতির উপর বিভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর মানুষের এই রূপ প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করে না বরং মানুষকেই প্রকৃতির সাথে সংগতি রেখে সমাজ গঠন করতে হয়। এজন্যই বোধ হয় সমাজবিজ্ঞানী কাল মার্কস বলেছেন "মানুষের সাথে প্রকৃতির পারস্পরিক ক্রিয়ার অপর নাম সামাজিক বিবর্তন তথা উভয়ই সামাজিক বিবর্তন ঘটায় (The interaction between man and nature is and produces social evolution)।

ম্যাকাইভারের মতে, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সামগ্রিক প্রভাবে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হয়। আমরা যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে, ভৌগোলিক, জৈবিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব মানুষের উপর কত প্রবল। যে সকল উপাদান সমাজ জীবনকে বেশী প্রভাবিত করে সেগুলি হল ঃ

ভৌগোলিক তথা পরিবেশ, সাংস্কৃতিক তথা কৃৎকৌশলগত উপাদান, বংশানুক্রমিক তথা জৈব-মনস্তাত্বিক উপাদান, সামাজিক তথা দলগত উপাদান। এ ইউনিট শেষে আপনারা সমাজের উপর উল্লিখিত চারটি মৌলিক উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

শিক্ষাসূচী

www.swapno.in

এই ইউনিটে ৪টি পাঠ রয়েছে। প্রতিটি পাঠ ৪৫ মিনিটের। চারটি পাঠ সম্পন্ন করার জন্য আপনার ১৮০ মিনিট সময় লাগবে। এছাড়া ৪টি পাঠে মোট ৭টি অনুশীলন (Activity) দেওয়া হয়েছে। এ অনুশীলনগুলোর (Activities) এর জন্য অতিরিক্ত ৪১ মিনিট সময় লাগবে। নিম্নের সারণীর মাধ্যমে আপনি পড়ার সময়কে ভাগ করে নিতে পারবেন।

দিন	নির্ধারিত সময়	পাঠ/পাঠের অংশ বিশেষ	অনুশীলন	মন্তব্য
শুক্রবার				
শনিবার				
রবিবার				
সোমবার				
মঙ্গলবার				
বুধবার				
বৃহস্পতিবার				

কখন পড়বেন ঃ

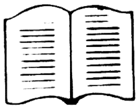

একটু ভাবুনতো আপনার হাতে পড়ার মত সময় কতটুকু এবং কখন আছে? – ভেবেছেন। আপনি যদি চাকুরীজীবী, শ্রমজীবী, পরিবারের দায়িত্বশীল কিংবা কর্তা ব্যক্তি হন তাহলে দেখা যাবে প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আপনি পড়াশুনা করার সময় পেয়ে থাকেন। এ সময়টুকু আপনি আপনার পড়াশুনার জন্য ব্যয় করে ভাল ফলাফলের অধিকারী হতে পারবেন। মনে রাখবেন, প্রতিদিন যা পড়বেন তা ঘুমানোর সময় একটু মনে করার চেষ্টা করুন। অনুশীলনগুলো করার পর বুঝতে পারবেন যে, আপনি পাঠটি ভালভাবে শিখেছেন কিনা। ইউনিট শেষে রচনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। এগুলো থেকে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা, এসাইনমেন্ট ইত্যাদি দেওয়া হবে। তাই পুরো ইউনিটটি খুব ভাল করে পড়বেন।

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজ জীবনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব

পাঠ ১

ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম ও আচার-আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

- **ভৌগোলিক উপাদনসমূহ**
- **সমাজ জীবনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রত্যক্ষ প্রভাব**
- **সমাজ জীবনে ভৌগোলিক উপাদানের পরোক্ষ প্রভাব**
- **অনুশীলন**
- **স্বমূল্যায়ন**

উদ্দেশ্য(Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

১. ভৌগোলিক উপাদান কি তা জানতে পারবেন;

২. ভৌগোলিক উপাদানের প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্পর্কে অবগত হবেন;

৩. ভৌগোলিক উপাদানের পরোক্ষ প্রভাব উপলব্ধি করতে পারবেন।

সামাজিক জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

ভৌগোলিক পরিবেশ বলতে ভূ-প্রকৃতির অবস্থা, জলবায়ু, মাটির উর্বরতা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, নিবিড় অরণ্য ও মরুভূমি-এ সকলের সামগ্রিক অস্তিত্বকে বুঝায়। সাধারণভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশই হচ্ছে ভৌগোলিক উপাদান। আর এই ভৌগোলিক উপাদানের বৈচিত্র্যের কারণেই পৃথিবীর নানা দেশের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অসম অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

মানুষ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। ভৌগোলিক পরিবেশ বলতে ভূ-প্রকৃতির অবস্থা, জলবায়ু, মাটির উর্বরতা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, নিবিড় অরণ্য এবং মরুভূমি এ সকলের সামগ্রিক অস্তিত্বকে বুঝায়। সাধারণভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশই হচ্ছে ভৌগোলিক উপাদান। আর এই ভৌগোলিক উপাদানের বৈচিত্র্যের কারণেই পৃথিবীর নানা দেশের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অসম অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ভৌগোলিক উপাদানটি এমনই প্রভাবশালী যে সমাজ চিন্তাবিদরা সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি, বিকাশ ও পতনের ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিককালের সমাজ দার্শনিকরা সমাজ জীবনে ভৌগোলিক উপাদানের গুরুত্বের কথা নানাভাবে উল্লেখ করেছেন।

ভৌগোলিক মতবাদের সাথে গ্রীক মনীষী এরিষ্টটল বিশেষভাবে জড়িত। তাঁর মতে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশে প্রাচীনকালে গ্রীকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছিল। বাক্‌ল ও হ্যান্টিংটন মানবসমাজে ভৌগোলিক প্রভাবের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেন, যা পরবর্তীকালে ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

মার্কিন ভূ-তত্ত্ববিদ হ্যান্টিংটন তাঁর Civilization নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, জলবায়ু মানুষের কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর মতে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবেই উষ্ণ অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল।

বাকল তাঁর History of civilization in England নামক বই-এ বলেছেন যে, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে ভৌগোলিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

ফরাসী দার্শনিক মন্টেসকিউর মতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য।

www.swapno.in

ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম ও আচার-আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ দৈহিক দিক থেকে শক্তিশালী ও সাহসী হয়ে থাকে। আর উষ্ণ অঞ্চলের মানুষ হয় দুর্বল ও ভীরু, শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ কর্মক্ষম ও গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের মানুষ কর্মবিমুখ ও অলস। ভৌগোলিক উপাদানের পার্থক্যের কারণে মানুষের জীবনধারা সর্বত্র অভিন্ন নয়।

মানুষ আধুনিক কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে প্রাণী জগতে শ্রেষ্টত্ব অর্জন করলেও সে অনেক ক্ষেত্রে এখনো অসহায়। যেমন ঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্বাভাসের মাধ্যমে মানুষ সতর্ক হতে পারলেও সেগুলি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আজও অর্জন করতে পারেনি।

বস্তুতপক্ষে, মানব জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে মানুষ কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারে না। মানব জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১) প্রত্যক্ষ প্রভাব

২) পরোক্ষ প্রভাব

প্রত্যক্ষ প্রভাব ঃ

১) সভ্যতার বিকাশ ঃ এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী 'গোল্ডেন ওয়েজার' বলেন, মানুষ কি ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলবে প্রাকৃতিক পরিবেশ তার রূপরেখা প্রদান করে, যেমন মরু প্রদেশ এবং উষ্ণ মন্ডলের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতএব জীবন যাত্রাও যে সেসব অঞ্চলে ভিন্ন হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। উষ্ণ মন্ডলের লোকদের পক্ষে এস্‌কিমোদের মত তুষার ঘর তৈরী করা সম্ভব নয়, আবার ইন্দোনেশিয়াতে উষ্ণমন্ডল জনিত কারণে দেখা যায়- নারিকেল গাছ বেশী জন্মে। তাই এই নারিকেলের উপর ভিত্তি করে সেখানে গড়ে উঠেছে নারিকেল সংস্কৃতি (Coconut Culture)। তাই এস্‌কিমোরা ইচ্ছে করলেই নারিকেল সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারবেনা। অন্যদিকে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল হবার ফলে সেখানে গড়ে উঠেছে প্রাচ্যের কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতা।

২) কর্ম প্রতিভার বিকাশ ঃ অনেক সময় অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের ফলে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাই কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে "ভৌগোলিক পরিবেশের সুতিকাগারই মানুষের কর্ম প্রতিভা বিকাশের সর্বোত্তম ক্ষেত্র"। কারণ এখানেই মানুষ আপন ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করার সুযোগ লাভ পায়।

৩) শিল্পের উপর প্রভাব ঃ শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান জন্য প্রয়োজন কাঁচামাল এবং ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা। যে সব অঞ্চলে কাঁচামাল সহজ লভ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল সেখানেই শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠে। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। সেকারণে পাট শিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

৪) কৃষির উপর প্রভাব ঃ বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশে তথা মাটি, জলবায়ু ও তাপমাত্রার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়। যেমন বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে সেখানে চা-শিল্প গড়ে উঠেছে। একইভাবে সিলেটে কমলা উৎপন্ন হয়, বরিশালে বিপুল পরিমাণ ধান জন্মে, রাজশাহী ও কুষ্টিয়ায় অনেক পরিমাণে আম পাওয়া যায়।

৫) পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব ঃ ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন স্থানে নানা পেশার লোক দেখা যায়; যেমন, যেখানে খনি আছে সেখানে খনিশ্রমিক, শিল্প এলাকায় শিল্প শ্রমিক এবং কৃষি প্রধান এলাকায় কৃষিশ্রমিক বেশী দেখা যায়।

www.swapno.in

৬) যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রভাব ঃ ভৌগোলিক অবস্থানের বৈচিত্র্য একটি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে। এক মহাদেশের সংগে অন্য মহাদেশের এক দেশের সংগে অন্যদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হলে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন সহজতর হয়। যেমন, খাইবার গিরিপথ ও সুয়েজখাল পাশ্ববর্তী দেশসমূহে বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করেছে। সাম্প্রতিককালে নির্মিত যমুনা বহুমুখী সেতু (যা দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘতম) শুধু বাংলাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগকেই সুগম করবে না, এটি বাংলাদেশকে সমগ্র এশিয়া, এমনকি ইউরোপের সাথেও স্থলপথে সমন্বিত সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

৭) কুটির শিল্পের উপর প্রভাব ঃ কুটির শিল্পের উপরও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট। যেসব অঞ্চলে যে ধরনের কাঁচামাল বেশী উৎপন্ন হয় কিংবা সহজলভ্য সেসব অঞ্চলে ঐ কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে কুটির শিল্প গড়ে উঠে। যেমন ঃ রাজশাহীতে প্রচুর তুতগাছ জন্মানোর কারণে সেখানে রেশমী শাড়ীর জন্য বস্ত্রমিল গড়ে উঠেছে তেমনি সিলেট বেত শিল্পের জন্য বিখ্যাত এবং পাবনা তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

৮) পোষাক-পরিচ্ছদের উপর প্রভাব ঃ পোশাক পরিচ্ছদও ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। শীত প্রধান অঞ্চলে মোটা কাপড় বা গরম পশমী কিংবা এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ হালকা সুতির কাপড় ব্যবহার করে।

৯) ঘরবাড়ীর উপর প্রভাব ঃ ভৌগোলিক পরিবেশের উপর ঘরবাড়ী তৈরির নমুনা নির্ভর করে। বাড়ীঘর তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন, বাঁশ, কাঠ, ছন, খড়, ইট ইত্যাদি ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাবাধীন। যে অঞ্চলে ভূমিকম্প বেশী হয় সেখানে কাঠের দ্বারা বাড়ীঘর তৈরী করে, আবার তুষার অঞ্চলের লোকেরা অর্থাৎ এসকিমোরা তুষার ঘর তৈরী করে।

১০) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব ঃ শিল্প, সাহিত্য ও প্রযুক্তির সৃষ্টির পেছনেও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন - জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বারবার প্রকৃতির কথা ফুটে উঠেছে। তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দের্যের কারণেই বাংলাদেশকে 'রূপসী' বাংলা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার পাহাড়ী অঞ্চলের গানের সুর ভাটিয়ালী সুর থেকে আলাদা। ভৌগোলিক পরিবেশ-নির্ভর আর্থ-সামাজিক অবস্থাই সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের রূপরেখা রচনা করে।

১১) আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রভাব ঃ সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে মানুষের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের সমাজে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলা হয় সেসব ইউরোপের দেশগুলোর আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে ভিন্ন। এক বিশেষ ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে বাঙালী সমাজে "আড্ডা", দুপুরে ঘুমান, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং শীতের পিঠা উৎসব এক একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। বিয়ের সময় গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠান এবং অতিথি আপ্যায়ন পান-সুপারীর ব্যবস্থার অস্ট্রিক জাতিভুক্ত বাঙ্গালীর অন্যতম সামাজিক বৈশিষ্ট্য, যার পিছনে অনুকূল ভৌগোলিক উপাদান ক্রিয়াশীল।

১২) ব্যক্তিগত আচরণ ও দক্ষতার উপর প্রভাব ঃ জলবায়ু ও তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে মানুষের আচরণেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, পাহাড়িয়া অঞ্চলের মানুষ পরিশ্রমী হয়, গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের মানুষ অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ক্ষুধা বেশী লাগে, মেজাজী হয় এবং ঐ অঞ্চলের মানুষের ঘুমের মাত্রা অত্যধিক। অন্যদিকে, শীত প্রধান অঞ্চলে মানুষের ঘুম কম এবং তারা বেশী পরিশ্রমী হয়।

১৩) ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব ঃ ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের ব্যক্তিত্বকেও প্রভাবিত করে। এই কারণেই "জাতীয় চরিত্র" বলে একটি কথা চালু রয়েছে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, এক এক দেশের মানুষের মৌলিক ব্যক্তিত্ব (Basic personality) এক এক ধরনের। যেমন বাংলাদেশের মানুষ বেশী আবেগ প্রবণ, সমতল ভূমির মানুষ- ধীর ও শান্ত হয় এবং পাহাড়ী

www.swapno.in

মানুষ হয় কর্মঠ এবং হিংস্র, সমুদ্র এবং নদীপ্রধান অঞ্চলের লোকেরা সাহসী হয়। কারণ তারা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে থাকে।

পরোক্ষ প্রভাব

১) রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব ঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মন্টেস্কু বলেছেন যে, পৃথিবীর কৃষি প্রধান অঞ্চলে অভিজাত তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, আর বাণিজ্যপ্রধান এলাকা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সে কারণে ইউরোপের শীত প্রধান অঞ্চলের শহরগুলোকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্র গড়ে উঠেছে।

২) অপরাধ প্রবণতার উপর প্রভাব ঃ অনেকে মনে করেন অপরাধ প্রবণতার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রভাব কম বেশী দায়ী। অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে অপরাধ প্রবণতা যথা - খুন, জখম, চুরি সহ বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সমতল অঞ্চলের তুলনায় পাহাড়ী অঞ্চলে বেশী। কারণ অপরাধ করে সহজেই পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা যায়। বাংলাদেশে জুন ও ডিসেম্বর মাসে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়, কারণ জুন মাসে বাংলাদেশের চাষীরা পাট বিক্রি করে এবং হাতে নগদ টাকা আসে। অন্যদিকে, ডিসেম্বর মাসের লম্বা রাত সিদেল চুরির জন্য খুবই উপযোগী।

৩) জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব ঃ মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উপরও ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ করা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের লোকেরা কম বয়সে বয়োপ্রাপ্তঃ হয়, আর শীত প্রধান দেশের লোকেরা বেশী বয়সে বয়োপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে জন্মহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৪) নীতিবোধের উপর প্রভাব ঃ মানুষের নীতিবোধের উপরও ভৌগোলিক প্রভাব দেখা যায়। গো-রক্ষা ভারতীয় হিন্দুদের ধর্মের একটি অন্যতম অংগ। তাই সে সমাজে গো-হত্যা মহাপাপ বলে গণ্য। প্রাচীনকালে যখন ভারতে কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ঘটে তখন কৃষি উৎপাদনের জন্য গরুর প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। আবার মরু অঞ্চলে অতিথি পরায়নতা একটি বিশেষ নীতিধর্ম। মরুঅঞ্চলে প্রচণ্ড গরমে যাতায়াতের সময় ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে হয়। তাই সেখানকার মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে অপূর্ব আতিথেয়তাবোধ। আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশ জনিত কারণে আরবের সংস্কৃতিতে আতিথেয়তা একটি নীতিবোধ হিসেবে আখ্যায়িত।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আচার-অনুষ্ঠানে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বিদ্যমান। তাই মানুষের জীবনে যে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে তা অনস্বীকার্য। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হলেও মানুষ এখনো প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়নি। আর এই অক্ষমতার জন্যই ভৌগোলিক পরিবেশ এখনও মানুষের সমগ্র জীবন ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

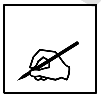

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৬ মিনিট**

দশটি ভৌগোলিক উপাদানের নাম লিখুন ঃ

১.	২.	৩.	৪.	৫.
৬.	৭.	৮.	৯.	১০.

www.swapno.in

অনুশীলনী ২ (Activity2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

অপরাধ প্রবণতার উপর ভৌগোলিক প্রভাব কতটুকু তা ব্যাখ্যা করুন ঃ (১৫০ শব্দ দ্বারা)।

সারাংশ

সমাজ জীবনে প্রভাবশীল উপাদানসমূহের মধ্যে ভৌগোলিক উপাদান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষ নানাভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। মানুষ অনেক সময় তার বুদ্ধি, চিন্তা, প্রযুক্তি ও কলাকৌশল দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষকে সমাজ জীবন গড়ে তুলতে হয়। ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের চিন্তা-চেতনা, কাজ-কর্ম, অর্থনীতি, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল। মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টা ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূত অগ্রগতির কারণে পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। বস্তুত, প্রাকৃতিক পরিবেশকে মোকাবেলা করার প্রয়াস থেকেই মানুষের সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। "প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা সভ্যতার রূপরেখা নির্ধারিত হয়" এ উক্তিটি কে করেছেন?

ক) সেন্ট-সাইমন খ) বটোমোর

গ) গোল্ডেন ওয়েজার ঘ) ম্যাকাইভার

২। পোষাক-পরিচ্ছদ সবচেয়ে কিসের দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়?

ক) ভৌগোলিক পরিবেশ খ) সংস্কৃতি

গ) রুচিবোধ ঘ) সামাজিক কাঠামো

৩। আবহাওয়ার দিক থেকে কোন অঞ্চলের মানুষেরা সবচেয়ে বেশী কর্মক্ষম হয়?

ক) শীতপ্রধান খ) গ্রীষ্ম প্রধান

গ) নাতিশীতোষ্ণ ঘ) চরম ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পন্ন।

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজ জীবনে জৈবিক উপাদান তথা বংশগতির প্রভাব

পাঠ ২

ভূমিকা

সমাজ জীবনের উপর জৈব–মনস্তাত্বিক প্রভাবও ক্রিয়াশীল। আমরা জানি যে, জীবের সকল বৈশিষ্ট্য ক্রোমোজোমে অবস্থিত 'জিন' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তা বংশ পরস্পরায় প্রবাহিত হয়। যেসব দৈহিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী প্রজন্মের সন্তান–সন্ততিরা অর্জন করে তা হলো নাকের আকৃতি, মাথার আকৃতি, চোখের রং, গায়ের রং, চুলের রং ও চুলের ধরণ, ইত্যাদি।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সমাজ জীবন বংশগতির চেয়ে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বেশী। বংশগতির মাধ্যমে মানুষ অনেক বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও পরিবেশের প্রভাবে সেসব বিকশিত কিংবা অবদমিত হয়। তবে আমরা একটু বলতে পারি যে, ভৌগোলিক পরিবেশ ও বংশগতির পারস্পরিক প্রভাবেই একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে।

মূলধারণা

মূলধারণা ঃ

- বংশগতিঃ সংজ্ঞা ও ধারণা
- সমাজ ও সভ্যতার, উপর বংশগতির প্রভাব
- বংশগতির উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পাঠটি পড়ে -

১. বংশগতি কাকে বলে তা জানতে পারবেন;
২. সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে বংশগতি কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে তা জানতে পারবেন;
৩. বংশগতির উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

> বংশগতি বলতে সাধারণত জৈবিক কতকগুলো বৈশিষ্ট্যকে বুঝায় যেসব জন্মসূত্রে মানুষ লাভ করে। স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, মেধা, স্মরণশক্তি, মেজাজ এবং সর্বোপরি দৈহিক কাঠামো একান্তভাবেই বংশগতির প্রভাবাধীন।

সামাজিক জীব হিসাবে ব্যাক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাব অনস্বীকার্য। বংশগতি বলতে সাধারণত কতকগুলো জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়, যেসব জন্মসূত্রে মানুষ লাভ করে। স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, মেধা, স্মরণশক্তি, মেজাজ সর্বোপরি দৈহিক কাঠামো একান্তভাবেই বংশগতির প্রভাবাধীন। মানুষ স্বেচ্ছায় এসব উপাদান সৃষ্টি কিংবা পরিবর্তন করতে পারেনা। মানুষের গড়া সমাজের উপর বংশগতির একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জন্মসূত্রে মানুষ মা-বাবা ও দাদা দাদীর কাছ থেকে দেহের আকৃতি, চোখের আকৃতি ও রং এবং ইত্যাদি অবয়ব পেয়ে থাকে। দেহের রং, চুলের রং, মাথার আকৃতি, রক্তের গ্রুপ, মন–মেজাজ, ও রোগ–ব্যাধির অনেকটাই মানুষ বংশানুক্রমিক ধারায় অর্জন করে। জীববিজ্ঞানী মেনডেল

www.swapno.in

বংশগতির এ তত্ত্ব দিয়েছেন বলে একে মেন্ডেলবাদ বলা হয়। বংশ পরম্পরায় জৈবিক বৈশিষ্ট্যবলীর পুনরাবৃত্তির মধ্যেই মেন্ডেলবাদের মূল কথা নিহিত।

এখন আমরা সমাজ জীবনে বংশগতির প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজ দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর মতবাদ আলোচনা করবো।

সমাজ জীবনে বংশগতির প্রভাব প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর সমাজ দর্শনে সামাজিক স্তর বিন্যাসের সাথে মানসিক গুণাবলীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। আর ঐ মানষিক গুণাবলীর অনেকটাই জৈবিক বৈশিষ্ট্য থেকে অর্জিত। প্লেটো তাঁর 'দি রিপাবলিক' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মানসিক গুণাবলীর ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব নির্ণয় করেছেন। যেমন তিনি যুক্তি (Reason) সাহত (Courge) ও ক্ষুধা (Appetite)-এ তিনটি জৈব-মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাচীন গ্রীক সমাজে যথাক্রমে দার্শনিক তথা শাসক শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী ও উৎপাদক শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে প্লেটোর চেয়ে তার প্রিয় ছাত্র এরিষ্টটলের রচনায় (পলিটিকস্) বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীক সমাজের প্রধান দু'টি শ্রেণী যথা দাস ও দাস-মালিক শ্রেণীর অস্তিত্বে মূলে যে জৈবিক উপাদান তথা বংশগতি অধিকতর ক্রিয়াশীল সে কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে (Some are from to commend and some are born to be Subjugated)। এরিষ্টটলের মতে দাস ও প্রভু সমাজ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। দাসা ছাড়া প্রভু এবং প্রভু ছাড়া দাসের কল্পনাই করা যায় না।

বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানীদের মতে কেবল উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর লোকেরাই সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কারণ তারা সভ্য, মার্জিত, কর্মঠ, উন্নত বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা ও সভ্যতার ধারক ও বাহক। তারা উৎকৃষ্ট শাসকও বটে।

অপর পক্ষে, নিকৃষ্ট বংশধারার লোকেরা অলস ও অমার্জিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের অনীহা থাকে। তাই তারা সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে কোন অবদানই রাখতে পারে না।

বর্ণবাদী পন্ডিত তথা জৈবিক নিয়ন্ত্রণবাদীদের মতে উৎকৃষ্ট জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষরাই কেবল সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারে। জৈবিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অভাব ঘটলে সভ্যতার পতন ঘটে।

তাদের মতে উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর সঙ্গে নিকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য লোপ পাবে এবং উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠী সভ্যতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে ব্যর্থ হবে। এতে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

অনেক সমাজবিজ্ঞানীও বংশগতির প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। এরা বিশ্বাস করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক জন্মগতভাবেই উত্তম অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তায় এরা উন্নত। এরা কর্মবীর, এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসক ও নেতা পদে আসীন হতে পারে। সে যা হোক বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের উক্ত ধারণা আজকাল অভ্রান্ত বলে আর স্বীকৃতি পায় না। অর্থাৎ মানুষের জীবনে বংশগতির চেয়ে পরিবারের প্রভাব বেশী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্রান্সিস গ্যাল্টন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যে-কোন পরিবারেই উত্তম ও অনন্য প্রতিভা জন্মাতে পারে। তাঁর মতে পিতামাতা যদি বুদ্ধিমত্তা ও উন্নত মানের হয় তা হলে তাদের সন্তানরাও উন্নত মানের এবং প্রতিভাবান হতে পারে। এই প্রতিভাবান সন্তনরা বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, সমান সুযোগ পেয়েও নিচুবংশের ছেলেমেয়েরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। তবে এর ব্যাতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়।

বিজ্ঞানী গোবীনের মতে সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির মূলে নরবংশগত উপাদানই দায়ী।

বিজ্ঞানী গোবীনের মতে সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির মূলে নরবংশগত উপাদানই দায়ী। তাঁর মতে উৎকৃষ্ট নরবংশ যদি বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে তাদের অগ্রযাত্রা

www.swapno.in

ব্যাহত হবে না। অপরপক্ষে, নিকৃষ্ট নরবংশের লোক যতই পরিশ্রমী হোক না কেন তাদের দ্বারা সমাজ ও সভ্যতার কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়।

লাপোজের মতে নরবংশ যদি নিকৃষ্ট গুণের অধিকারী হয় তবে শিক্ষা কিংবা অনুকূল পরিবেশ তার মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারেনা। জন্মগতভাবে নির্বোধ ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা যায় না।

> কার্ল পিয়ার্সনের মতে দৈহিক ও মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য উত্তারাধিকার সূত্রেই বর্তায়।

কার্ল পিয়ার্সনের মতে দৈহিক ও মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য উত্তারাধিকার সূত্রে অর্জিত হয়। তাঁর মতে মানব জাতির উত্থান ও পতনের জন্য মূলত জৈবিক উপাদানই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন বলেন যে, একই সমাজের মানুষের মধ্যে জন্মসূত্রে দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য বিদ্যমান। তার মতে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সন্তানদের বুদ্ধিমত্তা (I.Q) নিম্নশ্রেণীর লোকদের সন্তানদের থেকে অনেক বেশি। তাঁর মতে একই পরিবেশে এই দুই শ্রেণীর সন্তানদের সমান সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে লালন পালন করার পরও দেখা গেছে যে, নিম্নশ্রেণীর লোকদের সন্তানেরা সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখতে পারেনা। অথচ উচ্চ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পরিবেশ এক হওয়া সত্ত্বেও বংশগতির পার্থক্যের কারণে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে তারা সমান অবদান রাখতে পারছে না।

অপরাধ বিজ্ঞানীরাও বংশগতির প্রভাবকে সমাজে অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী করেন। এঁদের মধ্যে লম্ব্রোসো অন্যতম।

> মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডোগাল তাঁর তত্ত্বে বংশগতির প্রভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মানুষের কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলেছেন, যেসব মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে এবং সে যে আচরণ করে তা এই সহজাত প্রবত্তিরই ফল।

মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডোগাল তাঁর তত্ত্বে বংশগতির প্রভাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি মানুষের কতকগুলো সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলেছেন, যেসব মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে এবং সে যে আচরণ করে তা এই সহজাত প্রবৃত্তিরই ফল।

তবে বংশানুক্রমের উপর পরিবেশের প্রভাবকে বৈজ্ঞানিকরা একেবারে অস্বীকার করেননি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ, অনুকূল জলবায়ূ, খাদ্য এবং শিক্ষার কোন ভূমিকা নেই একথা স্বীকার করেন না। ভৌগোলিক পরিবেশ কিভাবে সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে এই বিষয়টি ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কিত পাঠের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি।

> আজকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংস্কৃতি ও পরিবেশ মানুষের জীবনের উপর এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, বংশগতির প্রভাব গৌণ বলে গণ্য।

বস্তুত, সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশ ও বংশগতি উভয়েরই কমবেশী প্রভাব রয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, বংশগতি এবং পরিবেশ উভয়েরই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিসত্তা গড়ে উঠে। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংস্কৃতি ও পরিবেশ মানুষের জীবনের উপর এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, বংশগতির প্রভাব প্রায় গৌণ বলে গণ্য হয়।

তাই বলা যায় যে, ব্যক্তির জীবনে বংশগতি ও পরিবেশ কোনটাই উপেক্ষনীয় নয়। মানুষ তার আচরণ–ব্যবহার চলাফেরা ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি, উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং অনুকূল পরিবেশের সহায়তায় ঘটাতে পারে । পরিবেশ অনুকূল হলে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাসমূহ বিকশিত হবার সুযোগ বেশি পায়।

তবু একথা সত্য যে, মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর বংশগতির প্রভাব বেশী। তাছাড়া সম্ভাবনা যতই বেশী হোক না কেন, কাব্য প্রতিভা নিয়ে না জন্মালে কেউ কবি হতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজ জীবনে ভৌগোলিক পরিবেশ ও বংশগতির প্রভাবের কোনটাকে অস্বীকার করা যায় না।

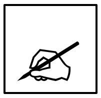

অনুশীলন ১ ঃ (Activity 1) **সময় ঃ ১০ মিনিট**

www.swapno.in

"ব্যক্তির জীবনে বংশগতি ও পরিবেশ কোনটিই উপেক্ষিণীয় নয়" - উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন (অনুর্ধ ১০০ টি শব্দ দ্বারা)।

সারাংশ ঃ
সমাজ জীবনের মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে বংশগতির প্রভাব অন্যতম। উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সমাজ জীবনে বংশগতির প্রভাব একেবারে উপেক্ষনীয় নয়। বস্তুত প্রতিটি মানুষই জন্মসূত্রে কিছু জৈবিক ও মানসিত গুণাবলী অর্জন করে, যা ব্যক্তি জীবনে তথা তার সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আবার অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, মানুষ পরিবেশের ফল। বংশগতির মাধ্যমে মানুষ তার গুণাবলী অর্জন করলেও পরিবেশের প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। অতএব আমরা বলতে পারি যে, আমাদের ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে পরিবেশ ও বংশগতি উভয়েরই প্রভাব রয়েছে এবং উভয়েরই মিথষ্ক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। কার মতে দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকর সূত্রে অর্জিত হয়?
ক) গোবিন খ) কার্লপিয়ার্সন
গ) ফ্রান্সিস গ্যাল্টন ঘ) ম্যান্ডেল

২। দৈহিক কাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে কোন উপাদানটি সবচেয়ে বেশী দায়ী?
ক) বংশগতি খ) ভৌগোলিক
গ) খেলাধূলা ও ব্যায়াম ঘ) ভাল খাওয়া দাওয়া

৩। "যে কোন পরিবারেই উত্তম ও অনন্য প্রতিভা জন্মাতে পারে" এ উক্তিটি কে করেছন।
ক) ম্যাকডোগাল খ) কার্লপিয়ার্সন
গ) ম্যান্ডেল ঘ) ফ্রান্সিস গ্যাল্টন

www.swapno.in

সমাজ জীবনে সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশলের প্রভাব

পাঠ ৩

মূলধারণা

- সংস্কৃতির সংজ্ঞা
- সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব
- উৎপাদন কৌশল ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশল বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন;
২. সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশল কিভাবে সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে তা জানতে পারবেন;
৩. কৃৎকৌশলের উপর ভিত্তি করে কিভাবে সমাজ বিবর্তিত হয় তা জানতে পারবেন।

ভূমিকা

অনেক সমাজবিজ্ঞানী সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসাবে সংস্কৃতিকে উৎপাদনের কৃৎকৌশল (Technique factor) বলে গণ্য করেন। সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের মতে 'মানব সৃষ্ট সব কিছুই সংস্কৃতি'। অর্থাৎ মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে তাই সংস্কৃতি। ব্যাপক অর্থে মানুষের ভাবধারা, বিশ্বাস, নীতিবোধ, আইন, ভাষা এবং মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার যন্ত্রপাতি, এমনকি বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যে সকল কৌশল অবলম্বন করে সে সব কিছুর সমষ্টি হল মানুষের সংস্কৃতি। মানুষ ও মানুষের সমাজ এই সংস্কৃতির উপাদান দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। নিম্নে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

বিষয়বস্তু

মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ তার সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির জীবনে এই সংস্কৃতির প্রভাব কখনো অবচেতন, আবার কখনো সচেতন ভাবে কাজ করে। ব্যক্তি তাই সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে চেষ্টা করে।

> সমাজজীবনকে যে সকল উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে সেসবের মধ্যে সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশল অন্যতম।

সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সাংস্কৃতিক উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে সমাজজীবনকে যে সকল উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে সেসবের মধ্যে সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশল অন্যতম।

www.swapno.in

সমাজ জীবনে প্রভাববিস্তারকারী উপাদান হিসেবে কৃৎকৌশলের তথা সংস্কৃতির ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা সংস্কৃতি বলতে উৎপাদনের কৃৎকৌশলকেও (Technique factor) বুঝিয়েছেন।

সংস্কৃতি বলতে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা মানবসৃষ্ট সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত উপকরণকে বুঝিয়ে থাকেন।

সংস্কৃতি বলতে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা মানবসৃষ্ট সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত উপকরণকে বুঝিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে যা কিছু মানুষের সৃষ্ট এবং মানব সমাজকে প্রভাবিত করে তাকেই সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশল বলে। এই অর্থে- উৎপাদনের কৌশল, হাতিয়ার বা যন্ত্রকে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উৎপাদন কৌশল বলতে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত সব উপাদান, যথা- কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন প্রকার হাতিয়ার, মানব শ্রম, ব্যবস্থাপনা এবং শ্রেণী সম্পর্ক– ইত্যাদিকে বুঝায়। অবশ্য সংস্কৃতির ব্যাখ্যা আরো ব্যাপক। কারণ সংস্কৃতি একটি বৃহত্তর প্রত্যয়। উৎপাদন কৌশল যেমন বস্তুগত সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক, তেমনি মানব সৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি মানুষের অবস্তুগত সংস্কৃতির এক একটি বহিঃপ্রকাশ। শুধু বস্তুগত সংস্কৃতিই নয়, অবস্তুগত সংস্কৃতিও সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। কেননা চিত্তের প্রশান্তি মানুষের সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং তাতে জীবন সংগ্রামে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তবে উৎপাদনের কৃৎকৌশল সমাজ জীবনকে মৌলিকভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুত উৎপাদন কৌশল হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির একটি মৌলিক দিক এবং সে কারণে উৎপাদন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন এলে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

আদিম সমাজ ছিল সরল-সহজ ও শ্রেণী হীন।

আদিম সমাজ থেকে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত সামাজিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ করলে হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। আদিম সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ যখন সরল-সহজ ও শ্রেণীহীন সমাজে বাস করতো এবং যখন হাতিয়ারের উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করতে পারেনি তখন সমাজ জীবন খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল । তখন তারা ফলমূল, শাক-পাতা, মাছ, পশু পাখি ইত্যাদি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। কোন কিছু উৎপাদন না করে তারা সম্পূর্ণ ভাবেই খাদ্য সংগ্রহ মূলত অর্থনীতির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতো। কারণ তখনও তারা উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করতে পারেনি। তখন ছিল শ্রেণীহীন আদিম সাম্যবাদী সমাজ। এ সমাজে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাগ ছিল। সক্ষম পুরুষরা সংঘবদ্ধ হয়ে পশু শিকার করতো। পুরুষেরা যখন পশু শিকারে বন জঙ্গলে যেত তখন মেয়েরা ঘরে বসে শিশু লালন-পালন করত এবং অবসর সময়ে ঘরের আশপাশ থেকে ফলমূল সংগ্রহ করত। কখনও কখনও তারা মাটিতে কোন কিছুর বীজ রোপন করত। এজন্যই মেয়েদের বলা হয় ইতিহাসের প্রথম কৃষক। কারণ তারাই এভাবে আদিম কৃষির সূচনা করে। গাছের ডালপালা ও নুড়িপাথরই ছিল মানুষের হাতিয়ার।

হাতিয়ার আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রথম পরিবর্তন আসে।

পরবর্তীতে মানুষ যখন তীর, ধনুক, বর্শা, বড়শি, ইত্যাদি হাতিয়ার তৈরী করে, তখন এসব হাতিয়ারের উপর নির্ভর করে জীবন ও জীবিকার নির্বাহের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিবর্তন আসে। আদিম উৎপাদন ব্যবস্থা, সমাজ-সংগঠন, পরিবার ও সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস প্রথা ইত্যাদি গড়ে উঠে। এই পর্যায়ে মানুষ বন্য পশুকে শিকার করে গৃহপালিত ও বংশবৃদ্ধির কৌশল আয়ত্ত করে। তখন পশুর মাংস, হাড়, চামড়া, ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। মানুষ তখন মূলত যাযাবর জীবনে পশুচারণ সমাজ (Pastoral Society) সৃষ্টি করে।

সবজি উৎপাদনের কৌশল আয়ত্বের মাধ্যমেই কৃষি অর্থনীতির গোড়া পত্তন

সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে উদ্যান কৃষি (Horticulture)। এই পর্যায়ে মানুষ বিভিন্ন সবজি উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ব করে এবং এটা কৃষি অর্থনীতির গোড়া পত্তনে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

আদিম সাম্যবাদের পরে আসে দাসপ্রথা ভিত্তিক ইতিহাসের প্রকৃত শ্রেণীবিভক্ত ও উৎপাদনমূলক সমাজ। এটি মূলত পাশ্চত্যের ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী গ্রীসে গড়ে উঠে। দাস ব্যবস্থার অধীনে কিছু কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের সুযোগ ছিল। ভৌগোলিক কারণেই প্রাচীন গ্রীসে উৎপাদনের

www.swapno.in

প্রয়োজনে দাসপ্রথা একটি অমানবিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। দাস-মালিক এই দুই শ্রেণীই ছিল প্রাচীন গ্রীসের সামজ কাঠামোর প্রধান সামাজিক গোষ্ঠী। এরপর মানুষের উত্তরণ ঘটে কৃষিভিত্তিক সামন্ত সমাজে। এই সমাজ ব্যবস্থায় ভূমিই প্রধান উৎপাদনের উপায়। ভূমিকে কেন্দ্র করে সমাজ শ্রেণী বিভক্ত ছিল। ভূমির মালিক ও ভূমি দাস ছিল সামন্ত সমাজের প্রধান দুই শ্রেণী।

নদীর তীরবর্তী পলিমাটি সমৃদ্ধ অঞ্চলে প্রাচ্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে। মানুষ যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করে কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে মানব সমাজ একটি স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং এক পর্যায়ে কৃষি ভিত্তিক সমাজে উদ্বৃত্ত ফসলের সমাগম ঘটে, যার উপর ভিত্তি করে একটি অবসর জীবন যাপন কারী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই কৃষি নির্ভর সমাজে ভূমি এবং উদ্বৃত্ত ফসলের উপর ভিত্তি করে সমাজে শ্রেণী ভেদাভেদ কঠোর ব্যবস্থায় পরিণত হয়। আর এভাবেই মানব সমাজে সামন্ত বাদের উদ্ভব ঘটে। এই পর্যায়ে ভূমির নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে সমাজে সামন্তপ্রভু, কৃষক, ভূমিদাস ইত্যাদি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

> বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উৎপাদন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি উৎপাদন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সূচনা করে। শিল্প, কারখানা গড়ে উঠে এবং উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধিপায়। বস্তুত, উৎপাদন কৌশলের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আধুনিক শিল্প পুঁজিবাদী সমাজের গোড়াপত্তন করে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মূলে উন্নত প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তিই উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন। মধ্যযুগের শেষভাগে যান্ত্রিক উন্নতির ফলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে উদ্ধৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি হয় তার ফলে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। শিল্প বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে সামন্ত অর্থনীতির পরিবর্তে নুতন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে, যা ইতিহাসে পুঁজিবাদ নামে পরিচিত। এর ফলে উৎপাদন যন্ত্রে তথা উৎপাদন কৌশলে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যের সমাজে নূতন ভাবাদর্শ উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হয় যান্ত্রিক ও যৌক্তিক। সামাজিক শোষণ, অনাচার, অপরাধ, ও মূলবোধের অবক্ষয় পুঁজিবাদী সমাজের একটি সাধারণ চিত্র। অন্যদিকে, শিল্প-উৎপাদন ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমবন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। এই সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিপরীতধর্মী একটি সাংস্কৃতিক জীবন যাত্রা গড়ে ওঠে। সমাজতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপায়সমূহ সামাজিক মালিকানাধীন থাকে। উক্ত উৎপাদন প্রণালী জনগণের সর্বাধিক কল্যাণে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। উল্লেখ্য, সমাজতন্ত্র হচ্ছে আধুনিক সাম্যবাদ উত্তরণের প্রথম পর্যায়। আধুনিক সাম্যবাদ এখনও কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাশিয়া ও চীনসহ পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা নব্বই এর দশকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

আধুনিককালে নুতন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সমাজ জীবনে উন্নত প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। যতই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছে ততই মানুষের জীবন যাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন কমবেশী প্রতিটি সমাজেই লক্ষণীয়।

আমরা উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যে, সংস্কৃতি অর্থাৎ মানুষের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, প্রথা, চিন্তা-চেতনা এবং উন্নত প্রযুক্তি মানুষের সমাজের উপর বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব প্রতিটি সমাজেই রয়েছে। তবে উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

www.swapno.in

অতএব আমরা বলতে পারি যে, সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশল নিঃসন্দেহে নানাভাবে সমাজ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। কেননা অর্থনৈতিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার সাংস্কৃতিক পরিবেশের পার্থক্যের ফলে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মানসিক গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

অনুশীলন ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

"আদিম সমাজ ছিল সরল-সহজ ও শ্রেণীহীন" কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। (অনুর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা)।

অনুশীলন ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

কেন এবং কখন উৎপাদন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল?

সারাংশ ঃ

সমাজ জীবনকে যে সকল উপাদান প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাদের মধ্যে সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশল অন্যতম। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সংস্কৃতি ও কৃৎকৌশল মানুষ ও সমাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব প্রতিটি সমাজেই কমবেশী বিদ্যমান। তবে দেশ ও সমাজ ভেদে সংস্কৃতি ও কৃৎকৌশলগত প্রভাবের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মানুষ শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃতির শক্তি অর্জন করে। উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্ক সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। কেননা অর্থনৈতিক কাঠামো (যা সমাজের মৌল ভিত্তি) সংস্কৃতি (যাকে উপরি কাঠামো বলা হয়) পরস্পর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কোন্ উপাদানের দ্বারা সমাজ জীবন মৌলিকভাবে প্রভাবিত হয়?

www.swapno.in

ক) অর্থনীতি খ) রাজনীতি
গ) ভৌগোলিক পরিবেশ ঘ) উৎপাদন কৌশল

২। কৃষি ভিত্তিক সামন্ত সমাজের উত্তরণ কখন ঘটে?
ক) কৃষি আবিষ্কারের পর খ) দাস ব্যবস্থার পর
খ) খ্রীস্টপূর্ব ২০০ বৎসর পূর্বে ঘ) উনবিংশ শতাব্দীর পর

৩। কোন সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহ সামাজিক মালিকানাধীন থাকে?
ক) পুঁজিবাদী খ) সামন্ততান্ত্রিক
গ) দাসপ্রথা ভিত্তিক ঘ) সমাজতান্ত্রিক।

www.swapno.in

www.swapno.in

সামাজিক উপাদানের প্রভাব

পাঠ ৪

ভূমিকা ঃ

সামাজিক উপাদান সমাজ জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। মানুষ সমাজ জীবনে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবাধীন হয়। সামাজিক পরিবেশে মানুষ পাস্পরিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করে। মানব শিশু জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবার, প্রতিবেশী, স্কুল, বন্ধু, সংঘ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির প্রভাবে থেকে সমাজের সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে। আর এসবের সম্মিলিত রূপকেই সামাজিক তথা দলগত উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এসব সামাজিক উপাদান মানুষের নৈতিক ও মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। আমরা এসব এখন বিভিন্ন সামাজিক উপাদান কিভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

মূল ধারণা

- সামাজিক উপাদান ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা
- সামাজিক উপাদানসমূহ
- মানুষের জীবনে সামাজিক উপাদানের প্রভাব
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

১। সামাজিক উপাদান কি তা জানতে পারবেন;

২। সামাজিক উপাদানগুলি কিভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে অবগত হবেন।

> সামাজিক উপাদান বলতে পরিবার , পাড়া–প্রতিবেশী, সম্প্রদায়, খেলারসাথী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় সংঘ, দল ইত্যাদিকে বুঝায়। মানুষের সমাজ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে সামাজিক

> ব্যক্তি যে– প্রক্রিয়ায় সামাজিক সদস্য হিসাবে গড়ে উঠে তার নাম সামাজিকীকরণ।

সমাজ জীবনকে যে চারটি মৌলিক উপাদান গভীরভাবে প্রভাবিত করে তার মধ্যে সামাজিক উপাদান অন্যতম। সামাজিক উপাদান বলতে পরিবার, পাড়া–প্রতিবেশী, সম্প্রদায়, খেলারসাথী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় সংঘ ইত্যাদিকে বুঝায়। মানুষের সমাজ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে এসব সামাজিক উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক উপাদানের দ্বারা মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী, তার বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা–দীক্ষা এবং ভবিষৎ জীবনের কর্মপন্থা প্রভাবিত হয়।

ব্যক্তি যে প্রক্রিয়ায় সামাজিক সদস্য হিসাবে গড়ে উঠে তার নাম সামাজিকীকরণ। সুষ্ঠ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ব্যক্তি সমাজের কাম্য পন্থায় আচরণ করতে শেখে। মানুষ যে ভাবে যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় বাস করুক না কেন সে সামাজিক উপাদান সমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। আমরা এখানে উপরে উল্লিখিত সামাজিক উপাদানসমূহ কিভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

www.swapno.in

পরিবারই হচ্ছে সমাজ জীবনের প্রাণকেন্দ্র।

১। **পরিবারের প্রভাব** ঃ সামাজিক উপাদানের অপর নাম দলগত উপাদান। এ দৃষ্টিকোন থেকেই আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি আলোচনা করব। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় একমাত্র পরিবারই হল মূখ্য দল। এ বিষয়ে আমরা তৃতীয় ইউনিটে আলোচনা করেছি। সামাজিক উপাদানের মধ্যে পরিবারই প্রধান। মানব শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবারকে কেন্দ্র করেই জীবন অতিবাহিত হয়। পরিবারই হচ্ছে সমাজ জীবনের প্রাণকেন্দ্র। পরিবারের মাধ্যমেই শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়।

পরিবারে পিতামাতাই হয় শিশুর প্রথম সাথী, বন্ধু এবং প্রতিপালক- তাই পিতামাতার আচরণ ব্যবহার তথা পারিবারিক পরিবেশ শিশুকে প্রভাবিত করে। এই পরিবার থেকেই শিশু সমাজের মূল্যবোধ, প্রথা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান–অর্জন করে।

শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম পর্যায়ে পরিবারই হচ্ছে একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিবারই ব্যক্তির অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাঙ্গন।

পরিবারেই স্নেহ–ভালবাসা, প্রথা, আচার–ব্যবহার এবং নিয়ম–শাসনের মধ্য দিয়ে একটি শিশুর জীবন পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়। তাই বলা হয় পরিবারই শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

একজন মানুষের সার্বিক ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক গুণাবলী পারিবারিক পরিবেশে বিকশিত হয়।

ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির, সমাজের প্রতি ব্যক্তির, প্রতিবেশীর প্রতি ব্যক্তির আচার ব্যবহার কি হবে, তার শিক্ষা জীবন, তার সামাজিক জীবন কিভাবে গড়ে উঠবে এসব কিছুর জ্ঞান সে প্রাথমিকভাবে পরিবার থেকেই আয়ত্ত করে। বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব কি হবে তাও সে পরিবার থেকেই অর্জন করে। সর্বোপরি একজন মানুষের সার্বিক ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক গুণাবলী পারিবারিক পরিবেশে বিকশিত হয়।

পারিবারিক কাঠামো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন যৌথ পরিবার ও একক পরিবার। আবার ধনসম্পদ, শিক্ষা ও পেশার ভিত্তিতে আমরা পরিবারকে শিক্ষিত পরিবার, ধনী পরিবার, মধ্যবিত্ত পরিবার, গরীব পরিবার, ব্যবসায়ী পরিবার, কৃষক পরিবার, শ্রমিক পরিবার প্রভৃতি রূপে চিহ্নিত করতে পারি। যে ধরনের পরিবারই হোন না কেন সংশ্লিষ্ট পরিবারে শিশুরা সেভাবেই গড়ে উঠবে।

মূল কথা হলো, পরিবারই হচ্ছে ব্যক্তি জীবনের প্রথম দল ও প্রতিষ্ঠান, যা জীবনকে সুন্দুরভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের আচরণ ও কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২। **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব** ঃ সমাজবিজ্ঞানে ধর্মকে একটি প্রতিষ্ঠান বলা হয়। মানব সমাজের প্রত্যেকটি ধর্ম সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। মসজিদ, মন্দির ও চার্চ যথাক্রমে মুসলিম, হিন্দু ও খৃষ্টান সমাজের লোকদের আচার–আচরণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রভাবিত করে। এটি দলগত তথা সামাজিক প্রভাবেরই নামান্তর। আর এভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের আচরণ ও কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। **বিদ্যালয়ের প্রভাব** ঃ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ জীবনকে সুন্দর ও মার্জিত করতে পারে। মানব শিশু তার পরিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিদ্যালয়ে শুরু হয়। এখানে মানুষ জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে পরিচিত হয়। এর ফলে তার মেধা ও মননের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি বিদ্যালয়ের শুধু পুঁথিগত জ্ঞানই অর্জন করে না। বিদ্যালয়ের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড তথা সাংস্কৃতিক ও চিত্তবিনোদন মূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সে একজন পরিপূর্ণ সামাজিক ব্যক্তিরূপে গড়ে উঠার সুযোগ পায়।

www.swapno.in

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানুষ নিয়ম শৃঙ্খলা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানুষ নিয়ম–শৃঙ্খলা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। পারিবারিক গন্ডি পার হয়ে মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দলগত জীবনযাপনের সুযোগ পায়। এখানে সে বিভিন্ন পরিবার পরিবেশ থেকে আসা ছাত্র–ছাত্রীদের সাথে মিশে এবং ভাল মন্দ সম্পর্কে অবহিত হয়। সেজন্য স্কুল জীবনকে বলা হয় ব্যক্তির ভবিষৎ জীবনের সূতিকাগার। অতএব আমরা বলতে পারি ব্যক্তির সমাজ জীবন রূপায়ণে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৪। **খেলার সাথীদের প্রভাব** ঃ মানব শিশু যখন বড় হয় তখন সে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলায় অভ্যস্ত হয়। পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে একটি শিশু খেলার মাঠে পাড়া–প্রতিবেশি ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য শিশুর সংস্পর্শে আসে। খেলার সাথীদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান শুরু হয়। খেলার মাঠে সে পরিবারের বাইরে ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব অনুভব করে। খেলার মাঠ থেকে সে নেতৃত্ব নিয়ম–শৃঙ্খলা, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জন করে। খেলাধূলায় নেতৃত্বদান ও নিয়ম–শৃঙ্খলা আয়ত্ত করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ ও সামাজিকতার বিকাশ ঘটে।

খেলার সাথীদের সঙ্গ এমনই একটি সামাজিক উপাদান যার থেকে মানুষ তার জীবন গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করতে পারে। খেলার মাঠ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও বিভিন্ন গুণাবলী তার ভবিষৎ জীবনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে।

অতএব বলা যায় একজন ব্যক্তির সামাজিক জীবন রূপায়ণে ও তার সমাজ জীবনের গন্ডি বৃদ্ধিতে খেলার মাঠের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৪। **সংঘের প্রভাব** ঃ মানুষ যখন পারিবারিক গন্ডি পেরিয়ে আসে তখন তার সামাজিক পরিধি বৃদ্ধি পায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে তার জ্ঞানের প্রসারতা ঘটে। সমাজ সম্পর্কে তার আগ্রহ বেড়ে যায় এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করার স্পৃহা বিকশিত হয়। কোন না কোন সংঘের সদস্য হলেই মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের প্রবণতার প্রকাশ ঘটে।

সংঘ হচ্ছে ঐচ্ছিক সংগঠন। সেখানে মানুষ অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সংগঠিত হয়। সংঘ বলতে তাই সমভাবাপন্ন কতক ব্যক্তির সমষ্টিকে বুঝায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়। সেজন্য মানুষ খেলাধূলা, সংগীত চর্চা, চিত্ত বিনোদন ও সেবামূলক কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংঘ প্রতিষ্ঠা করে।

সংঘের মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনকে দেশের ও জনসেবার কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমেই মানুষ সামাজিকতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে। মানুষ নেতৃত্ব প্রদান এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করতেও শিখে। অর্থাৎ সংঘ হচ্ছে মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম সামাজিক উপাদান।

তাই বলা যায়, সমাজ জীবনের সার্থক রূপায়ণে সংঘ বা সমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫। **দলের প্রভাব** ঃ দলবদ্ধ জীবন যাত্রা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির পরিচায়ক। আদর্শ বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মানুষের একত্রিত হওয়াকে দল বলে। উদ্দেশ্যহীন জনগোষ্ঠীকে দল বলা যায় না। প্রায় প্রতিটি সমাজেই দলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বিভিন্ন ধরনের দল থাকতে পারে।

দল সমাজে তার আদর্শ ও নীতিমালা বাস্তবায়িত করার জন্য এমন কর্মসূচি গ্রহণ করে যাতে দলের সদস্যরা এসব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়। ফলে দলের প্রভাব উহার সকল সদস্যের উপর পড়ে। দল গঠনের মাধ্যমে সমাজে সৃষ্টি হয় নতুন নেতৃত্ব এবং এভাবে সমাজ ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়।

www.swapno.in

পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দল এবং সংঘ - মানুষ ও সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। এছাড়া, আরো কতকগুলো উপাদান আছে যেসব মানুষের সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে, যেমন - বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কর্মক্ষেত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও পত্রপত্রিকা প্রভৃতি।

অতএব আমরা উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পরি যে, পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দল এবং সংঘ মানুষ ও সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। এছাড়া, আরো কতকগুলো উপাদান আছে, যেসব মানুষের সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে, যেমন - বন্ধু–বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, কর্মক্ষেত্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও পত্রপত্রিকা প্রভৃতি।

মানুষ সমাজে একা বাস করতে পারে না। যে বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করে। সামাজিক মেলামেশার মধ্যদিয়ে সে কতকগুলো গুণ আয়ত্ব করে। সে ভাল বন্ধুর সহযোগিতায় জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়, আর মন্দ লোকের সাহচর্যে অনেকের জীবন হয় ধ্বংস। আত্মীয়স্বজনের প্রভাবও মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানুষ যখন পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গন্ডি পার হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেখানেও সে বিভিন্ন সহকর্মীর ও পেশাজীবী মানুষের সংস্পর্শে আসে। এর ফলে তার আচর – আচরণ ও ভাবধারায় উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে। দেশে বিভিন্ন ধরনের পত্র – পত্রিকা রয়েছে। এগুলোতে নানা ধরনের খবরাখবর ছাপানো হয়। মানুষ যে ধরনের পত্রিকার পড়ে এর একটা প্রভাব তার উপর পড়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজ জীবনের উপর ভৌগোলিক পরিবেশ, বংশগতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক উপাদান সমূহের প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তুত, কোনটির প্রভাবকেই খাটো করে দেখা যায়না। প্রত্যেকটি উপাদান স্ব স্ব পরিমন্ডলে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

অনুশীলন ১ ঃ (Activity 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

“পরিবারই হচ্ছে সমাজজীবনের প্রাণকেন্দ্র ” - উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন (অনুর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা)।

অনুশীলন ২ ঃ (Activity 2) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

আপনি একাধারে বেশ কিছুদিন খেলাধূলা করেছেন - নিজের জীবনের উপর এমন একটি খেলার সাথীদের প্রভাব অনুর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। ব্যক্তি যে প্রক্রিয়ায় সামাজিক সদস্য হিসেবে বিকশিত হয় তাকে কি বলে ?

ক) সংঘবদ্ধতা খ) প্রতিষ্ঠানিকীকরণ

গ) সামাজিকীকরণ ঘ) মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধকরণ

www.swapno.in

২। প্রথম কোথায় একজন মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীর উন্মষ ঘটে?

ক) পরিবার　　ক) সম্প্রদায়

গ) সংঘ　　ঘ) সমাজ

৩। শিক্ষা মানুষের জীবনের কি ধরনের অধিকার?

ক) সাধারণ　　খ) মৌলিক

গ) অসাধারণ　　ঘ) গৌণ

৪। সংঘ কি ধরনের সংগঠন?

ক) ঐচ্ছিক　　খ) আবশ্যিক

গ) মুখ্য　　ঘ) মাধ্যমিক

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বংশগতি সমাজ জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে?

২। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন?

৩। সমাজ জীবনে সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশলের প্রভাব আলোচনা করুন।

৪। উৎপাদন কৌশলের সংজ্ঞা দাও। উৎপাদন কৌশল এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৫। সাংস্কৃতিক উপাদানকে কোন অর্থে কৃৎকৌশলগত উপাদান বলা যেতে পারে। আলোচনা করুন।

৬। সামাজিক উপাদান কি বুঝায়? সমাজ জীবনে এ উপাদনের প্রভাব কতটুকু?

উত্তরমালা ঃ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠ - ১ ঃ (১) গ, (২) ক, (৩) ক

পাঠ - ২ ঃ (১) খ, (২) ক, (৩) ঘ,

পাঠ - ৩ ঃ (১) ঘ, (২) খ, (৩) ঘ

পাঠ - ৪ ঃ (১) গ, (২) ক, (৩) খ, (৪) ক

www.swapno.in

ইউনিট
৫

মানুষের উৎপত্তি, বিবর্তন ও নরগোষ্ঠী

ভূমিকা

মহাবিশ্বের সময়সূচী অনুসারে বলা যায় যে, মানুষের আর্বিভাব হয়েছে মাত্র দুই মিলিয়ন তথা বিশ লক্ষ বছর আগে। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে আর এর মধ্যেই আমরা দেখেছি মানব সভ্যতার উত্থান ও পতন এবং সমাজের মৌলিক রূপান্তর। বহু যুদ্ধ বিগ্রহ, নতুন নতুন শক্তির অভ্যুদয় এবং সুদূর গ্রহ-নক্ষত্রে মানুষের অভিযাত্রা। পৃথিবী সম্ভবত আরও পাঁচ বিলিয়ন তথা পাঁচশ কোটি বছর বেঁচে থাকবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই সুদীর্ঘকালে মানুষের ইতিহাস কেমন রূপ নেবে। পন্ডিতেরা মনে করেন পৃথিবীর বয়স পাঁচ বিলিয়ন বছরের মত। আজ থেকে আরও চার থেকে পাঁচ বিলিয়ন বছর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তার আছে। অর্থাৎ আমরা বর্তমানে মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়েছি। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষের আবির্ভাব হয়েছে দুই মিলিয়ন বছর আগে। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চার হাজার বছরের মধ্যে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মহাবিশ্বের বয়স ১৫ বিলিয়ন বছর। ভাবতে অবাক লাগে পৃথিবী কিংবা মহাবিশ্বের তুলনায় মানব সভ্যতার ইতিহাস কত স্বল্পদিনের। ১৮ শতকে সমগ্রবিশ্বে সংখ্যা ছিল মাত্র এক বিলিয়নে। ১৯৩০ সালের দিকে সে সংখ্যা দাঁড়ায় দুই বিলিয়ন। আর ১৯৭৫ সালে দেখা যায় চার বিলিয়ন ও বর্তমানে প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন। আর আগামী ৫০ বছরে এই সংখ্যা দাঁড়াবে কম পক্ষে ১২ বিলিয়ন।

www.swapno.in

শিক্ষাসূচী

এই ইউনিটে ৫টি পাঠ রয়েছে। প্রতিটি পাঠ ৪৫ মিনিটের। পাঁচটি পাঠ সম্পন্ন করার জন্য আপনার ২২৫ মিনিট সময় লাগবে। এছাড়া ৫টি পাঠে মোট ৮টি অনুশীলন (Activity) দেওয়া হয়েছে। এ অনুশীলনগুলোর (Activities) এর জন্য অতিরিক্ত ৪০ মিনিট সময় লাগবে। নিম্নের সারণীর মাধ্যমে আপনি পড়ার সময়কে ভাগ করে নিতে পারবেন।

দিন	নির্ধারিত সময়	পাঠ/পাঠের অংশ বিশেষ	অনুশীলন	মন্তব্য
শুক্রবার				
শনিবার				
রবিবার				
সোমবার				
মঙ্গলবার				
বুধবার				
বৃহস্পতিবার				

কখন পড়বেন ঃ

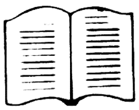

একটু ভাবুনতো আপনার হাতে পড়ার মত সময় কতটুকু এবং কখন আছে? – ভেবেছেন। আপনি যদি চাকুরীজীবী, শ্রমজীবী, পরিবারের দায়িত্বশীল বা কর্তা ব্যক্তি হন তাহলে দেখা যাবে প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আপনি পড়াশুনা করার সময় পেয়ে থাকেন। এ সময়টুকু আপনি আপনার পড়াশুনার জন্য ব্যয় করে ভাল ফলাফলের অধিকারী হতে পারবেন। মনে রাখবেন প্রতিদিন যা পড়বেন তা ঘুমানোর সময় একটু মনে করার চেষ্টা করুন। অনুশীলনগুলো করার পর বুঝতে পারবেন যে, আপনি পাঠটি ভালভাবে শিখেছেন কিনা। ইউনিট শেষে রচনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হতে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা, এসাইনমেন্ট ইত্যাদি দেওয়া হবে। তাই পুরো ইউনিটটি খুব ভাল করে পড়বেন।

www.swapno.in

মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তন

পাঠ ১

মূল ধারণা

- প্রাণী হিসাবে মানুষ
- জীবাশ্ম (ফসিল)
- মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ
- মানুষের বিবর্তন ও কয়েকটি জীবাশ্ম মানব (ফসিল)

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. প্রাণী জগতে মানুষের স্থান কোথায় তা জানতে পারবেন;
২. জীবাশ্ম (ফসিল) কাকে বলে তা বুঝতে পারবেন;
৩. মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন;
৪. কয়েকটি জীবাশ্ম মানব(ফসিল) সম্পর্কে অবগত হবেন।

www.swapno.in

প্রাণী হিসাবে মানুষ (Man As An Animal)

মানুষ যে প্রাণী একথা মানুষ অনুভব করলেও সহজে স্বীকৃতি পায়নি। বিশেষ করে অনেক আদিম উপজাতি মনে করে তারা কোন না কোন বন্যজন্তু থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কারণ এরা এসব জন্তুকে খুব শ্রদ্ধা করে। এদের শিকার করে না, এদের মাংস খায় না। কিন্তু সভ্য মানুষ এমন কথা ভাবতে পারেনি। ভেবেছে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। সম্পূর্ণ আলাদা পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে তার সৃষ্টি। বিলাতের আর্চ বিশপ উসার (Archbishop ussher, 1581-1650) বাইবেল এর উপর ভিত্তি করে হিসাব করে বলেন, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে খ্রীষ্ট পূর্ব ৪০০৪ সালে। তাঁর এই অভিমত বিলাতের অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত ছিল। চিন্তাশীল মানুষ লক্ষ করেছিল, প্রাণী ও মানুষের সাদৃশ্য। কেন এই সাদৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে, বিবর্তনবাদ তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু বির্বতনবাদ বিজ্ঞানী সমাজে সাধারণ স্বীকৃতি পাবার আগেই বিশ্ববিখ্যাত সুইডিস জীববিজ্ঞানী লিনিয়াস (Linnaeus) তাঁর বিখ্যাত Systems Natural নামক গ্রন্থে মানুষকে প্রাণীদের সাথে শ্রেণীবদ্ধ করেন। যে সব প্রাণী বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায় এবং সাধারণত শাবক প্রসব করে, তাদের বলা হয় স্তন্যপায়ী প্রাণী (mammals)। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সাধারণত ১৪টি বর্গে(Order) ভাগ করা হয়। এদের একটি বর্গকে বলা হয় প্রাইমেটা (Primeata)। লিনিয়াস প্রথম মানুষকে স্থাপন করেন বানরদের সাথে একই বর্গে(Order)। তিনি অবশ্য বাঁদুরকেও মানুষের সাথে একবর্গে স্থাপন করেন। কিন্তু এখন আর বাদুরকে কেউ মানুষের সাথে একবর্গে স্থান দেন না। প্রাইমেটা বলতে বোঝায় সেসব স্তন্যপায়ী প্রাণীকে, যাদের হাতে ও পায়ে পাঁচটা করে আঙ্গুল আছে। আঙ্গুলের মাথায় নখ আছে। যাদের অধিকাংশের হাতের বুড়ো আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের উপর স্থাপন করা সম্ভব। যেজন্য প্রাইমেটরা গাছের কান্ড ও ডালপালা আঁকড়ে সহজেই গাছে চড়তে পারে। এদের হাত ও পায়ের পাতা

> যেসব প্রাণী বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায় এবং সাধারণত শাবক প্রসব করে তাদের বলা হয় স্তন্যপায়ী প্রাণী বা ম্যামেল (mammals)।

> প্রাইমেটা বলতে বোঝায় সেসব স্তন্যপায়ী প্রাণীকে, যাদের হাতে ও পায়ে পাঁচটা করে আঙ্গুল থাকে।

www.swapno.in

লম্বা। এদের চোখ অক্ষিকোটরে থাকে। এদের চোখ মাথার সামনে সংস্থাপিত। অন্য জন্তুর মত পাশে নয়। এদের দেহের গঠন-প্রণালী এমন ধরনের যে, অন্য জন্তুদের চেয়ে এরা অনেক বিচিত্র ধরনের কাজ করতে পারে। প্রাইমেটদের স্নায়ুমন্ডলী খুব বেশী বিকাশ প্রাপ্ত ও সক্রিয়। এরা সাধারণত বৃক্ষচারী। ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করে। সাধারণত গ্রীষ্ম ও নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলেই এদের বাস। হাত, পা ও শরীরের অন্যান্য অংশের গড়নের সাদৃশ্যের বিষয়টি লক্ষ করে লিনিয়াস মানুষকে বানর, নরবানর বা বন মানুষ (Anthropoid Ape) ও লেমুরদের(Memur) সাথে একত্রে শ্রেণীবদ্ধ করেন। তবে লিনিয়াস মানুষকে প্রাণী ভাবলেও অতি সাধারণ ও নিছক একটা প্রাণী বলে ভাবেননি। মানুষের বৈশিষ্ট্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। লিনিয়াস মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম দেন হোমোসেপিয়ান (Homosapien)। ল্যাটিন Homo শব্দের বাংলা অর্থ মানুষ। আর Sapien শব্দের অর্থ জ্ঞান অথবা প্রজ্ঞা। লিনিয়াস ভেবেছেন, মানুষের আসল পরিচয় ফুটে উঠেছে তার বুদ্ধিবৃত্তিতে। অন্য কোন প্রাণীকে তার সাথে এ ব্যাপারে তুলনা করা যায় না। বুদ্ধির উৎকর্ষতায় মানুষ অন্য সকল প্রাণীকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। প্রাণী জগতে মানুষের স্থানকে এভাবে নির্দেশ করে দেখান যায় ঃ

লিনিয়াস মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম দেন হোমোসেপিয়ান (Homosapien), ল্যাটিন Homo শব্দের বাংলা অর্থ মানুষ, আর sapien শব্দের অর্থ জ্ঞান অথবা প্রজ্ঞা। অর্থাৎ Homosapien শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রজ্ঞাবান মানব।

প্রাইমেটদের ভাগ করা যায় দুটি উপবর্গে। একটি উপবর্গকে বলা হয় প্রসিমি(Prosimi), আর একটি উপবর্গকে বলা হয় এ্যানথ্রপডিয়া (Anthropodea)। লেমুর ও টারসিয়ার প্রভৃতি প্রাণী প্রসিমি (Prosimi) উপবর্গের, গীবন, ওরাং ওটাং, শিম্পাঞ্জী, গরিলা প্রভৃতি লেজহীন নর-বানরসহ বানর ও মানুষ এ্যানথ্রোপয়ডিয়া উপবর্গের অন্তর্গত। এসব ভাগকে পরিবার (Family) বলে উল্লেখ করা হয়। এ্যানথ্রোপডিয়াকে একাধিক পরিবারে ভাগ করা হয়; গরিলাদের পরিবারকে পঙ্গিডি (Pongidae) এবং মানুষের পরিবারকে হোমিনিডি (Hominidae) বলা হয়।

প্রাইমেটদের ভাগ করা যায় দু’টি উপবর্গে ; একটি উপবর্গকে বলা হয় Prosimi, আর অন্যটিকে বলা হয় Anthropodea ।

এ্যানথ্রোপয়ডিয়াকে একাধিক পরিবারে ভাগ করা হয়। গরিলাদের পরিবারকে Pongidae বলা হয়। আর মানুষের পরিবারকে Hominidae বলা হয়।

চিত্র ১ ঃ মানুষ ও নর বানর

এরূপ ভাগ করার সময় বিজ্ঞানীরা মানুষ ও নর-বানরের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছেন যে, গরিলার মত প্রাণীরা মানুষের নিকটতম হলেও তারা হাঁটে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে। হাত ও পায়ের উপর ভর করে চলে বলে এসব প্রাণীকে আগে কোয়াদ্রুমানা (Quadrumana) বলে উল্লেখ করা হত। কোয়াদ্রুমানা মানে চার হাতে চলা প্রাণী(Four handed animals)। কিন্তু মানুষ সোজা হয়ে হাঁটে। ফলে তারা হাত দিয়ে নানা কাজ করতে পারে। মানুষের হাত থাকে মুক্ত। মানুষ ছাড়া আর সব প্রাইমেটকেই বলা হত কোয়াদ্রমানা। মানুষ তার হাতের মুক্তির মাধ্যমেই তার মেধার বিকাশ ঘটায়। আর এভাবেই সে হয় বুদ্ধিমান প্রাণী (Homo Sapien)।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একথা বলতে পারি যে, মানুষ প্রাণীজগতের অংশ হয়েও সে সমাজবদ্ধ জীব। দ্রুত গতিতে মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটেছে। তাই অন্যান্য প্রাণীর উপর মানুষের প্রভুত্ব অসামান্য। এটা দৈহিক শক্তির বলে নয়, বরং মেধা, বুদ্ধি ও কৌশলের কারণে সম্ভব হয়েছে। মানুষের দেহ গরিলা ও শিম্পাঞ্জী ইত্যাদির মত ঘন লোমে আবৃত নয়। মানুষের নাক উন্নত এবং ঠোঁট ও চিবুক সুস্পষ্ট। মানুষের দন্ত বহির্মুখী নয়; তার

www.swapno.in

মস্তিষ্ক গরিলা থেকে দু-তিনগুণ বড় ও অনেক বেশী কর্মক্ষম। এই পার্থক্যগুলি থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, প্রাণীজগতে মানুষের স্থান সবার উপরে কেন হতে পারলো । মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের সাথে নরবানরের পার্থক্যগুলির কথা বিশেষভাবে নীচে নির্দেশ করা হল ঃ যেমন,

> মানুষ বৃহত্তর প্রাণীজগতের একটা অংশ বিশেষ মাত্র। মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রানীহল নরবানর।

১. মানুষের মগজের আয়তন, গরিলা থেকে অনেক বড় এবং তা অনেক বেশি সক্রিয়। যেখানে মানুষের মাথায় থাকে কমপক্ষে ১,০০০ সি.সি পরিমাণ মগজ, সেখানে গরিলার মাথায় খুববেশী হলে থাকে ৬৫০ সিসি।

২. মানুষের হাতের দৈর্ঘ্য পায়ের চেয়ে কম। হাতের বুড়ো আঙ্গুল অনেক বেশী বিকাশপ্রাপ্ত। ফলে হাতের সাহায্যে কোন কিছু ধরে মানুষ অনেক সহজে কাজ করতে পারে। বন মানুষেরা চলার সময় হাতের উপর ভর দিয়ে চলে। মানুষের তা প্রয়োজন হয় না বলে সে কাজে নিপুণ হয়।

৩. মানুষের পায়ের পাতা অন্যান্য প্রাণীর পায়ের পাতার মত উঁচু, নিচু বা বাঁকা নয়, বরং সমতল। এছাড়া, মানুষের গোড়ালীর হাড় বন মানুষ (Anthropoid Ape) এর মত বাঁকা নয়। গোড়ালীর হাড় বাঁকা হওয়ায় বন মানুষেরা গাছে চড়তে পটু। অপর পক্ষে মানুষের পা সমতল বলে মানুষ দক্ষ স্থলচর প্রাণী।

৪. বন মানুষেরা নিরামিষভোজী। কিন্তু মানুষ তা নয়। মানুষ আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। বন মানুষেরা ফলমূল যে অবস্থায় পায় সেভাবেই আহার করে, কিন্তু মানুষ কিছু ফলমূল যে অবস্থায় আছে সেভাবে আহার করলেও অনেক খাদ্য সে নিজে প্রস্তুত করতে পারে। ফলে মানুষ জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছে।

৫. কোন কোন নৃতাত্ত্বিকের মতে, মানুষ যখন নিরামিষ ছেড়ে আমিষ খেতে আরম্ভ করে, তখন তার বৃক্ষচারী জীবন শেষ হয়। জীব-জন্তু শিকারের জন্যে মানুষ অনুভব করেছে একে অপরের সহযোগিতা। এর ফলে তার মধ্যে জেগে ওঠে দলবদ্ধ হয়ে থাকার ইচ্ছা, যূথ প্রবৃত্তি(herd instinet)। এই যূথ চেতনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে মানুষের সমাজ জীবন।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, সামাজিক যৌথ প্রচষ্টোর মাধ্যমেই অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় দৈহিক শক্তিতে দুর্বল হয়েও মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে প্রাণের ধারা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। তারা গড়ে তুলতে পেরেছে আজকের সমৃদ্ধ ও বিচিত্র জীবন। এবার আমরা জীব-জন্তুদের সাথে মানুষের কর্মকৌশলগত পার্থক্যগুলি বিশেষভাবে বুঝবার চেষ্টা করবো ঃ

১. জীবজন্তুর জীবন প্রধানতঃ দাঁত ও নখ সর্বস্ব। কিন্তু মানুষের জীবন তা নয়। মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই পাথর দিয়ে অস্ত্রপাতি (tool) বানাবার কৌশল আয়ত্ত করেছে।

২. মানুষ পরিবেশকে বদলাতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষ পরিপূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়।

৩. মানুষ সুসংবদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারে।

৪. এছাড়া, মানুষ বিভিন্ন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে সবের মধ্যকার অভিন্ন সম্পর্ককে খুঁজে বের করতে পারে। মানুষ প্রাণী। অন্যান্য প্রাণীর সাথে তার দৈহিক গড়ন ও কার্য প্রণালীর কতক মিল আছে কিন্তু অন্য প্রাণীর সাথে মানুষের যে দৈহিক পার্থক্য আছে, যার উপর ভিত্তি করে মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে, যা তাকে দান করেছে অনন্যতা। কিন্তু তবু মানুষ প্রাণী জগতের বাহিরের জীব নয় । মানুষ মূলত মেরুদন্ডী প্রাণীকূলের অন্তর্গত একটি স্তন্যপায়ী জীব।

www.swapno.in

প্রাণী হিসেবে মানুষ সম্পর্কিত পর্যালোচনায় আমরা নি:সন্দেহে বলতে পারি যে, মানুষ বৃহত্তর প্রাণীজগতের অংশ। ১৮৫৯ সালে বিখ্যাত ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী (Naturalist) চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) মানুষের বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বলেন, মানুষ, বনমানুষ ও বানরের পূর্বপুরুষ ছিল এক ও অভিন্ন। তাই এদের মধ্যে রয়েছে কতক দৈহিক সাদৃশ্য। মানুষের সবচেয়ে নিকবর্তী প্রাণী হল নরবানর। ডারউইনের অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ The Descent of Man যাকে বাংলা ভাষায় মানুষের বলা যেতে পারে চিন্তা-জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, দৈহিক দিক থেকে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য ছাড়াও মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারে মানুষ ও প্রাণী পরস্পর ভিন্নধর্মী। মূলত জীবজগতের ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষই একমাত্র প্রাণী, যারা ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে। অন্যান্য প্রাণী তা পারে না। তারা শুধু অঙ্গভঙ্গিও বিকট অর্থহীন শব্দ করতে পারে। মানুষের সংস্কৃতি আছে। মানুষ লিখিত ভাষার মাধ্যমে তার জীবনধারা, ঐতিহ্য ও প্রথা-পদ্ধতি পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর সংস্কৃতি নেই। সে কারণে সংস্কৃতিকে অনেকে সহজাত আচরণ না বলে অর্জিত আচরণ (Learned behavior) বলেছেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতের আমরা বলতে পারি যে, মানুষ প্রাণী হয়েও বুদ্ধিবলে শ্রেষ্ঠ প্রাণী। সে সমাজে বসবাস করে এবং ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। মানসিক উৎকর্ষের জন্য মানুষ সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক, বাহক, স্রষ্টা এবং পৃষ্ঠপোষক। তাই মানুষ প্রাণী হয়েও তার উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করছে। অন্য প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। দৈহিক শক্তিতে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে পশুর কাছে অসহায়। তবে মানুষের মধ্যে সহযোগিতার মনোবৃত্তি খুব প্রবল এবং সে কারণেই যুথবদ্ধ হয়ে প্রকৃতিকে বশে এনে জীবন সংগ্রামে মানুষ জয়ী হয়েছে এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের ধারা বজায় রেখে চলেছে। অপরদিকে, অন্যান্য প্রাণী খুবই অসহায়, প্রকৃতির দয়ায় তারা বেঁচে আছে। তাই মানুষ যে এই পৃথিবীর সেরা জীব তাকে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

> মানুষ বুদ্ধিবলে বলীয়ান হয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসাবে গণ্য।

ফসিল পাঠ তথা জীবাশ্মবিজ্ঞান
(The Study of Fossil or Paleontology)

ল্যাটিন Fossile শব্দ থেকে ইংরেজী Fossil শব্দটি এসেছে। ফসিল শব্দটির বাংলা করা হয়েছে 'জীবাশ্ম'। অতএব ইংরেজী Paleontology শব্দের বাংলা জীবাশ্মবিজ্ঞান করা যায়।

তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই ফসিল বা জীবাশ্মকে বলে।

খুব সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, মাটির বিভিন্ন স্তর খুঁড়ে আবিষ্কৃত গাছপালা, প্রাণীদেহের নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষকে বলা হয় ফসিল বা জীবাশ্ম। গাছপালা, প্রাণীদেহের হাড় বা তাদের ব্যবহৃত কোন হাতিয়ার মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারে। মাটির স্তরের বয়স অনুযায়ী তাদের আয়ুকাল নির্ণয় করা হয়। প্লাবন, ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা নৈসর্গিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের কোন কোন অংশ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফসিল বা জীবাশ্ম হলো এসব কারণে লুপ্ত প্রাণী বা গাছপালার ধ্বংসাবশেষ।

> মাটির বিভিন্ন স্তর খুঁড়ে আবিষ্কৃত গাছপালা, প্রাণীদেহের নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষকে বলা হয় জীবাশ্ম (ফসিল)।

যেহেতু মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী সেহেতু মানুষ সম্পর্কে জানার আগ্রহ মানুষের অপরিসীম। মানুষ কি এবং কিভাবে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, এটা মানুষের প্রতি মুহূর্তের জিজ্ঞাসা। বিজ্ঞানীরা তার উত্তর খুঁজে বের করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীদের মনেও কৌতূহল জেগেছে কে মানুষের পূর্বপুরুষ, কি তাদের পরিচয়, কোথায় ছিল তাদের বাসভূমি, কোন ভাষায় তারা কথা বলত এবং তাদের আচার-ব্যবহারই বা কিরূপ ছিল। সাধারণত, যে-বিজ্ঞান মানুষের জীবাশ্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা ও গবেষণা করে, তাকে জীবাশ্মবিজ্ঞান বলা হয়। কালের করাল

www.swapno.in

মানুষের জীবাশ্ম পাওয়া যায় ভূ-ত্বকের খুব উপরের স্তরে, যাকে বলা হয় প্লাইসটোসিন ও হোলোসিন স্তর দুটির মধ্যবর্তী পর্যায়।

গ্রাসে জীব জগতের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদগণ চিহ্নস্বরূপ অতীতের আদিকালের অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের ছাপ খোঁজে পেয়েছেন। এ দিকে থেকে প্রস্তরীভূত ভূ-ত্বকের মধ্যে আবদ্ধ জীবদেহের অবশেষ বা ছাপকেই ফসিল বলা যায়।

তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ফসিল বলতে বোঝায় ঃ (১) মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের অবশেষ। যেমন (১) এক টুকরো কাঠ, প্রাণী দেহের কঙ্কাল ও দাঁত প্রভৃতি; (২) পাথরের বুকে এসব অংশের ছাপ; এবং (৩) এসব অংশের প্রস্তরীভূত (Petrified) অবস্থা। আমরা তাহলে বুঝতে পারছি যে, সাধারণত প্রাণী ও গাছ পালার লুপ্তাবস্থা বুঝাতে ফসিল শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Dictionary of Social Science এর ভাষায় "Human paleontology is the science of forms of life in former geologic period as represented by fossil animals and plants". অর্থাৎ মানব জীবাশ্ম বিজ্ঞান হচ্ছে আদি ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণী বা গাছপালার অংশবিশেষ, তাদের রাসায়নিক ছাপ অথবা কোন প্রাণীর ব্যবহৃত হাতিয়ার সম্পর্কিত বিজ্ঞান। বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা হয়ত সম্ভব নয়। তবু জীবাশ্মের উপর ভিত্তি করে হারিয়ে যাওয়া প্রাণীর বয়স, তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ার তথা জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। প্রথমে জীবাশ্মবিজ্ঞানীরা মানুষের [১]উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে গিয়ে বিভিন্ন প্রাণীর হারানো সূত্র খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। পরে দৈহিক নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের কি করে উৎপত্তি হলো তা খুঁজতে গিয়ে জীবাশ্ম বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন। আর তাই মানুষের গড়া সমাজ নিয়ে অধ্যয়নরত সমাজবিজ্ঞানীরা জীবাশ্মবিজ্ঞানী ও দৈহিক নৃবিজ্ঞানীদের আবিষ্কার থেকে তথ্য নিয়ে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তবে এখানে একথা মনে রাখা দরকার যে, ভূ-ত্বকের সকল স্তরে সব জীবের জীবাশ্ম পাওয়া যায় না। মানুষের জীবাশ্ম পাওয়া যায় ভূ-ত্বকের খুব উপরের স্তরে, যাকে বলা হয় প্লাইসটোসিন ও হোলোসিন স্তর দুটির মধ্যবর্তী পর্যায়। কোন শিলাস্তরে জীবাশ্ম পাওয়া গেছে জানতে পারলে এবং কোন্ জাতীয় প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে জানলে শিলাস্তরের কাল নির্ধারণ করা যায়। বয়স হিসেবে জীবাশ্মদের সাজালে জীব জগতের ক্রমবিবর্তনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। সব জায়গায় ফসিল পাওয়া যায় না। এগুলি অনেক কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হয়। সাধারণত রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলে ফসিলের সন্ধান মিলে। এরকম অঞ্চলে দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে ও প্রত্যেকটি পাথর পর্যবেক্ষণ করে জীবাশ্ম খোঁজ করতে হয়। বিভিন্ন লক্ষণ থেকে অনুসন্ধানকারী যখন বুঝতে পারেন যে, কোন একটি জায়গায় জীবাশ্ম থাকবার সম্ভাবনা আছে, তখন সে জায়গা খুঁড়া শুরু হয়। অনেক সময় সব কষ্টই বিফল হয়, আবার কখনো কখনো জীবাশ্ম সফল হয়। মাটি খুঁড়বার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। অসাবধানে জীবাশ্মের গায়ে আঘাত লাগলে সেটা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কোন ফসিল পাওয়া গেলে তার টুকরোগুলি খুব যত্নের সাথে গবেষণাগারে রাখতে হয় এবং মাটি, পাথর প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পরিষ্কার করে প্রাপ্ত টুকরোগুলি জোড়া লাগিয়ে কঙ্কালটি খাড়া করতে হয়। অনেক সময় পুরো কঙ্কালের দেহাবশেষ পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারীকে কিছুটা কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। মোটামুটিভাবে কঙ্কালটি পাওয়া গেলে তার অবয়ব কেমন ছিল, তা অনুমান করা যায়। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, জীবাশ্ম অনুসন্ধান করা যেমন কষ্টকর, তেমনি সময়ও লাগে প্রচুর।

মানুষের অতীত সম্পর্কে জানতে গিয়ে যেসব জীবাশ্ম বা ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে তার বৈজ্ঞানিক পাঠকেই মানব জীবাশ্ম বিজ্ঞান বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, এক ধরনের জীবের ক্রমবির্তনের ফলে অন্য ধরনের জীবের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। এটাকেই বলা হয় জৈবিক বিবর্তন তত্ত্ব (Theory of organic Evolution)। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, অতীতকালের এক ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে

---

[১] Dictionary of social Science, p.23

www.swapno.in

আধুনিক কালের প্রাণী ও উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। তাঁদের ধারণা, অন্য কোন প্রাণীর ক্রম রূপান্তরের মাধ্যমেই আধুনিক মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব আধুনিক মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাওয়া জীবাশ্মের সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কিত অধ্যয়ন ফসিল বা জীবাশ্ম একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মূলত মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে জানতে হলে একাধিক জীবাশ্ম মানবকে অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে।

মানুষের উৎপত্তি (Origin of MAN)

কোন সময় প্রথম পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভব হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ভূতাত্ত্বিক, মাইওসিন যুগের কোন এক সময় সম্ভবত মানুষের পূর্বপুরুষ ও বৃহৎ আকারের নর-বানরের পূর্বপুরষ একে অপর থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিল এবং মনে হয় প্লাইওসিন পর্বের মানুষ কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় মানবিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। যেসবকে আদিমতম মানুষের কঙ্কাল বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সেসব প্লাইসটোসিন পর্বের আদি কিংবা মধ্য স্তরের বলে মনে করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে প্রাগৈতিহাসিকরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষ যখন প্রথম পাথরের হাতিয়ারের আকৃতি দিতে সমর্থ হয়েছে, তখন থেকে মানুষের জীবনের অগ্রগতি শুরু হয়েছে। মানুষ পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল সে সম্বন্ধে শুধু জল্পনা-কল্পনাই চলেছে, এখনো পর্যন্ত সঠিকভাবে কোন জায়গা নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি।

> বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে কোন জীবের জন্ম হতে হলে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত থাকতে হবে। যেমন - (১) প্রয়োজনীয় পানীয় জল, (২) অনুকূল জলবায়ু এবং (৩) প্রয়োজনীয় খাদ্য।

বহু কাল ধরেই মানুষের উৎপত্তি নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা ও গবেষণা হয়ে আসছে। ফলে, এ সম্পর্কে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়। বস্তুত মানুষের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ তা মূলত চরমপন্থী বিজ্ঞানী ও ধর্ম প্রবক্তাদের সৃষ্টি। রহস্য নিয়ে আদিকালের মানুষ ভেবেছে, বর্তমানের মানুষও ভেবে চলেছে। বস্তুত উদ্দেশ্য এক, তবে পদ্ধতি ভিন্ন। বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত মানব সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হননি। তবে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, কোন জীবের জন্ম হতে হলে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত থাকতে হবে। এগুলো হলো: (১) প্রয়োজনীয় পানীয় জল, (২) অনুকূল জলবায়ু এবং (৩) প্রয়োজনীয় খাদ্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দু'ভাবে জীবনের উৎপত্তি খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে, যথা– (১) প্রাণবাদী তত্ত্ব (Vitalistic theory) অনুযায়ী পৃথিবীতে জীব সৃষ্টি হয়নি। সম্ভবত কোন দূরপ্রান্তের উৎস থেকে জীবের জন্ম হয়েছে। ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন এই তত্ত্বের সমর্থক। অপরপক্ষে (২) যান্ত্রিক তত্ত্ব (Mechanistic theory) অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের সকল মিশ্রণের ফলে জীবের জন্ম হয়েছে। আজ যে সকল প্রাণী আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাদের সবই হলো একটা ক্রমবিকাশের ফল। বর্তমানে বেঁচে থাকা কোন জীবকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলে ধরে নেওয়া যায় না। বিজ্ঞান যা বলতে চায় তা হল এই যে, অন্য রকম প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষ মানুষ ছিল না, ছিল অন্য কোন প্রজাতির প্রাণী। এই পরিবর্তন ঘটতে অনেক দিন লেগেছে। এই পৃথিবীর বুকে হঠাৎ একদিন পৃথকভাবে মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিম্পাঞ্জী জাতীয় প্রাণী ও মানুষের মত প্রাণীর পূর্বপুরুষ ছিল এক ও অভিন্ন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আজকের মানুষের পূর্বপুরুষ হল শিম্পাঞ্জী। গিবন, ওরাং, ওটাং গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রাণিজগতে মানুষের সবচেয়ে নিকটস্থ জীব।

www.swapno.in

চিত্র ২ ক ঃ গরিলা

মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ

(Different theories regarding the origin of MAN)

মানুষ কি এবং কিভাবে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে এটা আমাদের প্রতি মূহুর্তের জিজ্ঞাসা।

মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। সামাজিক ইতিহাসবিদ বিখ্যাত মিনু মাসানী তাঁর 'Our Growing Human Family' নামক গ্রন্থে মানুষের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, হাজার হাজার বছর যাবৎ এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র উদ্ভিদ এবং সমুদ্রজাত মৎস্য ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। অত:পর পৃথিবীতে উভচর উদ্ভিদ এবং উভচর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটল। এদের ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে কালক্রমে সর্পজাতীয় সরীসৃপের উদ্ভব হলো। বিবর্তনের ধারায় পরবতী স্তরে এই সরীসৃপগুলো ডানা বিশিষ্ট পাখী এবং পা-বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী জীবে পর্যবসিত হয়। পা-বিশিষ্ট জীবগুলো পরবর্তী স্তরে লেজবিহীন বানরে পরিণত হলো। বানরগুলো প্রথমে মাথা সোজা করে দাঁড়াতে এবং পরে দৌঁড়াতে শেখে। মিনু মাসানীর মতে, এভাবে এদের বিবর্তন চলতে থাকে এবং সর্বশেষ স্তরে এরা মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় চার্লস ডারউইনের যুগান্তকারী গ্রন্থ The Origin of Species। মানুষ কি করে মানুষ হল, মানুষের পূর্বপুরুষ কারা, অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় মানুষের উৎপত্তির একটা ব্যাখ্যা ডারউইনের উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। ডারউইন তাঁর গ্রন্থে জৈব ও অজৈব জগতের বিকাশের সূত্রের ভিত্তিতে সকল তথ্যকে একটা সার্বিক রূপ দিতে পেরেছিলেন। ডারউইনের মতে মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ন্যায় বর্তমান রূপে সৃষ্টি হয়নি। একটি সুস্থির ক্রমবিবর্তনের ধারায় পূর্বেকার রূপ হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তাঁর কথায় আদি মানবের সারা দেহ ছিল লোমে ভর্তি, সারা মুখ ছিল শ্মশ্রুপূর্ণ এবং কর্ণদ্বয় ছিল ছুঁচালো। তারা যূথবদ্ধভাবে বৃক্ষের শাখায় বাসা করতো এবং আহার করতো বৃক্ষের ফলমূল। মানুষের এই দলবদ্ধ জীবন-যাপন প্রকৃতিগত কারণেই সম্ভব হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিকে থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারায় জন্ম হয়েছে নব্য মানুষ। এভাবে ডারউইন মানুষের উৎপত্তির সূত্র তুলে ধরেন।

ডারউইনের মতে মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ন্যায় বর্তমান রূপে সৃষ্টি হয়নি। একটি সুস্থির ক্রমবিবর্তনের ধারায় পূর্বেকার রূপ হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

www.swapno.in

মানুষ যে কি করে মানুষ হল সে সম্পর্কে অনেক সঠিক তথ্য ল্যামার্কও দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৮০৯ সালে ফরাসী জীববিজ্ঞানী ল্যামার্কের (১৭৪৪-১৮২৯) "প্রাণীবিদ্যার দর্শন" প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তাঁর এই বিখ্যাত গ্রন্থে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে ক্রমবিকাশের প্রমাণ উপস্থিত করেন। ল্যামার্ক এর প্রতিপক্ষ ছিলেন জর্জ কুভি। তাঁর মতে জীবগজতের চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই; জগতের সৃষ্টিকাল থেকে চিরন্তন একটি চেহারাতেই জীব-জগৎকে দেখা যাচ্ছে। জর্জ কুভি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও জীবাশ্মবিদ। অনেকে বলেন মানুষের বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি "হারানো সূত্র" (Mising Link) রয়েছে।

ল্যামার্ক বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে ক্রমবিকাশের প্রমাণ উপস্থিত করেন।

আধুনিক কালের নৃবিজ্ঞানীগণ মানুষের উৎপত্তির পেছনে দুটি মতবাদের উল্লেখ করেন। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, মানুষেরা মোটামোটি বিভিন্ন বানর গোত্রীয় কোন জীব থেকে বিবর্তিত হয়েছে। তাঁদের মতে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রাণী যেমন এক একটি প্রজাতির মাধ্যমে তাদের বংশ ধারা টিকিয়ে রাখে এবং প্রতিটি প্রজাতি আবার নতুন করে ভিন্নতর প্রজাতির সৃষ্টি করতে পারে তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। প্রজাতির বহুমুখিতার ফলে নতুন নতুন প্রাণীর সৃষ্টি ঘটতে পারে এবং এক একটি প্রজাতি নতুন নতুন পরিবেশে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে টিকে থাকে, আবার বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। সেকারণে তারা মনে করেন, মানুষের বিভিন্ন জাতি শুরু থেকেই আলাদা ছিল। এই মতবাদের নাম হলো "মানুষের উৎপত্তির বহু উৎস সংক্রান্ত তত্ত্ব (Polygenetic theory of the Origin of man)।

মানুষের উৎপত্তির অপর মতবাদটির নাম হলো "মানুষের উৎপত্তির এক সূত্রীয় তত্ত্ব (Monogenetic theory of the Origin of man)। এই মতবাদে বিশ্বাসীগণ মনে করেন যে, সমগ্র মানব সমাজ একই প্রজাতির উৎস থেকে জন্মেছে। সকল মানব সমাজের পূর্ব পুরুষ এক সূত্রীয় অনুসারে মনে করা হয় যে, আধুনিক ক্রো-ম্যাগনন (Cro-magnon) মানুষেরা নিয়ানডার্থাল পুর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে আর নিয়ানডার্থালরা প্রাচীনতর কোন এক জীব থেকে জন্ম নিয়েছিল। একসূত্রীয় মতবাদে মনে করা হয় যে, এক একটি প্রজাতি ভৌগোলিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাদের জীবকোষের অন্তর্ভুক্ত জিন্(Gens) এর ক্ষমতাবলে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে এবং এই স্থায়িত্বকাল থেকেই দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে উঠে। ফলে প্রাণীজগতে এক একটি প্রজাতি এক একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বংশ বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সোভিয়েট নৃবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, বর্তমান মানবজাতি নিয়ানডার্থাল পূর্ব-পুরুষ থেকে উদ্ভূত। তাঁরা মানুষের উৎপত্তির প্রশ্নে একসূত্রীয় মতবাদের অনুসারী।

মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হচ্ছে Polygenetic theory of the Origin of man এবং অপরটি Monogenetic theory of the Origin of man।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মানবজাতির উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা আজও কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছে সে সবের উপর ভিত্তি করে অনেক হারানো সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, মানুষের দেহিক গঠনের সাথে শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাং, ওটাং ও গিবনের সামঞ্জস্য থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে দৈহিক বিবর্তনের মাধ্যমে এসব মানব সদৃশ্য প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে সে যুক্তি আধুনিক বিজ্ঞানীগণ গ্রহণ করেননি। মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে পরিশেষে এটুকু বলা যেতে পারে যে, মানুষ বৃহত্তর প্রাণীজগতের একটা অংশ বিশেষ মাত্র। হিসাব করে জানা গেছে যে, এই পৃথিবী দুই হাজার মিলিয়ন বছরেরও বেশী সময় ধরে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এর অর্ধেকেরও বেশী সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব ছিলনা। আজও কেউ জানেন না কেন, কিভাবে, কোথায় এবং কখন প্রথম জীবের উৎপত্তি হয়েছিল। সে যা হোক জীব সৃষ্টির এ অলৌকিক মানুষের নিঃসন্দেহে মানুষের অলক্ষ্যে ও অজান্তে ঘটেছে। বস্তুত জীবের উৎপত্তি সুদূর অতীতে ঘটেছে। সুখের কথা এই যে, জীব বিজ্ঞানীরা জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য নিরন্তর অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

মানুষের দৈহিক গঠনের সাথে শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাং, ওটাং ও গিবনের সামঞ্জস্য থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে দৈহিক বিবর্তনের মাধ্যমে এসব মানব সদৃশ প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে সেযুক্তি বিজ্ঞানীগণ গ্রহণ করেননি।

www.swapno.in

মানুষের বিবর্তন ও ফসিল পাঠ তথা জীবাশ্মবিজ্ঞান (Evolution of Man and the study of fossil or paleontology)

ডারউইন মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালে যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তা থেকে সাধারণভাবে ধারণা জন্মে যে, বানর থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এ ধারণা সত্য নয়। যে ধরনের প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে, তা এখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাঁরা বলেন, বর্তমানে বেঁচে থাকা কোন জীবকেই মানুষের পূর্ব-পুরুষ বলে ধরে নেওয়া যায় না। অন্য কোন প্রাণীর বিবর্তনের মাধ্যমেই মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এই বিবর্তন হঠাৎ ঘটেনি, আর পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবও আলাদাভাবে হয়নি। এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীর উদ্ভব সংক্রান্ত মতবাদ বর্তমান বিজ্ঞানী সমাজে স্বীকৃত। তাঁরা মনে করেন গিবন, ওরাং, ওটাং, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি নর-বানর মানুষের নিকটতম রক্তের সম্বন্ধ বিশিষ্ট এক একটি জীব। যে লুপ্ত কোয়াড্রুমানা (Quadrumana) থেকে মানুষের উদ্ভব হয়েছে বলে ডারউইন মনে করেন তা খুঁজে বের করবার জন্যে অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।

কোন প্রাণীকে মানুষ বলা হবে কিনা তা নৃতাত্ত্বিকরা তিনটি বিষয় বিচার করে ঠিক করেন যথা- (১) সোজা হয়ে দুপায়ে ভর দিয়ে চলতে পারতো কিনা, (২) তাদের মগজের পরিমাণ বর্তমান মানুষের কাছাকাছি ছিল কিনা এবং (৩) তাবা কম পক্ষে পাথর দিয়ে অস্ত্রবানাতে পারত কিনা।

চিত্র ৩ ঃ গীবন বা উল্লুক

চিত্র ৪ ঃ শিম্পাঞ্জী

www.swapno.in

আজ থেকে আনুমানিক ৭ কোটি বছর আগে নবজীবীয় যুগের ইওসিন পর্ব শুরু হয়। এই সময় পৃথিবীতে টারসিয়ার সদৃশ এক প্রকার ক্ষুদ্র জীব বাস করতো। এই ধরনের জীবের দৃষ্টি ছিল প্রখর। পরবর্তী ওলিগোসিন পর্ব শুরু হয় থেকে ৪ কোটি বছর আগে। এই সময় আফ্রিকায় যে জীব বাস করতো, তাকে বলা হয় প্যারাপিথেকাস। বর্তমান কায়রোর (মিশর) কাছাকাছি ফাইয়ুম মরুদ্যানের ওলিগোসিন স্তরে এই জীবের নীচের চোয়ালের ফসিল পাওয়া গেছে। কাঠ বিড়ালের মতো দেখতে এই এইপ (Ape) বড় জোর এক ফুট লম্বা এবং তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নর-বানরের মতো ছিল। ওলিগোসিন পর্বের শেষভাগ ফাইয়ুম অঞ্চলে যে জীবটির চোয়াল পাওয়া গেছে তাকে বলা হয় প্রপ্লিওপিথেকাস। এদের আকৃতি ছিল প্যারপিথেকাসদের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বড়। সম্ভবত তারা গিবনের পূর্ব-পুরুষ ছিল, প্যারাপিথেকাস বিবর্তিত হয়ে প্রপ্লিওপিথেকাস, তারপর প্লাইপিথেকাস এবং বর্তমানে গিবনে পরিণত হয়েছে। ওলিগোসিন

অন্য কোন প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমেই মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

www.swapno.in

> সকল মানব সদৃশ জীব দশলক্ষ বছর আগে প্লাইওসিন পর্বের শেষভাগ কিংবা প্লেইসটোসিন পর্বের প্রারম্ভে পৃথিবীর উপর বিচরণ করতো।

পর্বের প্রথম ভাগেই বানরের পূর্ব-পুরুষ এবং মানুষ ও মানব সদৃশ নর-বানরের পূর্ব-পুরুষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র ধারায় বেড়ে উঠেছে। কোন প্রাণীকে মানুষ বলা হবে কিনা তা নৃতাত্ত্বিকরা তিনটি বিষয় বিচার করে ঠিক করেন :

১. সোজা হয়ে দু'পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারতো কিনা।
২. তাদের মগজের পরিমাণ বর্তমান মানুষের কাছাকাছি ছিল কিনা।
৩. তারা কমপক্ষে পাথর দিয়ে অস্ত্রপাতি বানাতে পারত কিনা।

অর্থাৎ কোন প্রাণী মানুষ নামের পদবাচ্য হবে কিনা, তা বিচার করতে গিয়ে নৃতাত্ত্বিকরা কেবল তার দৈহিক সংগঠন (anatomy) বিচার করেন না, তার কর্মক্ষমতার কথাও বিচার করেন। আর এটা করবার সংগত কারণও রয়েছে। কারণ শিম্পাঞ্জির বুদ্ধির পরিচয় মেলে কেবলমাত্র খুবই কাছের ঘটনা থেকে। শিম্পাঞ্জি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু মানুষ পারে। মানুষ পাথর দিয়ে আদিম যুগে অস্ত্র বানিয়েছে, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, কেবল এই কথা ভেবে। তাই মাটি খুঁড়ে পাওয়া মানব আকৃতির কঙ্কালের বা তার দেহের কোন অস্থির সাথে মাটির সেই একই স্তরে যদি কোন পাথরের অস্ত্র পাওয়া যায়, তবে সেই প্রাণীকে সবদিক থেকে বিচার করে মানুষের পর্যায়েই ধরা হয়। তাকে হোমিনিডি (Hominidae) পরিবার ভুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে সেসব থেকে দেখা যায় যে, মানুষ কোন নিম্ন পর্যায়ের প্রাণী থেকে ক্রমবিকাশের সূত্র ধরে উদ্ভুত হয়েছে, কিন্তু এসব প্রমাণ এতই দুর্বল যে তা মানুষ সৃষ্টির রহস্য পুরোপুরি উদঘাটন করতে অক্ষম। বর্তমানে মানবাকৃতির যে সব প্রাণী রয়েছে তাদের সঙ্গে মানুষের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষ এমন একটি প্রাণী যে কৌশল ও দক্ষতার বলে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস করছে এবং অন্য প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানা হয়ত সম্ভব নয়। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আবিষ্কৃত ফসিলের উপর ভিত্তি করে, প্রাচীন কালের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার, দৈহিক গঠন প্রণালী তথা জীবন যাত্রা প্রণালী সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। তাই সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের কি করে উৎপত্তি হলো তা খুঁজতে গিয়ে ফসিলের সাহায্য নিয়েছেন। আমরা এবার কয়েকটি ফসিল মানব নিয়ে আলোচনা করবো। আদিম মানুষের জীবাশ্ম বা ফসিল হতে যে সব আদিম মানুষের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাদের বলা হয় 'লুপ্ত মানব'।

চিত্র ৫ ক ঃ চিত্রালী মানব

চিত্র ৫ খ ঃ সমকালীন মানব

এবারে আসুন আমরা কয়েকটি ফসিল মানব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি ঃ যেমন

১. **প্যারাপিথেকাস (Parapithecus)** ঃ নৃতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ফসিলের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব মানুষ সদৃশ জীবকে পেয়েছেন তাদেরকে বলেছেন লুপ্ত মানব। এই লুপ্ত মানবের প্রথম পর্যায় হলো প্যারাপিথেকাস। কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা হচ্ছে সকল হোমিনিডির আদি প্রতিনিধি হলো প্যারাপিথেকাস। প্যারাপিথেকাসের প্রাপ্ত

www.swapno.in

জীবাশ্মগুলো ছিল খুবই সামান্য- একটি চোয়ালের দাঁত ও হাঁড়। অনুমান করা হয় যে, এই ধরনের প্রাণী পৃথিবীতে বেঁচেছিল আজ থেকে প্রায় চার কোটি বছর আগে আলগোসিন কালে।

২. **অষ্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus)** ঃ ১৯২৫ সালে অধ্যাপক রেমণ্ড ডার্ট দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রদেশে একটি মাথার খুলি, মুখ এবং চোয়ালের অংশ বিশেষ আবিষ্কার করেন। এগুলো নর-বানর এবং মানুষের হাঁড়গোড়ের মত ছিল। এর নাম দেয়া হয় অষ্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস (Australopithecus Africanas)। ১৯৩৬ সালে জোহানসবার্গের কাছে ক্রমডালে নৃতত্ত্ববিদ টারব্লাঙ্ক যে জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন তার নাম দেয়া হয় প্যারানথ্রপাস রোবাস্টাস (Paranthropus Robustus)।

এ সকল প্রায়-মানব আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে প্লাইওসিন পর্বের শেষভাগ বা প্লেইসটোসিন পর্বের প্রারম্ভে পৃথিবীর উপর বিচরণ করতো।

মানুষের সাথে হাইডেলবার্গের দৈহিক মিল জাভা মানুষের চেয়ে বেশী ছিল।

৩. **জাভা মানব (Pithecanthropus Erectus)** ঃ ১৮৯২ সালে মধ্য জাভার (যবদ্বীপ) ত্রিনীল (Trinil) নামক গ্রামে সোলো নদীর ধারে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ডাঃ ইউজেন দ্যুবোয়া একটি চোয়ালের হাড় পান। ফলে তাঁর ঔৎসুক্য বেড়ে যায় এবং ব্যাপক অনুসন্ধান করতে করতে একটি উরুর হাড়, দুটি দাঁত ও একটি মাথার খুলির ঢাকনা আবিষ্কার করেন। দ্যুবোয়া এই প্রাণীটির নাম দেন (Pithecanthropus Erectus)। গ্রীক ভাষায় পিথেকো মানে বানর, অ্যানথ্রপ মানে মানুষ, এবং ল্যাটিন ভাষায় ইরেকটাস মানে সোজা। সুতরাং এর পূর্ণ অর্থ দাড়াচ্ছে সোজা হয়ে চলতে পারে এমন নর-বানর। পরে এরা জাভা মানুষ কিংবা ত্রিনীল মানুষ নামেও পরিচিত হয়।

জাভা এইপ মানব মানুষের আদিপুরুষ নয়। তবে অনেক নরবানরের চেয়ে এরা মানুষের কাছাকাছি বলতে হবে।

অনুমান করা হয় যে, এই জাভা এইপ মানব প্লাইসটোসিন যুগের প্রারম্ভে প্রায় ৫,০০,০০০ বছর আগে পৃথিবীতে বসবাস করতো। এদের মাথায় মগজের পরিমাণ ছিল ৪০ সি.সি। এটি শিম্পাঞ্জী ও মানুষের মাঝামাঝি পর্যায়ের মগজ। এদের উরুর হাড় প্রমাণ করে যে, এরা সোজা হয়ে চলতে পারত। দন্ডায়মান অবস্থায় এদের উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। এই পিথেকানথ্রোপাস বা জাভা মানব পাথর এবং হাড়ের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত এবং রান্নার কাজে আগুন ব্যবহার করতো। সম্ভবত এরা মানুষের আদি পুরুষ নয়। তবে অনেক নরবানরের চেয়ে এরা মানুষের কাছাকাছি বলতে হবে। জাভা মানবের জীবাশ্ম হল্যান্ডের হারলেম শহরের টিইলার যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

পিকিং মানব পাথরের হাতিয়ার, পশু শিকার ও আগুনের ব্যবহার আয়ত্ত করেছিলো।

আদিম মানুষের ফসিল হতে যে সব আদিম মানুষের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাদের বলা হয় ‘লুপ্ত মানব’।

www.swapno.in

চিত্র ৬ ঃ নরবানর থেকে মানুষ

৪. **পিকিং মানব (Sinanthropus erectus)** ঃ চীনের রাজধানী পিকিং শহরের তিনশত মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে চাকুতিয়েন পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় প্রথমে কয়েকটি দাঁত পাওয়া যায়। এই দাঁতের উপর ভিত্তি করে ১৯২৭ সালে তখনকার পিকিং মেডিক্যাল স্কুলের ডাক্তার উক্টর ডেভিডসন ব্ল্যাক যে প্রাচীন মানুষ সম্বন্ধে ধারণা দেন তারা পিকিং মানুষ নামে পরিচিত। পরে চকুতিয়েন অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে একাধিক বিশেষজ্ঞ মোট ছত্রিশটি মানুষের মাথার খুঁলি ও দেহের অন্যান্য অংশের হাড় সংগ্রহ করেন। এই হাড়গুলির সাথে বন্য জন্তুর পোড়া হাড় ও পাথরের অস্ত্র পাওয়া যায়। এ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, পিকিং মানুষেরা পাথরের হাতিয়ারের সাহায্যে পশু শিকার করতে এবং তারা আগুন জ্বালাতে পারতো ও মাংস পুড়িয়ে আহার করতো। বিজ্ঞানীরা পিকিং মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম রাখেন Sinanthropus Erectus অর্থাৎ পিকিং তথা চীনা মানুষ। তবে জাভা মানবের মাথার খুলির সাথে পিকিং মানবের মাথার খুলির অনেক সাদৃশ্য থাকায় এই নাম পরিবর্তন করে পিথেক্যানথ্রপাস পিকিনেনসিস রাখা হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এ ধরনের মানুষ মধ্য গেসটোসিন পর্বে চীন দেশে বাস করতো। ১৯২৯ সালের দিকে চীনা যুবক জীবাশ্মবিদ পেই পূর্ণাঙ্গ পিকিং মানবের জীবাশ্ম খুঁজে পান। যতদূর জানা যায়, পিকিং মানব ১০,০০,০০০ বছর আগে পৃথিবীতে বসবাস করতো। নৃবিজ্ঞানীরা জাভা মানব ও পিকিং মানবের একত্রে নাম দিয়েছেন Homo Erectus বা সোজা হয়ে চলতে সক্ষম মানুষ।

ক্রো-ম্যাগনন মানব প্রকৃত হোমো-সেপিয়েন ছিল বলে নৃবিজ্ঞানিগণ মনে করেন।

মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো সেপিয়েন।

বৈজ্ঞানিকরা নিয়ন্ডারথাল মানবের বৈশিষ্ট্য বিচার করে বর্তমান মানুষের সাথে অভিন্ন মহাজাতিভুক্ত (Gos us) করেন।

www.swapno.in

www.swapno.in

চিত্র ৭ ঃ পিকিং মানুষ

৫. **হাইডেলবার্গ মানব (Hiedelberg Man)** ঃ ১৯০৭ সালে জার্মানীর হাইডেলবার্গ শহরের ৬ মাইল দূরে নেকর নদীর গর্ভে মানুষের যে ফসিল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় হাইডেলবার্গ মানুষ। হাইডেলবার্গ মানুষের কেবলমাত্র একটি নীচের চোয়াল আবিষ্কৃত হয়েছে। হাইডেলবার্গ জাতীয় প্রাণী জাভা মানবের তুলনায় অনেক অগ্রসরমান ও বিকশিত। মানুষের সাথে হাইডেল বার্গের দৈহিক মিল জাভা মানবের চেয়ে বেশী ছিল। এরা দ্বিতীয় বরফ যুগে প্রায় ৩,০০,০০০ বছর পূর্বে পৃথিবীতে বসবাস করতো। এদের মাথায় মগজের পরিমাণ ছিল প্রায় ১,০০০ সি.সি। এদের দৈর্ঘ্য আধুনিক মানুষের গড় দৈর্ঘ্যের চেয়ে কিছু বেশী ছিল। হাইডেলবার্গ মানুষের জীবাশ্ম হাইডেলবার্গের ভূতাত্ত্বিক জীবাশ্ম প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আছে।

৬. এবার আসুন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি Homo-sapiens কাকে বলে। মূলত, মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো সেপিয়েন। সুইডিস জীব বিজ্ঞানী লিনিয়াস মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম দেন হোমো সেপিয়েন। ল্যাটিন ভাষায় Homo অর্থ মানুষ আর Sapiens হচ্ছে জ্ঞান বা বুদ্ধি। অর্থাৎ লিনিয়াস বুঝাতে চেয়েছেন, পৃথিবীতে যত জীবন রয়েছে মানুষ তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মানুষের পরিচয় তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই Homo Sapiens কে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১। নিয়ান্ডারথাল মানব   ২। ক্রো-ম্যাগনন মানব

প্রথমে আমরা নিয়ান্ডারথাল মানব নিয়ে আলোচনা করবো -

৬. **নিয়ানডারথাল মানব (Neanderthal Man)** ঃ নিয়াভারথাল শব্দটা এসেছে জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের কাছে নিয়াভারথাল উপত্যকা থেকে। এই উপত্যকা থেকে একজন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক, জোহান কার্ল ফুহলরট প্রথম নিয়ান্ডারথাল মানুষের মাথার খুলি ও কিছু হাড় আবিষ্কার করেন। পরে নিয়াভারথাল মানবের জীবাশ্ম প্যালেস্টাইন, অষ্ট্রিয়া,স্পেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে পাওয়া যায়। নৃবিজ্ঞানীরা নিয়াভারথাল মানব আবিষ্কার করে জীবের ক্রমবিকাশের একটি যোগসূত্র খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে করেন। নিয়াডারথাল মানুষের মাথার খুলির বাইরের আকৃতি কিছুটা বনমানুষের মত (ছবি দেখুন)। তবে এদের মাথায় বন মানুষের মাথার চেয়ে মগজের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। এদের মাথার মগজের পরিমাণ ছিল, ১,৫৫০ সি.সি। আজ থেকে প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে এরা

www.swapno.in

পৃথিবীতে বসবাস করতো বলে অনুমান করা হয়। বৈজ্ঞানিকরা নিয়ান্ডারথাল মানুষের নাম রাখেন Homo neanderthalensis। অর্থাৎ তারা এই মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিচার করে বর্তমান মানুষের সাথে অভিন্ন মহাজাতি (Genus) ভুক্ত করেন; কিন্তু বলেন, এদের প্রজাতি (Species) ছিল আলাদা। নিয়ান্ডারথাল মানুষের অনেক আচরণ ছিল অবিকল বর্তমান মানুষের মত। এরা এদের মৃতদেহ কবর দিত। মৃতদেহকে কবরের শায়িত করবার সময় কবরের মধ্যে এরা পাথরের অস্ত্রপাতি ও খাদ্য হিসেবে মৃত জীবজন্তু দিত। এ থেকে মনে হয় এরা পরজন্মে বিশ্বাস করত। এছাড়া অনুমান করা হয় যে, নিয়ান্ডারথাল মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ভেবেছে এবং এদের ভেতর এক ধরনের ধর্মীয় চেতনার প্রাথমিক উন্মেষ হয়ে থাকতে পারে। এরা গুহাবাসী, আগুন ব্যবহারকারীও শিকারী ছিল। এরা পশু চর্মের পোশাক ব্যবহার করতো বলে ধরে নেওয়া হয়। তারা হাতিয়ার তৈরী করতে জানতো এবং অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতো।

নিয়ান্ডারথাল মানবকে অনেকেই হোমো-সেপিয়ান বর্গের প্রথম সদস্য বলে উল্লেখ করেন। নিয়ান্ডারথাল মানবের জীবাশ্মের নমুনা প্যারিসের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

চিত্র ৮ ঃ নিয়ানডার থাল মানুষ

চিত্র ৯ ঃ মানুষের মা

www.swapno.in

www.swapno.in

www.swapno.in

চিত্র ১০ ঃ মোস্তেরীয় সংস্কৃতির নিয়ানডারথান মানুষ

৭. ক্রো-ম্যাগনন্ মানব (Cro-Magnon Man) : নিয়ান্ডারথাল মানবের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হবার বিশ বছর পর ফ্রান্সের একটি পাহাড়ি এলাকায় ক্রো-ম্যাগনন মানবের কয়েকটি জীবাশ্ম পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ছিল একটি বৃদ্ধ লোকের, দুটি প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের, একটি শিশুর ও একটি মেয়ের কঙ্কাল। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, বৃদ্ধ লোকটির মাথা লম্বাকৃতির এবং মগজের পরিমাণ ছিল ১,৫৯০ সি.সি। ক্রো-ম্যাগননদের শারীরিক গঠন খুব শক্ত। লম্বা ও সরু মাথা ছিল এদের অন্যতম দৈহিক বৈশিষ্ট্য। ক্রোম্যাগনন মানব প্রকৃত হোমো-সেপিয়াস ছিল বলে নৃবিজ্ঞানিগণ মনে করেন। এরা ছবি আঁকতে পারত, শিকার করতে পারত এবং আগুনের ব্যবহারও জানত। অনেক নৃবিজ্ঞানী মনে করেন যে, ২৫,০০০ বছর পূর্বে বসবাসকারী এই ক্রো-ম্যাগননরা কৃষি জানতো না। কিন্তু তারা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করার সময় গাছপালাকে নিপুণভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার শুরু করে বলে মনে হয়।

> নিয়ান্ডারথাল মানবের অনেক আচরণ ছিল বর্তমান মানুষের মত। এরা মৃতদেহ কবর দিত।

www.swapno.in

উপরে আমরা কয়েকটি জীবাশ্ম বা ফসিল মানব নিয়ে আলোচনা করলাম। যদিও জীবাশ্ম সম্পর্কে তথ্যাদি এখনও বেশ অপ্রতুল, তবু নৃবিজ্ঞানীগণ এই জীবাশ্ম বা ফসিলের উপর ভিত্তি করে ভূ-পৃষ্ঠে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে অনেকটা জানতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অতীত কালের এক প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে আধুনিক কালের প্রাণী ও উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। তাঁদের ধারণা, অন্য কোন প্রাণীর ক্রমিক রূপান্তরের মাধ্যমেই আধুনিক মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং আধুনিক মানুষের উৎপত্তি জানতে হলে আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় আবিষ্কৃত জীবাশ্মের সাহায্য নিতে হবে।

www.swapno.in

চিত্র ১১ ঃ ক্রাম্যানিয়ন মানবের শিকারের দৃশ্য

www.swapno.in

অনুশীলন ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

স্তন্যপায়ী প্রাণীর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

অনুশীলনী ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

মানুষের সাথে বন্যজন্তুর ৫টি পার্থক্য লিখুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সারাংশ ঃ

মানুষ যে প্রাণী একথা মানুষ বিশ্বাস করলেও প্রথম অবস্থায় সে তা সহজে মেনে নিতে পারেনি। বিশ্ববিখ্যাত সুইডিস জীব বিজ্ঞানী লিনিয়াস (Linnaeus) তাঁর বিখ্যাত Systems Natural নামক গ্রন্থে মানুষকে সর্বপ্রথম প্রাণীদের সাথে শ্রেণীবদ্ধ করেন। মানুষ বৃহৎ প্রাণীজগতেরই অংশ। ফসিল বলতে প্লাবন, ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা নৈসর্গিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠের লুপ্ত প্রাণী বা গাছপালার ধ্বংসাবশেষকে বুঝানো হয়ে থাকে। মানুষের অতীত সম্পর্কে জানতে গিয়ে যেসব জীবাশ্ম বা ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে সে সবের বৈজ্ঞানিক পাঠের নাম মানব জীবাশ্ম বিজ্ঞান। আধুনিক মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত ফসিল বা জীবাশ্মের সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত মানব সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হননি। তবে বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে স্বীকার করেছেন যে, জীবের সৃষ্টির জন্য কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত থাকতে হবে। এগুলো হল - (১) প্রয়োজনীয় পানীয় জল, (২) অনুকূল জলবায়ু; এবং (৩) প্রয়োজনীয় খাদ্য। মানুষ কি এবং কিভাবে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে এটা আমাদের প্রতি মুহূর্তের জিজ্ঞাসা। মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীর বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে এঁদের মধ্যে বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী চালর্স ডারউইনের মতবাদ সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ন্যায় বর্তমান রূপে সৃষ্টি হয়নি। স্থির ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বেকার রূপ হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে অতীত কালের অন্য কোন প্রাণীর ক্রমিক রূপান্তরের মাধ্যমেই আধুনিক মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হবে সেজন্য আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় আবিষ্কৃত জীবাশ্মের সাহায্য নিতে হবে।

www.swapno.in

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মানুষ ও বানরকে কে সর্বপ্রথম একই গোত্রভুক্ত বলে চিহ্নিত করেন?

ক) আর্চ বিশপ   খ) লিনিয়াস

গ) মর্গান   ঘ) ডারউইন

২। "The Origin of Species" গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু কি ছিল?

ক) প্রাণীর বিবর্তন ও মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা

খ) মানুষের উৎপত্তির ব্যাখ্যা

গ) প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যাখ্যা

ঘ) প্রাণীকূলের বিবরণ

৩। কত বছর পূর্বে নবজীবীয় যুগের ইওমিন পর্ব শুরু হয়?

ক) ৭ বিলিয়ন বছর পূর্বে   খ) ৭ কোটি বছর পূর্বে

খ) ৭ মিলিয়ন বছর পূর্বে   ঘ) ৭ লক্ষ বছর পূর্বে

৪। নৃবিজ্ঞানীরা কোন প্রাণীকে মানুষ নামের পদবাচ্যে বিচার করার জন্য কি কি বিষয় খতিয়ে দেখেন?

ক) প্রাণীর দৈহিক সংগঠন ও মেধা

খ) কোন প্রাণীর দৈহিক সংগঠন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

গ) কোন প্রাণীর দৈহিক সংগঠন ও তার কর্মকান্ড

ঘ) কোন প্রাণীর দৈহিক সংগঠন ও সামাজিক কর্মকান্ড

www.swapno.in

নরগোষ্ঠির ধারণা ও শ্রেণীবিভাগ

পাঠ
২

মূল ধারণা

- নরগোষ্ঠীর প্রাথমিক ধারণা
- নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা
- নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি
- নরগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- নরগোষ্ঠীর কি তা আপনি জানতে পারবেন।
- নরগোষ্ঠীর উদ্ভব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নরগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগের উপাদানসমূহকে আপনি চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

নরগোষ্ঠীর ধারণা ও শ্রেণীবিভাগ

ভূমিকা

আফ্রিকার কালো মানুষ; ইউরোপের সাদা মানুষ; চীনের হলুদ মানুষ এক রকম নয়। মানুষকে তাই বলা হয় পলিটিপিক।

নৃবিজ্ঞানে মানুষকে 'পলিটিপিক' (Polytipic) প্রজাতি বলে গণ্য করা হয়। প্রজাতি বলতে সাধারণতভাবে বোঝায় এমন একদল প্রাণী তাদের ভেতর মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং যাদের মধ্যে যৌন মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মে তা হয় স্বাভাবিক প্রজনন শক্তি সম্পন্ন। ঘোড়া আর গাধা আলাদা প্রজাতিভুক্ত কারণ তাদের যৌন মিলনের ফলে উদ্ভুত শাবক প্রজনন শক্তি সম্পন্ন হবে না। কিন্তু যদিও আফ্রিকার পিগমিরা অনেক মানুষের চেয়ে অনেক ছোট ও দেখতে আলাদা তবু তারা যদি অন্য ধরনের মানুষের সাথে মিলিত হয় তবে তাদের যে সন্তান জন্মাবে তা হবে স্বাভাবিক প্রজনন শক্তি সম্পন্ন। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা ইউরোপের মানুষের চেয়ে আকার আকৃতিতে অনেক আলাদা। কিন্তু ইউরোপীয় ও অষ্ট্রেলীয় মানুষের মিলনজাত সন্তান হবে স্বাভাবিক। অর্থাৎ মানুষে মানুষে জৈব পার্থক্যটা প্রবল নয়। তারা সবাই একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তবু মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে সেটা একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়। আফ্রিকার কালো মানুষ, ইউরোপের সাদা মানুষ ও চীনের হলুদ মানুষ এক রকম নয়। মানুষকে তাই বলা হয় পলিটিপিক অর্থাৎ বিভিন্ন আকার আকৃতি সম্পন্ন। মানুষের মধ্যে রয়েছে প্রকারভেদ (Variety)।

অনেকেই ইংরেজি Race শব্দের বাংলা জাতি (Nation) বা বর্ণ (Colour) করতে চান। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ Race এর বাংলা জাতি নয়। কেননা, জাতি হচ্ছে ইংরেজি Nation শব্দের বাংলা। বস্তুত জাতি গঠনে যেসব উপাদান প্রয়োজন Race তার অন্যতম। যেমন বাঙ্গালী

www.swapno.in

একটি জাতির নাম, নরগোষ্ঠীর নাম নয়। পক্ষান্তরে, মঙ্গোলয়েড হচ্ছে একটি নরগোষ্ঠীর নাম, জাতির নাম নয়।

Race এর বাংলা করা হয়েছে নরগোষ্ঠী।

বাদামী একটি রং বা বর্ণের নাম বটে তবে তা কোন নরগোষ্ঠীর নাম নয়। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর গায়ের রং বাদামী। তাই ইংরেজি Race এর বাংলা নৃবিজ্ঞানীরা নরগোষ্ঠী করেছেন।

নরগোষ্ঠী প্রাথমিক ধারণা ঃ (Primary concetp of Races)

নরগোষ্ঠী বলতে মানবজাতিরএক একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অভিন্ন অর্থাৎ অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

নরগোষ্ঠী বলতে মানব প্রজাতির এমন এক উপবিভাগকে বোঝায় যার সদস্যবৃন্দ একই দৈহিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে। এভাবে প্রতিটি উপবিভাগ এক একটি নরগোষ্ঠী এবং সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সাধারণত গায়ের রং, চুল ও চোখের গড়ন ও রং, নাক, ঠোঁট, চিবুক ও মাথার আকৃতি ও গড়ন, দৈহিক উচ্চতা ইত্যাদির ভিত্তিতে পৃথিবীর মানুষকে কয়েকটি বৃহৎ নরগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। যেমন, ককেশয়েড, মঙ্গোলয়েড, নিগোয়েড ও অষ্ট্রালয়েড। অবাধ রক্ত সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া সকল নরগোষ্ঠীর মধ্যেই চলছে। আজকের পৃথিবীতে বিশুদ্ধ নরগোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্ট সাধ্য। নরগোষ্ঠী বলতে মানব জাতির এক একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অভিন্ন অর্থাৎ আন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ন আলাদা। জাতি, জাতীয়তা, ভাষা ও ধর্মের দিক থেকে নরগোষ্ঠী শব্দকে ব্যবহার করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ এসকল জনসমষ্টি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আলাদা নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জার্মানী, ফরাসী ও ইহুদীরা নরগোষ্ঠী নয়। এসবকে 'জাতি' (Nation) বলা যেতে পারে। অন্যদিকে ইহুদিরা আবার ঠিক জাতিও নয়, নরগোষ্ঠীও নয়; এদেরকে একটি বিশেষ সাংস্কৃতির জনগোষ্ঠী বলা যায়। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে ইসরাইলীরা একটি স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করেছে। দু'টি নরগোষ্ঠীর ভেতর পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ নয়। নৃবিজ্ঞানীরা নরগোষ্ঠীর শ্রেনীবিভাগের জন্য বিভিন্ন কলা–কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। তবে নৃবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত কলাকৌশল সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। মার্কিন নৃবিজ্ঞানী রালফ লিনটন তাঁর (The Study of Man) নামক গ্রন্থে বুদ্ধিমান মানুষকে (Homosapian) বা বংশ (Breed) ও গোত্রের (Stock) দিক থেকে ভাগ করে দেখিয়েছেন। গরু ও ঘোড়া যেমন দুই ভিন্ন জাতের প্রাণী তেমনি মানুষের জাতও (Breed) আলাদা। নরগোষ্ঠী বলতে বিভিন্ন জাতের (Breed) মানুষকে বোঝায় যাদের ভেতর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে।

সাধারণত নরগোষ্ঠী শব্দটি রাজনীতিবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, জীববিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন।

সাধারণত, নরগোষ্ঠী শব্দটি রাজনীতিবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, জীববিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকেরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। ইংরেজ লেখকরা কখনও বা কোন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে বোঝাতে এ পদটিকে ব্যবহার করেছেন (যেমন, আইরিস রেস, স্কটিস রেস)। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করেন (যেমন Etruscan Race)। শব্দটি আবার কোন ধর্মীয় দল–উপদলকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় (যেমন, Jewish Race)। মূলত এটা বলা যায় যে, নরগোষ্ঠী হচ্ছে জীববিজ্ঞানী ও শারীরবিদ্যার একটি প্রত্যয়। নরগোষ্ঠী বলতে বোঝায় একদল লোকের সমষ্টি যাদের মধ্যে এমন কতগুলি সাধারণ দৃশ্যমান শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যা বংশপরম্পরায় পরবর্তীদের মধ্যে বর্তাতে পারে। নরগোষ্ঠী প্রত্যয়টি মানব প্রজাতির এক একটি উপবিভাগকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি সাধারণ জৈব ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

www.swapno.in

নৃগোষ্ঠী প্রত্যয়টি মানব প্রজাতির এক একটি উপবিভাগকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে কতকগুলি সাধারণ জৈব ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

সাধারণত একটি নরগোষ্ঠী অন্য একটি নরগোষ্ঠী থেকে মোটামুটিভাবে ভিন্নতর হয়ে থাকে। তবে মানবজাতির শুরু থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্বে নরগোষ্ঠীর মিশ্রণ এমনভাবে হয়েছে যে, বিশুদ্ধ বা খাঁটি নরগোষ্ঠির ধারণা নিতান্তই অলীক কল্পনায় (Myth) পরিণত হয়েছে। মানবজাতি সর্বকালেই সংকর। মূলত, মানুষ নামধারী সকল জীবকে নিয়ে একটি মাত্র বৃহৎ পরিবার ঃ মানুষে মানুষে মিলনের ফলে সৃষ্ট সংকর মানুষ (Cross) নিজেরাও সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলতে চাই যে, বিশুদ্ধ কোনও নরগোষ্ঠী নেই এবং কখনও ছিল না। প্রতিটি নরগোষ্ঠীর মধ্যে বহিরাগত জিনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে; বহিরাগত জিনকে গ্রহণ করে প্রতিটি নরগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। সঙ্গত কারণেই বলা যায় যে, পাঁচ কি দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আধুনিক কালের জনগোষ্ঠীর মতই সংকর ছিল। বস্তুত নরগোষ্ঠীর সংখ্যা কত তা চূড়ান্তভাবে বলা সম্ভব নয়। কারণ দুটি মানুষের মধ্যে, এমনকি যমজ সন্তানের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও মানব প্রজাতিসমূহকে কতকগুলি মৌলিক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Definition of Race)

ইউরোপের অনেক ভাষায় **Race** শব্দটা এসেছে ইটালিয়ান শব্দ রাজ্জা শব্দ (razza) থেকে।

ইংরেজি Race শব্দের বাংলা করা হয়েছে নরগোষ্ঠী। Race শব্দটির উদ্ভব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ইউরোপের অনেক ভাষায় Race শব্দটা এসেছে ইটালিয়ান রাজ্জা (Razza) শব্দ থেকে।

বস্তুত নরগোষ্ঠী হচ্ছে মানবজাতির এমন একটি উপবিভাগ যার সদস্যদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কতগুলি সাধারণ (Common) দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অতএব একথা বলা চলে যে, নরগোষ্ঠী বলতে বুঝায় ঃ

ক) মানব জাতির একটি উপবিভাগ (A subdivision of mankind)

খ) উপবিভাগের সদস্যদের মধ্যে থাকে কতিপয় সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্য;

গ) সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি জৈবিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। আর তাই এসব বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে জৈবিকসূত্রে বর্তায়।

ঘ) সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানব জাতির এক একটি উপবিভাগ হবে অন্যান্য উপবিভাগ থেকে পৃথক। অর্থাৎ একটি নরগোষ্ঠী অন্য নরগোষ্ঠী থেকে আলাদা।

নরগোষ্ঠী বলতে মানবজাতির এক একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বুঝায়,যারা দৈহিক বৈশিষ্টের দিক থেকে অভিন্ন।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, নরগোষ্ঠী বলতে সাধারণত মানবজাতির এক একটি বিশেষ জন গোষ্ঠীকে বুঝায়, যারা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অভিন্ন। নৃবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, আফ্রিকার কালো মানুষ, ইউরোপের সাদা মানুষ ও চীনের হলুদ মানুষ এক রকম নয়। নৃবিজ্ঞানে মানুষকে তাই বলা হয় পলিটিপিক। অর্থাৎ বিভিন্ন আকার-আকৃতি সম্পন্ন। এবার নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন যে, নরগোষ্ঠী বলতে আমরা বুঝবো যাদের মধ্যে আছে দৈহিক আকার - আকৃতির বিশেষ মিল - যে সব আকার আকৃতির মিল বংশ পরম্পরায় বিদ্যমান থাকে।

সংক্ষেপে বলা চলে যে, নরগোষ্ঠী বলতে আমরা বুঝি যে, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে গড়ে ওঠা এমন একটি জনসমষ্টি যারা বাস করে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে,কথা বলে একটি নির্দিষ্ট ভাষায়, নিজেদের মধ্যে অনুভব করে একধরনের মানসিক ঐক্য এবং যাদের মধ্যে রয়েছে দৈহিক আকার–আকৃতির বিশেষ সাদৃশ্য।এদিক থেকে চিন্তা করলে প্রতিটি নরগোষ্ঠীর একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ একদিকে যেমন দৈহিক গঠন প্রণালীর দিক থেকে প্রতিটি নরগোষ্ঠী ভিন্নতর রূপ লাভ করেছে তেমনি অপরদিকে, ধর্ম, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক রূপ নিয়েও এক একটি নরগোষ্ঠীর মানসিক ঐক্য গড়ে উঠতে পারে।

www.swapno.in

নরগোষ্ঠী মূলত এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা কোন বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবন যুদ্ধে টিকে আছে।

নরগোষ্ঠী সম্পর্কে যারা বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে গবেষণা করেছেন তাঁদের অনেকেই ভৌগোলিক নরগোষ্ঠী নামে একটি প্রত্যয় ব্যবহার করেন। এতে বুঝানো হয় যে, নরগাষ্ঠী মূলত এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা কোন বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবন যুদ্ধে টিকে আছে।

নরগোষ্ঠী একটা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বাস করে।

নৃবিজ্ঞানী মেয়ারের (Meyer) এর মতে, নরগোষ্ঠী হলো একটি সুনির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী এমন একদল মানুষ যাদের মধ্যে সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং যারা অন্যান্যদের থেকে দৈহিকভাবে ভিন্ন । বস্তুত নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক সংজ্ঞার পক্ষে যুক্তি রয়েছে। কেননা অতি দূরবর্তী কোন এলাকাবাসীরলোকের চেয়ে নিকটস্থ এলাকার মানুষের মধ্যেই দেহের মিল থাকার সম্ভাবনা বেশী। অধিকাংশ আধুনিক নৃবিজ্ঞানীই ভৌগোলিক নরগোষ্ঠী প্রত্যয়টি সমর্থন করেন। নৃবিজ্ঞানী গার্ণ (Gorn) ভৌগোলিক নরগোষ্ঠী প্রত্যয়ের পাশাপাশি আরেকটি ধারণার জন্ম দিয়েছেন, যার নাম Local Race । স্থানীয় নরগোষ্ঠী এমন এক জনসমষ্ঠি যারা তাদের প্রতিবেশী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে তাদের মধ্যে বিশেষ দৈহিক ও বংশগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে। তবে এই পার্থক্য এবং এ ধরনের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এতই কম যে, তাদেরকে কোন ভৌগোলিক নরগোষ্ঠী বলে গণ্য করা যায় না। নৃবিজ্ঞানী জে বি এস হলডেন নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "We may define a race as a people who normaly breed together and who differ from other peoples as regards inherited physical characteristics which are found in all members of the races" অর্থাৎ নরগোষ্ঠী বলতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝায় যাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য অন্য মানব গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন এবং এসব দৈহিক বৈশিষ্ট্য তারা উত্তারধিকার সূত্রে অর্জন করেছে।

নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি প্রধান তত্ত্ব রয়েছে।
১। বহু-উৎস-তত্ত্ব
২। একক-উৎস-তত্ত্ব

নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি (Origin of races)

নরগোষ্ঠীসমূহের উৎপত্তির সঠিক কারণ নির্ণয় করা কঠিন কাজ। কি করে নরগোষ্ঠীসমূহের উদ্ভব হলো? এক একটি নরগোষ্ঠী কি ভিন্ন ভিন্ন পূর্বপুরুষ (ancestor) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে? অথবা সব নরগোষ্ঠীর কি আদি উৎস একই পূর্বপুরুষ? নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে দু'টি প্রধান তত্ত্ব (theory) রয়েছে। ১) বহু উৎসতত্ত্ব (theory of Polygenesis); এবং ২) একক - উৎস তত্ত্ব (Theory of Monogenesis)। বস্তুত, ভিন্ন ভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভুত নরগোষ্ঠীর ধারনাকে বহুউৎস তত্ত্ব বলা হয়। পক্ষান্তরে, একই পূর্বপুরুষ বা একই উৎস থেকে সব নরগোষ্ঠী হয়েছে এরূপ ধারণাকে বলা হয় একক উৎস তত্ত্ব। আসুন, এবার আমরা আরো ভালোভাবে বহু উৎস তত্ত্ব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

বহু-উৎস-তত্ত্বানুযায়ী আধুনিক চারটি প্রধান নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে চারটি ভিন্ন পূর্ব পুরুষ বা

বহু-উৎস-তত্ত্ব (Theory of Polygenesis)

বহু-উৎস-তত্ত্বের সমর্থকদের মতে আধুনিক নরগোষ্ঠিসমূহ পরস্পর বংশসূত্রে আবদ্ধ নয়। তাই নরগোষ্ঠীগুলো পরস্পর অনাত্মীয় এবং সম্পর্কহীন। বহু - উৎস - তত্ত্বানুযায়ী আধুনিক চারটি প্রধান নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে চারটি ভিন্ন পূর্ব পুরুষ বা উৎস থেকে। যথা ঃ -

১। নিয়ান্ডারথাল (Neanderthal) থেকে প্রথমে ক্রো-ম্যাগনন(Cro-magnon) এবং তা থেকে আবার ককেশীয় নরগোষ্ঠীর (Caucasoid Race) উদ্ভব।

২। পিকিং মানব (Peking man) থেকে মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর উদ্ভব।

৩। রোডেশীয় মানব (Rhodesian man) থেকে নীগ্রো নরগোষ্ঠীর (Negro Race) উদ্ভব।

www.swapno.in

৪। জাভা মানব (Javaman) থেকে (Australoid) নরগোষ্ঠীর উদ্ভব।

সম্ভবত, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন প্রস্তর যুগের ক্রো-ম্যাগনন মানব ধারাকে আধুনিক নরগোষ্ঠী সমূহের পূর্ব পুরুষ বলে গণ্য করা হয়।

অনেকের মতেই উপরে উল্লিখিত ধারায় আধুনিক চারটি নরগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। কি করে নরগোষ্ঠীসমূহের উদ্ভব হয়েছে তা আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলা সম্ভব হয়নি। নরগোষ্ঠীসমূহ যদি একটি নির্দিষ্ট পূর্বপুরুষ থেকে, রূপান্তরের ধারায় এসে থাকে তাহলে প্রশ্ন জাগে ঐ রূপান্তরের ইতিহাসই বা কি? জীববিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত যতটা জানা সম্ভব হয়েছে তাতে এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ জবাব দেয়া যায় না। মূলত, মানুষের আকার আকৃতির পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি এবং নরগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পর্কে যেসব তথ্য আমাদের জানা আছে সেসব খুবই অপ্রতুল ও অসম্পূর্ণ। সম্ভবত আজ থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন প্রস্তর যুগের ক্রো-ম্যাগনন মানবধারাকে আধুনিক নরগোষ্ঠীসমূহ, বিশেষ করে কিছু ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষ বলে অনুমান করা হয়। অনেক বছর ধরে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী স্ব স্ব রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু কেমন করে ও পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এই পরিবর্তন হল, কিভাবে সেগুলির উপবিভাগ সৃষ্টি হল এবং কিইবা তাদের যোগসূত্র – এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এদিকে জীবাশ্মবিজ্ঞান পাঠ থেকে জানা গিয়েছে যে একলক্ষ বছর আগেই আদিম মানুষের মধ্যে দু'টো নৃগোষ্ঠীর ধারা সৃষ্টি হয়। আসুন এবার আমরা নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে একক উৎস তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করি ।

একক - উৎস - তত্ত্ব (Theory of Monogenesis)

এতত্ত্বানুযায়ী সব নরগোষ্ঠী একই পূর্ব পুরুষ বা উৎস থেকে উদ্ভব ও বিকশিত হয়েছে। যদি ধরে নেয়া যায় যে ৪টি প্রধান নরগোষ্ঠীর উৎস একই পূর্ব পুরুষ তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, কেমন করে একই পূর্ব পুরুষ থেকে আগত মানুষগুলোর মধ্যে এত দৈহিক বিভিন্নতা দেখা দিল। এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা নরগোষ্ঠীর উদ্ভব এবং নরগোষ্ঠীর বিভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন,

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু তথা গোটা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন নরগোষ্ঠী রূপায়ণে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে।

১. ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব (Influence of geographical factor) একথা বলা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু তথা গোটা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন নরগোষ্ঠী রূপায়ণে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। সাধারণত, শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষকে সারাক্ষণ গরম মোটা কাপড় পরে থাকতে হয়। অপরদিকে, গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ফলে আবৃত দেহের চামড়ার রং কৃষ্ণকায় হতে বাধ্য। জলবায়ু ও পরিবেশের দীর্ঘদিনের প্রভাবে মানুষের চেহারা ও দেহের গড়নে অন্তত কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে চুল ও চামড়ার রং নাকের গঠনাকৃতি, দেহের ওজন ও আকৃতিতে পরিবর্তন আসে। বাক্‌ল (Buckle) তাঁর Introduction to the History of civilization in England নামক গ্রন্থে নরগোষ্ঠীর উপর ভৌগোলিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে নরগোষ্ঠীর বিভিন্নতার জন্য জলবায়ু খাদ্য ও মাটি (Climate, food and Soil) বহুলাংশে দায়ী। ভৌগোলিক পরিবেশের তারতম্য এ নরগোষ্ঠীর বিভিন্নতার অন্যতম প্রধান কারণ। ডঃ এলেন চার্চিল মেম্মল তার Influence of Geographical Environment, on the basis of Ratzel's system of Anthropo-geopraphy নামক গ্রন্থে নরগোষ্ঠীর উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে শারিরীক গঠন, চামড়ার রং ও ঘনত্ব, চুলের ধরন প্রকৃতি ইত্যাদির উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। উপরে উল্লিখিত লেখকেরা নরগোষ্ঠীর উৎপত্তিতে একক–উৎস মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন যে, নরগোষ্ঠীর উৎপত্তির উৎস সূত্র এক এবং ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্নতা নরগোষ্ঠী উদ্ভবের অন্যতম কারণ বলে গণ্য হতে পারে।

www.swapno.in

প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটাতে পারে।

২. প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রভাব (Influence of natural and Social isolation) প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটাতে পারে। কারণ আদিম মানুষ খাদ্যের অন্বেষণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে। এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, কোন একটি নরগোষ্ঠীর অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন পরিবেশে জীবনধারণ করতে লাগল। হয়ত এমন হলো যে, তারা মূল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে পারল না। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, হাজার হাজার বছর ধরে স্থানীয় নতুন পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাবে এই বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নরবংশগত পরিবর্তন আসতে পারে। এমন কি আজও পৃথিবীর অনেক জায়গায় প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার (Natural isolation) প্রভাব সুদূরপ্রসারী। উত্তর ইউরোপীয় ল্যাপস, এশিয়া ও আমেরিকার উত্তর প্রান্তীয় এস্কিমো, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, নিউগিনির পাপুয়া ও কালাহারীর কিছু মানবগোষ্ঠীর বেলায় প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার প্রভাব বেশ প্রকট। বস্তুত মরুভূমি, ঘন অরণ্য, গভীর ও বিস্তৃত জলাশয়, পাহাড়, উপত্যকা, সমুদ্র ইত্যাদি ভৌগোলিক উপাদান মানুষের মধ্যে যোগাযোগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নান নরগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।

একই নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ও আন্তনরগোষ্ঠীর মধ্যে বৈধ এবং অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে মিশ্রণ নরগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।

৩. সংকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাব (Influence of crossbreeding) – একই মানুষের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এবং আন্তনরগাষ্ঠীর মধ্যে বৈধ এবং অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে মিশ্র নরগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। ফলে সংকর (hybrid) মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। সংকরণ প্রক্রিয়ার আরেক নাম জনমিশ্রন (Population mixture)। এই জনমিশ্রন বৈবাহিক সম্পর্ক ভিত্তিক হতে পারে এবং বিবাহ বহির্ভূত পন্থায়ও হতে পারে।

আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াতে অনেক উপজাতি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট সংকর জাতের লোক দেখা যায়। ম্যাক্সিকোর তেত্রিশ মিলিয়ন মানুষ তথা শতকরা ষাট ভাগই ইউরোপীয় - ভারতীয় রক্ত মিশ্রনের ফল। কলম্বিয়ার এগার মিলিয়ন জনসংখ্যার চল্লিশ ভাগের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। বিভিন্নভাবে সংকর মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হচ্ছে। বলা যায় যে, আদিতে বিক্ষিপ্তভাবে পৃথিবীর নানা স্থানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকজন ছড়িয়ে থাকত। উৎপাদন যন্ত্রের উন্নতিতে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। এতে ভৌগোলিক বাধা ডিঙ্গিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একে অপরের সংস্পর্শে আসে। শুরু হয় রক্তমিশ্রন প্রক্রিয়া। এর ফলে নরগোষ্ঠীসমূহ অনেকটা অবাধে পরস্পরের সাথে মিশতে থাকে। প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার স্থলে সংকরণ প্রক্রিয়া (Cross-breeding) নতুন নরগোষ্ঠী উদ্ভবের নিয়ামক উপাদান বলে পরিগণিত হয়। সংকর ও মিশ্রণ উভয় প্রক্রিয়ার ফলেই অতীতে এবং বর্তমানে অনেক মিশ্র মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের বুঝতে হবে যে,নরগোষ্ঠী মূলত জীবের ক্রমবিকাশের ফল। আসুন, এবার আমরা জেনে নেই নরগোষ্ঠীর উৎপত্তিতে মিউটেশনের প্রভাব কতটুকু।

প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতার স্থলে সংকর প্রক্রিয়া নূতন নরগোষ্ঠী উদ্ভবের নিয়ামক উপাদান বলে পরিগণিত

৪. জৈবিক পরিবর্তনের প্রভাব (Influence of mutation) – প্রজনন প্রক্রিয়ার ফলে জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। এর দ্বারা জীবদেহে কোষগুলির গঠনাকৃতি বদলে যায় ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সূচিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে নৃবিজ্ঞানের ভাষায় মবহব mutation বলে। মিউটেশন প্রক্রিয়ায় পূর্ব পুরুষের বংশানুক্রম পরিবর্তিত হয় এবং নতুন বংশগত উপাদানের উৎপত্তি ঘটে। এভাবে বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়া নরগোষ্ঠীসমূহের উৎপত্তির পিছনে কাজ করে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, রুশ নৃবিজ্ঞানী নেস্তর্খ তাঁর (The Races of Mankind) নামক গ্রন্থে নরগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, মানব সমাজের বিকাশের ধারায় নরগোষ্ঠী গঠনের যেকোন উপাদান ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। একসময় যেখানে প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতা ও ভৌগোলিক পরিবেশ নরগোষ্ঠী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আজ সেখানে রক্ত মিশ্রন প্রক্রিয়াই প্রাধান্য লাভ করেছে। এ প্রক্রিয়া এখন

www.swapno.in

নরগোষ্ঠী সমূহের পার্থক্য দূরীকরণে অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে নরগোষ্ঠী সমূহের উৎপত্তি ও রূপায়ণে বিভিন্ন উপাদান প্রভাব রাখছে।

নরগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ (Classification of Races) ঃ -

সাধারণত, নরগোষ্ঠী বলতে আমরা বোঝবো এমন একটি জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে আছে দৈহিক আকার–আকৃতির বিশেষ মিল, যা বংশ পরস্পরায় চলতে থাকে।

নৃবিজ্ঞানীরা মূলত, মানুষের দেহের উচ্চতা, মাথার আকৃতি, নাকের ধরন, গায়ের রং, চুলের ধরন প্রভৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষকে ৩টি প্রধান নরগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন।

> দৈহিক পার্থক্যের ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীর মানব জাতিকে প্রধানত ৩টি নরগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ
> ১। ককেশীয়;
> ২। মঙ্গোলীয়
> ৩। নিগ্রীয়;

১। ককেশীয় (Caucasoid) বা শ্বেতকায়

২। মঙ্গোলীয় (Mongoloid) বা পীতাভ

৩। নিগ্রীয় (Negroid) বা কৃষ্ণকায়

নরগোষ্ঠীর এই তিনটি প্রধান বিভাগের সাথে নৃতাত্ত্বিকগণ আরও একটি বিভাগ যোগ করেন, যাকে বলা হয় অষ্ট্রেলীয় বা অষ্ট্রালয়েড (Australoid)। একথা আগেই একবার বলা হয়েছে যে, মানুষকে প্রথম চার ভাগে বিভক্ত করেন বিখ্যাত সুইডিস জীববিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৮-১৭৭৮) তাঁর System Naturae নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় রচিত। এই বইয়ের প্রভাব সমগ্র ইউরোপের প্রাণী ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের উপর পড়ে।

লিনিয়াসের বিভাগসমূহ নিম্নরূপঃ যথা –

আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান ঃ লাল, কোপন স্বভাব (Choleric), সোজা

ইউরোপিয়ান ঃ সাদা, আশাবাদী, পিঙ্গল

এশীয় ঃ হলুদ, বিষন্ন, অনমনীয়

আফ্রিকান ঃ কালো, শান্ত, অলস

> ব্লুমেনবাখ মানুষকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে দেখান । তিনি মাথার খুলির বৈশিষ্ট্য দিয়ে মানুষের শ্রেনীবিভাগ

লিনিয়াসের পর বিখ্যাত জার্মান নৃতাত্ত্বিক জোহান ফ্রেডারিক ব্লুমেনবাখ মানুষকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে দেখান। তিনি মানুষকে কেবল গায়ের রং বিচার করে নয়, মাথার খুলির বৈশিষ্ট্য দিয়ে ভাগ করেছেন। উক্ত নৃবিজ্ঞানী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৬০ টি মাথার খুলি সংগ্রহ করে তাঁর শ্রেণীবিভাগগুলি দাঁড় করিয়েছেন। ব্লুমেন বাখের বিভাগগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

১। ককেশীয় বা সাদা

২। মঙ্গোলীয় বা হলুদ

৩। মালয়ী (Malayan) বা বাদামী

৪। আমেরিকান (রেডইন্ডিয়ান) বা লাল

৫। আফ্রিকান বা কালো।

> যাদের বলা হয় নিগ্রো তাদের চুল পশমী, যাদের বলা হয় মঙ্গোলীয় তাদের চুল সোজা; এবং যাদের বলা হয় ককেশীয় তাদের চুল তরঙ্গায়িত।

এরপর ফরাসী নৃতাত্ত্বিক বোরিদ্যে স্যাঁ ভঁস (Boryde saint vicent) ১৮২৭ সালে মানুষকে চুলের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনভাগে ভাগ করেন। বস্তুত চুলের বৈশিষ্ট্য খুবই স্থায়ী । কোন প্রাকৃতিক কারণে উহা সহজে পরিবর্তিত হয় না। মানুষের মধ্যে তিন ধরনের চুল দেখা যায়। এক রকম চুল পশমী, পাক খাওয়া। আর এক রকম চুল সোজা, খড়খড়ে ও শক্ত। তৃতীয় ধরনের চুল হল নরম ও তরঙ্গায়িত। যাদের বলা হয় নিগ্রো তাদের চুল পশমী, যাদের বলা হয়

www.swapno.in

মঙ্গোলীয় তাদের চুল সোজা, যাদের বলা হয় ককেশীয় তাদের চুল তরঙ্গায়িত। আসুন, এবার আমরা জেনে নেই নরগোষ্ঠীকে কিভাবে চুলের বৈশিষ্ট্য দিয়ে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ

১। ককেশীয় বা তরঙ্গচুল (Cymotrichi)
২। মঙ্গোলীয় বা সোজাচুল (Leiotrichi)
৩। নিগ্রয়েড বা পশমী চুল (Ulotrichi)

> অষ্ট্রালয়েডদের চুলের বৈশিষ্ট্য ককেশীয়দের অনুরূপ। তাই এদের বিচার করতে হবে ককেশীয়দের একটি বিশেষ শাখা হিসাবে।অনেকে মনে করেন বাঙ্গালী দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অষ্ট্রালয়েডদের প্রভাব বিদ্যমান।

অনেকে উপরে উল্লিখিত তিনটি নরগোষ্ঠীর সাথে আরেকটি ভাগকে যোগ করতে চান। এঁরা এই বিভাগের নাম দেন অষ্ট্রালয়েড। এই অষ্ট্রালয়েড বিভাগে পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, ভারত উপমহাদেশের সাঁওতাল, ওরাও প্রভৃতি উপজাতি, সিংহলের ভেদ্দা উপজাতি ও জাপানের আইমু (Aimu)। কিন্তু অন্যরা বলেন, যেহেতু এদের চুলের বৈশিষ্ট্য ককেশীয়দের অনুরূপ তাই এদের বিচার করতে হবে ককেশীয়দের বিশেষ শাখা হিসেবে। সম্ভবত, এঁরা ককেশীয়দের প্রাচীন রূপ হিসাবে অস্টালয়েডদের বিবেচনা করতে চান। তাই এই শাখার নাম দেওয়া হয় প্রত্মককেশীয় (Archaic Caucasoid)। যাঁরা অষ্ট্রেলয়েডদের পৃথক করে বিচার করার পক্ষে যুক্তি দেখান তাঁরা বলেন এদের মধ্যে আছে নিয়ান্ডারথাল বৈশিষ্ট্য। যেমন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ভ্রূর হাড় উঁচু, থুতনীর হাড় উঁচু নয়, কপাল ভেতরের দিকে অনেক পরিমানে চাপা। অষ্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠী আমাদের কাছে বিশেষভাবে আলোচ্য। কারণ অনেকে মনে করেন বাঙালী দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অষ্ট্রালয়েডদের প্রভাব বিদ্যমান।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সব মানুষ একই প্রজাতিভুক্ত । কিন্তু সব মানুষের মধ্যে সবরকম সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সে যা হোক নৃবিজ্ঞানীদের ভেতর নরগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। নরগোষ্ঠীসমূহের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হচ্ছে নিম্নোক্ত উপাদান ঃ যথা—

১। **দেহের উচ্চতা ঃ** যাদের দেহের উচ্চতা ৬২ ইঞ্চির মত তাদের বলা হয় খর্বকায়। যাদের দেহের উচ্চতা ৬৬ ইঞ্চির মত তাদের বলা হয় মাঝারি এবং যাদের দেহের উচ্চতা ৬৮ ইঞ্চির মত তাদের বলা হয় লম্বা।
২। **মাথার আকৃতি ঃ** মাতার আকৃতিকেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, লম্বা মাথা, গোল মাথা, মধ্যমাকৃতি মাথা।
৩। **মুখের চেহারা ঃ** মুখের চেহারা নির্ধারণে কপালের আকৃতি, নাকের আকৃতি, ঠোঁটের আকৃতি, চোয়ালের আকৃতি, চোখর মনির রং, চোখের পাতার রং ইত্যাদির তারতম্য বিবেচনা করা হয়।
৪। **চুলের ধরন ঃ** চুলের ধরন বিশ্লেষণ চুলের পরিমান, রং এবং চুল কি সোজা, মসৃণ, তরঙ্গায়িত ও পশমের মত প্রভৃতি দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
৫। **গায়ের রং ঃ** গায়ের রং সাদা, হলুদ, লাল, বাদামী, কালো ও তামাটে ইত্যাদির পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে এরূপ বিভাজনের বিশেষ কোন মূল্য নেই। কারণ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্বলিত যে–মিশ্র নরগোষ্ঠী দেখা যায়, তাদের সুনির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ নরগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। কারণ আমরা জানি জীববিজ্ঞানীদের মতে একই উৎস হতে ভিন্ন ভিন্ন নরগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। বলা যায়, ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যগত কারণে মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্ন নরগোষ্ঠী পরস্পরের সংস্পর্শে আসার পূর্বে যে ভৌগোলিক অবস্থানে যে নরগোষ্ঠী নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল তা থেকেই বৃহত্তর

www.swapno.in

নরগোষ্ঠীসমূহকে জানা যায়। আসুন, এবার আমরা জেনে নেই নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ কি কি?

নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ (Geographical Classification of Race)

নৃবিজ্ঞানী কুন, গার্ন ও বার্ডশেল তাঁদের Race : "a Study of race formation in Man" নামক এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক শ্রেণী বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। নৃবিজ্ঞানী হোবেল (Hoebel) এটাকে নরগোষ্ঠীর আধুনিক শ্রেণীবিভাগ (A modern classification of Race) নামে আখ্যা দিয়েছেন। এই শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ। যথা ঃ -

১. ইউরোপীয় ঃ ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী, উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ ও বিশ্বব্যাপী তাদের বংশধরেরা;
২. ইন্ডিয়ান ঃ ভারতীয় উপমহাদেশের জনগোষ্ঠী;
৩. এশীয় ঃ সাইবেরিয়া, মঙ্গোলীয়া, চীন, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার জনগোষ্ঠী;
৪. মাইক্রোনেশিয়ান ঃ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসী;
৫. মেলানেশিয়ান ঃ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলবাসী (হাওয়াই থেকে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত);
৬. পলিনেশিয়ান ঃ পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলবাসী (হাওয়াই থেকে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত);
৭. আমেরিকান ঃ ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী (Population of "Indians")
৮. আফ্রিকান ঃ সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ-অঞ্চল তথা আফ্রিকার জনগোষ্ঠী; এবং
৯. অস্ট্রেলীয় ঃ অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী।

বস্তুত, আদিকাল থেকে বর্ণ মিশ্র এমনভাবে ঘটে চলেছে যে নরগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগের বেলায় তেমন কোন নির্ভরযোগ্য মানদন্ড খুঁজে পাওয়া কঠিন। যেসব উপাদানের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ করা হয় সেসব এক নরগোষ্ঠী থেকে অন্য নরগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বাঙ্গালীদের যে নরগোষ্ঠীভুক্তই করা হোক না কেন তা নির্ভুল নয়। কারণ বাঙ্গালীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যে খুবই তারতম্য দেখা যায়। বিভিন্ন বর্ণ মিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যই এর জন্য দায়ী। মানবজাতিকে তবু প্রধানত তিনটি নরগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে; যেমন, ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো। ককেশীয়দের মধ্যে পড়ে নর্ডিক, আলপাইন, মেডিটেরানিয়ান। এদের গায়ের রং সাদা, চুল কোকড়ানো,নাক পাতলা ও উন্নত। নর্ডিকদের গায়ের রং লালচে ফর্সা, মাথা ও মুখমন্ডল লম্বা, চোখ নীলাভ,নাক উন্নত ও সরু। ভারত ও জার্মানীতে এদের কিছু কিছু দেখা গেলেও এরা বেশীর ভাগই ইউরোপীয়। মেডিটেরানিয়ানদের মাথা মাঝারি থেকে লম্বা, নাক পাতলা, গায়ের রং সাদা, চুল স্বাভাবিক কালো। স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপে এদের বাস।

ককেশীয়দের মধ্যে পড়ে নর্ডিক, আলপাইন, মেডিটেরানিয়ান।

আলপাইনদের মাথা গোল এবং উচ্চতা খুব বেশী নয়। এদের বসতি চীন, ফ্রান্সের মধ্যভূমি ও ইরানে। মঙ্গোলীয়দের মধ্যে পড়ে এশীয় মঙ্গোলীয়, আমেরিকান ইন্ডিয়ান ও পলিনেশীয়। এদের গায়ের রং পীতবর্ণ থেকে উজ্জ্বল শ্যামলা হয়ে থাকে। এদের চোখ বাদামী এবং চুল কাল, নাক মোটা। এদের বেশীর ভাগই এশিয়ায় বসবাস করে।

মঙ্গোলীয়দের মধ্যে পড়ে এশীয় মঙ্গোলীয়, আমেরিকান ইন্ডিয়ান ও পলিনেশীয়।

নিগ্রোদের মধ্যে পড়ে আফ্রিকান এবং সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের নিগ্রো ও নেগ্রীটোরা। এদের গায়ের রং কালো, চুল পশমী এবং নাক প্রশস্ত। সাধারণত আফ্রিকায় এদের বসবাস।

নিগ্রোদের মধ্যে পড়ে আফ্রিকান এবং সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের নিগ্রো ও নেগ্রীটোরা।

www.swapno.in

অনেক নৃবিজ্ঞানী নরগোষ্ঠীর চতুর্থ একটি শ্রেণীভাগ করেন। এর নাম অস্ট্রালয়েড। অস্ট্রেলীয় আদিবাসী ও জাপানের আইমুদের এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অষ্ট্রালয়েডদের মধ্যে পড়ে অস্ট্রেলীয় আদিবাসী ও জাপানের আইমু।

এবার আসুন আমরা এই জেনে নেই নরগোষ্ঠীর আধুনিক শ্রেণীবিভাগ কি? নরগোষ্ঠীর আধুনিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে তাদেরকে নিম্নলিখিত নয়টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ
যথা ঃ

১। **ইউরোপীয়**
- ক) উত্তর পশ্চিম ইউরোপীয়;
- খ) উত্তর-পূর্ব ইউরোপীয়;
- গ) আলপাইন; এবং
- ঘ) মেডিটেরানিয়ান।

২। **ভারতীয়**
- ক) ইন্ডিক; এবং
- খ) দ্রাবিড়।

৩। **এশীয় ঃ**
- ক) মঙ্গোলীয়;
- খ) উত্তর চীনবাসী;
- গ) তুর্কী;
- ঘ) তিব্বতীয়;
- ঙ) দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়;
- চ) আইনু; এবং
- ছ) লপ্।

৪। **মাইক্রোনেশীয়**

৫। **মেলানেশীয় ঃ**
- ক) পাপুয়ান; এবং
- খ) মেলানেশিয়ান।

৬। **পলিনেশীয় ঃ**
- ক) পলিনেশিয়ান আদিম উপজাতি; এবং
- খ) নব-হাওয়াইয়ান।

৭। **আমেরিকান ঃ**
- ক) উত্তর আমেরিকান
- খ) কেন্দ্রীয় আমেরিকান (ইন্ডিয়ান); এবং
- গ) দক্ষিণ আমেরিকান।

৮। **আফ্রিকান ঃ**
- ক) পূর্ব আফ্রিকান;
- খ) সুদানীয়;

www.swapno.in

গ) পাহাড়ী নিগ্রো; এবং

ঘ) পিগ্‌মি।

৯। **অস্ট্রেলিয়ান;**

ক) মুরাইয়ান ঃ দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার আদিম উপজাতি; এবং

খ) কার্পেন্টারিয়ান ঃ কেন্দ্রীয় ও উত্তর অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠী।

> সাধারণত নরগোষ্ঠী সমূহকে শ্রেণী বিভাগ করবার সময় সাতটি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনাকরা হয়।

এভাবেই নরগোষ্ঠীর একটি আধুনিক শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। পরিশেষে নরগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা বলতে পারি যে, সাধারণত, নরগোষ্ঠীসমূহকে শ্রেণীবিভাগ করবার সময় সাতটি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করা হয়। যেমন;

১। মাথার চুল

২। মাথার আকৃতি

৩। নাকের আকৃতি

৪। চোখের রং ও আকৃতি

৫। মুখের সাধারণ আকৃতি

৬। গায়ের রং

৭। দেহের উচ্চতা

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতিকে চারটি নরগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। যেমন;

১। ককেশীয়

২। মঙ্গোলীয়

৩। নিগ্রীয়

৪। অস্ট্রেলীয়

> একটি জাতি সাধারণত এক বা কতিপয় নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠে।

এসব নরগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত। চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে একই নরগোষ্ঠীর দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ দৈহিক মিল নেই। পৃথিবীতে এত মানুষ। অথচ দু'জন ব্যক্তির বুড়ো আঙ্গুলের ছাপের মধ্যে পুরো মিল পাওয়া যায় না। অতএব মানব প্রজাতিকে কয়টি নরগোষ্ঠীতে ভাগ করা সম্ভব তা বলা কঠিন। তবু নৃবিজ্ঞানীরা কতিপয় সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবজাতিকে প্রধান তিন বা চারটি নরগোষ্ঠীতে ভাগ করেন। সে যা হোক নরগোষ্ঠীর আলোচনায় এ সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব যে, কেমন করে একটি জাতি (Nation) গঠিত হচ্ছে। একটি জাতি সাধারণত, এক বা একাধিক নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠে। কোন জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য,সংস্কৃতি তথা জাতীয়তাবোধ অনুধাবনে নরগোষ্ঠী সম্পর্কিত আলোচনা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনী ১ (Activity : 1) **সময় : ৫ মিনিট**

নৃবিজ্ঞানে মানুষকে "পলিটিপিক" প্রজাতি বলা হয় কেন - ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

www.swapno.in

অনুশীলনী ২ (Activity : 2) **সময় : ৫ মিনিট**

নরগোষ্ঠীর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন :

১।

২।

৩।

৪।

৫।

অনুশীলনী ৩ (Activity : 3) **সময় : ৫ মিনিট**

পৃথিবীর প্রধান ৩টি নরগোষ্ঠীর প্রধান ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখুন

১।

২।

৩।

www.swapno.in

সারাংশ

নরগোষ্ঠী বলতে সাধারণত মানবজাতির এক একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অভিন্ন। নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাদের এসব মতবাদের মধ্যে 'বহু উৎস তত্ত্ব' ও 'একক উৎস তত্ত্ব' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহুউৎস তত্ত্ব অনুযায়ী আধুনিক চারটি প্রধান নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে চারটি ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ বা উৎস থেকে, যেমন নিয়াভাথাল থেকে প্রথমে ক্রো – ম্যাগনন (Cro–Magnon) এবং তারপর ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উদ্ভব, পিকিং মানব থেকে মঙ্গোলয়েড

www.swapno.in

নরগোষ্ঠীর উদ্ভব, রোডেশীয় মানব থেকে নীগ্রো নরগোষ্ঠীর উদ্ভব, জাভা মানব থেকে অষ্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর উদ্ভব। একক উৎস তত্ত্ব অনুযায়ী ভৌগোলিক উপাদান প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, সংকরণ প্রক্রিয়া এবং জৈবিক পরিবর্তনের প্রভাবে এক একটি নৃগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে । সাধারণত, পৃথিবীর মানবজাতিকে তিনটি মুখ্য নরগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়; যথা– ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রোয়েড। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ হতে পৃথিবীর সকল নরগোষ্ঠীকে নয়টি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা– ইউরোপীয়, ইন্ডিয়ান, এশীয়, মাইক্রোনেপ্লিয়ান, মেলানেশিয়ান, পলিনেশিয়ান, আমেরিকান, আফ্রিকান ও অষ্ট্রেলীয়। এসব নরগোষ্ঠীকে আবার কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়। তবে মানবজাতিকে সঠিকভাবে কয়টি নরগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় তা আজও নির্ধারণ করা যায়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। মঙ্গোলয়েড কিসের নাম

ক) মানব জাতির নাম খ) নরগোষ্ঠীর নাম
গ) জাতির নাম ঘ) সংঘের নাম

২। বহু উৎস তত্ত্ব অনুযায়ী কয়টি উৎস থেকে নরগোষ্ঠীসমূহের উদ্ভব হয়েছে?

ক) একটি খ) দু'টি
গ) তিনটি ঘ) চারটি

৩। লিনিয়াসের তত্ত্ব অনুযায়ী এশীয় নরগোষ্ঠীর কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ?

ক) হলুদ, বিষন্ন, অনমননীয়, খ) কালো, শান্ত, অলস
গ) সাদা, আশাবাদী, পিঙ্গল ঘ) লাল, সোজা

www.swapno.in

ককেশীয় নরগোষ্ঠী

পাঠ
৩

জার্মান নৃবিজ্ঞানী ব্লুমেন বার্ক সর্বপ্রথম ককেশীয় শব্দটি ব্যবহার করেন। ককেশীয় হচ্ছে মূলত, শ্বেতকায় বা ইউরোপীয় নরগোষ্ঠী।

বণা

- ককেশীয় নরগোষ্ঠী কি?
- ককেশীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি

১. ককেশীয় নরগোষ্ঠী কাকে বলে জানতে পারবেন।
২. ককেশীয় নরগোষ্ঠীর দৈহিক গঠন প্রণালী জানতে পারবেন।
৩. ককেশীয় নরগোষ্ঠীর আবাসভূমি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৪. ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উপ-বিভাগ বিষয়ে অবগত হতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ

নরগোষ্ঠী বলতে এমন একটি মানবগোষ্ঠীকে বুঝায় যার সদস্যদের মধ্যে কতিপয় অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেসব বংশগতিসূত্রে পরবর্তী প্রজন্মে বর্তায়। একথা বলা হয়েছে যে, একটি নরগোষ্ঠী অপর নরগোষ্ঠী থেকে আলাদা। কারণ পৃথিবীতে এত মানুষ। অথচ দুইজন ব্যক্তির বুড়ো আঙ্গুলের ছাপের মধ্যে পুরো মিল পাওয়া যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু তথা গোটা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বিভিন্ন নরগোষ্ঠী রূপায়ণে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। জলবায়ু ও পরিবেশের দীর্ঘদিনের প্রভাবে মানুষের বাহ্যিক চেহারা ও দেহের গড়নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে, চুল ও গায়ের রং, নাকের গঠনাকৃতি এবং দেহের ওজন ও আকারের পরিবর্তন আসে। জীবন ব্যবস্থার তারতম্যের কারণে নরগোষ্ঠীর উপর এ সবের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সাধারণত, নরগোষ্ঠীসমূহকে শ্রেণীবিভাগ করবার সময় সাতটি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করা হয়; সেগুলি হল ১। মাথার চুল, ২। মাথার আকৃতি, ৩। নাকের আকৃতি, ৪। চোখের মনির রং ও আকৃতি ৫। মুখের সাধারণ আকৃতি, ৬। গায়ের রং, ৭। দেহের উচ্চতার পরিমাপ। এইসব দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানব জাতিকে ৩টি প্রধান ও বৃহৎ নরগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

১। ককেশীয় বা শ্বেতকায়;
২। মঙ্গোলীয় বা পীতাভ এবং
৩। নিগ্রীয় বা কৃষ্ণকায়;

অনেকে এই তিনটি বিভাগের সাথে আরেকটি ভাগকে যোগ করতে চান। এই বিভাগের নাম দেয়া হয়েছে অস্ট্রালয়েড। আসুন, এবার আমরা জেনে নেই ককেশীয় নরগোষ্ঠী কি?

ককেশীয় নরগোষ্ঠী কি?

www.swapno.in

জার্মান নৃবিজ্ঞানী ব্লুমেনবার্ক সর্ব প্রথম ককেশীয় শব্দটি ব্যবহার করেন। ককেশীয় হচ্ছে শ্বেতকায় বা ইউরোপীয় নরগোষ্ঠী। তবে ককেশীয় কথাটিই বহুল প্রচলিত। এদের অধিকাংশ ইউরোপ মহাদেশে বাস করে বলে আজকাল এদের ইউরোপয়েড বা ইউরোপীয় বলা হয়। এদের সবার গায়ের রং যে সাদা বা লাল-সাদা এমন নয়। গায়ের রং লাল-সাদা থেকে উজ্জ্বল বাদামী পর্যন্ত লক্ষণীয়। চোখের রং নীল থেকে বাদামী পর্যন্ত হতে পারে। গায়ে তাদের প্রচুর লোম, ঢেউ খেলানো এবং সোজা বাদামী-লালচে চুল, পাতলা ঠোঁট। ককেশীয়দের নাক তীক্ষ্ম ও উন্নত। বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ককেশীয়রা সর্বোচ্চ নরগোষ্ঠী। এছাড়া, মনে করা হয় যে, ককেশীয়রা সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক-বাহক এবং শাসক ও প্রভুর গুণে গুণান্বিত। যদিও এ ধারণা ইদানিং নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তবুও ইউরোপীয়রা কৃষ্ণকায়দের উপর প্রভুত্ব ও কতৃত্ব বজায় রেখেছে। ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উপবিভাগগুলি হলো নর্ডিক, আলপাইন, মেডিটেরানিয়ান এবং ভারতের আটরা। মনে রাখা উচিত যে, গায়ের রঙ, (যা মানুষে–মানুষে প্রভেদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য) সাদা হওয়ার কারণে ককেশীয় নরগোষ্ঠীকে শ্বেতকায় জনগোষ্ঠী বলেই গণ্য করা হয়। তাদের বাসভূমি ইউরোপ, উত্তর ও মধ্য এশিয়া, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ও আধুনিককালে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া। উল্লিখিত শেষোক্ত দুটি মহাদেশে শ্বেতকায়রা পরে এসে আদিবাসীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এসব দেশের অধিবাসীতে পরিণত হয়েছে। এবার আমরা জেনে নেই ককেশীয় নরগোষ্ঠীর মুল জন্মস্থান কোথায় ছিল।

মনে রাখা উচিত যে, গায়ের রঙ, (যা মানুষে– মানুষে প্রভেদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য) হওয়ার কারণে সাদা ককেশীয় নরগোষ্ঠীকে শ্বেতকায় জনগোষ্ঠী বলে গণ্য করা হয়।

ককেশীয় নরগোষ্ঠীর বাসভূমি ইউরোপ, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ও আধুনিককালে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া।

চিত্র ১২ ঃ ককেশীয়

অনেকে মনে করেন ককেশীয় নরগোষ্ঠীর জন্মস্থান উত্তর আফ্রিকায়। কেননা এককালে এখানকার অনুকূল আবহাওয়া, খাদ্যের প্রাচুর্য, বিস্তৃত জায়গা এবং এখান থেকে ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ায় যাওয়া আসার পথ সুগম ছিল। আফ্রিকায় প্রাপ্ত নরকঙ্কালে ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর ছাপ পাওয়া গেছে। মৌরিতানিয়ায় ফর্সা, লম্বা, নীল চোখ বিশিষ্ট একটি উপজাতি দেখা গিয়েছিল।

অনেকে মনে করেন ইউরোপ থেকে উত্তর আফ্রিকায় ককেশীয়রা গিয়েছিল।

আবার অনেকে মনে করেন ইউরোপ থেকে উত্তর আফ্রিকায় ককেশীয়রা গিয়েছিল। এখানে প্রাপ্ত প্রাচীন ও নতুন পাথরযুগের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনের জন্য একথা মনে করা হয়। মূলত, বলা যায় যে, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার উর্বর অঞ্চলই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্মভূমি-এখান থেকেই ককেশীয় নরগোষ্ঠী বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অঞ্চলভেদে তাদের মধ্যেও দৈহিক বিভিন্নতা দেখা দিয়েছিল।

ককেশীয় নরগোষ্ঠী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ।

সে যা হোক, বস্তুত, পৃথিবীর সব অঞ্চলে মানুষের যাতায়াত ও ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমেই এসব নরগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। বিশুদ্ধ নরগোষ্ঠী বলতে কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক ককেশীয়রা একে অপরের মতো নয় বরং তাদেরকে ভূমধ্যসাগরীয়, নর্ডিক, দিনারিক, আলপীয় প্রভৃতি উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়েছে ও যদিও ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উপবিভাগ নিয়ে বিশেষ মতপার্থক্য নেই। একথা মনে করা হয় যে, ককেশীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগের মধ্যে ক্রো-ম্যাগনন মানবের রক্ত ধারা প্রবহমান।

ককেশীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগের মধ্যে ক্রো-ম্যাগনন মানবের রক্ত ধারা প্রবাহমান।

বিদ্যমান ইউরোপীয় নরগোষ্ঠী সম্পর্কিত সাম্প্রতিক পরীক্ষায় উপরোক্ত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এখানে একথাটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ককেশীয় নরগোষ্ঠী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ।

নৃবিজ্ঞানী ব্লুমেনবার্ক ছিলেন মানুষের খুলি বিশেষজ্ঞ। তাঁর সংগৃহীত খুলির মধ্যে জর্জিয়ায় প্রাপ্ত স্ত্রীজাতীয় একটি চমৎকার খুলি ছিল। খুলিটিকে তিনি নিগ্রো এবং মঙ্গোলীয় টাইপের খুলির মাঝামাঝি টাইপের খুলি বলে অনুমান করেন। তবে তাঁর মতে এই মধ্যবর্তী খুলিটি অন্য দুই

www.swapno.in

টাইপের খুলির চেয়ে উন্নততর। ব্লুমেন বার্ক এই উন্নততর টাইপের খুলির নাম দেন 'ককেশীয়'। নৃবিজ্ঞানী জ্যাকব ও স্টার্নের মতে এই টাইপটিকে 'শ্বেতকায়' নামে অভিহিত করা ঠিক নয়। কারণ, এই নরগোষ্ঠীর সদস্যদের গায়ের রঙে ফ্যাকাসে সাদা থেকে গাঢ় বাদামি পর্যন্ত রং এর পার্থক্য আছে। তবে মোটামুটি ভাবে, এদের নাক সরু এবং ছুঁচালো, ঠোঁট পাতলা। কিন্তু উচ্চতায় ও কপালাঙ্কে বেশ বৈচিত্র্য আছে। তাহলে বলা যায় যে, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো শ্রেণীর মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উন্নতীতে এই খুলিটিকে ককেশীয় নামে অভিহিত করা হয়। ককেশীয়রা সাধারণত, লম্বা মাথা ও গোল মাথা নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। লম্বা মাথা বিশিষ্ট ককেশীয়দের উপবিভাগ হচ্ছে নর্ডিক, ভূমধ্যসাগরীয় ও দ্রাবিড়, এবং গোলমাথা বিশিষ্ট ককেশীয়দের উপবিভাগ হচ্ছে আলপাইন, দিনারীয় ও আর্মানীয়। ইউরোপের বাইরে বসবাসকারী ককেশীয়রা হচ্ছে পূর্ব বাল্টিক, পূর্ব ভারতীয় ও পলিনেশীয়। অতএব বলা যায়, আধুনিক ককেশীয় নরগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক।

> মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো নরগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উন্নতঁর মাথার খুলিটিকে ককেশীয় নামে অভিহিত করা হয়।

> ইউরোপের বাইরে বসবাকারী ককেশীয়রা হচ্ছে পূর্ব-বাল্টিক, পূর্ব ভারতীয় ও পলিনেশীয়।

ককেশীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগ (Subdivision of caucasoid)

একথা শুরুতেই বলা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ কোনও নরগোষ্ঠী নেই এবং কখনও ছিল না। বস্তুত, প্রতিটি নরগোষ্ঠীর ভেতর বাহির থেকে জিনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে; বহিরাগত জিনকে গ্রহণ করেই প্রতিটি নরগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। জিন হচ্ছে মানব শরীরের জীবকোষ গঠনে সাহায্য করে। তাহলে এটা বলা যায় যে, পাঁচ কি দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আধুনিক জনগোষ্ঠীর মতই সংকর ছিল। এখানে আরোও একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন নরগোষ্ঠীই অপর নরগোষ্ঠী থেকে শ্রেষ্ঠ নয়, আগেও ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না। বিশুদ্ধ নরগোষ্ঠীর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। প্রায় প্রতিটি নরগোষ্ঠীর ভেতরই বিভিন্ন উপবিভাগ রয়েছে। কারণ একটি নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য নরগোষ্ঠীগত বিভাজনে কোন গুরুত্ব বহন করে না। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিন্নতা জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি জাতির ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একাধিক নরগোষ্ঠীর বাস করতে পারে। একই জাতির লোকেরা বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। অতএব কোনও নরগোষ্ঠীই স্থবির কিংবা অনড় নয়। তারা নিরন্তর মিশ্র দৈহিক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে একাধিক প্রান্তীক (marginal) জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে চলেছে। নৃবিজ্ঞানী কুন, গার্ণ ও বার্ডসেলের কথায় "নরগোষ্ঠী অপরিবর্তনীয় ব্যাপার নয়; বরং নিত্য নতুন নরগোষ্ঠী সৃষ্টি হচ্ছে।" এই কথাটির যথার্থতা নৃবিজ্ঞানী জ্যাকব ও স্টার্ণ স্বীকার করেছেন। ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উপ-বিভাগ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে ককেশীয় নরগোষ্ঠীর আবাসভূমি এবং দৈহিক গঠন প্রণালী অবগত হতে হবে।

> একটি নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জন-সমষ্টির মধ্যে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক একতার কোনও ইঙ্গিত নৃগোষ্ঠীগত শ্রেণীবিভাগ বহন করে না।

> একটি জাতির সদস্যরা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীতে বিভক্ত খাকতে পারে।

১. **প্রধান আবাসভূমি** ঃ ককেশীয়দের বাসস্থান প্রধানত ইউরোপ, আমেরিক, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার কিছু অঞ্চল ।

২. **মাথার আকৃতি** ঃ ককেশীয়দের মাথার আকৃতি প্রধানত লম্বা। তবে এদের মধ্যে মধ্যমাকৃতির এবং চওড়া মাথার অস্তিত্ব নেই এমনটি বলা যাবে না।

৩. **মুখাকৃতি** ঃ ককেশীয় নরগোষ্ঠীর মুখের আকৃতি প্রধানত সরু কিংবা লম্বা ।

৪. **নাক** ঃ ককেশীয়দের নাক প্রধানত, উন্নত, চিকন, লম্বা এবং সরু। নাকের উপরিভাগ পাতলা।

৫. **চোখ-ঠোঁট-কান** ঃ ককেশীয়দের চোখের রং হালকা থেকে কালো বাদামি। চোখের মনি নীল। ঠোঁট প্রধানত পাতলা। কান লম্বা এবং প্রশস্তে মাঝারি ধরনের।

www.swapno.in

৬. **গায়ের রং ঃ** ককেশীয়দের অনেকেরই গায়ের রং সাদা বা সাদা লালচে। তবে বাদামী এবং কাল বাদামী রং এর ককেশীয় নরগোষ্ঠীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।

চিত্র ১৩ ঃ বিভিন্ন প্রকার নাক- সরু, মধ্যম ও চওড়া

৭. **চুল-লোমকূপ ঃ** ককেশীয়দের মাথার চুলের রং বাদামী বা সোনালী। মাথার চুল চিকন ও মোটা দুই রকমই হয়ে থাকে। চুল খাড়া থেকে কোঁকড়ানো পর্যন্তও লক্ষণীয়। এদের মাথার চুল, মুখে দাড়ি এবং গায়ে লোমের প্রাচুর্য রয়েছে।

৮. **উচ্চতা এব দৈহিক গড়ন ঃ** ককেশয়েডদের মধ্যে খর্বাকায় লোক প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ এরা দীর্ঘাঙ্গের অধিকারী। তবে উচ্চতায় অনেকেই মধ্যম। বাহু মধ্যমাকৃতির, পা দীর্ঘাকৃতির। ককেশীয়দের দেহের গঠন বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী। এরা উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী।

আসুন, এবার আমরা ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উপবিভাগগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জানার চেষ্টা করি।

ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উপবিভাগ

ককেশীয় নরগোষ্ঠীকে কয়টি উপবিভাগে ভাগ করা যাবে তা নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের ভেতর মতভেদ আছে। ১৮৯৯ সালে নৃবিজ্ঞানী রিপলে (১) নার্ডিক, আলপাইন ও ভূমধ্যসাগরীয় উপবিভাগের কথা বলেন। ১৯৪৫ সালে ক্রোগম্যান(২) আর্মেনয়েড ও দীনারীয় উপবিভাগ দুটিকে রিপলের উপবিভাগের সঙ্গে যুক্ত করেন। একই বছর (১৯৪৫) আস্‌লে মন্টেগু (৩) ককেশয়েডদের আটটি ভাগে ভাগ করেন যথা—পূর্ব ভারতীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, আলপাইন, আর্মেনয়েড, নার্ডিক, দিনারীয়, পূর্ববাল্টিক এবং পলিনেশীয়।

মাথার আকৃতির ভিত্তিতে ককেশীয়দের দু'ভাগে ভাগ করা যায় যথা
১। লম্বা মাথা
২। গোল মাথা

সত্যি কথা বলতে কি, ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উপবিভাগ নিয়ে যত মতানৈক্য আছে, অন্যান্য নরগোষ্ঠীর উপবিভাগ নিয়ে তত মতানৈক্য নেই। মাথার আকৃতির ভিত্তিতে ককেশীয় নরগোষ্ঠীকে সাধারনত দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা - ১। লম্বা মাথা এবং , ২। গোল মাথা।

মনে রাখতে হবে যে, ককেশীয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে যাদের মাথা লম্বা তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নার্ডিক, মেডিটেরানীয়ান, বা ভূমধ্যসাগরীয় এবং দ্রাবিড় আর যাদের মাথা

www.swapno.in

গোল তাদের মধ্যে মধ্যে যাদের মাতা লম্বা তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ আল পাইন, দিনারীয়, ও আর্মানীয় ।

ককেশীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগ নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো ঃ লম্বা মাথা বিশিষ্ট ককেশয়িদের উপবিভাগগুলি হচ্ছে ঃ

অস্ট্রালয়েডদের সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার বলেছেন যে, অস্ট্রালয়েডদের মধ্যে নিগ্রো বৈশিষ্ট্যই বেশী তবে কিছু বৈশিষ্ট্য ককেশীয়দের সঙ্গে মিলে।

তিনটি হচ্ছে নর্ডিক, ভূমধ্যসাগরীয় ও দ্রাবিড়।

গোল মাথা বিশিষ্ট ককেশীয় উপবিভাগ হচ্ছে আলপাইন, দিনারীয় ও আর্মানীয়।

১. **নার্ডিক** ঃ এটা ককেশীয় নরগোষ্ঠীর একটি উপবিভাগ। এদের মাথা লম্বা, গায়ের রঙ রক্তাভ সাদা, চুল হলুদ, লাল অথবা হালকা বাদামী, মুখ মন্ডল লম্বা, চিবুক উন্নত; চোখের তারা নীল অথবা ধূসর; নাক চিকন; দেহের উচ্চতা লম্বা। এরা প্রধানত উত্তর ইউরোপের অধিবাসী। নরওয়ে ও সুইডেনের শতকরা ৮০ ভাগ লোক নর্ডিক নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া জার্মানীর শতকরা ২০ ভাগ লোক নর্ডিক। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও নর্ডিক নরগোষ্ঠীর লোক বাস করে। ভারত উপমহাদেশেও কিছু কিছু নর্ডিক নরগোষ্ঠীর মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। নর্ডিক নরগোষ্ঠীর প্রধান বাসভূমি সুইডেন। সুইডিসদের মধ্যে শতকরা সাতজনের মাথা মাঝারি আকারের, আর শতকরা ৩০ জনের মাথা লম্বা। অধিকাংশ সুইডিসের উচ্চতা মাঝারি, চোখ হালকা, চুল বাদামী এবং মাথা গোল। অনেকেই নর্ডিকদের আর্য বলে উল্লেখ করলেও নৃতত্ত্ববিদরা তা স্বীকার করেন না। কারণ আর্য শব্দটা মূলত একটা ভাষা–পরিবারকেও (Language Family) বোঝায়। আর এ ভাষায় যারাই কথা বলে দৈহিক ধরনের দিক থেকে তারা সবাই নর্ডিক নয়। বাঙালীরা আর্য ভাষায় কথা বলে। কিন্তু তারা কোনক্রমেই নিজেদের নর্ডিক বলে দাবী করতে পারে না। তাই আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা ভাষা–পরিবার ও নরগোষ্ঠীকে সমার্থক মনে করেন না। তবে এককথা ঠিক যে, কোন ভাষা প্রথমে কোন একটি জাতির মধ্যে বিকশিত যা পরবর্তীকালে একাধিক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে ।

২. **মেডিটেরানিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয়** ঃ এদের মাথা সাধারণত লম্বা, কোন কোন ক্ষেত্রে মাঝারি, মুখমন্ডল লম্বা অথবা ডিম্বাকৃতি, নাক চিকন, গায়ের রঙ পিঙ্গল সাদা, চুল কালো, উচ্চতা মাঝারি। পশ্চিম আয়ারল্যান্ড, স্পেন, ইউরোপের দক্ষিণভাগ, উত্তর আফ্রিকা ও ভারত উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর আবাসভূমি।

৩. **দ্রাবিড়** ঃ মাথা লম্বা কিন্তু নাক চওড়া; চুল বাদামী কালো; গায়ের রঙ কালো থেকে বাদামী; উচ্চতায় খাটো এই নরগোষ্ঠী প্রধানত দক্ষিণ ভারতে বাস করে। অনেক নৃতাত্ত্বিক মনে করেন, যাদের বলা হয় দ্রাবিড় তারা আসলে সংকর। এদের মধ্যে মিলে আছে একাধিক নরগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, দ্রাবিড় কথাটাও ভাষাতত্ত্বে ব্যবহার করা হয়। ভাষাতত্ত্ব থেকেই কথাটা নৃতত্ত্বে এসেছে। কিন্তু যারাই দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে তারা সবাই একই নরগোষ্ঠীভুক্ত নয়। ওঁরাওরা দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে। কিন্তু অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিক তাদেরকে অপর নরগোষ্ঠীভুক্ত করার পক্ষপাতী। অনেকের মতে দ্রাবিড়রা মূলত ভূমধ্যসাগরীয়। এদের সাথে মিশ্রণ ঘটেছে নিগ্রবটু ও অস্ট্রালয়েড প্রভাব। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দ্রাবিড়রা মূলত ভূমধ্যসাগরীয়। এদের সাথে নিগ্রবুট ও অস্ট্রেলীয়দের প্রভাব মিলিত হয়েছে। এজন্যে দ্রাবিড়রা আসলে সংকর। যে কোন জনগোষ্ঠী দ্রাবিড় ভাষায় কথা বললেই তাকে দ্রাবিড় বলে গন্য করা হয় না। গোল মাথা বিশিষ্ট ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উপবিভাগগুলি হচ্ছে ঃ

আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা ভাষা-পরিবার ও নরগোষ্ঠীকে সমার্থক মনে করেন না।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দ্রাবিড়রা মূলত ভূমধ্যসাগরীয়। এদের সাথে নিগবটু ও অস্ট্রেলীয়দের প্রভাব মিলিত হয়েছে। এজন্য দ্রাবিড়রা সংকর।

১। **আলপাইন** ঃ মাথা গোল, নাক চিকন, চুল হালকা বাদামী থেকে কালো, গায়ের রং হালকা, পিঙ্গল, দেহের উচ্চতা মাঝারি। মধ্য ফ্রান্স, চীন, তুর্কীস্থান, ইরানের কিছু এলাকায় এদের বাস। অনেকে, মনে করেন বাঙালীদের মধ্যে ও ভারতের গুজরাট অঞ্চলের মানুষের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য আলপাইন উপাদান বিদ্যমান।

২। **দিনারিক বা দিনারীয়** ঃ এদের মাথা গোল হলেও আলপাইনদের মত গোল নয়। দিনারিক মানবগোষ্ঠীর নাক সরু, চোখের মনি কালো; গায়ের রং আলপাইনদের তুলনায় ময়লা; উচ্চতায়

www.swapno.in

লম্বা। উক্ত নরগোষ্ঠীর মানুষ প্রধানত আল্পস পর্বতের পূর্ব দিকে, সুইজারল্যান্ডে, আলবেনিয়া, এশিয়া-মাইনর ও সিরিয়াতে বাস করে। ভারত উপমহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যেও দিনারীয় নরগোষ্ঠীর লোক দেখতে পাওয়া যায়।

৩। আর্মেনয়েড বা আর্মানীয় ঃ এদের মাথা গোল; নাক সরু ও খুব খাড়া; গায়ের রং ফরসা; উচ্চতায় খর্ব থেকে মাঝারি আকৃতির। এদের প্রধান বাসভূমি এশিয়া মাইনর। বোম্বাইয়ের পারসিকদের মধ্যে আর্মানীয়দের দেখতে পাওয়া যায়। ককেশীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগ আলোচনা করা হলো। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উপবিভাগ নিয়ে যত মতানৈক্য আছে অন্যান্য নরগোষ্ঠীর উপ-বিভাগ নিয়ে ততটা নেই। এখানে অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠী (যাদের প্রত্নককেশীয় বলা হয়) তাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। অতএব আসুন এবার আমরা জেনে নেই অস্ট্রালয়েড বা প্রত্নককেশীয় নরগোষ্ঠী কাকে বলে।

সবসময়ই আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান নরগোষ্ঠী তিনটি যথা - ককেশীয়, মঙ্গোলীয় এবং নিগ্রো। এ কারণ যে অর্থে ককেশীয়, মঙ্গোলীয় এবং নিগ্রো এক একটি পৃথক নরগোষ্ঠী, অস্ট্রালয়েডকে সেই অর্থে পৃথক একটি নরগোষ্ঠী বলে গণ্য করা যায় না। অস্ট্রালয়েডদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কিন নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার বলেছেন যে, অস্ট্রালয়েডদের মধ্যে নিগ্রো বৈশিষ্ট্যই বেশী, তবে কিছু বৈশিষ্ট্য ককেশীয়দের সঙ্গে মিলে। যদি অস্ট্রালয়েডদের একটি পৃথক নরগোষ্ঠী বলা হয় তাহলে ভেদ্দা পলিনেশীয়ান এবং আইমুদেরকেও ভিন্ন ভিন্ন নরগোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করতে হয়। আমরা এ বির্তকে না গিয়ে সহজে বলতে পরি যে, অস্ট্রালয়েডদের গায়ের রং কালো–বাদামী। এদের মাথার চুল ঢেউ–খেলানো। তাদের গায়ে লোমের প্রাচুর্য বিদ্যামান। এসব অনেকটা ককেশীয় নরগোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলা চলে। অস্ট্রালয়েডদের মাথা লম্বা, তবে নাক প্রশস্ত এবং তারা উচ্চতায় মধ্যমাকৃতির।

অস্ট্রালয়েডদের আবার চারভাগে ভাগ করা হয়ঃ যথা-

ক) অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী

খ) সিংহলের ভেদ্দা উপজাতি

গ) প্রাক–দ্রাবিড়-প্রোটো অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoaid)

ঘ) জাপানের আইমু

চিত্র ১৪ ঃ অষ্ট্রেলিয়

অনুশীলন ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

ককেশীয় নরগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন ঃ

www.swapno.in

সারাংশ ঃ

ককেশীয়দের বাসস্থান প্রধানত ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, এশিয়া মাইনর ও ভারতীয় উপমহাদেশ। বর্তমানে ককেশীয়দের সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশভাগ। এদের মোট সংখ্যা প্রায় ১,২০০ মিলিয়ন। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গায়ের রঙ সাদা থেকে কালো বাদামী। মাথার চুল সোজা থেকে কোঁকড়ানো। গায়ে প্রচুর লোম। ককেশীয়দের নাক উন্নত ও চিকন। ঠোঁট পাতলা। ককেশয়েডদের সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়; (ক) লম্বা মাথা ও (খ) গোল মাথা। লম্বা মাথার ভিত্তিতে এবং তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্তঃ যথা - নর্ডিক, মেডিটেরানীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় ও দ্রাবিড়। আর গোল মাথার উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ আলপাইন, দিনারীয় ও আর্মানীয় ।

সম্প্রতি ককেশীয়রা ইউরোপ থেকে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছে। ককেশীয় নরগোষ্ঠী উন্নত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কে প্রথম ককেশীয় শব্দটা ব্যবহার করেন?

ক) ব্লুমেন বার্ক — খ) মর্গান

গ) ক্রোবার — ঘ) ডারউইন

২। অস্ট্রালয়েডদেরকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) দুই — খ) তিন

গ) চার — ঘ) পাঁচ

৩। ককেশীয় নরগোষ্ঠীর চোখের রং কি?

ক) সাদা থেকে নীল — খ) বাদামী থেকে লাল

গ) কালো — ঘ) নীল থেকে বাদামী

৪। ককেশীয় নরগোষ্ঠী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার কত ভাগ?

www.swapno.in

ক) ৪০ ভাগ খ) ৫০ ভাগ
গ) ৩০ ভাগ ঘ) ৬০ ভাগ

www.swapno.in

www.swapno.in

মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী

পাঠ
৪

মূল ধারণা

- মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী কাকে বলে ?
- মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগ
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি

১. মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী কি তা জানতে পারবেন।

২. মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী কাকে বলে? এবং মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগ

সংখ্যার দিক দিয়ে ককেশীয় নরগোষ্ঠীর পরেই মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর স্থান। তিব্বতকে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর কেন্দ্রস্থল বলা হয়। মাটি খুঁড়ে সে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে ধারণা করা হয় যে, প্রাচীনকালে এখানে ছিল সমভূমি, মাঝারি উষ্ণ আবহাওয়া ও জীবনযাত্রার অনুকূল বনভূমি। প্লাইস্টোসিন যুগে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী এখানে পরিণতি লাভ করেছিল। এরপর ধীরে ধীরে ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে একদল অধিবাসী নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে নিতে এখনকার রুক্ষ তিব্বতীতে পরিণত হয়েছে। অন্যেরা আস্তে আস্তে পূর্বদিকে সরে এসেছে। তিব্বতে পাথর যুগ ও ধাতব যুগের প্রমাণ এখনো নানা জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এখনো উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলের পশুপালকেরা ধাতুর ব্যবহার জানা সত্ত্বেও পাথরের পাত্র ব্যবহার করছে। ভারতের নর্মদা নদীর তীর, মীর্জাপুর ও ইরাবতী, অঞ্চলে পুরনো পাথর যুগের প্রচুর প্রমাণ থেকে ধারণা করা হয় যে, এই পথ দিয়ে মঙ্গোলীয় মানুষ ইন্দো-চীনে পৌঁছেছে। এরা ছাড়া আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ান ও এস্কিমোদের মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তভুর্ক্ত করা হয়। অনেকে মনে করেন যে, মঙ্গোলীয়, ককেশীয় ও অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর মিশ্রণের ফলে এশিয়ার কোন এক অঞ্চলে রেড-ইন্ডিয়ানদের উদ্ভব হয়েছিল। তারপর এরা যেকোন তাগিদেই হোক না কেন, আমেরিকায় গিয়েছিল। রেড ইন্ডিয়ানরা মঙ্গোলীয় ও ককেশীয় নরগোষ্ঠীর মিশ্রণে সৃষ্ট একটি উপজাতি জনগোষ্ঠী। আসুন, এবার আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বাসভূমি, দৈহিক গঠন প্রণালী এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনে নেই।

> সংখ্যার দিক দিয়ে ককেশীয় নরগোষ্ঠীর পরই মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর স্থান।

> আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ান ও এস্কিমোদের মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

> রেড ইন্ডিয়ানরা মঙ্গোলীয় ও ককেশীয় নরগোষ্ঠীর মিশ্রণে সৃষ্ট একটি উপজাতি জনগোষ্ঠী।

www.swapno.in

সাধারণত মঙ্গোলীয়দের গায়ের রঙ হলুদ বলে এই নরগোষ্ঠী হলুদ বা পীতকায় নামে পরিচিত।

বাসভূমি ঃ মঙ্গোলীয়দের বাসভূমি প্রধানত তিব্বত, দক্ষিণ হিমালয় অঞ্চল, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, চীন, মালয়েশিয়া, বার্মা, ভূটান, নেপাল, জাপান, আন্দামান–নিকোবর, পূর্ব রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চল।

চিত্র ১৫ ঃ মঙ্গোলীয়

চুল- কালো, সোজা;

দাঁড়ি – নেই, কদাচিৎ দেখা যায়।

রঙ – হালকা হলুদ, কোথাও ককেশীয় প্রভাব;

গালের হাড় – কোথাও খুব স্পষ্ট, কোথাও সামান্য স্পষ্ট;

নাক – সাধারণত ছোট ও চ্যাপ্টা;

চোখ – বাদামী, তেরচা, চোখের উপর চামড়ার ভাঁজ;

উচ্চতা – সাধারণত বেঁটে, তবে লম্বাও দেখা যায়;

ঠোঁট – পাতলা, মোটা

ভাষা – এক বর্ণভিত্তিক, অস্ট্রোলেশিয়;

চিত্র ১৬ ঃ এপিক ক্যানথিক ফোল্ড ঃ মাঝের চোখে কোন ভাঁজ নেই মঙ্গলীয়দের মতো। অন্য চোখগুলোতে মঙ্গলীয় মানব বিভাগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এপিক্যানথিক ফোল্ড দেখানো হয়েছে।

মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বাসভূমি হচ্ছে এশিয়ার বিস্তীর্ণ

মঙ্গোলীয়দের প্রায় অর্ধেক রয়েছে চীনে।

সংস্কৃতি – বর্বর দশার বিভিন্ন পর্যায়ে শিকার, মাছ ধরা, সাধারণ কৃষিকাজ, তাঁতের কাজ, ধাতুর কাজ, মাটির কাজ, চামড়ার কাজ, ব্যবসা, শিল্প, ভাস্কর্য এসবই ছিল মঙ্গোলীয়দের সংস্কৃতি। এছাড়া, সমৃদ্ধ মৌখিক লোক-সাহিত্যও ছিল তাদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

ধর্ম – আত্মাপূজা (সর্বপ্রাণবাদ) ভূতপ্রেতের পূজা, নরবলি, যাদু-মন্ত্র-তন্ত্র, হিন্দু, ইসলাম খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি।

মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর একটি সাধারণ পরিচিতি দিতে হলে উল্লেখ করা যায় যে, মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বাসভূমি হচ্ছে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর সংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর

www.swapno.in

বাংলাদেশের চাকমা, গারো ও হাজং উপজাতি জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় মনে করা হয়।

মানবধারার প্রায় অর্ধেক, এদের সংখ্যা প্রায় ১,৫০০ মিলিয়ন। আবার সমগ্র মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীভুক্ত লোক সংখ্যার প্রায় অর্ধেক রয়েছে চীনে। এছাড়া, বার্মা, ভিয়েতনাম, আফ্রিকার মাদাগাস্কার দ্বীপের অধিবাসী, মেরু অঞ্চলের এসকিমো ও আমেরিকার রেপ-ইন্ডিয়ানরা এই মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের চাকমা, গারো ও হাজং উপজাতি জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ- যথা—

ক) উত্তর মঙ্গোলীয় — তারা এশীয় মহাদেশে উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী

খ) দক্ষিণ মঙ্গোলীয় — এরা প্রধানতঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রয়েছে।

গ) আমেরিকান ইন্ডিয়ান — এরা আমেরিকায় রয়েছে।

মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর চোখের পাতায় বিশেষ ধরনের ভাঁজ থাকে, যাকে বলে এপিক্যানথিক ফোল্ড।

মঙ্গোলীয়দের গায়ের রঙ পীতাভ অথবা পীতাভ বাদামী।

মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এবার বলতে পারি যে, মঙ্গোলীয়দের চুল সোজা; মাথার আকৃতি সাধারণত গোল; নাক মধ্যমাকৃতি। তবে নিগ্রোদের মত মাংসল নয়। চোখ ছোট এবং চোখের উপরের পাতা সামনের দিকে ঝুলে থাকে। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর চোখের পাতায় বিশে ধরনের ভাঁজ থাকে, যাকে বলে এপিক্যানথিক ফোল্ড। মঙ্গোলীয়দের মুখকে দেখে মনে হয় সমতল। কারণ নাকের গোড়া অক্ষিকোটর থেকে যথেষ্ট উঁচু নয় এবং কপোল উঁচু। মুখে দাড়ি-গোঁফ থাকে না বললেই হয়; দাঁত মধ্যমাকৃতি। গায়ের রঙ পীতাভ অথবা পীতাভ বাদামী।

আসুন, এবার আমরা মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগ সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেই।

মঙ্গোলীয় উপবিভাগুলোর ভেতর দুটি বিশেষত্ব দেখা যায়ঃ একটি মুখের চেপ্টা আকৃতির পরিবর্তন, অপরটি চোখের এ্যাপিক্যানথিক ভাঁজের ক্রমশ বিলুপ্তি।

মঙ্গোলীয়দের উপবিভাগগুলির মধ্যে দু'টি বিশেষত্ব দেখা যায়; সেটা হচ্ছে মুখের চেপ্টা আকৃতির ক্রম পরিবর্তন এবং চোখের এ্যাপিক্যানথিক ভাঁজের পর্যায়ক্রমিক বিলুপ্তি। বস্তুত, উত্তর এশিয়া ও উত্তর চীনের ক্লাসিক মঙ্গোলীয়দের একত্রিত করে নৃবিজ্ঞানীরা নব্য এশিয়াটিক নাম দিয়ে দিয়েছেন। নব্য এশিয়াটিকদের মধ্যে আছে -

ক) উত্তর-চৈনিক;

খ) কোরীয়;

গ) জাপানী;

সাধারণত মনে করা হয় যে, উত্তর-চৈনিক, কোরীয় ও জাপানীদের মধ্যে মৌলিক দৈহিক সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্যান্য উপবিভাগগুলি হচ্ছে যথাক্রমে —

ক) দক্ষিণ - এশিয়াটিক মঙ্গোলীয়;

খ) তিব্বতী - ইন্দোনেশিয়ান মঙ্গোলীয়;

গ) মালয় - এবং ইন্দোনেশিয়ান;

কোন কোন নৃবিজ্ঞানী মঙ্গোলীয়দের তিনভাগে ভাগ করেছেন;

১। এশীয় মঙ্গোলয়েড,

২। ওসেনীয় মঙ্গোলয়েড;

৩। আমেরিকান ইন্ডিয়ান।

আমেরিকান ইন্ডিয়ানদেরও মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী বলে গণ্য করা হয়। ইন্ডিয়ানরা খুব সম্ভব পুরাতন পাথর যুগে চুকচি উপদ্বীপ, ইলিউশি আন দ্বীপপুঞ্জ ও আলাস্কা হয়ে আমেরিকায় প্রবেশ করেছিল। উল্লেখ্য দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের চেয়ে উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে মঙ্গোলীয় ছাপ বেশী। বস্তুত আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের মুখ মন্ডল চওড়া ও বড়; নাক সুশ্রী এবং টিকালো। নৃবিজ্ঞানী কুন, গার্ন ও বার্ডসেল পশ্চিম মধ্য এশিয়ার লোকদের তুর্কী আখ্যা দিয়েছেন। এরা মূলত মঙ্গোলীয় ও ককেশীয়দের অন্তর্বর্তী একটি টাইপ।

মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর উপবিভাগ সম্পর্কে আরো উল্লেখ বলা পারে যে, অনেক নৃবিজ্ঞানী মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীকে সাধারণত চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

www.swapno.in

মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ক) উত্তর মঙ্গোলীয়,
খ) দক্ষিণ মঙ্গোলীয়
গ) আমেরিকান ইন্ডিয়ান।

গায়ের রং বিচার করে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীকে অনেকটা ককেশীয় এবং নিগ্রোদের মাঝামাঝি ধরে নেওয়া যেতে পারে।

১) উত্তরের মঙ্গোলীয়;
২) দক্ষিণের মঙ্গোলীয়;
৩) দ্বীপমালার মঙ্গোলীয়;
৪) আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান;

মূলত, উত্তরের মঙ্গোলীয়দের মধ্যে পড়ে এসকিমো, সাইবেরিয়ার প্রাচীন অধিবাসী ও আরো অনেকে। আমাদের প্রতিবেশী তিব্বত ও বার্মার লোকদের দক্ষিণের মঙ্গোলীয়দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বীপমালার মঙ্গোলীয়দের মধ্যে পড়ে মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্যরা। আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ানরা সাধারণভাবে পূর্ব-এশিয়ার অধিবাসী।

কোন কোন নৃবিজ্ঞানী মঙ্গোলীয়দের তিনভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে ঃ

১। এশীয় মঙ্গোলয়েড;
২। ওমেনীয় মঙ্গোলয়েড;
৩। আমেরিকান ইন্ডিয়ান;

পলিনেশীয়রা মূলত ককেশীয় ও মঙ্গোলয়েডদের মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়ে। এভাবেই মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী পৃথিবীর অন্যতম উন্নত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ।

এবার আমরা মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর আবাসভূমি এবং এবং দৈহিক গঠন প্রণালী পৃথকভাবে আলোচনা করবো। আসুন, আমরা জেনে নেই মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর আবাসভূমি এবং দৈহিক গঠন প্রণালী কোথায় ও কিরূপ।

১. **প্রধান আবাসভূমি ঃ** মঙ্গোলীয়দের প্রধান আবাসভূমি হচ্ছে মধ্য, উত্তর এবং পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।
২. **মাথার আকৃতি ঃ** মঙ্গোলীয়দের মাথার আকৃতি ককেশীয়দের তুলনায় চওড়া বা গোল। তবে আমেরিকান মঙ্গোলীয়দের (আমেরিকান ইন্ডিয়ান) মাথা কিছুটা লম্বাকৃতির।

ক খ

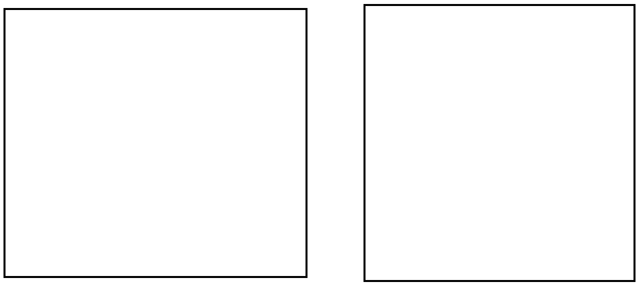

চিত্র ১৭ ঃ গোল মাথা ও লম্বা মাথা

৩. **মুখাকৃতি ঃ** মঙ্গোলীয়দের মুখ ককেশীয়দের তুলনায় চওড়া। এদের গাল মোটা চামড়ায় আবৃত। মঙ্গোলীয়দের মুখ চওড়া, গোলাকৃতি এবং ভাসা–ভাসা সমতল।
৪. **নাক ঃ** মঙ্গোলীয়দের নাক ককেশয়েডদের নাকের তুলনায় কিছুটা ক্ষুদ্রাকৃতির, মোটা এবং অনুচ্চ বা অনুন্নত। তবে মঙ্গোলীয়দের নাক নিগ্রোদের নাকের তুলনায় চিকন, উন্নত এবং পাতলা। সে কারণে মঙ্গোলীয়দের নাক মধ্যমাকৃতির বলে বর্ণনা করা হয়।

www.swapno.in

৫. **চোখ-ঠোঁট-কান ঃ** মঙ্গোলীয়দের চোখের রং কালো-বাদামী থেকে শুরু করে ঘোর কালো বর্ণের হয়ে থাকে। চোখের পাতা একটু মোটা, আকারে অন্যান্য নরগোষ্ঠীর চোখের তুলনায় একটু ক্ষুদ্র। মঙ্গোলীয়দের ঠোঁট মাঝারি। অর্থাৎ ককেশীয়দের ঠোঁটের মত মঙ্গোলীয়দের ঠোঁট পাতলা নয়, তবে নিগ্রোদের মত অতটা মোটাও নয়। মঙ্গোলীয়দের কান লম্বা এবং সরু।

৬. **গায়ের রং ঃ** মঙ্গোলীয়দের গায়ের রং প্রধানত বাদামী বা হলুদ । গায়ের রং বিচার করে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীকে অনেকটা ককেশীয় এবং নিগ্রোদের মাঝামাঝি বলা যেতে পারে।

৭. **চুল-লোমকূপ ঃ** মঙ্গোলীয়দের মাথার চুল প্রধানত কালো। তবে কালো বাদামী রংও দেখা যায় । এদের চুল খাড়া, মোটা এবং দীর্ঘ। মঙ্গোলীয়দের মুখে এবং গায়ে লোমের পরিমাণ বেশ কম।

৮. **উচ্চতা ও দৈহিক গড়ন ঃ** মঙ্গোলীয়রা উচ্চতায় প্রধানত মধ্যম মানসম্পন্ন। আবার অনেকেই খর্বাকৃতির। আমেরিকান মঙ্গোলীয়দের উচ্চতা একটু বেশী। মঙ্গোলীয়দের বাহু মধ্যমাকৃতির এবং পা খর্বাকৃতির। এদের দেহের গড়নও মোটামুটি বলিষ্ঠ।

আমরা তাহলে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর দৈহিক গঠন-প্রণালী সম্পর্কে মোটামুটি জানতে পারলাম। পরিশেষে বলা যায় যে, মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম বৃহৎ নরগোষ্ঠী। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বাস হচ্ছে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন উপবিভাগ। কারণ প্রতিটি নরগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংকর প্রক্রিয়া কমবেশী বিদ্যমান। একথা বলা যায় যে, বিগত কয়েকশ বছর ধরে উক্ত প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে। মূলত, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার, ভাবের অবদান প্রদান ব্যবস্থার বিকাশ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মূল্যবোধ পরিবর্তনের সাথে সাথে সংকর প্রক্রিয়া অনেকটা সহজতর হয়ে এসেছে। এসব কারণেই মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর ভেতর বিভিন্ন উপবিভাগ থাকা স্বাভাবিক। মঙ্গোলীয়দের সংখ্যা প্রায় এক বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। অতএব বলা যায়, এই মঙ্গোলীয়রা পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নরগোষ্ঠী।

> প্রতিটি নরগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংকর প্রক্রিয়া কম বেশী বিদ্যমান।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

নিম্নে অংকিত মানচিত্রে মঙ্গোলীয়দের বাসস্থান চিহ্নিত করুন ঃ

অনুশীলনী ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

www.swapno.in

মঙ্গোলীয়দের পাঁচটি মূল বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সারাংশ ঃ

মঙ্গোলয়েডদের সংখ্যা প্রায় এক বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বাসভূমি হচ্ছে এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নরগোষ্ঠী। মঙ্গোলীয়দের প্রায় অর্ধেক রয়েছে চীনে। এছাড়া, বার্মা, ভিয়েতনাম, সুমেরু অঞ্চলের এসকিমো, দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ মানুষ ও দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের চুল সোজা, মাথার আকৃতি সাধারণত গোল, নাক মধ্যমাকৃতি থেকে চেপটা, তবে নিগ্রোদের মত মাংসল নয়। মঙ্গোলীয়দের গায়ের রং হলদে, বাদামী ধরনের। এদের চোখ ছোট এবং চোখের উপরের পাতায় বিশেষ ধরনের ভাঁজ থাকে, যাকে বলে এপিক্যানথিক ফোল্ড। এদের মুখমন্ডল সমতল। মঙ্গোলয়েডদের কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন, এশিয়া মঙ্গোলয়েড, ওসেনীয় মঙ্গোলয়েড ও আমেরিকান ইন্ডিয়ান্।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সংখ্যার দিক থেকে কোন নরগোষ্ঠীর পর মঙ্গোলীয়দের স্থান?

ক) ককেশীয়   খ) নিগ্রোয়েড

গ) নর্ডিক   ঘ) অষ্ট্রালয়েড

২। আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান ও এস্কিমোদের কোন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

ক) ককেশয়েড   খ) মঙ্গোলয়েড

www.swapno.in

গ) নিগ্রোয়েড ঘ) অস্ট্রালয়েড

৩। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীকে সাধারণত কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) দুই খ) তিন

গ) চার ঘ) পাঁচ

৪। পলিনেশীয়রা কোন দু'টি নরগোষ্ঠীর মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়ে?

ক) মঙ্গোলয়েড ও নিগ্রোয়েড খ) ককেশয়েড ও অষ্ট্রালয়েড

গ) ককেশয়েড ও মঙ্গোলয়েড ঘ) এশীয় মঙ্গোলয়েড ও আমেরিকান ইন্ডিয়ান

www.swapno.in

www.swapno.in

নিগ্রো নরগোষ্ঠী

পাঠ ৫

মূলধারণা

- নিগ্রো নরগোষ্ঠীর আবাসভূমি
- নিগ্রো নরগোষ্ঠীর দৈহিক গঠন-প্রণালী;
- নিগ্রো নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ;
- সাংস্কৃতিক দক্ষতা অর্জনে নরগোষ্ঠীর গুরুত্ব;
- অনুশীলন;
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য(Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি

১. নিগ্রো নরগোষ্ঠীর আবাসভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
২. এদের দৈহিক গঠন-প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৩. সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষমতা সকল নরগোষ্ঠীর সমান কিনা সে সম্পর্কেও অবহিত হবেন।

নিগ্রো নরগোষ্ঠীর প্রধান আবাসভূমি এবং তাঁদের দৈহিক গঠন-প্রণালী (The main residetial location of negroid and their physical System)

পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতিকে প্রধানত তিনটি প্রধান নরগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

১। ককেশীয় বা শ্বেতকায়;
২। মঙ্গোলীয় বা পীতাভ;
৩। নিগ্রো বা কৃষ্ণকায়;

নৃবিজ্ঞানীরা এই তিনটি বিভাগের সাথে আরো একটি বিভাগ যোগ করেন, যাকে বলা হয় অস্ট্রালয়েড। অনেকের মতে উক্ত চারটি প্রধান নরগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে এভাবে ঃ

১. নিয়ান্ডারথাল মানব থেকে প্রথমে ক্রো-ম্যাগনন এবং তা থেকে ককেশীয় নরগোষ্ঠীর উদ্ভব;
২. পিকিং মানব থেকে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর উদ্ভব;
৩. রোডেশীয় মানব থেকে নিগ্রো নরগোষ্ঠীর উদ্ভব; এবং
৪. জাভা মানব থেকে অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর উদ্ভব।

> দ্বীপমালার নিগ্রোদের সাথে আফ্রিকান নিগ্রোদের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ঘনিষ্ঠ মিল আছে। তবে উভয় প্রকার নিগ্রোরা পৃথকভাবে বিকাশ লাভ করেছে বলে মনে হয়।

নিগ্রো নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকের অভিমত এই যে, রোডেশীয় মানব থেকে নিগ্রো নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে। নিগ্রো নরগোষ্ঠীকে নিগ্রীয় বা নিগ্রোয়েড বলেও অভিহিত করা হয়। পুরনো ও নতুন পাথর যুগের বহু নিদর্শন অফ্রিকায় থাকায় একথা মনে করা হয় যে, নিগ্রো নরগোষ্ঠী এখানেই পরিণতি লাভ হয়েছে। তবে প্রাপ্ত সব তথ্য এতই বিচ্ছিন্ন যে, এসবের ভিত্তিতে এদের উদ্ভবের সঠিক ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়নি। নিগ্রো নরগোষ্ঠী বিভিন্ন শাখা গুলির নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ

www.swapno.in

১। পিগমী শিকারী জাতি;

২। বুশম্যান – যাযাবর জাতি ও খাদ্য সংগ্রহকারী; এবং

৩। হটেনটট – পশুপালক জাতি।

> আফ্রিকান নিগ্রোদের সংখ্যা প্রায় একশত মিলিয়ন হবে।

নৃবিজ্ঞানীদের মতে নিগ্রো নরগোষ্ঠীরও দৈহিক গঠন-প্রণালীতে মঙ্গোলীয় ও ককেশীয় নরগোষ্ঠীর ছাপ দেখা যায়। এতে এ কথা আবারও প্রমাণিত হয় যে, কোন নরগোষ্ঠীই বিশুদ্ধনয় তথা মিশ্রণবিহীন নয়। আসুন, এবার আমরা নিগ্রো নরগোষ্ঠী সম্পর্কে জেনে নেই। প্রথমেই বলা যায় যে, নিগ্রো নরগোষ্ঠীর লোকেরা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

ক) আফ্রিকার নিগ্রো; এবং

খ) দ্বীপমালার নিগ্রো।

সংখ্যার দিক থেকে আফ্রিকার নিগ্রো বৃহত্তর। উত্তর সাহারা ও উত্তর আফ্রিকা ছাড়া সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ নিগ্রোদের বাসভূমি। আফ্রিকার নিগ্রোদের মাথার চুল পশমের মত কুঞ্চিত, মাথা লম্বা, নাক মাংসল, চ্যাপ্টা ও প্রশস্ত; তাদের ঠোঁটগুলি মোটা, পুরু ও উল্টানো; কান ছোট, চোয়াল ভারী, হাত দুইটি লম্বা, মনে হয় কিছুটা ঝুলে আছে; মুখে দাড়ি গোঁফের পরিমাণ কম। সাধারণত, নিগ্রোরা গাঢ় কালো রঙের; তবে চকলেট রঙের এবং চকলেট ও নিকষ কালোর মাঝামাঝি বিভিন্ন রঙের নিগ্রোও দেখা যায়। সেনেগাল ও গিনি উপসাগরের কালো চোখ, কালো রঙ, পশমী চুল, চ্যাপ্টা নাক, চওড়া ঠোঁট ও ভারী চোয়াল বিশিষ্ট নিগ্রোরা অরণ্য– নিগ্রো নামে পরিচিত। অরণ্য–নিগ্রো, সুদানীয় ও বুশম্যানদের একটি মিশ্র গোষ্ঠীর নাম হচ্ছে বান্টু। তাদের গায়ের রঙ অপেক্ষকৃত হালকা এবং আকার বেশ খাটো। মূলত আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে ব্যাপক দৈহিক বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। সেনেগালের ওলফ, (ouolof), সুদানের মালিঙ্কি(Malinke), নীলের ডিঙ্কা, চারি নদীর সারা Sara, মধ্য কঙ্গোর জুলু হচ্ছে নিগ্রোদের উল্লেখযোগ্য ভাগ। মধ্য আফ্রিকার পিগমীরা সবচেয়ে বেঁটে। তাদের গায়ের রঙ অপেক্ষাকৃত হালকা এবং গায়ের পশম বেশ ঘন। আফ্রিকার হটেন্টটদের উচ্চতা মোটামুটি চলনসই; কিন্তু বুশম্যানদের উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর মত হটেন্টট ও ব্যুশম্যানদের চোখের উপরের পাতায় এ্যাপিক্যানথিক ভাঁজ আছে।

> অনেকের অভিমত এই যে, রোডেশীয় মানব মানব থেকে নিগ্রো নরগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছে।

> নিগ্রোদের তিনটি প্রধান শাখা
> ১. পিগমী;
> ২। বুশম্যান; এবং
> ৩। হটেনটট

চিত্র ১৮ ঃ নিগ্রো গোত্রীয়

> সংখ্যার দিক থেকে আফ্রিকার নিগ্রোর বৃহত্তর।

সাধারণত, দ্বীপমালার নিগ্রোরা আন্দামান-নিকোবার, মালয় উপদ্বীপ, ফিলিপাইন, নিউগিনি, তাসমেনিয়া এবং মেলানেসিয়ায় বাস করে। দ্বীপমালার নিগ্রোদের সাথে আফ্রিকান নিগ্রোদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ঘনিষ্ঠ মিল আছে। তবে উভয় প্রকার নিগ্রোরা পৃথকভাবে বিকাশ লাভ করেছে বলে মনে হয়। সম্ভবত প্রতিবেশী অস্ট্রেলীয় মানবধারার সাথে মিশ্রণের ফলে দ্বীপমালার নিগ্রোদের রঙ কালো হয়েছে। তারা বন্য ও লাজুক প্রকৃতির। তাদের দেহে লোম নেই এবং চুল পশমের মতো। দ্বীপমালার নিগ্রোদের একটি গোষ্ঠী নেগ্রিটো(Negrito) বা নিগ্রো-বটু নামে পরিচিত। বস্তুত, তারা খুবই বেঁটে আকারের। এবার নিগ্রো নরগোষ্ঠীর আবাসভূমি এবং তাদের দৈহিক আকার আকৃতি কেমন তা জানার চেষ্টাই করব। তবে প্রথমে জেনে নেই আবাসভূমি সম্পর্কে, এরপর পর্যায়ক্রমে দৈহিক আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

> আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে চরম দৈহিক বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়।

১. **প্রধান আবাস ভূমি** ঃ আফ্রিকা, বিশেষ করে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চল এবং মেলানেশিয়া।

www.swapno.in

২. **মাথার আকৃতি ঃ** নিগ্রোদের মাথা সাধারণত লম্বাকৃতির। নিগ্রোদের একটা অংশের মাথা অবশ্য চওড়া। তাদের মাথা উঁচু এবং কপাল উল্লম্বী(vertical) ধরনের।

৩. **মুখাকৃতি ঃ** যদিও মঙ্গোলয়েডদের তুলনায় নিগ্রোদের মুখ সরু ও লম্বাকৃতির, তথাপি তা কখনই ককেশয়েডদের মত অতটা সোজা, লম্বাকৃতি সম্পন্ন এবং সরু নয়।

৪. **নাক ঃ** নিগ্রোদের নাকের উচ্চতা খুব কম। অর্থাৎ নাক অনুন্নত বা বোঁচা। নাক শুধু অনুন্নতই নয়, তা আবার প্রশস্তও বটে। নাকের উপরিভাগও বেশ মোটা। বস্তুত, নিগ্রোদের নাক নিচু, মোটা, প্রশস্ত ও ভোঁতা।

৫. **চোখ-ঠোঁট-কান ঃ** নিগ্রোদের চোখের গড়ন ককেশয়েড়দের মতই। তবে চোখের রং কালো-বাদামী থেকে কালো। নিগ্রোদের ঠোঁট অবশ্যই মোটা বা পুরু। নিগ্রোদের ঠোঁট দেখে মনে হয় ঠোঁটটা যেন সম্মুখে বের হয়ে স্ফীত হয়ে আছে। নিগ্রোদের কান ছোট এবং প্রশস্ত।

উত্তর সাহারা এবং উত্তর আফ্রিকা ছাড়া সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ নিগ্রোদের বাসভূমি।

চিত্র ১ ঃ বিভিন্ন প্রকার ঠোটের ছবি

৬. **গায়ের রং ঃ** নিগ্রোর ঘোর কৃষ্ণ বর্নের। প্রায় ব্যতিক্রম নেই বললেই চলে। তবে বাদামী বর্ণের নিগ্রোদের সংখ্যা একেবারে কম।

৭. **চুল-লোমকূপ ঃ** নিগ্রোদের চুলের রং কালো ও চুলের ঘনত্বও বেশী। নিগ্রোদের চুলগুলো বেশ মোটা। গায়ে বেশ লোমকূপ দেখতে পাওয়া যায়।

৮. **উচ্চতা ও দৈহিক গড়নঃ** নিগ্রোদের উচ্চতার ঠিক নেই। নিগ্রোর লম্বাকৃতি ও খর্বাকৃতি উভয় ধরনেই হতে পারে। দেখতে পাওয়া যায়। তবে মধ্যম এবং লম্বার দিকে ঝোঁক বেশী। নিগ্রোদের দেহের গঠন শক্ত ও বলিষ্ঠ।

উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই আপনারা নিগ্রো নরগোষ্ঠীর বাসভূমি এবং দৈহিক গঠন-প্রণালী সম্পর্কে মোটামোটি একটা ধারণা পেয়েছেন। আসুন, এবার আমরা সংক্ষিপ্তভাবে নিগ্রো নরগোষ্ঠীর উপবিভাগ সম্পর্কে জেনে নেই।

www.swapno.in

উপবিভাগ ঃ নৃবিজ্ঞানী কুন, গার্ণ ও বার্ডশেল নিগ্রোদের চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন, (ক) ফরেস্ট নিগ্রো, (খ) মেলানেশীয় নেগ্রিটো, (গ) বুশম্যান বান্টু (ঘ) সুদানীয়।

অনেক নৃবিজ্ঞানী আবার নিগ্রো নরগোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ১। আফ্রিকার নিগ্রো ২। দ্বীপমালার নিগ্রো তবে একথা বলা যায় যে, নিগ্রোরা প্রধানত আফ্রিকার বাসিন্দা। আফ্রিকান নিগ্রোদের সংখ্যা প্রায় একশত মিলিয়ন হবে। নিগ্রো জাতীয় নরগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আফ্রিকান নিগ্রো সংখ্যায় বৃহত্তম। উত্তর সাহারা এবং উত্তর-আফ্রিকা ছাড়া সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ এদের বাসভূমি। সংখ্যায় এরা প্রায় দশকোটি। নিগ্রোদের আরো একটি উপবিভাগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যাদেরকে বলা হয় অরণ্য-নিগ্রো(Forest Negro)। আসুন, আমরা দেখি কারা অরণ্য-নিগ্রো।

সাধারণত, সেনেগাল ও গিনি এলাকার কালো চোখ, কালো রং, ভারী চোয়াল, চওড়া ঠোঁট, চেপ্টা নাক, পশমের মত চুল-বিশিষ্ট নিগ্রোদের অরণ্য-নিগ্রো বলে। অরণ্য—

নিগ্রো (Forest Negro) সুদানীয় ও বুশম্যানদের একটি মিশ্র গোষ্ঠীর নাম হচ্ছে বান্টু। বান্টুদের রং অপেক্ষাকৃত হালকা এবং দৈহিক আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট। বান্টু, বারবার(Berber), সেমাইট(Semite), লম্বাকৃতি সম্পন্ন নিলোটিক সুদানিজ(Nilotic Sudanese) ও হামিটিক(Hamitic) টাইপের পূর্ব আফ্রিকানদের একটি মিশ্র গোষ্ঠী বোধ করি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার জনক। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, নিগ্রোরা একটি মিশ্র নরগোষ্ঠী। কারণ এই নরগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটেছে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকী এবং রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ এলাকার সাঁওতালদের নিগ্রো নরগোষ্ঠীর অংশ বিশেষ বলে মনে করা হয়।

নিগ্রো নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ (Geographical classification of Negroid)

আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী জাকব ও স্টার্ণ প্রথমে নিগ্রো নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ করেন। এরপর নৃবিজ্ঞানী কুন, গার্ণ ও বার্ডসেল নিগ্রো নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগকে সমর্থন করেন। আসুন, আমরা নিগ্রো নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে জেনে নেই। ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **অস্ট্রেলীয় ভৌগোলিক মানবধারা ঃ** অস্ট্রেলিয়া ও তাসমেনিয়ায় এই মানবধারা দেখতে পাওয়া গেলেও এই উভয় জায়গা থেকে তারা বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে। বার্ডসেল মনে করেন যে, মুরাইয়ান (Murrayian) ও কার্পেন্টারীয়ান (carpentarian) নামক দু'টি স্থানীয় ককেশীয় মানবধারার পরবর্তী দু'টি প্রবাহের সাথে নেগ্রিটোদের বর্ন সংকরতার মাধ্যমেই অস্ট্রেলীয়দের উৎপত্তি সাধিত হয়েছে।

২. **পলিনেশীয় ভৌগোলিক মানবধারা ঃ** দক্ষিণে তুবুয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে উত্তরে ইন্টার পর্যন্ত সমগ্র মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপমালা পলিনেশীয়ার অন্তর্গত। বিশাল সাগরের জলরাশি পলিনেশীয়ার দ্বীপগুলিকে বিচ্ছিন্ন করায় পলিনেশীয় মানব ধারায় আঞ্চলিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। দৈহিক গড়ন, উচ্চতা, চুলের আকৃতি, গায়ের রং নাকের গঠন বৈচিত্র্যের জন্য পলিনেশীয়রা অন্যান্য মানবধারা থেকে স্বতন্ত্র। এদের দেহ লম্বা এবং মাথায় সচরাচর ঢেউ খেলানো চুল দেখতে পাওয়া যায়।

৩. **মাইক্রোনেশীয় ভৌগোলিক মানবধারা ঃ** পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে মাইক্রোনেশীয়া বাস করে। অতীতে সাংস্কৃতিক ও মানবধারা উভয় দিক থেকে মাইক্রোনেশীয়দের প্রায়ই পলিনেশীয়দের সাথে যুক্ত করা হতো। কিন্তু বর্তমানে গায়ের রং অপেক্ষাকৃত কালো, খর্ব আকৃতি এবং তরঙ্গায়িত ও কুঞ্চিত চুলের জন্য তাদেরকে আলাদা

www.swapno.in

মানবধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিউজিল্যান্ডের মাওরি উপজাতি এই বিভাগের অন্তর্গত।

৪. **মেলানেশীয় পাপুয়া ভৌগোলিক মানবধারা** ঃ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের নাম মেলানেসিয়া। মেলানেসিয়ার বিশ লাখ অধিবাসীর সঙ্গে আফ্রিকান নিগ্রোদের দৈহিক মিল আছে। মেলানেসিয়ানদের বাসভূমি নিউগিনি থেকে ফিজি পর্যন্ত, তিন হাজার মাইল জুড়ে বিস্তৃত। এক সময় নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, আফ্রিকান ও মেলানেসিয়ান নিগ্রো উভয়েই একটি অভিন্ন বংশের প্রতিনিধি। এশিয়ার মূলভূখন্ড ছিল এই নরগোষ্ঠীর মাতৃভূমি; পরে এরা আফ্রিকা ও মেলানেসিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অতীতে এদেরকে সামুদ্রিক নিগ্রো হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হতো। কিন্তু বর্তমানে জন্মগত ও ইতিহাসগত উভয় দিক থেকে তারা আফ্রিকার নিগ্রো থেকে স্বতন্ত্র বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৫. **বুশম্যান ও হটেন্টটট** ঃ এক সময় বুশম্যান হটেন্টটেরা বিপুল সংখ্যক ছিল। কিন্তু হ্রাস পেতে পেতে এদের সংখ্যা এখন নগন্য। আগে এরা দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে বাস করতো; কিন্তু বর্তমানে তারা প্রধানত কালাহারি মরুভূতিতে বসবাস করে। হটেন্টটদের উচ্চতা মোটামোটি চলনসই। হটেন্টটদের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বুশম্যানদের উচ্চতা প্রায় পাঁচফুট। বুশম্যানরা দেখতে বহুলাংশে ওসেনিয়ান নেগ্রিটোদের মতো। বুশম্যানদের দৈহিক উচ্চতা ও মুখাকৃতি কঙ্গোর নিগ্রোদের মত। কিন্তু তাদের মুখের উন্নত সামনের অংশ এবং ঠোঁট ও চোখ নিগ্রো ও নেগ্রিটো উভয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। বুশম্যানরা ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত। এসব পরিবারের লোকসংখ্যা চার থেকে পাঁচজনের বেশী নয়। প্রত্যেক পরিবারই স্বনির্ভর। কতকগুলি পরিবার মিলে একটি গোত্র গঠিত হয়। বুশম্যানরা মূলত খাদ্য সংগ্রহকারী সমাজের মানুষ। সুতরাং শিকার প্রাপ্তির সুযোগ ও অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণের উপর তাদের পারিবারিক উন্নতি নির্ভর করে। স্থানীয়ভাবে খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিলে তারা বছরে কয়েকবার জায়গা পরিবর্তন করে। বুশম্যানদের অর্থনীতিতে শিকারী জন্তুর প্রাধান্য বিদ্যমান থাকায় প্রত্যেক পরিবারে যথেষ্ট পরিমাণ চামড়া, হাড় ও প্রাণীদের পেশীতন্তু রয়েছে। বস্তুত, চামড়া, হাড় ও পেশীতন্তুর বিনিময়ে অন্যান্য উপজাতি বা বিদেশীদের কাছ থেকে বুশম্যানরা খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে। বুশম্যানরা যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করে তাকে পোশাক না বলে লজ্জা নিবারক অবলম্বন বলে অভিহিত করাই ভাল। তারা বেশীর ভাগই চামড়ার পোশাক ব্যবহার করে। তাদের পোশাকও অতি সাধারণ বুশম্যান মহিলারা খুব সৌখিন। বিরূপ প্রকৃতির মধ্য থেকে সহজলভ্য জিনিসগুলি নিয়ে তারা নানা রকম গহনা তৈরী করে ব্যবহার করে। মনোরম গহনা তৈরি করবার জন্য তারা প্রধানত উট পাখির ডিমের খোসা, উট পাখীর হাড় ও চকমকি পাথর ব্যবহার করে। বুশম্যানদের খাদ্য সামগ্রীগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১। মাংস জাতীয় খাদ্য ও ২। উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য। তারা মাটির পাত্রে এসব খাদ্য সিদ্ধ করে আহার করে। বুশম্যানদের ব্যবহার্য জিনিসের সংখ্যা কম ও সাদামাটা। কিন্তু ঐ সব জিনিস দেখে মনে হয় যে, তারা তাদের অঞ্চলের স্বল্প সম্পদকে দক্ষতার সাথে ব্যবহারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। বুশম্যানদের অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরির জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয়। বুশম্যান পুরুষদের কাজ হলো শিকার করা। পরিশেষে বুশম্যানদের সম্পর্কে বলা যায় যে, কালাহারি মরুভূমি অঞ্চলে এবং বসবাসের পক্ষে অনুপযোগী এমন নির্জন জায়গাগুলিতে শিকারী যাযাবর বুশম্যানরা আদিম পদ্ধতিতে জীবিকা নির্বাহ করছে। এদের অধিকাংশই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে; মাত্র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠী এখনো টিকে আছে।

৬. **দূরপ্রাচ্যবাসী পিগমী** ঃ এরা মালয়, ফিলিপাইন, নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়া ও মেলানেসিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এদের মোট সংখ্যা চল্লিশ হাজার হতে পারে। তবে সঠিক

www.swapno.in

www.swapno.in

সংখ্যা জানা সম্ভব নয়। কারণ এরা বন্য এবং লাজুক প্রকৃতির এবং বাস করে অতি দুর্গম অঞ্চলে। এদের উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট। দূর প্রাচ্যবাসী পিগমীদের রং কালো এবং দেহ লোম শূন্য। চুল পশমের মত, আফ্রিকান পিগমীদের মত কুঞ্চিত বা গোল মরিচ সদৃশ নয়। বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের হিংস্র-দর্শন কিন্তু চিত্তাকর্ষক আদিবাসীদের এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ- ব্রাউন সহানুভূতি সহকারে এদের পরীক্ষা করেছেন।

৭. **আফ্রিকার পিগমী ও সামুদ্রিক নেগ্রিটো ঃ** বিশেষ করে চরম ক্ষুদ্র আকৃতি ও কালো চামড়ার দিক থেকে পিগমী ও নেগ্রিটোরা একে অপরের অনুরূপ। গ্রীক শব্দ 'pugme" থেকে ইংরেজী " pygmy " শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাক ঐতিহাসিক সময় থেকে অতি ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষদের বুঝবার জন্যে 'পিগমী' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। নিরক্ষীয় আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপমালার গভীর জঙ্গলে বসবাসকারী ছোট আকারের মানুষরা বেশ আদিম প্রকতির।

পৃথিবীর সব পিগমী মানবগোষ্ঠী নিগ্রোয়েড (Negroid) বা নিগ্রো নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত খর্বাকৃতি মানুষরা বৃহত্তর মানবধারাগুলির বৃদ্ধিতে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত বা বিকৃত আকার বিশিষ্ট সদস্য বলে মনে করা ঠিক নয়। পিগমী নরগোষ্ঠীর মধ্যে আফ্রিকার পিগমী সবচেয়ে বেঁটে। তাদের গড় উচ্চতা পাঁচ ফুটের নীচে। তাদের মাথা মাঝারি ধরনের, তাদের গায়ের রং কালচে থেকে লালচে বাদামী; কিন্তু চুল যথেষ্ট কালো, গায়ের পশম বেশ ঘন। পিগমীরা স্বল্প মনোযোগ বিশিষ্ট। তারা প্রফুল্ল, প্রাণবন্ত ও আবেগময় এবং লাজুক। কিন্তু লাজুক প্রকৃতির হলেও পিগমীরা উত্তম স্বভাব ও সহযোগী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। শিকার ও খাদ্যের সন্ধানে পিগমীদের প্রায়ই আবাসস্থল পরিবর্তন করতে হয় বলে তাদের ঘরের স্থায়ী কাঠামো দেখা যায় না। পিগমীরা তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষক। তারা শিকারে পারদর্শী, হাতি বা অনুরূপ বৃহত্তম প্রাণীগুলিও তারা বন্দী করে ও বধ করে। ক্ষুদ্র আকৃতি হওয়া সত্ত্বেও একজন পিগমী স্বাভাবিক খাদ্য ছাড়াও একসাথে ৬০টি কলা খেতে সক্ষম বলে জানা যায়। নিগ্রোদের কাছ থেকে কলা, লোহার হাতিয়ার, চাকু, সুতীর কাপড়, নিকৃষ্ট মানের অলঙ্কার এবং কখনো কখনো ইউরোপীয় জিনিসগুলি পাওয়ার জন্যে পিগমীরা বন থেকে সংগৃহীত মাংস, পশুর চামড়া ও বন্য মধু বিনিময় করে। খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে পিগমী ও নিগ্রোরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পিগমীরা যেভাবে জীবন-যাপন করে তাতে ভিন্ন পথে যাবার সুযোগ খুবই কম। বন্য পরিবেশের মধ্যে জীবন-যাপন করার কারণে নিরাপত্তারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অদূর ভবিষ্যতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে; কারণ শ্বেতকায় ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে সৃষ্ট নতুন পরিবেশের সাথে এই লাজুক প্রকৃতির অনুন্নত মানুষরা ভালভাবে খাপ-খাওয়াতে পারবে বলে মনে হয় না।

৮. **মেসটিজো বা লাডিনো নরগোষ্ঠী ঃ** এদের অধিকাংশ ল্যাটিন আমেরিকায় আগমনকারী; এরা সুদানীয় বা অরণ্য নিগ্রো। অধিকাংশ দেশে উপনিবেশিক যুগে আমদানিকৃত নিগ্রো ক্রীত দাসদের সংখ্যা ইউরোপীয় আগমনকারীদের সংখ্যা অতিক্রম করেছিল। নিগ্রো ও ইউরোপীয় আগমনকারী উভয়ের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল বেশী এবং উভয়েই ব্যাপকভাবে ইন্ডিয়ানদের সাথে মিশ্রিত হয়েছিল। নিগ্রোরা জানত যে, ইন্ডিয়ানদের সন্তান-সন্ততি দাসে পরিনত হবে না। অনেক এলাকায়, প্রধানত ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে নিগ্রোরা এখনও অতি সাধারণ। আর্জেন্টিনার মতো অন্যসব জায়গায় মিশ্রণ এতই সম্পূর্ণ হয়েছিল যে, বর্তমানে নিগ্রো লোকদের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন এক সময়ে ঐ সব অঞ্চলে ইউরোপীয়দের থেকে নিগ্রোদের সংখ্যা বেশী ছিল। আমরা নিগ্রো নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোকপাত করলাম। বস্তুত বলা যায় যে নিগ্রো নরগোষ্ঠীর ভেতর বহিরাগত বহু নরগোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটেছে। কারণ নিগ্রো নরগোষ্ঠীর মধ্যে

www.swapno.in

রয়েছে বিভিন্ন উপবিভাগের অস্তিত্ব। তাই বলা যায়, বিশুদ্ধ কোনও নরগোষ্ঠী নেই, কখনও ছিল না। প্রতিটি নরগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ উপবিভাগ। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি নরগোষ্ঠির ভেতরই বহিরাগত জিনের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বহিরাগত জিনকে(Gene) গ্রহণ করে প্রতিটি নরগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। নিগ্রো নরগোষ্ঠীকে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ নরগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

সাংস্কৃতিক দক্ষতা অর্জনে নরগোষ্ঠীর গুরুত্ব

সাধারনত নরগোষ্ঠী বলতে আমরা বুঝাবো এমন একটি জনগোষ্ঠী, যাদের মধ্যে আছে দৈহিক আকার-আকৃতির বিশেষ মিল এবং এসব আকার–আকৃতি চলে বংশ পরস্পরায় বিদ্যমান থাকে। নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের দৈহিক আকৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর সমগ্রমানব ধারাকে প্রধান ৪টি নরগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন। যথাঃ

১। ককেশীয় বা শ্বেতকায়;

২। মঙ্গোলীয় বা পীতাভ;

৩। নিগ্রীয় বা কৃষ্ণকায়; এবং

৪। অস্ট্রালয়েড।

আসুন, এবার আমরা জেনে নেই সাংস্কৃতিক দক্ষতা অর্জনে নরগোষ্ঠী গুরুত্ব কতটুকু? অর্থাৎ মানুষের যে সাংস্কৃতিক দক্ষতা তাতে নরগোষ্ঠীর ভূমিকা কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ।

সাধারনত, বর্ণবাদীরা বিশ্বাস করেযে, পৃথিবীর সব নরগোষ্ঠী কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে অভিন্ন নয়। মনোভাবের দিক থেকেও তারা এক নয় নরগোষ্ঠী সব সমান উন্নত নয়; কারণ কোন কোন নরগোষ্ঠী জন্মগতভাবেই অন্য নরগোষ্ঠী থেকে উন্নত। আর উন্নত নরগোষ্ঠী অনুন্নত নরগোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে। একটি নরগোষ্ঠীর সাথে অন্য নরগোষ্ঠীর সংঘাত অপরিহার্য। সেজন্য বর্ণবাদের সূত্র অনুসারে ইউরোপের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন ফরাসী ঐতিহাসিক উগসত্যাঁ তেরি। তিনি তাঁর Letter sur Histoire de France নামক গ্রন্থে ফরাসী বিপ্লবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন ঃ ফরাসী বিপ্লব আসলে দু'টি নরগোষ্ঠীর সংঘাতের ফল। ফান্সে প্রথম বসতি স্থাপন করে গল-রা। তারপর আসে রোমানরা। উভয়ে মিলে সৃষ্টি হয় গালো-রোমান জনসমষ্টি ও তার সংস্কৃতি। পরে জার্মান থেকে আসে ফ্রাঙ্করা। তারা এসে প্রতিষ্ঠা করে নতুন রাজপরিবার। দখল করে রাষ্ট্রক্ষমতা। সৃষ্ট হয় রাজাকে ঘিরে নতুন অভিজাত শ্রেণী। অন্যদিকে, প্রথমে আগমনকারী গালো–রোমানরা মূলত কৃষক ও মধ্যবিত্ত। ফরাসি বিপ্লব আসলে গালো-রোমান কৃষক ও মধ্যবিত্তদের সাথে ফ্রাঙ্ক রাজা ও আভিজাতদের সংঘাত। গালো-রোমানরা দাবী করে স্বাধীনতা, সমতা ও সখ্যতা। কিন্তু ফ্রাঙ্ক আভিজাত্য ও রাজতন্ত্র এর বিরোধিতা করে । ফ্রাঙ্করা তাদের সুবিধা বজায় রাখবার জন্য ক্ষমতাবান রাজতন্ত্রের পক্ষ নেয় । এখানে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে ফ্রাঙ্করা, গালো-রোমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

> সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষমতা সকল জাতির সমান।

> নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য নয়, বরং পরিবেশের প্রভাবই বুদ্ধিমত্তাও সাংস্কৃতিক দক্ষতার উপর বেশি ক্রিয়াশীল।

কিন্তু সাংস্কৃতিক দক্ষতা অর্জনে নরগোষ্ঠীর যে কোন গুরুত্ব নেই তা জার্মানরা প্রমাণ করেছে। কারণ রোমান রাষ্ট্র যখন উন্নতির চরম শিখরে তখন জার্মানদের পূর্ব-পুরুষেরা বর্বর দশায় বাস করত। পরে জার্মানরা অনুকূল পরিবেশের আশীর্বাদে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার পরিচয় দেয়। আর্থ-সামাজিক উপাদানই সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা নিরূপণ করে; সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবেই নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন। মানবজাতির বন্য অবস্থা থেকে বর্বর দশা এবং তা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত অবস্থায় পৌঁছাতে নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। বিশ্বের সব ধরনের মানুষের মধ্যেই চার প্রকার রক্ত গ্রপের পরিচয় মিলে। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মধ্যে সংমিশ্রণের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তা হয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুস্থ। আর এদের সাংস্কৃতিক দক্ষতা প্রধানত পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

> ফরাসী বিপ্লব আসলে দু'টি নরগোষ্ঠীর সংঘাতের দল।

www.swapno.in

> যে মানবগোষ্ঠী প্রতিকূল জলবায়ু ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম তারাই বিশ্বে শক্তিশালী হতে পেরেছে।

বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, মস্তিস্কের আয়তন বড় হলে সাংস্কৃতিক দক্ষতা বেশী হবে। প্রাচীন মিশরীয়রা উন্নত সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। জার্মান নৃবিজ্ঞানী E.Schmidt এর তথ্যানুযায়ী মিশরীয় পুরুষ ও মেয়েদের মাথায় মগজের পরিমাণ যথাক্রমে ১৩৯৪ সি. সি. এবং ১২৫৭ সি.সি.। মিশরীয়দের মগজের এই পরিমাণ তাদের প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর মগজের চেয়ে কম। বেশী মগজের অধিকারী হয়েও তারা মিশরীয়দের ন্যায় সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে পারেনি। এতে প্রমাণিত হয় যে, মাথার আকৃতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার কোন সম্পর্ক নেই। তদুপরি, ইউরোপীয় শ্বেতকায় নরগোষ্ঠীর লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে (যেমন, ঢেউ খেলানো, চুল, দাড়ি, গোঁফ, গাত্র লোমের ক্ষেত্রে) অস্ট্রেলীয় আদিবাসীর মত।

> মানুষের সাংস্কৃতিক দক্ষতা প্রধানত পরিবেশ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

মূলত সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষমতা সকল জাতির সমান। একটি সভ্যতার উদ্ভব এবং উত্তরোত্তর জীবনযাত্রা প্রণালীর বিকাশ কোনও নির্দিষ্ট নির্ভেজাল নরগোষ্ঠীর প্রতিভার ফলশ্রুতি নয়। একটি মহান নরগোষ্ঠী প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার স্রষ্টা নয়। অনেকগুলি জনগোষ্ঠী একটি সীমিত এলাকায় সম্মিলিত হয়ে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল। বিশেস করে মিশরের আশেপাশের সবকটি জনগোষ্ঠীর প্রতিভা ছিল সমান, কেউ কারে চেয়ে বড় নয়। সবারই নিজস্ব মূল্যবান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল এবং তারা সবাই মিলে পরস্পরের ঐতিহ্যকে আরো জোরদার করে তুলেছিল। বস্তুত প্রাচীন মিশরের প্রতিষ্ঠাতা উপজাতিগুলি নীলনদের উপত্যকায় পরস্পরের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে পড়েছিল এবং নিজ নিজ অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে সমগ্র মিশরীয় সভ্যতার সার্বিক জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। মিশর যে সুদীর্ঘকাল তার সমৃদ্ধি বজায় রেখেছিল তার অন্যতম কারণ ধর্ম ও নরগোষ্ঠীর প্রতি মিশরের ঐতিহ্যবাহী সহিষ্ণুতা।

> মাথার আকৃতির সঙ্গে সংস্কৃতিক উৎকর্ষতার কোন সম্পর্ক নেই।

কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট সামাজিক মনোবিজ্ঞানী নিগ্রোদের বুদ্ধাংক(I.Q.) পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য নয়, বরং পরিবেশের প্রভাবই বুদ্ধিমত্তা ও সাংস্কৃতিক দক্ষতার উপর বেশী ক্রিয়াশীল। বস্তুত, নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, সময় সুযোগ ও পরিবেশের আনুকূল্যেই কোন জাতি এবং নরগোষ্ঠী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য াবদান রাখতে পারে। প্রখ্যাত আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার (Krobber) লক্ষ্য করেন যে, মিশর যখন সভ্যতার চরম পর্যায় অতিক্রম করছিল, গ্রীকবাসীরা তখন বর্বরদশা কাটিয়ে উঠেছে মাত্র; গ্রীকবাসীরা যখন উন্নতির উচ্চ মার্গে পৌঁছায় রোমানরা তখন তেমন কিছু অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু যখন রোমানরা আবার সভ্যতার উচ্চ শিখরে পৌঁছল তখন টিউটোনরা (যারা কিছুদিন আগেও উন্নতির একচেটিয়া দাবিদার বলে মনে করছে) আধা-বন্য দশায় জীবন কাটাচ্ছিল। তাই সংস্কৃতি সৃষ্টিতে কিংবা সংস্কৃতিক উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে নরগোষ্ঠীর তেমন কোন উল্লেখযোগ ভূমিকা নেই।

> কোন জাতির উন্নতি তার পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

নিগ্রো শিক্ষকদের মধ্যে বুদ্ধাংক পরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গিয়েছে যে, বংশগতি নয় বরং অনুকূল পরিবেশের কারণেই সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভবপর। দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোদের (Southern Negro) চেয়ে উত্তরাঞ্চলের নিগ্রো (Northern negro) শিশুরা বেশী আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার সুযোগ পায় বলে তারা বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে, কোন জাতির উন্নতি নির্ভর করে প্রধানত অনুকূল পরিবেশের উপর। এক্ষেত্রে জৈব-বৈশিষ্ট্যের তেমন কিছু করার নেই। যে– মানব গোষ্ঠী প্রতিকূল জলবায়ু ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম তারাই বিশ্বে শক্তিশালী হতে পেরেছে।

নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে এই যে, সব নরগোষ্ঠীই সাংস্কৃতিক দক্ষতার্জনে সমান পারদর্শী এবং সংস্কৃতি নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্টের উপর নির্ভর না করে নিরপেক্ষ নিয়ামক (Variable) রূপে কাজ করে।

www.swapno.in

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

নিগ্রো নরগোষ্ঠীর ১০টি মুখ্য বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

সারাংশ ঃ

নিগ্রো নরগোষ্ঠীর নামকরণ হয়েছে ল্যাটিন শব্দ (Niger) নিগার হতে। নিগার এর ইংরেজী অর্থ হল ব্ল্যাক বা কালো।

নিগ্রো নরগোষ্ঠী প্রধানত আফ্রিকার অধিবাসী। এ ছাড়া, নিগ্রো নরগোষ্ঠীর লোকদের মালয়েশিয়া, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও মেলানেশিয়ার কোন কোন দ্বীপেও দেখতে পাওয়া যায়। নিগ্রো নরগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাথার চুল কোঁকড়ানো, পশমী বা কোঁচকানো(Curly to wooly or Frizzly)। এদের গায়ে পশম বেশী নয়। নিগ্রোদের নাকের আকৃতিতে তারতম্য লক্ষ করা যায়। তবে নাক প্রশস্ত, চ্যাপ্টার দিকে ঝোঁক বেশী। কানগুলি সাধারণত ছোট। ঠোঁট বেশী মোটা ও পুরু। নিগ্রোদের উচ্চতা সাধারণত ১৮০ সে. মি. এবং এরা পৃথিবীর দীর্ঘতম মানুষের অন্যতম। এরা কাঠামোগত দিক থেকে বেশ মজবুত ও শক্তিশালী। নিগ্রো নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগ রয়েছে। তবে সাধারনত নিগ্রো নরগোষ্ঠীকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা– আফ্রিকান নিগ্রো ও অস্ট্রেলীয় নিগ্রো।

আফ্রিকান নিগ্রোরা দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান ও পূর্ব আফ্রিকার অধিবাসী। অস্ট্রেলীয় নিগ্রোরা মেলানেশিয়া, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া ও সিংহলে রয়েছে।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বুশম্যান জাতির মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি কি?

ক) যাযাবর জীবন যাপন

খ) পশুপালন ও কৃষি

গ) পশুশিকার

ঘ) মৎস্য শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ

২। মানুষের সাংস্কৃতিক দক্ষতা মূলত কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?

ক) বর্ণ খ) ধর্ম

গ) শিক্ষা ঘ) পরিবেশ

৩। পিগমী মানবগোষ্ঠী কোন্ নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?

ক) মঙ্গোলীয় খ) নিগ্রোয়েড

গ) অষ্ট্রালয়েড ঘ) ককেশীয়

৪। মাথার আকৃতির সাথে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার সম্পর্ক কিরূপ?

ক) আছে খ) নিবিড়

গ) নেই ঘ) সামান্য

www.swapno.in

www.swapno.in

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নিগ্রো নরগোষ্ঠী কি? নিগ্রো নরগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।

২. নিগ্রো নরগোষ্ঠীর ভৌগোলিক শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন ।

৩. মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তন আলোচনা করুন ।

অথবা

মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্বন্ধে কি জানুন? আলোচনা করুন।

অথবা

অতি আদিম মানুষ ও তাহার আদি বসতি সম্পর্কে যা জানুন সংক্ষেপে লিখুন।

৪. ফসিল বা মানব জীবাশ্ম কাকে বলে? কয়েকটি জীবাশ্ম মানব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

অথবা

ফসিল কি? কয়েকটি লুপ্ত মানব সম্পর্কে আলোচনা করুন ।

৫. নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দাও? নরগোষ্ঠী সমূহের উৎপত্তির জন্য দায়ী উপাদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন ।

৬. নরগোষ্ঠী বলতে কি বুঝায়? নরগোষ্ঠী সমূহের প্রকারভেদ আলোচনা করুন

অথবা

নরগোষ্ঠী কি? নরগোষ্ঠী সমূহের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন ।

৭. ককেশীয় নরগোষ্ঠী বলতে কি বুঝায়। ককেশীয় নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

অথবা

ককেশীয় নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিন। ককেশীয় নরগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

৮. ককেশীয় নরগোষ্ঠী কি? ককেশীয় নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

১। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করুন। এই নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপবিভাগ কি কি?

২। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর আবাসভূমি এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩। অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীকে কেন প্রধান নরগোষ্ঠী বলে গণ্য করা হয় না? আলোচনা করুন।

৪। অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১ ঃ (১) খ, (২) ক, (৩) খ, (৪) ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২ ঃ (১) খ, (২) .., (৩) ... (৪) ...

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩ ঃ (১) ক, (২) গ, (৩) ঘ, (৪) ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪ ঃ (১) ক, (২) খ, (৩) খ, (৪) গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫ ঃ (১) গ, (২) ঘ, (৩) খ, (৪) গ

www.swapno.in

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহ ঃ সমুদ্র তীরবর্তী ও নদী তীরবর্তী

ইউনিট ৬

ভূমিকা

কোন একটি অঞ্চল বা দেশের জাতীয় সংস্কৃতির বাহ্যিক রূপ হল সেই অঞ্চল বা দেশের সভ্যতা। প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহের বিকাশ ঘটে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে। আফ্রিকার মিশর এবং এশিয়ার মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষ ও চীন মানব সভ্যতার অন্যতম আদি লীলাভূমি। এসব সভ্যতা খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০০ বছর আগে বিকশিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। প্রাচীন সভ্যতাগুলো সমুদ্র ও নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল। যেমন ভূমধ্যসাগর তীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা। অন্যদিকে নীলনদের তীরে গড়ে উঠেছিল মিশরীয় সভ্যতা এবং টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মেসোপটমিয়া তথা ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। বস্তুত, সভ্যতার উন্মেষের পথ সুগম হয় খ্রীষ্ট পূর্ব ৪০০০ বছর আগে। সুপ্রাচীন কালে মানুষ কৃষিকাজ জানত না। ধীরে ধীরে কৃষিকাজ শুরু করল। উদ্ভব হল নবোপলীয় অর্থনীতির। তারপর মানুষ নতুন নতুন হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হল। তারা মৃৎশিল্প, ধাতুবিদ্যা, কৃষিযন্ত্রপাতি, লাঙ্গল, ভার বহনে পশুশক্তির ব্যবহার, ইট, গাড়ীর চাকা ইত্যাদি তৈরি করতে শিখল। এভাবে শুরু হল তাম্রপলীয় অর্থনীতির। ফলে সমাজ কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের এ গুণগত পরিবর্তনই নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে মিসর, মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু অববাহিকায় নবোপরীয় অর্থনীতি বিলুপ্ত হয়ে নগর সভ্যতার উদ্ভব হয়। এরপর পরই গড়ে উঠে গ্রীক ও রোমান সভ্যতা। মানব সভ্যতাকে প্রধানত দু'টো ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ প্রাচ্যের নদী তীরবর্তী সভ্যতা ও পাশ্চাত্যের সমুদ্র তীরবর্তী সভ্যতা। এই ইউনিটটি পাঠ করে আপনারা পাশ্চাত্যের সমুদ্রতীরবর্তী সভ্যতা, যেমন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা এবং প্রাচ্যের নদী তীরবর্তী সভ্যতা, যথা - মিশরীয়, মেসোপটোরিয়ান, ভারতীয় সভ্যতা ও চৈনিক সভ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

www.swapno.in

www.swapno.in

শিক্ষাসূচী

এই ইউনিটে ৬টি পাঠ রয়েছে। প্রতিটি পাঠ ঘণ্টা অর্থাৎ মিনিটের। পাঁচটি পাঠ সম্পন্ন করার জন্য আপনার -------------------- মিনিট সময় লাগবে। এছাড়া ----টি পাঠে মোট -------------------------টি অনুশীলন (Activity) দেওয়া হয়েছে। এ অনুশীলনগুলোর (Activities) এর জন্য অতিরিক্ত ------- মিনিট বা ---------- সময় লাগবে। নিম্নের সারণীর মাধ্যমে আপনি পড়ার সময়কে ভাগ করে নিতে পারবেন।

দিন	নির্ধারিত সময়	পাঠ/পাঠের অংশ বিশেষ	অনুশীলন	মন্তব্য
শুক্রবার				
শনিবার				
রবিবার				
সোমবার				
মঙ্গলবার				
বুধবার				
বৃহস্পতিবার				

কখন পড়বেন ঃ

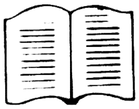

একটু ভাবুনতো আপনার হাতে পড়ার মত সময় কতটুকু এবং কখন আছে? – ভেবেছেন। আপনি যদি চাকুরীজীবী, শ্রমজীবী, পরিবারের দায়িত্বশীল বা কর্তা ব্যক্তি হন তাহলে দেখা যাবে প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আপনি পড়াশুনা করার সময় পেয়ে থাকেন। এ সময়টুকু আপনি আপনার পড়াশুনায় ব্যয় করে ভাল ফলাফলের অধিকারী হতে পারবেন। মনে রাখবেন, প্রতিদিন যা পড়বেন তা ঘুমানোর সময় একটু মনে করার জন্য সচেষ্টা হবেন। অনুশীলনগুলো করার পর বুঝতে পারবেন যে, আপনি পাঠটি ভালভাবে শিখেছেন কিনা। ইউনিট শেষে রচনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হতে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা, এসাইনমেন্ট ইত্যাদি দেওয়া হবে। তাই পুরো ইউনিটটি খুব ভাল করে পড়বেন।

www.swapno.in

সমুদ্র তীরবর্তী গ্রীক সভ্যতা

পাঠ ১

মূলধারণা

- গ্রীক সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- গ্রীক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
- গ্রীক সভ্যতার অবদানসমূহ
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি

১. গ্রীক সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।

২. গ্রীক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩. মানব সভ্যতার বিকাশে গ্রীকদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

গ্রীক সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background of Greek Civilization)

ভৌগোলিক দিক থেকে গ্রীক সভ্যতা ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত। প্রাচীন গ্রীসের উপরে আছে আলপস্ পর্বত, আর নীচে রয়েছে ভূমধ্য মহাসাগর। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এজন্য গ্রীক সভ্যতাকে সদুদ্রতীরবর্তী সভ্যতা বলে অভিহিত করেছেন। উক্ত পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে গ্রীস অবস্থিত। প্রাচীন গ্রীসে ১৫৮টির মতো নগর রাষ্ট্র ছিল; তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সমৃদ্ধ ছিল এথেন্স নগর রাষ্ট্র যা এট্টিকা (Attica) উপত্যাকা অঞ্চলে গড়ে উঠে। এটি বলকান উপদ্বীপের দক্ষিণে এক পাহাড়ময় অঞ্চল। প্রাচীনকালে পাহাড়ময় এই দেশটিতে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই বিশ্ব সামাজিক ইতিহাসে গ্রীক সভ্যতা নামে পরিচিত। এ সভ্যতা এতই সমৃদ্ধ ছিল যে, আধুনিক সভ্যতার স্বর্ণযুগে দাঁড়িয়ে আমরা যখন প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার দিকে তাকাই তখন আমাদের অবাক হতে হয়।

> আর্যজাতির একটি শাখা খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০ সালে প্রাচীন গ্রীসে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০ সালে আরও কয়েকটি ইন্দো-ইউরোপীয় দল গ্রীসে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এই ইন্দো-ইউরোপীয় তথা আর্যজাতির ইউরোপীয় শাখা খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০ সাল থেকে ৪০০ সাল পর্যন্ত যে অভূতপূর্ব সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল, তাকে মোটামুটিভাবে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা নামে চিহ্নিত

গ্রীসের অধিবাসীরা নিজেদেরকে হেলেনীয় (Hellenes) নামে পরিচয় দিত। ইতিহাসে একটি কথা আছে যে, Wherer the Heleness there were Hellas অর্থাৎ হেলেনীয়রা যেখানেই গেছে সেখানেই তারা Hellas গড়ে তুলেছে। গ্রীক ভাষায় Hellas শব্দের অর্থ শহর বা নগর। এজন্য প্রাচীন গ্রীসে এতগুলি নগর রাষ্ট্রের উৎপত্তি। হেলেনীয়রা গ্রীসের আদি অধিবাসী নয়, তারা আর্যজাতির অন্তর্গত। আর্যজাতির একটি শাখা খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০ সালে গ্রীসে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০ সালে আরও কয়েকটি ইন্দো-ইউরোপীয় দল গ্রীসে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এই ইন্দো-ইউরোপীয় তথা আর্যজাতির ইউরোপীয় শাখা খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০ সাল থেকে ৪০০ সাল পর্যন্ত যে অভূতপূর্ব সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল, তাকে মোটামুটিভাবে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা নামে চিহ্নিত করা হয়। গ্রীকরা হল একটি মিশ্রজাতি। খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫০ সালের দিকে

www.swapno.in

গ্রীকরা রাজ্য বিস্তারের কাজে মনোনিবেশ করে এবং সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য ঔপনিবেশ স্থাপন করেছিল। উপনিবেশগুলোতেও তাদের সভ্যতার ছাপ পড়েছিল। উপজাতীয় কোন্দল, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য সম্রাটের আক্রমণ, এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যকার যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব ইত্যাদির কারণে গ্রীস তার স্বাধীনতা হারায়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে গ্রীস ব-দ্বীপ রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এভাবে গ্রীক সভ্যতার অবসান ঘটে।

গ্রীক সভ্যতার মূল কেন্দ্র বিন্দু ছিল স্পার্টা ও এথেন্স নগর। এদের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত অভিজাত শ্রেণীর মাধ্যমে।

গ্রীক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Charactristics of Greek Civilization)

প্রাচীন গ্রীক সমাজ ব্যবস্থার মূলভিত্তি ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদ। অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রীকরা ছিল সমৃদ্ধশালী এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। নিম্নে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল ঃ

প্রাচীন গ্রীক সমাজ ছিল শ্রেণী বিভক্ত। তখন সেখানে তিনটি প্রাচীন শ্রেণী ছিল, যেমন- অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেনী ও দরিদ্র শ্রেণী।

সামাজিক অবস্থা ঃ প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগে মানবেতিহাসের প্রথম শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গড়ে উঠে। তখন সেখানে তিনটি প্রধান শ্রেণী ছিল, যেমন- অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেনী ও দরিদ্র শ্রেণী। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ক্রীতদাস, ভূমিদাস, শ্রমিক ও সাধারণ চাষীরা অন্তর্ভূক্ত ছিল। সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থান ছিল অভিজাত শ্রেণীর, মধ্যস্তরে ক্ষমতাসীন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নস্তরে নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষক। গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলো বিবদমান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং নিরন্তর ক্ষমতার লড়াই চলত। শ্রেণীদ্বন্দ্ব সবচেয়ে বেশী দেখা দিয়েছিল এথেন্সে। ক্রীতদাসদের দ্বারা সমস্ত কায়িক পরিশ্রমের কাজ করানো হত, যেমন কারখানা, পূর্তকর্ম, অফিস আদালতের কেরানী, পিয়ন, দারোয়ান ইত্যাদি। গ্রীসের সকল মানুষ নাগরিক মর্যাদা ভোগ করতে পারতনা। নগরে বাস করলেই নাগরিক হওয়া যেত না। নাগরিকদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজকর্ম, তাদের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান ও বিষয়বৈভব রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ক্রীতদাসদের দিয়ে করানো হত। গ্রীসে নানা উপজাতি বাস করত। সেজন্য প্রাচীন গ্রীক জাতিকে সংকর বলে গণ্য করা হয়। গ্রীসের সামাজিক সংগঠন ধাপে ধাপে বিকাশ লাভ করে। গ্রীসের অধিবাসীরা প্রথমে কতকগুলো গোত্র বা কৌমে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গোত্র গঠিত হয়। প্রতিটি গোত্রের একজন আদি পিতা ছিল এবং তার মাধ্যমে গোত্রের সদস্যরা রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। গোত্রগুলো গ্রামে বাস করতো। সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিল গোত্র।

প্রাচীন গ্রীসে সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কায়িক শ্রম। ক্রীতদাসরা ছিল এথেন্স ও স্পার্টাসহ গ্রীসের সকল নগর রাষ্ট্রের কায়িক শ্রম দাতা জনগোষ্ঠী।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কায়িক শ্রম তথা দাস প্রথা (Slavery)। ক্রীতদাসরা ছিল এথেন্স ও স্পার্টাসহ প্রাচীন গ্রীসের সকল নগর রাষ্ট্রের কায়িক শ্রম দাতা জনগোষ্ঠী। যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হত। যেহেতু গ্রীস পাহাড় সংকুল একটি দেশ সেহেতু সেখানে শুরুতে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠেনি। তবে গ্রীকদের সাধারণ জনগনের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল কৃষি ও পশুপালন। তাছাড়া, তারা আঙ্গুর, জলপাই ও মদ উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা ঘোড়া, মেষ ও ছাগল পালন করত। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। বহির্বাণিজ্য মূলত অভিজাত শ্রেণীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। তারা তাদের পোষাক নিজেরাই তৈরী করত। গ্রীকরা ধাতুর মুদ্রার প্রচলন করেছিল। গ্রীকরা খনিক সম্পদ আহরণে সক্ষম ছিল। খনির মালিক ছিল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র খনিগুলোকে নাগরিকদের কাছে ইজারা দিত। ক্রীতদাসরা খনিতে কাজ করত। এজন্য প্রাচীন গ্রীসের দাসপ্রথাকে একটি শিল্প ব্যবস্থা (Industrial System) বলা হয়। তারা আকরিক ধাতু কেটে কারখানার যন্ত্রপাতি তৈরী করত এবং পাশ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে খাদ্য বা মুদ্রার বিনিময়ে রপ্তানী করত।

নগর গড়ে তোলা ছিল গ্রীক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সভ্যতায়সর্বপ্রথম পরিকল্পিতভাবে নগর গড়ে উঠে বলে একে নগর-সভ্যতাও বলা হয়।

নগর সভ্যতা ঃ নগর গড়ে তোলা ছিল গ্রীক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ সভ্যতায় সর্বপ্রথম পরিকল্পিতভাবে নগর গড়ে উঠে বলে একে নগর সভ্যতাও বলা হয়। এসব নগরের প্রতিটিকে

www.swapno.in

এক একটি নগর রাষ্ট্র বলা হত। প্রাচীন গ্রীসে কয়টি নগর রাষ্ট্র ছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনেকের ধারণা এর সংখ্যা ১৫৮টি হবে। নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্পার্টা, এথেন্স, করিন্থও পিলিস ছিল উল্লেখযোগ্য। এসবের মধ্যে স্পার্টা ছিল আয়তনে সবচেয়ে বড় (৩,৩৬০ বর্গমাইল), তারপরেই ছিল এথেন্সের অবস্থান (১০৬০ বর্গমাইল)। করিন্থ ও পিলিসের আয়তন ছিল যথাক্রমে ৩৫২ বর্গমাইল ও ৭২ বর্গমাইল মাত্র। স্পার্টা ছিল সমরপন্থার অনুসারী ও স্বৈরতান্ত্রিক। স্পার্টার রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমন কঠোর ছিল যে, নাগরিকদের বিদেশ ভ্রমন করা নিষিদ্ধ ছিল। সকল পুরুষ নাগরিকের জন্য সামরিক শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। এথেন্স সমুদ্র তীরের অনেকগুলো ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রকে একত্রিত করে গড়ে উঠেছিল । এথেন্সের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল স্পার্টার বিপরীত। এথেন্স ছিল গণতান্ত্রিক। তবে এ দুটি নগর রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা অভিজাতদের মাধ্যমেনিয়ন্ত্রিত হত।

> গ্রীকরা প্রথম শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং একই স্থানে একত্রে বহুলোকের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ গ্রীক সভ্যতার মূল কেন্দ্র বিন্দু ছিল দুটো কথা- স্পার্টা ও এথেন্স নগর রাষ্ট্র। এদের শাসন ব্যবস্থা অভিজাত শ্রেণীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হত। অভিজাত শ্রেণীর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার উৎস ছিল জমির মালিকানা। নগর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোর শীর্ষে ছিল নগরের রাজা। তবে তিনি সর্বময় ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। কারণ নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও পরিবার, গোত্র ও উপজাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। স্পার্টায় সামরিক স্বৈরতন্ত্র বিরাজ করছিল। স্পার্টা বৃহত্তম নগর রাষ্ট্র হলেও কৃষি জমির পরিমাণ ছিল কম। অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে কম সম্পদের অধিকারী। সেজন্য স্পার্টা প্রায়শই বল প্রয়োগ করে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো দখল করে নিয়েছিল এবং বিজিত নগর রাষ্ট্রগুলোর জনগণকে ভূমিদাস ও ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। সমৃদ্ধ নগর রাষ্ট্র এথেন্সও বহুবার স্পার্টার আক্রমণের শিকার হয়েছিল। এথেন্সের রাজনৈতিক রূপ ছিল স্পার্টার বিপরীত। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে এথেন্সের গণতন্ত্র পরিণতি লাভ করেছিল। সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) প্রবর্তিত হয়েছিল।

> ধর্মের দিক থেকে প্রাচীন গ্রীকরা ছিল ভারতীয় হিন্দুদের মতো বহু - ঈশ্বরবাদী। শুরুতে গ্রীকরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং প্রেতাত্মার পূজা করত। পরে প্রেতাত্মাগুলো দেব-দেবীর রূপ নেয় এবং এভাবে বহু ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এথেন্সের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তিন পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছিল- রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও সবশেষে গণতন্ত্র। এথেন্সের নাগরিকরা পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করত, কিন্তু বহিরাগতরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

ধর্ম ও বিশ্বাস ঃ গ্রীকরা ছিল বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তবে তারা প্রথমে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস করত এবং প্রেতাত্মার পূজা করত। পরে প্রেতাত্মাগুলো দেব দেবীর রূপ নেয় এবং এভাবে বহু ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবী, সূর্য, সমুদ্র, বড় বড় নদী তাদের কাছে দেবতার মর্যাদা লাভ করে এবং তাদের পূজা শুর হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে প্রাচীনকালের গ্রীকরা ভারতীয় হিন্দুদের মতো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত ছিল বলা যায়। গ্রীকদের ধারণা ছিল যে, দেবদেবীর আচার-আচরণ মানুষের মত এবং ষড় রিপু দ্বারা তাড়িত হয়; কিন্তু দেবতারা অমর ও অতি প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী। গ্রীকদের মনে ভবিষ্যতকে জানবার প্রবল আগ্রহ ছিল এবং তারা ভবিষ্যত্বাণী বিশ্বাস করত। তাদের ধারণা ছিল যে, প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে রয়েছে দেবতার নির্দেশ। তাই তারা দেবতার দৈববাণী কামনা করত এবং ইহা দ্বারা প্রভাবিত হত। প্রাচীন গ্রীক ধর্মের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সেখানে সংঘবদ্ধ ধর্মযাজক শ্রেণীর অনুপস্থিতি। ফলে পুরোহিত শ্রেণী গড়ে উঠেনি।

> প্রাচীন গ্রীক সমাজে পরিবার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পিতামাতা, অবিবাহিত সন্তান ও পৌত্রাদি নিয়ে গ্রীক পরিবার গঠিত হত।

আইন ও বিচার ব্যবস্থা ঃ প্রাচীনকালে গ্রীসের সর্বত্র অভিন্ন আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি যেমন, স্পার্টার শাসকগণ ইচ্ছামত আইন তৈরী করে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু এথেন্সের বিচার কার্য পরিচালনার জন্য একটি জুরি ছিল। গ্রীক বিচার পদ্ধতিতে ধর্ম যাজকদের স্থান ছিল না। গ্রীকরা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার পত্তন করেছিল। প্রতি বছরের শুরুতে ছয় হাজার নাগরিককে লটারীর মাধ্যমে বাছাই করা হত। এরা

www.swapno.in

জুরীর দায়িত্ব পালন করতেন। প্রতিটি মামলার জন্য ২০১ থেকে ১০০১ জন সদস্য নিয়ে জুরী গঠিত হত এবং জুরীর সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে রায় দেওয়া হত। বিচারক একজন থাকতেন বটে, কিন্তু জুরীরাই ছিলেন প্রকৃত বিচার কর্তা। সংখ্যাগরিষ্ঠ জুরীর মতামত উপেক্ষা করার ক্ষমতা বিচারকের ছিল না।

পরিবার ঃ প্রাচীন গ্রীক সমাজে পরিবার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পিতামাতা, অবিবাহিত সন্তান ও পৌত্রাদি নিয়ে গ্রীক পরিবার গঠিত হত। পিতা ছিলেন পরিবার প্রধান। পরিবারের আকৃতি সীমিত রাখার জন্য সন্তান হত্যা প্রচলিত ছিল। আর ছেলে সন্তান ছিল অধিকতর কাম্য। সীমিত আকারের পরিবার গঠনের জন্য মূলত মেয়ে সন্তানকেই হত্যা করা হত। পরিবারে পিতার প্রতাপ ছিল অত্যন্ত প্রবল। পিতা নবজাত শিশুকে মেরে ফেলতে পারতো ও সন্তানদের শ্রম ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জন করত। এমনকি, মৃত্যুর আগে বিধবা স্ত্রী তার ভাবী স্বামী নিয়োগ করে যেতো।

বিবাহ ঃ প্রাচীন গ্রীসে বিয়ে-সাদির বেলায় প্রেম-ভালবাসার তেমন কোন মূল্য ছিলনা। পরিবারের অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়ের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বর-কনে ঠিক করতেন। কনের বাপকে যৌতক দিতে হত। তবে এই যৌতুক কনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হত। গ্রীক যুবকরা মূলত স্ত্রীর যৌতুকের লোভে ও বংশ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিয়ে করতো। বিয়ের পর প্রত্যেক বিত্তমান গ্রীক নাগরিক উপপত্নী রাখতো। পুরুষ বিনাকারণে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো; কিন্তু নারী সুনির্সিষ্ট কারণ না দেখিয়ে এবং সরকারী অনুমতি ছাড়া স্বামীকে তালাক দিতে পারতো না। নারীরা অবরুদ্ধ জীবন যাপন করত। স্পার্টায় মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স বিশ ও পুরুষদের ত্রিশ।

গ্রীকরাই প্রথম গণতান্ত্রিক বিচার ও শাসন ব্যবস্থা চালু করে।

গ্রীক সভ্যতার অবদান (Contributions of Greek Civilization)

বিচার-ব্যবস্থা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রীকদের অতুলনীয় অবদানের ফলে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা মানবেতিহাসে এক অনন্য সাধারণ স্থান অধিকার করে আছে। নিম্নে উক্ত সভ্যতার অবদানগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

গণতান্ত্রিক বিচার ও শাসন ব্যবস্থা ঃ গ্রীকরাই প্রথম গণতান্ত্রিক বিচার ও শাসন ব্যবস্থা চালু করে। এর পূর্বে বিচার-ব্যবস্থা মূলত ধর্মীয় যাজক বা পুরোহিতদের দ্বারা পরিচালিত হত। স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য আধুনিক সভ্যতা প্রাচীন গ্রীক জাতির মনীষার কাছে চিরঋণী।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ গ্রীকরা প্রথম শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং একই স্থানে একত্রে বহুলোকের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পেশাদার শিক্ষকগণও ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুল স্থাপন করতেন। প্রাচীন গ্রীসে সরকারী বিদ্যালয় ছিল না। ছয় বছর বয়সে শিশুরা স্কুলে যেত, আঠার বছর বয়সে যুবকদেরকে সেনাদলে ভর্তি করা হত এবং কঠোর সামরিক শিক্ষা দেয়া হত। মেয়েরা মায়ের কাছে বাড়ীতে লেখাপড়া করত। নগর রাষ্ট্র এথেন্স ছিল প্রাচীন গ্রীসের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র। আর স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলত সামরিক। উক্ত সামরিক শিক্ষা থেকেই আধুনিক সামরিক শিক্ষার সূচনা ঘটে। তাছাড়া, ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব, সঙ্গীত সম্পর্কেও তারা জ্ঞানার্জন করত।। সেখানকার চারণ কবিরা বীরত্বপূর্ণ কাহিনী কাব্যাকারে রচনা করে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতেন। গ্রীক কবি হোমার রচনা করে গিয়েছেন মহাকাব্য ইলিয়াড ও অডিসী। এভাবে তারা কাব্য ও ব্যাকরণ চর্চার মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যে অবদান রেখে গেছেন।

www.swapno.in

বিজ্ঞান ও দর্শন ঃ প্রাচীন কালের গ্রীকরা বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। বিজ্ঞানী ডেমেক্লিটাস, হেরাক্লিটাস এর নাম বিজ্ঞান জগতে এখনও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন হিপোক্রেটিস। তাছাড়া, অংক শাস্ত্রে ইউক্লিড এবং জ্যামিতিশাস্ত্রে পিথাগোরাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিষ্টটল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগের তিনজন বিশিষ্ট দার্শনিক। এরা পরস্পর ছাত্র-শিক্ষাক সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। সক্রেটিসের অন্যতম ছাত্র ছিলেন প্লেটো, আর প্লেটোর ছাত্র এরিষ্টটল এবং এরিষ্টটলের ছাত্র ছিলেন আলেকজান্ডার। সক্রেটিস বিষপানে আত্মহত্যা করেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনার অনেকটাই প্লেটোর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিপাবলিক'-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভাববাদী দার্শনিক প্লেটোর ছাত্র বাস্তববাদী এরিষ্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'পলিটিকস্'। উক্ত গ্রন্থ দুটি সমগ্র সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশের পথ সুগম করে দিয়েছে।

> গ্রীকরা বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। বিজ্ঞানী ডেমেক্লিটাসও, হিরাক্লিটান এর নাম বিজ্ঞান জগতে এখনও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ গ্রীকরা বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। তাদের শিল্পের মননশীলতা ও শিল্প কলা ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা এক্রোপলিস' এর মতো বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পের স্রষ্টা। তারা বড় বড় মর্মর মূর্তি ও দর্শনীয় মন্দির নির্মাণ করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে বিশেষ অবদান রেখে গেছে।

অনুশীলন ১ (Activity 1) সময় ৫ মিনিট

নিম্নের ছকটি পূরণ করুন ঃ

১। গ্রীক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি তিনটি : যথাক্রমে ------------, ------------, ------------।

২। গ্রীক সমাজ ব্যবস্থার তিনটি শ্রেণী; যথাক্রমে -----------, ------------, ----------।

৩। স্পার্টার শাসন ব্যবস্থার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল ----------, -----------, ---------।

অনুশীলন ২ ঃ সময় ৬ মিনিট

আধুনিক যুগের পরিবার পরিকল্পনার সাথে গ্রীক সভ্যতার কোন্ বৈশিষ্ট্যটির যোগসূত্র বিদ্যমান? ঐ বৈশিষ্ট্যটির পাঁচটি বাক্য লিখ?

১.
২.
৩.
৪.
৫.

সংক্ষেপ ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০ সালে সমুদ্র তীরবর্তী প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিকাশ শুরু হয় এবং খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক সভ্যতার অবসান ঘটে। প্রাচীন গ্রীস ছিল মানব সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি। আধুনিক সভ্যতার প্রায় সব কয়টি বৈশিষ্ট্যই গ্রীক সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম ও চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে গ্রীক সভ্যতা যে অভিনবত্বের সূচনা করেছিল তার তুলনা নেই। কিন্তু নৈতিক আদর্শ, স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক এবং নারীর সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রীক সভ্যতা অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার সমতুল্য ছিল বলে মনে হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন,

www.swapno.in

সাহিত্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীক পন্ডিতদের অবদান অবিস্মরণীয়। ধর্ম যাজকের অহেতুক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত গ্রীসের মানুষ দার্শনিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিল। তাই গ্রীক সভ্যতা মানব সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পেরেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। গ্রীস কোথায় অবস্থিত?

ক) ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিমে খ) ইউরোপ মহাদেশের পূর্বে

গ) ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণে ঘ) ভূমধ্য মহাসাগর তীরে

২। কোন কাজটি গ্রীক ক্রতিদাসরা করত না?

ক) অফিস আদালতের কেরানীর কাজ খ) অফিস আদালতের পিয়নের কাজ

গ) ব্যাংকের কেরানীর কাজ ঘ) কলকারখানার হিসেব নিকেশের কাজ।

৩। গ্রীকরা খনি হতে কি উৎপাদন করত?

ক) লোহা খ) স্বর্ণ

গ) ইস্পাত ঘ) আকরিক

৪। কিভাবে জুরীর সদস্যগণকে নির্বাচিত করা হত?

ক) লটারীর মাধ্যমে খ) নির্বাচনের মাধ্যমে

গ) সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ঘ) রাজার ইচ্ছা অনুসারে

৫। চিকিৎসা বিদ্যায় কোন গ্রীক পন্ডিত পারদর্শী ছিলেন?

ক) ডেমোক্রিটাস খ) হেরাক্লিটাস

গ) হিপোক্রেটিস ঘ) সক্রেটিস

www.swapno.in

সমুদ্র তীরবর্তী রোমান সভ্যতা

পাঠ ২

মূলধারণা

- রোমান সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- রোমান সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
- রোমান সভ্যতার অবদান
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠ শেষে আপনি

১. রোমান সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।

২. রোমান সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্টসমূহ জানতে পারবেন।

৩. রোমান সভ্যতার অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background)

> সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের মতে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে আল্পস পর্বতমালার পাদদেশে রোম নামক গ্রামে দাসদের সম্মিলিত চেষ্টায় যে বিশাল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত।

খ্রীষ্ট পূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে রোম ছিল ইতালী উপদ্বীপের একটি গ্রাম। সেখান থেকে রোমান সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। প্রাচীন রোমানরা নিজেদের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি সভ্যতা, যার নাম রোমান সভ্যতা। ম্যাকাইভারের মতে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে আল্পস পর্বতমালার পাদদেশে রোম নামক গ্রামে দাসদের সম্মিলিত চেষ্টায় যে বিশাল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত। তারা উন্নত প্রশাসনিক ও সুষ্ঠু আইন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে তাদের এলাকা শাসন করা শুরু করেন। ধীরে ধীরে তারা একদিকে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, মোসোপটেমিয়া, গ্রীস ও ম্যাসিডন সহ সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, এবং অপর দিকে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স, স্পেন ও দানিয়ুব নদীর পশ্চিম তীরবর্তীর এলাকাসহ গোটা পশ্চিম ইউরোপ তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। যেহেতু ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেহেতু তাকে পাশ্চাত্যের অন্যতম সমুদ্র তীরবর্তী প্রাচীন সভ্যতা বলে গণ্য করা হয়।

পুরাতন প্রস্তর যুগে রোম তথা ইতালী উপদ্বীপে জনবসতি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালে অর্থাৎ নতুন প্রস্তর যুগে ইতালী উপদ্বীপে আর্য জাতির আগমন শুরু হয়। যে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী গ্রীক সভ্যতার জনক সেই গোষ্ঠীই রোমান সভ্যতারও স্রষ্টা। এদের মধ্যে কয়েকটি দল খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সালে টাইবার নদীর তীরে ল্যাটিয়াম (latium) অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। রোম নামক গ্রাম থেকে রোম নগরীর উদ্ভব হয়। ল্যাটিয়ামে বসতি স্থাপনকারী ইন্দো-ইউরোপীয়দের ঐ অঞ্চলের ভাষা ছিল ল্যাটিন। তাই তারা ল্যাটিন জাত নামে পরিচিত ছিল। রোম নগরীর উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের অপূর্ণতা রয়েছে; কিন্তু কিংবদন্তীর অভাব নেই। কারোর মতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩ সালের ২২শে এপ্রিল; আর প্রতিষ্ঠাতা হলেন রমুলাম ও রেমুম নামের যমজ দুই ভাই। রাজা রমুলামের নাম অনুসারেই রাম নগরীর নামকরণ হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫৫ সালে এশিয়া মাইনর থেকে আগত

www.swapno.in

ইট্রাস্কান জাতি রোমের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। খ্রীস্টপূর্ব ৫০৮ সালে ইট্রাসকান জাতি নির্বাচিত সিনেট কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয়। তখন থেকে সিনেট কর্তৃক মনোনীত কন্সাল (Consul) দ্বারা রাজ্য শাসন শুরু হয়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতক রোম গৃহযুদ্ধের বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে গৃহযুদ্ধের অবসান হয় এবং আবার সিনেট কর্তৃক মনোনীত কন্সাল দ্বারা দেশটি শাসন হতে থাকে। খ্রীস্টপূর্ব ৪৬ সালে সেনানায়ক জুলিয়াস সিজার ক্ষমতায় আরোহন করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪ সালে সিজারের গুপ্তহত্যা ঘটে। তারপরও ২৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিনেট দ্বারা রোম শাসিত হত। ঐ সালে ডিওক্লিটিয়ানরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং প্রকাশ্য স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে জনমনে সৃষ্টি হয় চরম অসন্তোষ। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানদের হাতে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং এর ফলে রোমান সভ্যতার অবসান ঘটে।

রোমান সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ
(Characteristics of Roman Civilization)

প্রাচীন বিশ্বে রোমে যে সম্পদ, শৌর্য ও সমৃদ্ধির সমারোহ হয়েছিল তা প্রাচীন অন্যকোন সভ্যতার সাথে তুলনা করা যায় না। গণতান্ত্রিক আইন ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রোমানরা একটি অনন্য সাধারণ সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। আধুনিক সভ্যতার নির্দেশক হিসেবে অনেকে রোমান সভ্যতাকে অভিহিত করে থাকেন। নিম্নে রোমান সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

সামাজিক অবস্থা ঃ রোমে মূলত দুটি জাতি বসতিস্থাপন করেছিল। জাতি দুটির নাম যথাক্রমে স্যাবাইন ও ইট্রাসকান। এ দুটি জাতি নিয়ে রোমান জাতি নিয়ে গঠিত হয়। এদের যেকোন সদস্য রোমের নাগরিক ছিল। রোমান সমাজ ছিল শ্রেণী বিভক্ত। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার মতো রোমেও দাসপ্রথা ছিল। অভিজাত শ্রেণী দাসদের উৎপাদিত সম্পদ ভোগ করত আর দাসরা ছিল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর হাতেই ক্ষমতা ও সম্পদ কুক্ষিগত ছিল। কৃষিকাজ থেকে কারখানার কাজ পর্যন্ত সকল কাজকর্ম ক্রীতদাসদের দ্বারা সম্পন্ন হত। অন্যদিকে প্রাচীন রোম সমাজে কতকগুলো অভিজাত ও ক্ষমতাধর পরিবারের সৃষ্টি হয়। এসব ক্ষমতাধর পরিবারের সকল সদস্যকে একত্রে প্রোট্রিসিয়ান বলা হত। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে বলা হত প্লেবিয়ান। শুরুতে সিনেটের সদস্যপদ ও অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ পদ প্রোট্রিসিয়ানদের দখলে ছিল। প্লেবিয়ান জনগণ কৃষি ও শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করা ছাড়াও ছোট খাট ব্যবসা করে জীবন যাপন করত।

প্রাচীন রোমান সমাজ ছিল শ্রেণী বিভক্ত। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার মতো রোমেও দাসপ্রথা ছিল। অভিজাত শ্রেণী দাসদের উৎপাদিত সম্পদ ভোগ করত; আর দাসরা ছিল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ রোমের অধিবাসীরা মূলত ছিল কৃষিজীবী। কৃষি এবং দাস ব্যবসাই ছিল রোমান অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কারণ প্লেবিয়ান শ্রেণীর বেশীরভাগ লোকই কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল। আর ক্রীতদাসরা কৃষি, শিল্প, পূর্তকর্মসহ অন্য যেকোন উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিল। প্রকৃত পক্ষে দাসদের কোন উৎপাদনই হত না। রোমানরা খাদ্যে স্বায়ংসম্পূর্ণ ছিল না। তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি বিজিত অঞ্চল থেকে স্বল্পমূল্যে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানী করত। ধনী প্যাট্রিসিয়ানদের বড় বড় খামার ছিল। খামারে কাজ করার জন্য ক্রীতদাস নিয়োগ করা হত। রোমের শিল্প কারখানা ছিল কুটির শিল্পের পর্যায়ের। দুটি বড় কারখানা ছিল, যথা : একটি কাগজের কল ও অন্যটি রঙের কারখানা। শ্রমিকদের আশিভাগই ছিল ক্রীতদাস। ব্যবস্থাপকদের মধ্যেও কেউ কেউ ক্রীতদাস ছিল। এভাবে ধীরে ধীরে প্রাচীন রোমান অর্থনীতি ক্রীতদাস নির্ভর হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, দাসদের সরাসরি বাজারে বেচাকেনা হত। প্রতি সপ্তাহে একদিন দাস কেনাবেচার বাজার বসতো এবং সেখানে উর্ধপক্ষে দশ হাজার পর্যন্ত দাস কেনাবেচা হত।

রোমের অধিবাসীরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। কৃষি ও দাস ব্যবসাই ছিল রোমান অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

www.swapno.in

রোমান সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার ছিল একটি প্রতিষ্ঠানের মতো। পিতা, মাতা, কন্যা, পুত্র ও ক্রীতদাসদেরকে নিয়ে পরিবার গঠিত হত।

প্রাচীন গ্রীসের মতো রোমের রাষ্ট্র ব্যবস্থাও মূলত তিনটি পর্যায়ে বিকশিত হয়েছিল, যথা : রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র।

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ প্রাচীন গ্রীসের মতো রোমের রাষ্ট্র ব্যবস্থাও মূলত তিনটি পর্যায়ে বিকশিত হয়েছিল, যথা : রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০৮ অব্দ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের যুগ। রাজারা স্যাবাইন ও ইট্রাস্কান গোত্রের দলপতিদের নিয়ে সিনেট গঠন করতেন এবং এদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। ধীরে ধীরে সিনটরদের সংখ্যা প্রায় তিনশতে পৌঁছায়। পরিবারসমূহ প্যাট্রিনিয়ান নামে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়। এরাই সিনেটের সকল সদস্যপদ এবং সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদসমূহ দখল করে রাখত। তাছাড়া প্যাট্রিসিয়ানরাই কৃষি জমির নব্বই শতাংশের মালিক ছিল । এক কথায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্যাট্রিসিয়ানদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। যখন প্রাচীন রোমান সমাজের অধিকাংশ মানুষ অধিকার বঞ্চিত হতে থাকে তখন সিনেটরা গৃহযুদ্ধের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য রাজাকে বাদ দিয়ে দুজন কন্সাল নিয়োগ করে। দু'জন কন্সাল নিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল যাতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়। ধীরে ধীরে নাগরিকদের সরাসরি ভোটে সিনেট নির্বাচিত হয়। কিন্তু শ্রেণী বৈষম্য থেকে যায়। কারণ অভিজাত ও ধনী পরিবারের লোকেরা টাকা দিয়ে দরিদ্র কৃষক মেহনতী মানুষ ও দাসদের কাছ থেকে ভোট কিনে নিত। রোমান সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই যে ক্রীতদাসরাও কালক্রমে ভোটাধিকার পেয়েছিল। এভাবে সামাজিক বিবর্তনের ধারায় প্রাচীন রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ধর্ম ঃ রোমানদের মধ্যে প্রবল ধর্মীয় বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। তারা গোড়ার দিকে সর্ব প্রাণবাদে (animism) বিশ্বাস করত। তাছাড়া, রোমানরা অসংখ্য দেবদেবী ও প্রেতাত্মার পূজা করত। তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। রোমের দেবতারা ছিল নিরাকার ও নৈর্ব্যক্তিক; রোমানরা এদেরকে বলত নুমিনা বা প্রেতাত্মা। তাদের প্রধান প্রধান দেবদেবীর মধ্যে জুপিটার, ভেনাস, নেপচুন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রোমানরা পুরোহিতকে অত্যন্ত সম্মান এবং গুরুত্ব দিত, পুরোহিতরা মন্দিরে অবস্থান করে ধর্মকর্ম পরিচালনা করত। ফলে রোমান সমাজে ধর্ম ও মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। প্রথম শতাব্দীর শুরুতে রোমান সমাজে খ্রীষ্টধর্ম প্রচলিত হয়। ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কনস্টাইটাইন খ্রীস্টধর্মকে আইন সম্মত ধর্ম বলে স্বীকার করেন। ৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে রোমে খ্রীষ্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

রোমানদের মধ্যে প্রবল ধর্মীয় বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। তারা গোড়ার দিকে সর্ব প্রাণবাদে (animism) বিশ্বাস করত

আইন ও বিচার ব্যবস্থা ঃ রোমের আইন ও বিচার ব্যবস্থা অনেকটা গ্রীকদের মতই ছিল। তবে আইনের চোখে ক্রীতদাসকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না, এরা ছিল ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য পণ্য। সে বিচারের জন্য বিচারালয়ে আশ্রয় নিতে পারত না। মালিক তাকে ইচ্ছামত শাসন করতে পারত, এমনকি প্রাণনাশও করতে পারত। অপরাধীদের বিচারের জন্য বিচারালয় ছিল। সিনেটদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগ করা হত; এবং সিনেটের অনুমোদনক্রমে রাজা (কন্সাল)বিচারকদের নিয়োগদান করতেন। প্রথম দিকে বিচারকগণ সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের পক্ষে রায় প্রদানে পছন্দ করতেন।

দাসরা ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য বিচারালয়ে আশ্রয় নিতে পারত না।

ভাষা ও সাহিত্য ঃ রোমানদের ভাষা ছিল ল্যাটিন। তারা সাহিত্য চর্চা করত। তারা নিজেদের সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি গ্রীক সাহিত্যও চর্চা করত। গ্রীক ভাষাও ছিল রোমানদের জন্য অবশ্য পঠনীয়।

রোমানদের ভাষা ছিল

পরিবার ঃ রোমান সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার ছিল একটি প্রতিষ্ঠানের মতো। পিতা, মাতা, কন্যা, পুত্র ও ক্রীতদাসদেরকে নিয়ে পরিবার গঠিত হত। পরিবারের প্রধান ছিল পিতা। পিতা তার ইচ্ছা অনুসারে পরিবারের যে কোন সদস্যের উপর প্রভাব খাটাতে পারত। সে পুত্রকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করতে পারত, এমনকি অবাধ্য সন্তানকে হত্যাও করতে পারত। স্ত্রীর অপরাধের বিচার করত স্বামী। অবাধ্য স্ত্রীকে স্বামী হত্যাও করতে পারত। এক কথায় পরিবারে পিতাই ছিলেন হর্তা-কর্তা ও বিধাতা।

www.swapno.in

বিবাহ ঃ রোমান পরিবারের ভিত্তি ছিল বিবাহ। বিবাহের জন্য পুরুষদের সর্বনিম্ন বয়স ছিল চৌদ্দ ও মেয়েদের বারো। পিতামাতা সন্তানের বিয়ে ঠিক করত। পিতামাতা শিশু সন্তানদের শৈশবে বাকদানের মাধ্যমে বিবাহ দিতে পারত। পিতার বিনা অনুমতিতে পুত্রের বিবাহ করার অধিকার ছিল না। বিবাহ তিন ধরনের ছিল, যথা ব্যবহারসিদ্ধ বিবাহ, বিক্রয় বিবাহ ও আনুষ্ঠানিক বিবাহ। ব্যবহার সিদ্ধ বিবাহে দম্পতি এক বছর একত্রে বাস করত এবং এক বছর পর স্বামী-স্ত্রী রূপে স্বীকৃত পেত। বিক্রয় বিবাহে কন্যার পিতার কাছ হতে বর স্ত্রী হিসেবে কিনে নিত। আনুষ্ঠানিক বিবাহে বর ও কনের উভয়ের পিতার আলোচনা ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ ধরনের কেক খাওয়ার মধ্য দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। এ ধরনের বিবাহ অধিকতর স্থায়ী ছিল। এতে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন উপায় ছিল না।

> রোমান পরিবারের ভিত্তি ছিল বিবাহ। বিবাহের জন্য পুরুষদের সর্বনিম্ন বয়স ছিল চৌদ্দ ও মেয়েদের ছিল বারো।

নারীর অবস্থান ঃ রোমান নারীর উপর বিভিন্ন ধরনের আইনগত বাধা-নিষেধ আরোপিত ছিল। নারীরা আদালতের আশ্রয় নিতে পারতো না। আদালতে স্বাক্ষী হতে পারত না। তারা সর্বদাই একজন অভিভাবকের অধীনে থাকতো। তাই বলে রোমান নারীরা গৃহে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করত না। মেয়েরা ক্ষুদ্র ব্যবসা, কলকারখানায় চাকুরী করত। অভিজাত শ্রেণীর নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারতো।

রোমান সভ্যতার অবদান (Contribution of Roman Civilization)

শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য ঃ রোমানরা পরিবার-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল। অভিজাত শ্রেণীর প্রতিটি লোকে গ্রীক ভাষা শিখতে হত। তারা গ্রীকদের সাহিত্য ও দর্শন চর্চা করত। যেহেতু তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক সেহেতু গ্রীকদের মতো বিখ্যাত দার্শনিক ও সাহিত্যিক রোমানরা জন্ম দিতে পারেনি। মুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করার সুযোগ ছিল। রোমানরা পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে শিক্ষিত করে তোলার যে ঐতিহ্য রেখে গেছে তা আধুনিক সমাজের শিক্ষাকে গতিশীল করে তুলেছে। রোমান কবি ভার্জন 'ইনিটা নামে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ও হোরেস গীতি কবিতা রচনা করে সাহিত্য জগতে বিশাল অবদান রেখে গেছেন।

স্থাপত্য শিল্প ঃ স্থাপত্য শিল্পে রোমানদের বিশেষ অবদান ছিল। তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাস্তা ঘাট তৈরী করত। তারা অট্টালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে ছোট ছোট ইট ব্যবহার করত। এর আগে অন্যকোন প্রাচীন সভ্যতায় ছোট ছোট ইটের ব্যবহার হত না। তাছাড়া, তারা শ্বেত পাথরের মোজাইক ব্যবহার করত। এগুলো ছিল আধুনিক সভ্যতার স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান বিশেষ।

> রোমানরা পরিবার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল। অভিজাত শ্রেণীর প্রতিটি লোককে গ্রীক ভাষা শিখতে হত। তারা গ্রীকদের সাহিত্য ও দর্শন চর্চা করত।

আদালত ঃ রোমনরাই প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে একাধিক আদালতের জন্ম দিয়েছিল। যদিও আদালতের বিচার-ব্যবস্থায় ত্রুটি ও দুর্নীতি ছিল। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার নিম্ন ও উচ্চ আদালত ব্যবস্থা রোমান সভ্যতা থেকে গৃহীত। অর্থাৎ রোমানরা প্রশাসনিক ও বিচার-ব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়ে আধুনিক কালের প্রশাসনিক ও বিচার-ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে গেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, রোমানরা জমি-জমার পরিমাপ ও রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সেজন্য আধুনিক আইন শাস্ত্র অধ্যয়নে রোমান আইন একটি অন্যতম গুরুত্ব বিষয় হিসাবে বিবেচিত।

অনুশীলন ১ (Activity-1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সর্বোচ্চ ৫০টি শব্দ দ্বারা রোমান সভ্যতার সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও

www.swapno.in

অনুশীলন ২ (Activity) সময় ৬ মিনিট

টীকা লিখ

কন্‌সাল
প্যাট্রিসিয়ান

সংক্ষেপ ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ইতালী উপদ্বীপের ল্যাটিয়ান অঞ্চলের রোম নামক একটি গ্রাম থেকে সমুদ্রতীরবর্তী প্রাচীন রোমান সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে রোমের পতন হয়। উত্থান ও পতনের মধ্যবর্তী সময়ে রোমানরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। রোমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্যাট্রিসিয়ান বা সিনেটের হাতে ন্যস্ত ছিল। সেখানে গণতন্ত্রের নামে বরাবরই স্বৈরশাসন বিদ্যমান ছিল। মূলত দাসদের শ্রমের ভিত্তিতে রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা দাসদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করত। তারা ক্রীত দাসদের হত্যাও করতে পারত। রেমানরা ব্যবসা, স্থাপত্য, পারিবারিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখে গেছে। তবে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টনের অসঙ্গতি, জনগনের চারিত্রিক অধ:পতন, সামাজিক অনাচার রোমান সভ্যতাকে অন্তসারশূন্য করে ফেলে। এর ফলে বিশ্ব ইতিহাসে প্রাচীন রোমান সভ্যতার অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। রোমান ভাষার নাম কি?

ক) রোমান

খ) ল্যাটিন

গ) ইংরেজি

ঘ) হিব্রু

www.swapno.in

২। রোমান সভ্যতায় চিরস্থায়ী বিবাহ ব্যবস্থা কোনটি?

ক) বিক্রয় বিবাহ

খ) ব্যবহার সিদ্ধ বিবাহ

গ) আনুষ্ঠানিক বিবাহ

ঘ) বাক্‌দান বিবাহ

৩। সিনেটর কি?

ক) নির্বাচিত প্রতিনিধি

খ) পার্লা মেন্টের সদস্য

গ) প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর সদস্য

ঘ) বিভিন্ন গোত্রের দলপতি

৪। প্রাচীন রোমের কল-কারখানার শ্রমিকদের কয় ভাগ ছিল ক্রীতদাস?

ক) $\frac{৪}{৫}$ ভাগ

খ) $\frac{২}{৩}$ ভাগ

গ) $\frac{৩}{৪}$ ভাগ

ঘ) $\frac{৫}{৬}$ ভাগ

৫। 'ইনিটা' কি?

ক) একটি কাটা পাথরের নাম

খ) রোম সম্রাজ্ঞীর নাম

গ) একটি শহরের নাম

ঘ) একটি কাব্যগ্রন্থের নাম

www.swapno.in

www.swapno.in

মেসোপটেমীয় নদী তীরবর্তী সভ্যতা

পাঠ ৩

মূলধারণা

- মেসোপটেমীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য
- মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবদানসমূহ
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objective)

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

১. মেসোপটেমীয় সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন,
২. ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৩. মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৪. মেসোপটেমীয় সভ্যতার মুখ্য অবদান সম্বন্ধে অবগত হতে পারবেন।

প্রাথমিক ধারণা (Preliminary Idea)

টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীরমধ্যবর্তী উপত্যকার নাম মেসোপটেমিয়া নামে পরিচিত।

ইতিহাসবিদরা মেসোপটেমীয়, সুমেরীয় ও আসিরীয় সভ্যতা তিনটিকে বৃহত্তর অর্থে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলে অভিহিত করেন। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকাটির নাম মেসোপটেমিয়া। গ্রীক লেখকগণ মূলত এ স্থানটির নামকরণ করেছেন। মেসোপটেমিয়া দু'ভাগে বিভক্ত- উত্তর ও দক্ষিণ। উত্তর অংশের বর্তমান নাম অ্যাসিরীয় এবং দক্ষিণ অংশের নাম মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়া এলাকাটি ছিল অখন্ড ও অবিচ্ছিন্ন। এটি মূলত টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী উর্বর উপত্যকা ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত নামের মধ্যেই তার পরিচয় মিলে। গ্রীক (Meso মানে ইংরেজি Middle এবং Prtamia মানে valley। অর্থাৎ Mesopotamia মানে Middle valley) তথা মধ্যবর্তী উপত্যকা। ফলে সেখানে একটি প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠে।

ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background)

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও নৃবিজ্ঞানীদের মতে মেসোপটমিয়া প্রাচীনতম সভ্যতার উৎপত্তিস্থল। এখানে প্রাচীনকালে অনেকগুলো বসতি গড়ে উঠেছিল। বসতিগুলোর মধ্যে অ-সেমেটিক সুমের, সেমেটিক আক্কাদ প্রধান। সুমেরের অধিবাসী সুমেরীয়রা পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার সূত্রপাত ঘটায়। তবে তাদের অভিগমন ও বসতিস্থাপন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে তারা কতকগুলো উন্নত নগর গড়ে তুলে ছিল। সুমেরীয় নগরগুলো ছিল এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ধীরে ধীরে সেখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে তারা স্বাধীনতা হারায়। খ্রীষ্টপূর্ব একবিংশ শতাব্দীতে আক্কাদের রাজা সারগন সমগ্র আক্কাদ ও সুমেরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সুমেরীয় স্বাধীন রাষ্ট্রের পতন ঘটে

www.swapno.in

এবং সমগ্র মেসোপটেমিয়ায় আক্কাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সারগনের মৃত্যুর পর মেসোপটেমিয়ার সার্বভৌমত্ব চলে যায় এবং সুমেরীয়রা পরাধীনতা থেকে মুক্তি পায়। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে সুমেরীয় রাজা 'উর-নামু' অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং সমগ্র মেসোপটমিয়া দখল করে নেন। কিন্তু সুমেরীয় সার্বভৌমত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৬০ অব্দে সেমেটিক ভাষাভাষী এমোরাইটদের রাজা হামুরাবি সমগ্র মেসোপটেমিয়া আপন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। হামুরাবির রাজধানী ছিল ব্যাবিলন। তিনি ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা। ফলে তাঁর অধীনে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায় এবং মেসোপটেমিয়া সভ্যতার চরম উৎকর্ষ ঘটে। হামুরাবি অত্যন্ত দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে খ্রিষ্টপূর্ব ১৭৯২ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪২ বছর এ বিশাল ভূ-খন্ড শাসন করেন। অত:পর খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ সালে এশিয়ায় মাইনরের হিট্টাইট জাতি ব্যাবিলন নগরী দখল করে।

মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

মেসোপটেমীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

কৃষি ঃ প্রত্নতত্ত্ববিদগনের কাছ হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মেসোপটেমীয় সভ্যতা ছিল কৃষি নির্ভর অর্থাৎ এটি কৃষিজীবীদের দ্বারা সৃষ্ট সভ্যতা। তারা কৃষিকাজে পশু ব্যবহার করত এবং শস্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা যাতায়াতের ক্ষেত্রে চাকা ওয়ালা গাড়ী চালাত। চাষীরা গ্রামে নলখাগড়া বা ছন দিয়ে তৈরী কুটিরে বাস করতো। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাস মেসোপটেমিয়ার শস্যের প্রাচুর্য এবং কৃষি ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদী থেকে জল সেচ করার জন্য খাল কাটা হয়েছিল। তাছাড়া, জলসেচের কার্যকরী ব্যবস্থার জন্য আরো তৈরি করা হয়েছিল ডাইক ও বাঁধ। বস্তুত, সেচ ব্যবস্থা দ্বারা মেসোপটেমিয়রা জমিকে কৃষি-উপযোগী করেছিল। রাজকীয় জমিছাড়া, অধিকাংশ জমির মালিক ছিল মন্দির। পুরোহিত মন্দিরের অধীনস্থ জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দিতো; তাদের হাল, লাঙ্গল, হালের বলদ দিত, শস্য বীজ দিত। প্রত্যেক মন্দিরে শস্য ভান্ডার ছিল; ভান্ডারে উদ্বৃত্ত ফসল রাখা হতো। গম, বার্লি খোরমা ও তরিতরকারি ইত্যাদি হল প্রধান প্রধান শস্য। আর এ কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার মূলে ছিল পূর্বে উল্লিখিত নদী দু'টির মধ্যবর্তী উর্বর উপত্যকার অস্তিত্ব কৃষিতে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকার কারণে প্রাচ্যের অন্যতম নদী তীরবর্তী প্রাচীন সভ্যতা মেসোপটেমিয়ায় কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র (Centralized Bureaucracy) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্র প্রায় সমার্থক ছিল। এজন্য কোন কোন লেখক প্রাচ্যের এরূপ প্রাচীন সভ্যতা এ রাষ্ট্রকে সমাজের উপরমু একটি প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করতেন। আর তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্র (Oriental Despotism) জলসেচ এবং ভিত্তিক সমাজ সভ্যতা (Irigation Society/Civilization) ইত্যাদি নামকরণ করেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ মেসোপটেমিয়ার সমাজে অর্থনীতি ছিল কৃষি-কেন্দ্রিক। কৃষকরা সেচ ও শস্য ভান্ডারে উন্নত বীজ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। কৃষকদের মাঝে জমিদারগণ করের শর্তে জমিদান করত। গম ও বার্লি ছিল এদের অর্থনৈতিক ফসল। এরা উদ্বৃত্ত গম ও বার্লি পাশ্ববর্তী এলাকায় ভিন্ন ধরনের পণ্য বা শস্যের পরিবর্তে বিনিময় করত। কৃষি ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ কৃষির পরেই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান। পাথর, তামা ও অন্যান্য জিনিসের সাথে উদ্বৃত্ত ফসলের বিনিময় হতো। মেসোপটেমিয়ায় পাথর ছিল না; গৃহ নির্মাণের জন্য কাঠের অভাব ছিল। তবে উদ্বৃত্ত ফসলের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহে অসুবিধা হতো না।

www.swapno.in

মন্দির ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্র। এখানে বসে পুরোহিতরা লেনদেন করতেন। কৃষি ও বাণিজ্যের জন্য হিসেবপত্র রাখা হতো। রশিদ ছাড়া লেনদেন আইনত সিদ্ধ ছিল না।

শিক্ষা ঃ ১৮৯৪ সালে ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খনন কার্য পরিচালনা করে একটি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া স্কুলের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। ৫৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট এ স্কুলে লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হত এবং নরম মাটিতে বিভিন্ন। প্রায় ৩৫০টি চিহ্ন অংকিত ছিল। এ স্কুলের দেয়ালে লিখিত ছিল 'ফলকে লিখন পদ্ধতিতে যে উৎকর্ষ সাধন করবে সে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।

এ সভ্যতায় বিদ্যাচর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যা শেখানো হতো।

ধর্ম ঃ মেসোপটেমিয়ার লোকেরা ধর্মের দিক থেকে ছিল বহু–ঈশ্বরবাদী। প্রত্যেক নগরের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ছিল। তবে একেকটি নগরে একেকটি দেবতার প্রাধান্য ছিল। প্রধান দেবতাকে কেন্দ্র করে মন্দির গড়ে উঠেছিল। তবে কোন দেবতা কখন প্রাধান্য পাবে তার নিশ্চয়তা ছিল না। নগরের রাজনৈতিক শক্তির উত্থানপতন ঘটতো। সুমেরীয়দের সূর্যদেব মেসোপটেমিয়াদের নিকট 'মারদুক' নামে পরিচিত ছিল। প্রধান দেবতা 'মারদুক' ছাড়াও বায়ুর দেবতা 'মারুত্তম' এবং অসংখ্য প্রকৃতির দেবতা, নরদেবতা ও একাধিক ছোটখাট দেবতা মেসোপটেমিয়াদের পূজনীয় ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, দেব-দেবীর ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা ছিল। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নরবলির প্রচলন ছিল এবং মন্দিরে দেবদাসী রাখা হতো।

হামুরাবির আইন সংহিতা (Code of Hammurati) মেসোপটেমীয়া সভ্যতার অন্যতম অবদান। এই সংহিতা পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ আইন ব্যবস্থার অপূর্ব নিদর্শন।

মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অবদান
(Contributions of Mesopotamian Civilization)

মেসোপটেমীয় সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় আইন, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্যবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ও জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এ সভ্যতার অবদান সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল।

রাষ্ট্রীয় আইন : হামুরাবির আইন সংহিতা (Code of Hammurabi) মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্যতম অবদান। এই সংহিতা পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ আইন ব্যবস্থার অপূর্ব নিদর্শন। মৃত্তিকা ফলকে সংহিতার বিভিন্ন বিধি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তবে সংহিতার ভিত্তি স্থাপন করে ছিলেন সুমেরীয় রাজা উর-নামু। হামুরাবি উর-নামুর প্রণীত বিধিগুলোকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে পূর্ণাঙ্গ সংহিতার রূপ দেন। মেসোপটেমিয়ার জীবনের কোনও কার্যকলাপ উক্ত আইন-সংহিতার আওতা বহির্ভূত ছিল না। সংহিতার মূল মন্ত্র ছিল "যেমন অপরাধ, তেমনি সাজা'। হামুরাবির ভাষায়, "এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির চোখ বিনষ্ট করে, তবে ঐ অপরাধী ব্যক্তির চোখ বিনষ্ট করা হবে।" তবে হামুরাবির আইনে সবাই সমান নয় - বড় ছোট ভেদ আছে। অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী সাজার তারতম্য ছিল। তবে তিনি আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন। অপরাধ যদি আকস্মিক হয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয়, তবে দন্ড হ্রাস করার বিধান ছিল।

বিজ্ঞান ও গণিত ঃ এ সভ্যতায় বিদ্যাচর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যা শেখানো হতো। গণিতে ষাট (৬০) সংখ্যাটি মৌলিক একক হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং এই এককের ভিত্তিতে যোগ-বিয়োগ করা হতো। "ষাট' (৬) সংখ্যক এককটি পরবর্তীকালে সময়ের একক এবং কৌণিক পরিমাপের এককরূপে গৃহীত হয়েছিল। বারোমাসের একটি চান্দ্র বর্ষপঞ্জী উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং চন্দ্রকলা অনুসারে সময় গণনা করা হতো।

www.swapno.in

বিবাহ ঃ মেসোপটেমিয়ার বিবাহ পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে একটা চুক্তি। লিখিত দলিল ব্যতিরেকে বিবাহ সিদ্ধ নয়। প্রত্যেক বিয়েতে বর বধূকে বধূপণ দিতো, কন্যা পিতামাতার কাছ থেকেও যৌতুক পেতো। মেসোপটেমিয়ার পুরুষরা সাধারণত একটি মাত্র বিয়ে করতো। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা হলে তারা ক্রীতদাসী বা উপপত্নী গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু ক্রীতদাসী ও উপপত্নী সমাজের দৃষ্টিতে বিবাহিত স্ত্রীর অধীন এবং তাদের আইনগত মর্যাদা বিবাহিত স্ত্রীর চেয়ে কম ছিল।

পরিবার ও সম্পত্তি ঃ মেসোপটেমিয়ার সমাজে ব্যক্তি প্রধান, পরিবার গৌণ। হামুরাবির সংহিতায় পরিবারের অধিকার ও দায়িত্বের চেয়ে ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্বকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। সন্তানদের অধিকার সম্পর্কিত আইন করা হয়েছিল। আদালতের অনুমোদন না নিয়ে পিতা-পুত্রকে নিজ সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারতো না। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা হতো, পারিবারিক সম্পত্তি যৌথ মালিকানা বা যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব ছিল না। স্বামী-স্ত্রীও নাবালক সন্তান নিয়ে পরিবার গঠিত হত। স্বামী ছিল পরিবার প্রধান।

নারীর মর্যাদা ঃ মেসোপটেমিয়ার সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল। পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমান অংশ ছিল। মেয়েদের স্বাধীন ব্যবসা করার , ক্রীতদাস রাখার, জমির মালিক হবার, স্বনামে সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় করার এবং প্রয়োজনে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করার অধিকার ছিল।

পরিকল্পিত অর্থনীতি ঃ মেসোপটেমিয়ার সমাজ পরিকল্পিত অর্থনীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্র সকল প্রকার দ্রব্য ও জমিজমার উপর মূল্য বেধে দিয়ে ছিল। মজুরি ও দ্রব্যমূল্য আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল। খাদ্যের ঘাটতি ঘটলেও খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা যেতো না; যুদ্ধে অনেক যুদ্ধবন্দী ধৃত হলেও ক্রীতদাসের দাম কমত না। শ্রমিকের মজুরি নির্দিষ্ট ছিল এবং কোন অবস্থাতেই নির্ধারিত মজুরির কম দিয়ে শ্রমিক ভাড়া করা যেতো না।

স্থাপত্য ও চারুকলা ঃ মেসোপটেমিয়ায় স্থাপত্য ও চারুকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। পাথরের অভাবে মাটি ও ইট দিয়ে ঘরবাড়ি বানানো হতো। সুউচ্চ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এসব উঁচু মন্দিরকে বলা হতো জিগুরাট। প্রায় ৭০ ফুট উঁচু এনামেল করা ইটের তৈরী জিগুরাটের সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্যাবিলনের স্থপতির থাম, মিলান খিরান করা ছাদ এবং গম্বুজ নির্মাণ করেছিল।

নক্শা ও সিল ঃ মেসোপটেমিয়ানরা নক্শা ও সিল আবিষ্কার করেছিল। এরা দলিলপত্রে সই করতো না। স্বাক্ষরের পরিবর্তে সিল মারত। সিলগুলো ছিল বেলনাকর এবং তাতে নক্শা করা হতো। ছোট ছোট সিল গলায় ঝুলিয়ে রাখা হতো এবং প্রয়োজন মতো ভেজামাটিতে চেপে সিল দেওয়া হতো।

www.swapno.in

অনুশীলন - ১ (Activity-1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

মেসোপটেমীয়া সভ্যতার প্রধান ৬টি বৈশিষ্ট্য ৬টি বাক্যে প্রকাশ করুন।

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট্য
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

অনুশীলন মূল্যায়ন ২ (Activity-2) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান ৬টি অবদান ৬টি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করুন।

ক্রমিক নং	**অবদান**
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

সংক্ষেপ ঃ

মেসোপটেমীয় সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৫০০০ অব্দে। এ সভ্যতা মূলত সুমেরীয় সভ্যতা। সুমেরীয়রদের প্রথমে আক্কাদ ও পরে মেসোপটেমিয়ানের অধীনে থাকতে হয়েছিল, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি ধ্বংস হয়নি। কৃষিকাজই ছিল মেসোপটেমিয়ানদের সভ্যতার প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি। তখন সমাজে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল। বিদ্যালয়-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। উক্ত সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল বহু–ঈশ্বরবাদী। স্বামী-স্ত্রী ও নাবালক সন্তান নিয়ে এদের পরিবার গঠিত হতো। এদের সমাজে নারীদের সম-মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। হামুরাবির আইন সংহিত (Code of Hammurabti) বিজ্ঞান ও গণিত চর্চা, পরিকল্পিত অর্থনীতি, স্থাপত্য, চারুকলা, নক্‌শা, সিল ইত্যাদি ছিল মেসোপটেমীয় সভ্যতার মৌলিক অবদান।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। উত্তর ও দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার নাম যথাক্রমে কি ছিল?

ক) অ্যাসিরীয় ও পারস্য
খ) অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলন
গ) ব্যাবিলন ও সুমের
ঘ) ব্যাবিলন ও সুমেরু

২। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে মেসোপটেমিয়কে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেন?

ক) আক্কাদ
খ) হামুরাবি
গ) উর-নামু
ঘ) হিট্টাইট

৩। মেসোপটেমিয়ানদের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কি ছিল?

ক) কৃষি
খ) শিল্প
গ) ব্যবসা-বাণিজ্য
ঘ) পশুপালন

৪। হামুরাবির আইন সংহিতার মূল বক্তব্য কি ছিল?

ক) খুনের বদলে খুন
খ) খুনের বদলে যাবৎজীবন কারাদণ্ড
গ) আকস্মিক আক্রমণের ক্ষেত্রে বিলম্বে বিচার
ঘ) সামাজিক স্তর অনুযায়ী শাস্তির তারতম্য ।

৫। লেনদেন প্রধানত কিসের মাধ্যমে পরিচালিত হত?

ক) চেকের মাধ্যমে
খ) ড্রাফ্‌টের মাধ্যমে
গ) রশিদের মাধ্যমে
ঘ) দলিলের মাধ্যমে

www.swapno.in

www.swapno.in

নদী তীরবর্ত মিশরীয় সভ্যতা

পাঠ ৪

মূলধারণা

- মিশরীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- মিশরীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
- মিশরীয় সভ্যতার অবদানসমূহ
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য(Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি –

১. মিশরীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।

২. মিশরীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে পারবেন।

৩. মিশরীয় সভ্যতার অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মিশরীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background of the Egyptian Civilization)

প্রাচ্যের নদী তীরবর্তী সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে মিশরীয় সভ্যতা। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে নীল নদীর অববাহিকায় এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাই একে নীল সভ্যতাও বলে অভিহিত করা হয়। এটি ধারনা করা হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কোন নির্দিষ্ট নরগোষ্ঠী দ্বারা মিশরীয় সভ্যতার উৎপত্তি ঘটেনি। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে ককেশীয় নরগোষ্ঠী, মধ্য, ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নিগ্রো নরগোষ্ঠী, লিবিয়া ও মধ্য এশিয়া এলাকা থেকে সেমেটিক নরগোষ্ঠী মিশরে এসে মিলন মিশ্রণের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছে।

> প্রাচ্যের নদী তীরবর্তী সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে মিশরীয় সভ্যতা। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে নীল নদীর অববাহিকায় এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তাই একে নীল সভ্যতাও বলে অভিহিত করা হয়।

খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে মিশর ত্রিশ থেকে চল্লিশটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ রাজ্যগুলোকে কোন না কোন পশুর নামে নামকরণ করা হত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০০ সাল পর্যন্ত 'মিশর' নামে কোন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ছিল না। সমগ্রদেশ জুড়ে ছিল প্রায় পঞ্চাশটি নোম (Noom)। এক একটি নোমকে এক একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা প্রদেশ বলা হত। প্রতিটি নোমের নিজস্ব দোদেস (রাজা), নিজস্ব দেবতা এবং নিজস্ব নিয়ম-কানুন ছিল। নোমগুলো ছিল স্বাধীনচেতা। তাই বিভিন্ন নোমের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০০ সালে সমস্ত নোম মিলে দু'টি রাজ্য গড়ে উঠে; মেম্ফিস ও নীলনদের ব-দ্বীপ মিলে একটি রাজ্য এবং সমগ্র দক্ষিণ মিশর (আসোয়ান পর্যন্ত) মিলে আরেকটি রাজ্য। খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০০ সালের শেষের দিকে দক্ষিণ রাজ্যের নরপতি মেনেস্ দু'টো রাজ্যকে আপন অধিকারে নিয়ে এসে একটি সার্বভৌম 'মিশর' রাষ্ট্রের পত্তন করে এবং রাজ বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ১০৪৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৭টি রাজবংশ ক্ষমতায় ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এ দীর্ঘ সময়কে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০০-২২৭০ সাল পর্যন্ত পুরাতন যুগের রাজত্বকাল। এরপর রাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মিশর আবার অনেকগুলো ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

www.swapno.in

খ্রীষ্টপূর্ব ২০২৬ সালে সমগ্র মিশর পুণরায় একটি কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের অধীনে আসে। থীবিতে রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত এ রাজতন্ত্র চলতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ২০২৬-১৭৮৫ সাল পর্যন্ত সময়কে বলা হয় মধ্যযুগের রাজত্বকাল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৮৫ সালে গৃহযুদ্ধ শুর হয়। কালক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৮০ সালে মিশরীয় রাজতন্ত্র আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং হিক্সসদের বহিষ্কার করে আবার রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ রাজতন্ত্রের শাসন কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১০৪৪ সাল পর্যন্ত এ সময়কে নতুন যুগের রাজত্ব কাল বলে।

মিশরীয় রাষ্ট্র ছিল স্বৈরতন্ত্রের একটি চরম দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রের অধিপতিকে ফারাও বলা হত এবং তারা ছিলেন বংশানুক্রমিক রাজা।

খ্রীষ্টপূর্বে ১০৪৫ সাল হতে মিশরের পতন শুরু হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৬৬৩ সালে আসিয়ানদের বিতাড়িত করে রাজতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু সমগ্র মিশরকে একটি সার্বভৌম শক্তির অধীনে আনতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে মিশর খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৫ সালে পারস্যের অধীনতা স্বীকার করে। আরো দু'শো বছর পরে বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার মিশরকে গ্রীক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং প্রায় ত্রিশটি রাজবংশের পতন এবং হাজার বছরের রাজত্বের পর মিশরীয় সভ্যতার অবসান ঘটে।

মিশরীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristic of Egyptian Civilization)

মিশরীয় সভ্যতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীন সত্তায় উদ্ভাসিত ছিল। নিম্নে মিশরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

মিশরীয় সমাজ ছিল শ্রেণী বিভক্ত। সমাজের শীর্ষে থাকত রাজ পরিবার। আর সামাজিক শ্রেণীর ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ধর্মীয় কর্তৃক। আমলা, কৃষক, শ্রমজীবী ও দাস ছিল এক একটি শ্রেণী।

সমাজ ব্যবস্থা ঃ মিশরীয় সমাজ শ্রেণীবিভক্ত ছিল। সমাজের শীর্ষে থাকত রাজ পরিবার। আর সামাজিক শ্রেণীর ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব। ক্ষমতা, আমলা, কৃষক, শ্রমজীবী ও দাসরা ছিল এক একটি সামাজিক স্তরবিন্যাসে। ফারাও অর্থাৎ রাজপরিবারের পরেই ছিল মন্দিরের পুরোহিত এবং এদের নীচে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অবস্থান। এরা ছাড়াও আরো কিছু লোক সমাজের উচ্চস্থানে ছিল, কিন্তু এদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সমাজের সর্ব নিম্নস্তরে ছিল গরীব কৃষক মজুর, কারিগর ও ক্রীতদাস। ক্রীতদাস আর গবাদি পশুর তেমন কোন প্রভেদ ছিল না। যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল। কৃষকের অবস্থা ক্রীতদাসের চেয়ে উন্নত ছিল না। জমিতে তাদের মালিকানা ছিল না; পুরোহিত কিংবা আমলার তত্ত্বাবধানে ভূমিহীনরা জমি চাষ করতো। জমি চাষ ছাড়াও কৃষকদের বেগার খাটতে হত। বিনা মজুরিতে সরকারী পূর্তকর্মে অংশগ্রহণ করতে হত। তারা ফারাও এর আদেশে রাস্তা তৈরী করতে, খাল কাটতে, পিরামিড, মন্দির ও অন্যান্য স্থাপত্য কর্মে বিনা মজুরিতে শ্রমদান করতে বাধ্য ছিল। আসলে কৃষিতে এক ধরনের ভূমিদাস প্রথা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাচ্য ধরনের দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ কৃষি ছিল মিশরীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন। সেখানে এক ধরনের সামন্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ দাসেরা কৃষিকাজ করত ও মনিবগণ উৎপাদিত ফসল ভোগ করত। নীল নদের বন্যা বাহিত পলি সমভূমিতে পড়ার কারণে ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর। তাই সেখানে প্রচুর পরিমাণ গম, যব, জোয়ার, পেঁয়াজ, শাকসব্জি ইত্যাদি উৎপন্ন হত। কিন্তু কৃষকরা সম্পূর্ণ ফসল ভোগ করতে পারত না। ফসলের সিংহভাগই রাজা, পুরোহিত ও আমলাবর্গকে দিয়ে দিত।

কৃষি ছিল মিশরীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন। সেখানে এক ধরনের সামন্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মিশরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক অর্থনীতি বলা চলে। সমস্ত জমি রাজার দখলে, বহির্বাণিজ্য রাজার আদেশে সরকারী আমলা দ্বারা পরিচালিত হত। প্রায় সমস্ত পূর্ত কর্ম, যেমন- রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল জলসেচ ব্যবস্থা, ইমারত ও মন্দির নির্মাণ এবং পিরামিড স্থাপন প্রভৃতি কর্ম। ফলে মিশরের অধিকাংশ মেহনতী মানুষ কাজ করত রাজকীয় জমিতে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে কিংবা গণপূর্ত বিভাগে। অর্থাৎ মিশরের সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে ঘিরে আবর্তিত হতো, অর্থাৎ রাষ্ট্র ছিল সমস্ত উৎপাদন কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু।

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ মিশরীয় রাষ্ট্র ছিল স্বৈরতন্ত্রের একটি চরম দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রের অধিপতিকে ফারাও বলা হত এবং তারা ছিলেন বংশানুক্রমিক রাজা। তাদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। ফারাও

www.swapno.in

মিশরে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা বজায় থাকা সত্ত্বেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার মায়ের দিক থেকে নির্ধারিত হত।

তার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে বলবৎ রাখতে একটি জটিল, কিন্তু সুদক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। প্রশাসনের শীর্ষে ছিল ফারাও এর অবস্থান। তার অধীনে একটি সুসংগঠিত আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে শাসন কার্য পরিচালিত হত, যাকে কেন্দ্রিয় আমলাতন্ত্র (Centralized Bureaucracy) বলা হয়। আমলাদের প্রধান ছিল উজির, ফারাও এর পরেই তার অবস্থান। মিশরে শুধু স্বৈরতন্ত্রই ছিল না, ছিল পুরোহিততন্ত্রও। ফারাও ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয়বিধ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ফারাও একাধারে ছিলেন পার্থিব রাজা, অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও পুরোহিত। তিনি নিজেকে কখনও কখনও ঈশ্বর বলে দাবী করতেন এবং সে অনুযায়ী প্রজাপালন করতেন।

আইন ও বিচার ব্যবস্থা ঃ মিশরে কোন লিখিত আইন কানুন ছিল না। ব্যবিলনের রাজা হামুরাবির অনুরূপ আইন-সংহিতা মিশরে প্রণীত হয়নি। তবে লিখিত আইন না থাকলেও ন্যায়–বিচারের ব্যবস্থা ছিল। ফারাও নিজেকে ঈশ্বর রূপে ন্যায়-বিচারকে অপরিহার্য ধর্ম বলে মনে করতেন। তাই বিচারকের পক্ষে সুবিচার না করে উপায় ছিল না।

ধর্ম ঃ মিশরীয়দের সামাজিক জীবন ছিল ধর্ম নিয়ন্ত্রিত। তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। তাই মৃত দেহকে মমি করে রাখত। তারা সমাধি মন্দিরে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, মনিমুক্তা, নানা ধরনের খাদ্য ও পানীয় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করত। মিশরীয়দের মধ্যে টোটেম বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। তারা কোন গাছপালা বা পশুপাখির নামে নিজের গোত্রের পরিচয় দিত।

মিশরীয়দের সামাজিক জীবন ছিল ধর্মের নিয়ন্ত্রাণাধীন

ভাষা ও সাহিত্য ঃ মিশরের ভাষা ছিল সেমেটিক। মিশরীয়দের সাহিত্য কর্ম ও ছিল বেশ উন্নত। সাধারণত অবসরভোগী উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সাহিত্য চর্চা করত। এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

বিবাহ ও পরিবার ঃ অর্থনৈতিক কারণে মিশরীয় সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত একটি বিবাহ করত। কিন্তু রাজপরিবারের লোকজন ও আমলারা একাধিক বিবাহ করত; এমনকি তারা নর্তকী ও উপপত্নী রাখত। মিশরীয় সমাজে কদাচিৎ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটত। রাজপরিবারে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ে হতো। যেমন, ভাই–বোনের মধ্যে বিবাহ। রাজা নিজের বোন, এমনকি নিজের কন্যাকে বিয়ে করতে পারতেন। রাজা এ ধরনের বিবাহের মাধ্যমে রাজপরিবারের আভিজাত্য ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করতেন। মিশরে মাতৃতান্ত্রিক প্রথা চালু ছিল। মায়ের দিক থেকে সন্তানের পরিচয় নির্ধারিত হতো। তবে পুরুষের উপর স্ত্রীর কর্তৃত্ব কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঘরে ও বাইরে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোথাও মিশরীয় স্ত্রী তবে স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করতে পারতনা। স্বামীই পরিবারের প্রধান । সকল রাজাই ছিলেন পুরুষ। কিন্তু সমাজে মেয়েদের মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। মেয়েরা সমাজের সকল কাজ, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সামাজিক মেলামেশায় অংশগ্রহণ করতে পারতো। মিশরীয় সমাজে মেয়েরা মোটামুটি স্বাধীনতা ভোগ করতো।

মিশরের ভাষা ছিল সেমেটিক।

সম্পত্তি ঃ মিশরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বজায় থাকা সত্ত্বেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার মায়ের দিকথেকেনির্ধারিত হত। মা ছিল সম্পত্তির মালিক, মায়ের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি মেয়েরা পেত। ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহের ফলে মায়ের সম্পত্তি পুত্র ও কন্যা উভয়ের ভোগ দখল করতে পারত।

www.swapno.in

মিশরীয় সভ্যতার অবদান
(Contributions of Egyptian Civilization)

জলসেচ ব্যবস্থা ঃ ফারাওদের পৃষ্ঠপোষকতায় মিশরে অসংখ্য খাল কেটে এবং ভাইক ও বাঁধ নির্মাণ করে বন্যার পানিকে কৃষি কাজে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হত। জলসেচের সুব্যবস্থা থাকার ফলে মিশরে কৃষির দ্রুত উন্নতি ঘটে এবং এর মাধ্যমে সেখানে একটি মহান সভ্যতা গড়ে উঠে।

কুটির শিল্প ঃ মিশর কৃষির সাথে কুটির শিল্প ছিল। তারা তামা দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরী করত। কাদা মাটি রোদে রেখে ইট বানাতো। মিশরীয়রা চামড়াজাত দ্রব্য তৈরী, বস্ত্রবয়ন, কাঁচের কাজ ও এনামেল শিল্পের ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি সাধন করেছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ মিশরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। স্থাপত্যের চরম নিদর্শন হল পিড়ামিড ও ধর্ম মন্দির। মিশরে ধর্মকে আশ্রয় করে ভাস্কর্য গড়ে উঠে। সমাধি স্তম্ভ ও মন্দিরের প্রবেশ পথে বিরাট বিরাট ভাস্কর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

> ফারাওদের পৃষ্ঠপোষকতায় মিশরে অসংখ্য খাল কেটে এবং ভাইক ও বাঁধ নির্মাণ করে বন্যার পানিকে কৃষি কাজে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হত।

লিখনী ঃ প্রাচীন মিসরীয়দের লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। সুমেরীয় লিপির অনুকরণে মিশরীয় লিপি কতিপয় ছবি দিয়ে শুরু হয়েছিল। প্রথমে পদ্ধতিটা ছিল জটিল। তবে তারা ক্রমশ ছবির কিছু অংশ বাদ দিয়ে লেখার কাজ সহজ করতে সক্ষম হয়। ছবিগুলো সরল হতে হতে কালক্রমে ছোট হয়ে এক একটি চিহ্নে পরিণত হয়। এভাবে চব্বিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল।

সময় গণনা ঃ ব্যাবিলনের অনুকরণে মিশরীয়রা চন্দ্র বর্ষপঞ্জী ব্যবহার করতো। তারাই প্রথমে ৩৬০ দিনে বছর, বছরে ১২ মাস এবং একমাসে ৩০ দিন গণনা শুরু করে।

বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা ঃ মিশরীয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। তারা গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিদ্যায় বেশ পারদর্শী ছিল। তাদের ওজনের মাপের একক ছিল ‘ভেবেন’। ভেবেন’ আধুনিক চৌদ্দ গ্রামের সমান। মন্দির ও পিরামিড নির্মাণের জন্য তারা প্রকৌশল বিদ্যা অর্জন করেছিল বলে ধারণা করা যায়।

চিকিৎসা বিদ্যা ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানেও তারা দক্ষতা অর্জন করেছিল। একজন চিকিৎসক সব রোগের চিকিৎসা করতেন না। এক একজন চিকিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক একটি শাখায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শল্য চিকিৎসায় তারা প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। মিশরীয় চিকিৎসকরা হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া ও নাড়ির স্পন্দন উপলব্ধি করতে পারতেন।

www.swapno.in

অনুশীলন ১ (Activity) **সময় ঃ ৭ মিনিট**

নদী তীরবর্তী মিশরীয় সভ্যতার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখকরুন

	বৈশিষ্ট্য
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

অনুশীলন ২ (Activity 2) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

নিম্নলিখিত ছকটি পূরণ কর

১। মিশরীয়রা গম, ----------, ----------, ----------, ---------- ইত্যাদি ফসল ফলাত।

২। ক্রীতদাসদের দ্বারা গৃহের কাজ, ----------, ----------, ----------, ----------, ----------, ----------, ইত্যাদি কাজ করাত।

৩। মিশরের সামাজিক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল ক্ষমতা, ----------, ----------, ----------, ----------, ----------, উপর ভিত্তি করে ।

৪। ফারাও ছিলেন ----------, ----------, ----------,।

সংক্ষেপ ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ সাল হতে মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ শুরু হয় এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৩ সালে প্রায় ত্রিশটি রাজবংশের রাজত্বের পর মিশরীয় সভ্যতার অবসান ঘটে। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে মিশরীয় সভ্যতা ছিল অন্যতম। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নব নব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মিশর ছিল বিশ্বসভ্যতায় অগ্রগামী। তবে মিশরীয় সভ্যতার পেছনে রয়েছে নীলনদের অবিস্মরণীয় অবদান। ফলে সেখানে কৃষি উৎপাদন চরম উৎকর্ষ লাভ করে। কৃষির পরেই ছিল ব্যবসা–বাণিজ্যের স্থান। মিশরে স্বৈরতন্ত্র ও রাষ্ট্র–কেন্দ্রিক অর্থনীতির অস্তিত্ব ছিল। সমস্ত জমির ভোগ–দখল ও বহির্বাণিজ্য রাজার আদেশে সরকারী আমলাতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। মেয়েরা স্বাধীনতা ভোগ করত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে, বিশেষ করে শৈল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা বেশ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কত সালে সার্বভৌম মিশর রাষ্ট্রের পত্তন হয়?

ক) খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ সাল
খ) খ্রীষ্টপূর্ব ১০৪৫ সাল
গ) খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০০ সাল
ঘ) খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সাল

২। কোনটিতে বিনা মজুরীতে শ্রমদান করতে হত না?

ক) পিরামিড নির্মাণ
খ) খাল খনন
গ) মন্দির নির্মাণ
ঘ) গবাদি পশু পালন

৩। ফারাওরা কিভাবে কৃষি কাজের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করেছিল?

ক) খাল কেটে
খ)বাঁধ বেধে
গ) খাল কেটে ও বাঁধ বেধে
ঘ) নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে

৪। কে নিজের কন্যাকে বিয়ে করতে পারতো?

ক) রাজা
খ) পুরোহিত
গ) অভিজাত শ্রেণীর পুরুষ
ঘ) আমলা

৫। মিশরীয় সভ্যতায় পিতামাতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি কে পেত?

ক) পুত্র
খ) উপপত্নী
গ) কন্যা
ঘ) রাজা

www.swapno.in

নদী তীরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা

পাঠ ৫

মূল ধারণা

- ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- ভারতীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ
- ভারতীয় সভ্যতার অবদানসমূহ
- অনুশীলন
- স্ব-মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠ শেষে আপনি

১. ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।

২. ভারতীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৩. ভারতীয় সভ্যতার অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background of Indus Valley Civilization)

সিন্ধুনদ ও উহার শাখা-প্রশাখাকে কেন্দ্র করে খ্রীস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে যে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সেটাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা।

প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ সভ্যতা প্রাচীন মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার সমকালীন বলে স্বীকৃত। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সিন্ধুনদ ও ইহার শাখা নদীগুলোকে বেষ্টন করে বিকাশ লাভ করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন মার্শাল বর্তমান পাকিস্তানের মহেঞ্জোদাড়ো নামক স্থানে এই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ উদঘাটন করেন। মহেঞ্জোদাড়োর ৪০০ মাইল উত্তরে হরপ্পায় এই সভ্যতায় আরেকটি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। মহেঞ্জোড়া বর্তমান পাকিস্তানের লারকানা জেলায় ও হরপ্পা মন্দো গোম্মারী জেলায় অবস্থিত। এই দুটি নগরসহ আরও প্রায় চল্লিশটি ছোট শহর নিয়ে সিন্ধু নদের অববাহিকায় ভারতীয় সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ এ এলাকাকে তৃতীয় নগর বিপ্লবের কেন্দ্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ভারতীয় সভ্যতার স্থায়িত্বকাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার থেকে আড়াইহাজার সাল পর্যন্ত। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে এ সভ্যতা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলে অনুমান করা হয়। সিন্ধু নদ ছিল এ সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে আরব সাগর পর্যন্ত প্রায় ৯৫০ মাইল এলাকা জুড়ে ভারতীয় সভ্যতা ব্যাপ্তি লাভ করেছিল।

www.swapno.in

ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ
(Characteristics of Indus Valley Civilization)

নদী তীরবর্তী প্রাচীন ভারতের সভ্যতা মূলত ছিল একটি পরিকল্পিত নগর সভ্যতা। সেখানে নদীপথে যোগাযোগের ছিল সুব্যবস্থা। ফলে ভারতীয়রা সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভূত উন্নত সাধন করেছিল। নিম্নে ভারতীয় সভ্যতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলঃ

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে তিনটি শ্রেণী ছিল বলে অনুমান করা হয়। যথা : অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত।

সামাজিক অবস্থা ঃ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় বর্ণভেদ তথা সামাজিক স্তর বিভাগ ছিল। ভারতীয় সভ্যতার বড় বড় প্রাসাদ, মাঝারি ও ছোট আকারের ভবনগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে তিনটি শ্রেণী ছিল বলে অনুমান করা হয়। যথা : অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। ঐতিহাসিকদের মতে, সেখানে পুরোহিত, চিকিৎসক, জ্যেতির্বিদ প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠির অস্তিত্ব ছিল। তাছাড়া সমাজে কামার, কুমার, রাজমিস্ত্রী, বণিক ও যোদ্ধাসহ বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় দাস প্রথার প্রচলন ছিল। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা শহরে বাস করত। নগরের অভিজাত শ্রেণী ও বিত্তশালী ব্যবসায়ীরা তাদের গৃহে কায়িক পরিশ্রমের কাজে ক্রীতদাস নিয়োগ করত। রাজারও থাকত অগণিত ক্রীতদাস। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি ও ব্যবসা।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি ও ব্যবসা । কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা। তাছাড়া পশুপালনও প্রচলিত ছিল। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ছিল বলেও অনুমান করা হয়। কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ধান, গম, যব বার্লি, ইত্যাদি ছিল প্রধান শস্য। প্রাচীন ভারতীয়রা শাক, সবজি ও মাছের চাষ করত। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মিশর, মেসোপটসিয়াও পারস্য প্রভৃতি এলাকায় যাতায়াত করত। এটা ধারণা করা হয় যে, ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতব মুদ্রা ব্যবহৃত হত।

এটা ধারনা করা হয় যে, প্রতিটি নগরেই একজন জমিদার ছিল এবং সকল জমিদার কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অধীনে থাকত। আর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের শীর্ষে ছিল রাজা।

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ ভারতীয় সভ্যতার রাজনৈতিক অবস্থার সঠিক চিত্র আজও সঠিকভাবে উদ্ঘাটিত হয়নি। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগর সভ্যতায় অভিন্ন নক্শা সম্বলিত ঘর বাড়ির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই ধারনা করা হয় যে, প্রতিটি নগরেই একজন জমিদার ছিল এবং সকল জমিদার কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অধীনে থাকত। আর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের শীর্ষে ছিল রাজা। এ সভ্যতায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করত। রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হত। তবে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালুসত্ত্বেও ব্যাবিলন কিংবা মিশরের মতো প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে মনে করা হয়। কারণ সেখানে রাজনৈতিক সামাজিক সংঘাত কিংবা বিদ্রোহের কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

নগর-পরিকল্পনা ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা ঃ নগর-পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় সভ্যতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে একটি অবসরভোগী শ্রেণীর আর্বিভাগ ঘটে সারা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দর্শন চর্চায় মনোনিবেশ করে। ফলে গড়ে উঠে একটি পরিকল্পিত উন্নত নাগরিক জীবন। সিন্ধু সভ্যতায় নগরগুলো ছিল সুষ্ঠু পরিকল্পনা নির্ভর। নগরের রাস্তাগুলো ছিল সরল রৈখিক ও প্রশস্ত। গোটা শহরে পয়প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। এমনকি, নগরের কেন্দ্র স্থলে গণ স্নানাগারও , শৌচাগার ছিল। রাতে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ছিল। সেখানে একটি পৌর সভারও অস্তিত্ব ছিল ,যা একটি উন্নত মানের প্রশাসন, রুচিবোধ, সাংস্কৃতিক তথা নাগরিক সমাজ জীবনের ইঙ্গিত বহন করে। নগরের ভবনগুলো ছিল পোড়ানো শক্ত ইটের তৈরী প্রত্যেক বাড়ীতে প্রশস্ত বারান্দা, দরজা, জানালা, কূপ, নর্দমা ও গোসলখানার অপূর্ব ব্যবস্থা ছিল।

www.swapno.in

ভারতীয়রাই সর্বপ্রথম মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন করে বলে ধারণা করা হয়।

ভারতীয়রা ছিল বহু ঈশ্বরবাদী। ভারতীয় সভ্যতার জনগনের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত

ভারতীয় সভ্যতায় বিচার কার্য পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিদ্যমান

ধর্মীয় ব্যবস্থা ঃ ভারতীয়রা ছিল বহু ঈশ্বরবাদী। ভারতীয় সভ্যতার জনগনের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত প্রবল। তারা মূর্তিপূজা করত। বাঘ. মহিষ, গন্ডার পরিবেশিত ত্রিমুখী শিংধারী এবং ধ্যানরত যে মূর্তির পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় তারা শিব দেবতাকে পূজা করত। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, সিন্ধু নদের অববাহিকার জনগণ একটি ধাত্রী দেবীর আরাধনা করত এবং তার উদ্দেশ্যে পশু বলির ব্যবস্থা ছিল।

আইন ও বিচার ব্যবস্থা ঃ ভারতীয় সভ্যতায় বিচার কার্য পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। রাজা নিজেও বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। রাজা ও নগর প্রধানগণ একত্রে বসে আইন প্রণয়ন করতেন বলে ধারণা করা হয়।

পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থা ঃ ভারতীয় সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল একান্নবর্তী পরিবার। মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নাতি-নাতনী সবাইকে নিয়ে একটি যৌথ পরিবার গঠিত হত। পরিবারের প্রধান ছিল দাদা অথবা বাবা। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষই ছিল ঐ পরিবারের প্রধান কর্তা এবং তার থাকত একাধিক স্ত্রী। অর্থাৎ বহুপত্নী বিবাহ (Polygymy) পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সাধারণত অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে হত। মহিলাদের স্বামী মারা গেলে তারা পুনরায় বিয়ে করতে পারতো।

সিন্ধু সভ্যতার অবদান

শিল্পকলা ঃ চিত্রাংকন ও ভাস্কর্য নির্মাণে ভারতীয়রা ছিল অত্যন্ত পারদর্শী। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারায় ষাড়, হাতি, বাঘ. গণ্ডার, কুমির, হরিণ ইত্যাদির ছবি সম্বলিত অনেক সীলমহর মোহর আবিষ্কৃত হয়েছে, যা থেকে ধারণা করা হয় যে তারা শিল্পকলায় অনেক উন্নত ছিল। আধুনিক শিল্পকলার বিকাশে উক্ত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল সুরম্য ও কারুকার্য খচিত অট্টালিকা। আজও বাড়ী ঘর নির্মাণে এর নক্শা ও শিল্পকলাকে অনুকরণ করা হয়।

প্রাছীন ভারতীয় সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল সুরম্য ও কারুকার্য খচিত অট্টালিকা। আজও বাড়ীঘর নির্মাণে এর নক্শা ও শিল্পকলাকে অনুকরণ করা হয়।

নগর পরিকল্পনা ঃ যতটুকু জানা যায়, ভারতীয়রাই পৃথিবীতে প্রথম পরিকল্পিত নগর গড়ে তুলে ছিল। পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থা ভারতীয় তথা সিন্ধু সভ্যতার বিশেষ অবদান।নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইদানিং বাংলাদেশে সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় নগর পরিকল্পনার গুরুত্ব বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ ঢাকা শহরের একটি বাড়িঘর নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের নামই হরপ্পা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড (Harappa Construction Limited)।

নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইদানিং বাংলাদেশে সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় নগর পরিকল্পনার গুরুত্ব বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে বলা যায়।

অলংকার শিল্প ঃ অলংকার তৈরীতে ভারতীয়রা ছিল অত্যন্ত দক্ষ। তাদের অলংকার তৈরীর নক্শা ও আলপনা আধুনিক কালেও ব্যবহৃত হচ্ছে। তখন অলংকার শিল্প একটি কুটির শিল্প হিসেবে রূপ লাভ করেছিল এবং দেশের বাইরে এই অলংকার বিক্রি হত বলে তৎকালীন অর্থনীতিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ঃ ভারতীয়রাই সর্বপ্রথম মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন করে বলে ধারণা করা হয়। মুদ্রা- ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতা এক বিশেষ অবদান রেখে গেছে। এখানে একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, উক্ত মুদ্রা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় আধুনিক মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে।

অনুশীলন ১ (Activity 1.) সময় ৫ মিনিট

অনুর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা সিন্ধু সভ্যতার পরিকল্পিত নগর জীবনের বিবরণ দিন।

www.swapno.in

অনুশীলন ২ (Activity) সময় ঃ ৫ মিনিট

সিন্ধু নদের তীরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের জন্য দায়ী তিনটি কারণ উল্লেখ করুন।

ক্রমিক নং	কারণ
১	
২.	
৩.	

সারাংশ ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব চারহাজার বছর আগে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধুনদ ও উহার শাখা-প্রশাখাকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা গড়ে উঠে তাকেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বলে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালে এ সভ্যতার অবসান ঘটে। সিন্ধু নদের অববাহিকার বেশিরভাগ মানুষ সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও রক্ষণশীল জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। কৃষিই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। নগর-প্রধান ও রাজা দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হত। সমাজে তিনটি স্তর বিদ্যমান ছিল। সিন্ধু সভ্যতার জনগণ ধাত্রী দেবীর পূজা করত এবং তারা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিল। পরিকল্পিত নগর গঠনে সিন্ধু সভ্যতার অবদান ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, উক্ত সভ্যতা শিল্পকলা, অলংকার তৈরি, মুদ্রা প্রচলন সম্পদ ও বিনিময় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছে।

www.swapno.in

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মহেঞ্জোদারো কোন জায়গায় অবস্থিত?

ক) এশিয়া মহাদেশে

খ) ভারত উপমহাদেশে

গ) পাকিস্তানে

ঘ) লারকানায়

২। কেন এ সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল?

ক) যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য

খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে

গ) বন্যার জন্য

ঘ) ভূমিকম্পের কারণে

৩। সিন্ধু সভ্যতায় কোন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা চালু ছিল?

ক) স্বৈরতান্ত্রিক

খ) সামরিক

গ) পিতৃতান্ত্রিক

ঘ) মাতৃতান্ত্রিক

৪। সিন্ধু সভ্যতার জনগণ কার উদ্দেশ্যে পশু বলি দিত?

ক) ধাত্রী দেবীর

খ) ঈশ্বরের

গ) দুর্গা দেবীর

ঘ) শিব দেবতার

৫। কোন্ প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল একান্নবর্তী পরিবার?

ক) মিশরীয়

খ) রোমান

গ) গ্রীক

ঘ) ভারতীয়

www.swapno.in

www.swapno.in

নদী তীরবর্তী চৈনিক সভ্যতা

পাঠ ৬

মূল ধারণা

- চৈনিক সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- চৈনিক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
- চৈনিক সভ্যতার অবদানসমূহ
- অনুশীলন
- স্ব-মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠ শেষে আপনি

১. চৈনিক সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।

২. চৈনিক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।

৩. চৈনিক সভ্যতার অবদানসমূহ জানতে পারবেন।

চৈনিক সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

(Historical Background of chinese Civilization)

আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব ৩০০০ থেকে ২৫০০সালের মধ্যে হোয়াংহো ও ইয়াসি কিয়াং নদীর অববাহিকায় চৈনিক সভ্যতার উদ্ভব হয়। নব্য প্রস্তর যুগ থেকে এ সভ্যতার ব্রোঞ্জযুগে উত্তরণ ঘটে।

> আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব ৩০০০ থেকে ২৫০০ সালের মধ্যে হোয়াংহো ও ইয়াসি কিয়াং নদীর অববাহিকায় চৈনিক সভ্যতার উদ্ভব হয়।

পুরাতন প্রস্তর যুগে তথা যারা পিথেক্যানথ্রপাস 'পিকিং মানুষ' নামে খ্যাত তারা চীনদেশে বাস করতো। খ্রীস্টপূর্ব ২২০০ অব্দ থেকে ১৫০০ অব্দের মধ্যবর্তী কালে চীনের ইংয়াং-মাও এবং লাং-শান নামে দু'টো নতুন প্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুই সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্যের বড়ই অভাব। সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে চৈনিক সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে ১১০০ অব্দ পর্যন্ত শাং রাজবংশ উত্তর চীন এলাকায় রাজত্ব করেছিল। এই যুগে ব্রোঞ্জ শিল্পকলা, চিত্রলিপি এবং পূর্বপুরুষ পূজার সূত্রপাত হয়েছিল। শাং আমলের সভ্যতা কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। খ্রীস্টপূর্ব একাদশ শতকে চৌ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একটানা আটশত বছর চীনে চৌ রাজবংশের একচ্ছত্র শাসন বলবৎ ছিল। তবে চৌ রাজত্বের শেষ ভাগে অভ্যন্তরীণ কলহ ও গৃহযুদ্ধ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। চৌ রাজবংশ বিভিন্ন বর্বর উপজাতির সহায়তায় ক্ষমতা করায়ত্ত করেছিল এবং উপজাতিগুলোকে বশে রাখার জন্য সমগ্র রাজ্যটিকে উপজাতিগুলোর দলপতি ও তাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জায়গীর হিসেবে ভাগ করে দিয়েছিল। ফলে চৌ-রাজ্য মূলত কতকগুলো সামন্ত প্রদেশের সমষ্টিতে পরিণত হয়েছিল।

> সম্ভবত, খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে চৈনিক সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে।

> খ্রীস্টপূর্ব ২৫৬ অব্দে চিয়েন রাজবংশ চৌ রাজবংশের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ২২১ সালের মধ্যে সকল সামন্ত নৃপতিকে পরাস্ত করে সমগ্র চীন নিয়ে ঐ রাজবংশ নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

খ্রীস্টপূর্ব ২৫৬ অব্দে চিয়েন রাজবংশ চৌ রাজবংশের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ২২১ সালের মধ্যে সকল সামন্ত নৃপতিকে পরাস্ত করে সমগ্র চীন নিয়ে ঐ রাজবংশ এক নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

www.swapno.in

www.swapno.in

চৈনিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Chinese Civilization)

এশিয়া মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে চৈনিক সভ্যতা অন্যতম। চীনারা প্রস্তর যুগ, ধাতুযুগ এবং ব্রোঞ্জাযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী। চৈনিক সভ্যতার ধারা কয়েক হাজার বৎসর যাবৎ অব্যাহত গতিতে চলছিল এবং এখনও চীনের কোন কোন স্থানে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতার উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে চৈনিক সভ্যতার মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

চৌ রাজবংশের আমলে সমাজের শীর্ষস্থানে ছিল সামন্ত অভিজাতরা; চিয়েন রাজবংশের আমলে এদের সাথে যুক্ত হয় আমলাতন্ত্র।

সামাজিক অবস্থা

চৌআমলে সমাজের শীর্ষ স্থানে ছিল সামন্ত অভিজাতরা; চিয়েন রাজবংশের আমলে এদের সাথে যুক্ত আমলাতন্ত্র। চৌ রাজত্ব কালে রাজা ও সামন্ত সহচরবর্গ সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সামন্ত প্রভুরা ছিল অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এদের উচ্চ মর্যাদার মাপকাঠি ছিল জমির মালিকানা ও বংশ গৌরব। তারা কয়েকটা গোত্রে ছিল; নির্দিষ্ট গোত্রগুলোর বহির্ভূত কোনও ব্যক্তি অভিজাত পদবাচ্য হতে পারতো না। গোত্রগুলো কতিপয় পরিবারে বিভক্ত ছিল এবঙ তাদের মধ্যে সমস্ত সামরিক উচ্চপদ ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বংশানুক্রমে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। চিয়েন আমলে সামরিক ও প্রশাসনিক পদে বেতনভুক আমলা নিয়োগ করা হয়। ফলে আমলাতন্ত্র উচ্চ শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করে এবং সামন্ত পরিবারগুলোর সুযোগ-সুবিধায় ভাগ বসায়। সামন্ত অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ও উচ্চপদস্থ আমলারা বিলাস-ব্যসনে জীবন-যাপন করত। প্রাচীন চীনের সামাজিক স্তরবিন্যাসের নীচে যারা অবস্থান করত তারা হল ঃ কৃষক, মালী, সুতার, মিস্ত্রি, পশুপালক, শিল্পকুশলী, ব্যবসায়ী, রেশম ও তন্তুবয়ন শিল্পী চাকর-বাকর ও অদক্ষ শ্রমিক।

সামন্ত প্রভুরা ছিল অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এদের উচ্চ মর্যাদার মাপকাঠি ছিল জমির মালিকানা ও বংশ গৌরব। তারা কয়েকটা গোত্রে বিভক্ত ছিল; নির্দিষ্ট গোত্রগুলোর বহির্ভূত কোনও ব্যক্তি অভিজাত পদবাচ্য হতে পারতো না।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

কৃষিই ছিল প্রাচীন চৈনিক সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি। দেশের সকল ভূমির মালিক ছিল রাষ্ট্র। সামন্ত প্রভুরা আপন স্বার্থে এ সকল ভূমি ব্যবহার করত। কৃষকরা ভূমির কোন সুবিধা ভোগ করতে পারত না; তারা ছিল ভূমিদাস। সামন্ত প্রভুর বাসগৃহকে ঘিরে গ্রাম গড়ে উঠেছিল। আমলাতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পর আমলার বাসগৃহকে কেন্দ্র করেও গ্রামের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি গ্রামকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যবস্থা হয়।

বাণিজ্য ও শিল্প

চৈনিক সভ্যতার কতক গ্রাম অর্থনৈতিক কারণে শহরে পরিণত হয়েছিল। শহরকে ভিত্তি করে বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে উঠে। চীনা সমাজ তখন পারিবারিক পর্যায় অতিক্রম করে উন্নতর স্তরে উপনীত হয়। এর ফলে সংঘবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ব্যবসায়ী ও শিল্পী কুশলীদের গিল্ড গঠিত হয়। চৌ রাজবংশের শাসনামলে ব্যবসা ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। সুতীবস্ত্র ও রেশমের ব্যবসা ছিল ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক উন্নতির মূল কারণ। দর্জিরা ধনিক শ্রেণীর জন্য সূচীকর্মের পোষাক তৈরী করত। উচ্চবংশীয় নারী-পুরুষের জন্য সূক্ষ্ম চামড়া ও স্বর্ণের দ্রব্যাদি তৈরী করত। ধনিক শ্রেণীর বাসগৃহ আরামদায়ক ও বিলাসবহুলভাবে সজ্জিত করার জন্য উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরী হত। কুশলী শিল্পীরা বাঁশের ঝুড়ি ও মৃৎপাত্র তৈরী করত এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সরবরাহ করত।

রাজনৈতিক অবস্থা

www.swapno.in

চৈনিক মেয়েদের মোটামুটি সম্মান ও স্বাধীনতা ছিল।

চৌ-রাজ্য বস্তুত কতকগুলো সামন্ত প্রদেশের সমষ্টি ছিল। চৌ-রাজা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সামন্ত নৃপতিদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কালক্রমে সামন্ত নৃপতিদের ক্ষমতা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, চৌ রাজাদের পক্ষে সামন্ত নৃপতিদের শাসনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষমতাবৃদ্ধির বাসনায় সামন্ত প্রভুরা নিজেদের মধ্যে বাদবিসম্বাদে লিপ্ত হয় এবং শক্তিশালী সামন্ত নৃপতিরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল সামন্ত অধিপতিদের পরাভূত করে আপন অধিকার ও কর্তৃত্বের 'মাত্রা' বিস্তৃত করে। এভাবে কতিপয় সামন্ত নৃপতি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং চৌ সম্রাটের ক্ষমতা খর্ব হয়। তবে চৌ রাজার শাসন ক্ষমতা হ্রাস পেলেও সামন্ত নৃপতিরা তার অধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করতে পারেনি।

বস্তুত চৌ রাজ্য কতকগুলো সামন্ত প্রদেশের সমষ্টি ছিল। চৌ-রাজা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সামন্ত নৃপতিদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

আইন ও বিচার ব্যবস্থা

চৈনিক সভ্যতার প্রাপ্ত নিদর্শন হতে বলা যায় যে, চীনে তখন সুলিখিত কোন আইন ছিল না এবং কেন্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থা ছিল অনুপস্থিত। গ্রাম ভিত্তিক বিচারকার্য পরিচালনা করা হত। কৃষকরা গ্রামে বাস করতো। গ্রামের সকল অধিবাসীর মধ্যে সাধারণত রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং গ্রামীণ সংগঠনের ভিত্তি ছিল গোত্র। প্রত্যেক গোত্রের একজন দলপতি ছিল। গ্রামের ব্যাপারে গোত্রের দলপতি ও সরকারী আমলা ছিল সর্বেসর্বা এবং তারা একত্রে বসে স্থানীয় সমস্যাগুলো গ্রামেই সমাধান করতো।

গ্রামের ব্যাপারে গোত্রের দলপতি ও সরকারী আমলা সর্বেসর্বা ছিল এবং তারা একত্রে বসে স্থানীয় সমস্যাগুলো গ্রামেই সমাধান করতো।

চৈনিক শাসনযন্ত্রের প্রধান দুর্বলতা ছিল রক্ষণশীলতা ও দুর্নীতি। দুর্বল নরপতি সিংহাসনে বসলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতো। । ঐতিহ্যবাহী জীবনধারার যাঁতাকলে সমাজ ও রাষ্ট্র আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা ছিল।

ধর্মীয় ব্যবস্থা

চৈনিক সংস্কৃতিতে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিভু মনে করা হতো। চৌ সাম্রাজের শক্ত খুঁটি ছিল ঈশ্বরের অনুমোদন। ঈশ্বরের ম্যাণ্ডেট নিয়ে রাজা রাজত্ব করতেন। রাজার ওপর ঐশ্বরিক অনুমোদনের ধারণাকে পুঁজি করে পরবর্তী কালে চৌ রাজারা নিজেদের 'ঈশ্বর পুত্র' বলে দাবী করেছিল। ধর্মীয় বিধানের কারণে চৈনিক সামন্ত প্রভুরা সম্রাটকে চৈনিক রাষ্ট্র ও চৈনিক সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিল। রাজার অনুমোদন ব্যতীত সামন্ত প্রভুর অধিকার আইন-সিদ্ধ হতো না। রাজা ঐশ্বরিক ম্যাণ্ডেট প্রয়োগ করে সামন্ত নৃপতি ও অমাত্যদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতেন; একটা নতুন সামন্ত রাজ্যের উদ্ভব হলে রাজা ঐ রাজ্যের অস্তিত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতেন। তা ছাড়া ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসেবে তার ধর্মীয় ব্যাপারে অগ্রাধিকার ছিল। চৈনিক রাজা ছিল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র; সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সম্রাটের একচ্ছত্র ভূমিকা ছিল। অর্থাৎ ঈশ্বর-পুত্র চৈনিক নরপতি ছিলেন একাধারে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় শক্তিধর ও ধর্মীয় প্রধান। প্রতি পরিবারে পূর্বপুরুষ পূজার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক পরিবারে পূর্বপুরুষও প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে নিয়মিত পূজা-অর্চনা অনুষ্ঠিত হত এবং নৈবেদ্য নিবেদন করতো। তবে রাজকীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দেবতার পূজা হতো। রাজা নদী, মাটি ও আকাশের দেবতারদের উদ্দেশ্যে পূজা দিতেন।

চৈনিক সংস্কৃতিতে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিভূ মনে করা হতো।

পরিবার ও পেশাগোষ্ঠী

পেশা ভিত্তিক গোষ্ঠী ছাড়াও প্রাচীন চৈনিক সমাজে আত্মীয়তার বন্ধনের উপর ভিত্তি করে গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল। সর্বাধিক শক্তিশালী সামাজিক সংঘের নাম ছিল 'পরিবার'। অস্থায়ীভাবে উর্বর জমি চাষাবাদের মাধ্যমে চীনের পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা প্রভাবিত হয়েছিল। পল্লীতে বসবাসরত স্ব-স্ব পরিবারে গোষ্ঠীর নাম অনুসারে প্রত্যেক সদস্যের নামকরণ হত।

বিবাহ ও উত্তরাধিকার

www.swapno.in

চৈনিক মেয়েদের মোটামুটি সম্মান ও স্বাধীনতা ছিল। পিতামাতা পুত্র-কন্যার বিয়ে স্থির করতো, বরবধূর অভিমতের কোন মূল্য ছিল না। পুরুষ বা উপপত্নী রাখতে পারতো; কিন্তু একজন স্ত্রীই থাকতেন, তবে বহুপত্নীত্ব বিরল ছিল না। পুরুষ পরিবারের কর্তা ছিল, কিন্তু বাড়ির গৃহিণী ছিল স্ত্রী। এমন কি, স্ত্রীর পক্ষে রাজ্য শাসনে বাধা ছিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার উত্তরাধিকার হত। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ভাষা

চীনাভাষা একক-উচ্চারিত (mono-syllablic) শব্দ নিয়ে গঠিত। কণ্ঠের উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্যের কারণে শব্দার্থের বিভিন্নতা সৃষ্টি হত। এই ভাষায় লেখা ৪০০০০ চিহ্ন দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রতিটি চিহ্ন পৃথক পৃথক অর্থ বহন করে। তবে চীনের কথ্যভাষা শতশত আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্ত।

চীনাভাষা একক উচ্চারিত (mono-syllabic) শব্দ নিয়ে গঠিত।

চৈনিক সভ্যতার অবদানসমূহ (Contributions of chinics civilization)

চীনারা আমলাতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা প্রবর্তন, শিল্পকলা, দর্শন, লিখন পদ্ধতি, কারুকার্য ও ভাস্কর্য, সংগীত ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছে। নিম্নে চৈনিক সভ্যতার অবদানসমূহ আলোচনা করা হল।

আধুনিক আমলাতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা

চৌরাজবংশের শাসনামলে চীনে আমলাতন্ত্রের প্রবর্তন হয়। চীনের প্রশাসকমণ্ডলী বেসামরিক কর্মচারী (Civil Sergant) নিয়ে গঠিত হত। সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর পণ্ডিতরা এর অন্তর্ভুক্ত হত। এদের দ্বারা প্রশাসন কার্য পরিচালিত হত। যোগ্যতা ও সচ্চরিত্রের উপর ভিত্তি করে আমলাদের বাছাই করা হত। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্বপুরুষের যোগ্যতা কিংবা মর্যাদা কখনোই বিবেচনা করা হতো না। সরকারী কর্মচারীদের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো।

চৌরাজবংশের শাসনামলে চীনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক আমলাতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্পকলা

ভৌগোলিক প্রকৃতির প্রতি চীনাদের ভালবাসা ও আকর্ষণ ছিল অকৃত্রিম। ফলে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য তাদের শিল্পকলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। চৈনিক শিল্পে সংযত রুচি ও ভারসাম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রক্ষণশীল ও নির্মল মনোভাব থেকেই সম্ভবত চৈনিক শিল্পকলায় উক্ত উৎকর্ষতার বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন চীনে (Jade) পাথর ছিল সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পাথর। ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধে পবিত্র জিনিসকে সুসজ্জিত করার ক্ষেত্রে এই পাথর ব্যবহৃত হত। চীনের মানুষ ব্রোঞ্জের অলঙ্কার ব্যবহার করত। চীনামাটির তৈজসপত্র প্রস্তুতের ক্ষেত্রে চীনারা নিঃসন্দেহে প্রাচীনযুগের মানুষের মধ্যে ছিল শীর্ষ স্থানীয়। মৃৎপাত্র প্রস্তুতে সর্বোৎকৃষ্ট সৌকর্য ও উপযোগিতার সমন্বয় ঘটেছিল। চিত্রশিল্পে সংযত রুচি ও ভারসাম্য রোধের সুসমন্বয়ের ফলে চীনের চিত্রশিল্প সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু ভাস্কর্য শিল্পে চীনারা হুন রাজবংশের শাসনামল পর্যন্ত ততটা অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি।

ভৌগোলিক প্রকৃতির প্রতি চীনাদের ভালবাসা ও আকর্ষণ ছিল অকৃত্রিম। ফলে প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য তাদের শিল্পকলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। চৈনিক শিল্পে সংযত রুচি ও ভারসাম্যের পরিচয় পাওয়া

দর্শন

চৌ রাজবংশের গৌরব উহার মহান দার্শনিকদের অবদানের মধ্যে নিহিত। খ্রীস্টপূর্ব ছয়শত থেকে তিনশত বছরের ভেতর চীনে দর্শনের বিকাশ ঘটে। বিশ্বের বুকে কিভাবে নৈতিকতা ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ হিসাবে টিকে থাকা যায় চীনারা সেটা উদ্ভাবন করতে চেয়েছিল। কনফুসিয়াস ও মেনিসিয়াস সহ আরও কয়েক জন দার্শনিক দুই হাজারেরও অধিক কাল ধরে চীনা সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সাধারণ মানুষ কনফুসিয়াস ও ‘মেনিসিয়াস

www.swapno.in

নৈতিকতার’ বিমূর্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করতে সক্ষম ছিল না। তারা সাধারণত ধর্মের ঐতিহ্যবাহী দিক নিয়ে তৃপ্ত থাকত। তারা পূর্ব পুরুষের আত্মার অর্চনা করতো। চীনা দর্শনের প্রধান উপজীব্য ছিল মানুষ। অন্যদিকে, ভারতীয় দর্শন সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরমব্রহ্মের মাহাত্ম্য নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে, মানুষের সমসত্তাকে তেমন আমল দেয়নি। চীনের দর্শন মাটির মানুষের কাছে নেমে এসেছে । চীনা দার্শনিকের কাছে মানুষই প্রধান, সৃষ্টিতত্ব নয়। মানুষকে তার আধ্যাত্মিক বিকাশ ও আধ্যাত্মিক গুণাগুণের দিক বিচার না করে, চীনা দর্শন মানুষকে বিচার করেছে ব্যক্তি হিসেবে, সমাজের সদস্য হিসেবে। মানুষের নৈতিক চরিত্র, তার নৈতিক দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ চৈনিক দর্শনের প্রধান উপজীব্য।

চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কনফুসিয়াস খ্রীস্টপূর্ব ৫৫১ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। কনফুসিয়াস ও তাঁর অনুসারীরা তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন যথা- ব্রক্ষ্মাণ্ড বা বহির্বিশ্বে, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ, এবং পরিবার তথা ব্যক্তিগত নৈতিকতা। সমাজ জীবনের প্রধান একক হল পরিবার। প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে তার পরিবারের প্রতি কর্তব্য, বয়োজ্যেষ্ঠের রয়েছে বয়োকনিষ্ঠের প্রতি কর্তব্য এবং বয়োকনিষ্ঠের রয়েছে বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি নির্দিষ্ট কর্তব্য, তেমনি পিতার সাথে পুত্রের, অগ্রজের সাথে অনুজের এবং স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের উপর নির্ভরশীল। যে বয়সে বা পদমর্যাদায় বড় তাকে সম্ভ্রম দেখাতে হবে। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের প্রতি দেখাবে আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও সম্মান। বিনিময়ে গুরুজন নবীনদের লালন-পালন করবে ও ভালবাসবে।

লিখন পদ্ধতি

শাং রাজত্বে চীনা ভাষার লিপি উদ্ভাবিত হয়েছিল। সামান্য রদবদল সাপেক্ষে শাং লিপি অদ্যাপি চীনে প্রচলিত আছে। চীনা লিখন পদ্ধতিতে একটি বস্তু বোঝাতে একটা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। চিহ্নগুলো এক একটা চিত্র। যেমন, একটা গোলাকার চিহ্ন দিয়ে সূর্য বোঝানো হয়- গোলাকৃতি চিহ্নটি বস্তুত সূর্যের ছবি। বিভিন্ন ভাব প্রকাশের জন্য একাধিক চিত্রকে সমন্বিত করা হয়, যেমন, সূর্যের চিহ্ন ও চন্দ্রের চিহ্নকে একত্রিত করে ঔজ্জ্বল্য বোঝানো হয়; পূর্বদিক বোঝাতে বৃক্ষের পশ্চাতে উদীয়মান সূর্য আঁকা হয়। শাং আমলে দুহাজার পঞ্চাশটি চিত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল। বর্তমানে চীনা ভাষায় চিহ্নের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চল্লিশ হাজারে। চিহ্নগুলো দিয়ে চৈনিক লেখকরা ভাব ও বস্তুকে প্রকাশ করে থাকেন। চীনা ভাষা চিত্রভিত্তিক চিহ্নের স্তরে রয়ে গেছে, চিহ্নগুলো বর্ণমালার রূপ নেয়নি। ফলে চৈনিক লিখন পদ্ধতিতে বর্ণমালা নেই। চীনা লিখন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে আশে পাশের দেশগুলোতেও একই লিখন পদ্ধতির প্রচলন ঘটে।

কারুকার্য ও ভাস্কর্য

চীনা কারুকার্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে মর্মর পাথর, হাতির দাঁত ও নানা হাড়ের ব্যবহারে তাদের সুস্থ ও সুন্দর রুচির পরিচয় মিলে।

সঙ্গীত

শাংরা যন্ত্র সংগীত, গান-বাজনা ও নাচ পছন্দ করতো।

অনুশীলন ১ (Activity 1.) **সময় ৭ মিনিট**

চৈনিক সভ্যতার ৫টি বৈশিষ্ট্য পাঁচটি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করুন :

১.

www.swapno.in

২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলন ২ (Activity) সময় ঃ ৫ মিনিট

চৈনিক সভ্যতার ৫টি অবদান উল্লেখ করুন ঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলন ৩ (Activity 3) সময় ঃ ৫ মিনিট

চৈনিক সভ্যতার সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান ৯টি শ্রেণীর নাম লিখুন ঃ

১.	৪.	৭.
২.	৫.	৮.
৩.	৬.	৯.

সারাংশ ঃ

খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০-৩০০০ অব্দে চৈনিক সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তবে এই সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের দিকে। প্রথম দিকে শাং রাজবংশ উত্তর চীনে রাজত্ব করে; কালক্রমে শাং রাজ বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং চৌ রাজবংশের উদ্ভব হয়। খ্রীস্টপূর্ব ২৫৬ সালে চিয়েন রাজবংশ চৌ রাজবংশের স্থলাভিষিক্ত হয়। এ সভ্যতার আমলে সামন্ত প্রভুরা ছিল সমাজের শীর্ষস্থানে। তাপর ছিল সরকারী আমলা ও ব্যবসায়ীদের স্থান। কৃষি ছিল তখনকার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। এর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। রাজা সব সময় সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণ করত। আর সামন্ত প্রভু, দলপতি ও আমলারা কৃষকসহ সকল জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করত ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করত। চীনারা রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিভূ মনে করত এবং পূর্ব পুরুষের পূজা করত। বাবা-মা-ভাই-বোন মিলে পরিবার গঠিত হত। পিতামাতার মতামত অনুযায়ী সন্তানেরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো। চীনারা প্রতিযোগিতাপূর্ণ সরকারী চাকুরী ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। তারা শিল্পকলা,

www.swapno.in

দর্শন, লিখন পদ্ধতি, কারুকার্য, ভাস্কর্য ও সংগীত ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রেখে গেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। চৈনিক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল কোন্ সালে?

ক) খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে — খ) ১৫০০ সালে

গ) খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে — ঘ) ১৩০০ সালে

২। খ্রীস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে চীনে কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

ক) শাং — খ) চৌ

গ) ইয়াংশা — ঘ) লাং শান

৩। নীচের কোন্‌টি চৈনিক সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী বলে গণ্য নয়?

ক) কৃষক — খ) মালী

গ) সুতার মিস্ত্রী — ঘ) লোহার মিস্ত্রী

৪। চৈনিক রাজবংশের কোন আমলে অভিজাতদের সাথে সরকারী আমলারা একীভূত হয়েছিল?

ক) শাং — খ) চৌ

গ) চিয়েন — ঘ) লাং- শান

৫। চীনা দর্শনের প্রধান উপজীব্য কি ছিল?

ক) মানুষ — খ) মাটি

গ) মা — ঘ) মাতৃভূমি

www.swapno.in

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মেসোপটেমিয়া সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।
২. মেসোপটেমিয়া সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।
৩. মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অবদানসমূহ উল্লেখ করুন।
৪. মিশরীয় সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করুন।
৫. মিশরীয় সভ্যতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তা আলোচনা করুন।
৬. মিশরীয় সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
৭. গ্রীক সভ্যতার উত্থান ও পতন আলোচনা করুন।
৮. গ্রীক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৯. প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অবদানসমূহ উল্লেখ করুন।
১০. রোমান সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।
১১. রোমান সভ্যতার পরিবার, বিবাহ ও ধর্মীয় ব্যবস্থার বিবরণ দিন।
১২. প্রাচীন রোমান সভ্যতার অবদানসমূহ উল্লেখ করুন।
১৩. সিন্ধু সভ্যতাকে কেন নগর সভ্যতা বলা হয়?
১৪. সিন্ধু সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
১৫. প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অবদানসমূহ আলোচনা করুন।
১৬. চৈনিক সভ্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।
১৭. চৈনিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করুন।
১৮. চৈনিক সভ্যতার অবদানসমূহ আলোচনা করুন।
১৯. ভৌগোলিক দিক থেকে প্রাচীন সভ্যতারসমূকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায়? কোন্ ভাগে কয়টি সভ্যতা ও কি কি?
২০. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের সূত্র কি কি?

উত্তরপত্র ঃ পাঠোত্তর মূল্যায়ন (স্ব-মূল্যায়ন)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১ ঃ	১) গ	২) খ	৩) ক	৪) ক	৫) গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২ ঃ	১) খ	২) ঘ	৩) গ	৪) ক	৫) খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩ ঃ	১) ঘ	২) গ	৩) ঘ	৪) ক	৫) গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪ ঃ	১) খ	২) গ	৩) ঘ	৪) ক	৫) ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫ ঃ	১) ঘ	২) খ	৩) গ	৪) ক	৫) ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬ ঃ	১) ক	২) খ	৩) ঘ	৪) গ	৫) ক

www.swapno.in

পরিবার

ইউনিট ৭

ভূমিকা

পরিবার একটি সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর সব সমাজ এবং সংস্কৃতিতে পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যদিও পরিবার একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান তথাপি সমাজ ও যুগ ভেদে পরিবারের রূপ কাঠামো এবং আকারের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, কোন সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে যৌথ পরিবার কিংবা বর্ধিত (Extended)পরিবারের আধিক্য রয়েছে, আবার কোন সমাজে হয়ত অনুপরিবারের সংখ্যাই বেশী। এ ইউনিটটি পাঠ শেষে আপনি পরিবারের সংজ্ঞা ও ধারণা, পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, মর্ডান ও ওয়েষ্টারমার্কের তত্ত্ব, পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলী, বিবাহের সংজ্ঞা, পরিবারের সাথে বিবাহের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারবেন।

শিক্ষাসূচী

এই ইউনিটে ৬টি পাঠ রয়েছে। প্রতিটি পাঠ ৪৫ মিনিটের। ছয়টি পাঠ সম্পন্ন করার জন্য আপনার ২৭০ মিনিট সময় লাগবে। এছাড়া ৬টি পাঠে মোট ১০টি অনুশীলন (অপঃরারঃ) দেওয়া হয়েছে। এ অনুশীলনগুলোর (Activities) এর জন্য অতিরিক্ত ৫০ মিনিট সময় লাগবে। নিম্নের সারণীর মাধ্যমে আপনি পড়ার সময়কে ভাগ করে নিতে পারবেন।

দিন	নির্ধারিত সময়	পাঠ/পাঠের অংশ বিশেষ	অনুশীলন	মন্তব্য
শুক্রবার				
শনিবার				
রবিবার				
সোমবার				
মঙ্গলবার				
বুধবার				
বৃহস্পতিবার				

কখন পড়বেন ঃ

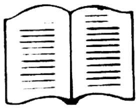

একটু ভাবুনতো আপনার হাতে পড়ার মত সময় কতটুকু এবং কখন আছে? — ভেবেছেন। আপনি যদি চাকুরীজীবী, শ্রমজীবী, পরিবারের দায়িত্বশীল বা কর্তা ব্যক্তি হন তাহলে দেখা যাবে প্রতিদিন বিকেলের পর হতে রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত আপনি পড়াশুনা করার সময় পেয়ে থাকেন। এ সময়টুকু আপনি আপনার পড়াশুনার জন্য ব্যয় করে ভাল ফলাফলের অধিকারী হতে পারবেন। মনে রাখবেন, প্রতিদিন যা পড়বেন তা ঘুমানোর সময় একটু মনে করার চেষ্টা করুন। অনুশীলনগুলো করার পর বুঝতে পারবেন যে, আপনি পাঠটি ভালভাবে শিখেছেন কিনা। ইউনিট শেষে রচনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। এগুলো থেকে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা, এসাইনমেন্ট ইত্যাদি দেওয়া হবে। তাই পুরো ইউনিটটি খুব ভাল করে পড়বেন।

www.swapno.in

পরিবারের ধারণা ও সংজ্ঞা

পাঠ ১

মূলধারণা

- পরিবার ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা
- পরিবারের বৈশিষ্ট্য
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি

১. বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত পরিবারের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. পরিবারের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. পরিবারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পরিবারের প্রাথমিক ধারণা

পরিবার এমন একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করি, লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়ে উঠি, কর্মজীবনে কাজ শেষে পরিবারে ফিরে আসি, আবার পরিবারেই একজন সদস্যের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ - জন্ম - জীবন - ও মৃত্যুতে পরিবারই আশ্রয় স্থল। জন্মগত ভাবে আমরা তাই পরিবারের আজীবন অনানুষ্ঠানিক সদস্য। এজন্যই রবার্ট ফ্রস্ট (Robert Frost) বলেছেন, "Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in"- অর্থাৎ পরিবারই সেই স্থান, যেখানে আপনি যখন যেতে চাইবেন তখন পরিবার আপনাকে গ্রহণ করবে। পরিবার তার সদস্যকে সাধারণত প্রত্যাখ্যান করেনা, অস্বীকার করেনা। তাই মৌলিকত্বের দিক থেকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পরিবারের পৃথক সত্তা ও মর্যাদা রয়েছে।

> পরিবারই সেই স্থান, যেখানে আপনি যখন যেতে চাইবেন তখন পরিবার আপনাকে গ্রহণ করবে।

ঐতিহ্যগতভাবে, স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্তাতি নিয়ে পরিবার গড়ে ওঠে এবং সাধারণত স্বামীকেই পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে হয়। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও স্বামীর ওপরই ন্যস্ত। তবে সময়ের পরিবর্তনে পরিবারের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আধুনিক সমাজে কেবল স্বামী নয়, স্ত্রীও অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের বাইরে কাজ করেন, আয়-উপার্জন করেন এবং ভরণ-পোষণ চালাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাই পরিবারের গড়ন, বৈশিষ্ট্য এবং এর ভূমিকা ও কার্যাবলীতে এসেছে পরিবর্তন। পরিবারের গড়ন, ভূমিকা ও কার্যাবলীতে এতই দ্রুত পরিবর্তন এসেছে যে ইদানিং আমেরিকান ও ইউরোপীয় সমাজে পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে - পরিবার আদৌ থাকবে কি না। পরিবারের কাজগুলো যদি বিকল্প অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা চালিয়ে নেয়া যায় তবে পরিবার টিকে থাকবে কিনা। যদিও এর পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি দেয়া হচ্ছে - তথাপি অদ্যাবধি অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীই মনে করেন যে, পরিবারের কোন বিকল্প নেই এবং পরিবার এমন কতিপয় কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করে, যা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যেমন, মাতৃ ও পিতৃ স্নেহের কোন বিকল্প নেই।

www.swapno.in

www.swapno.in

নার্সারী বা দিবাযত্ন প্রতিষ্ঠানে এমন কোন নিবেদিত প্রাণ পাওয়া যাবেনা, যা মাতৃ-পিতৃ স্নেহের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে সক্ষম।

সহজ কথায় বলা যায় যে, পরিবারের আকারে ও প্রকারে এবং কাজের মধ্যে পরিবর্তন এলেও পরিবার তার নিজস্ব গুরুত্ব বজায় রেখেছে এবং সময়ের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে পরিবার অদ্যাবধি তার ভূমিকা পালন করে চলেছে। পরিবার আমাদের নানাবিধ প্রয়োজন মিটিয়েই টিকে আছে এবং হয়ত টিকে থাকবে।

১.১ পরিবারের সংজ্ঞা

সহজ কথায় পরিবার হলো এমন একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততিসহ বসবাস করে। অবশ্য এমন পরিবারও রয়েছে যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত এবং বিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়েও বসবাস করে।

> সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ (Nimkoff) পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ, যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস

সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ (Nimkoff) পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করেন। ("Family is a union of husband and wife with or without children")

স্কট (W. P. Scott) তাঁর **Dictionary of Sociology** গ্রন্থে সীমিত অর্থে এবং ব্যাপক অর্থে পরিবারকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে সীমিত (বা সংকীর্ণ অর্থে) পরিবার হলো এমন একটি মৌলিক জ্ঞাতিভিত্তিক সামাজিক একক, যা স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত। ব্যাপক অর্থে পরিবার হলো পোষ্য সন্তানাদি (দত্তক) সহ এমন এক জ্ঞাতি সমষ্টি যারা একত্রে বসবাস করে। ("Family is a basic kinship unit, in its minimal form consisting of husband, wife and children. In its widest sense, it refers to all relatives living together ... including adopted persons").

> সমাজবিজ্ঞানী রবার্টসনের মতে পরিবার হচ্ছে আপেক্ষিক অর্থে এমন একটি স্থায়ী গোষ্ঠী, যার সদস্যরা রক্ত, বিবাহ এবং দত্তকগ্রহণ সূত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে একত্রে বসবাস করে এবং এমন একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে গড়ে ওঠে যার বয়স্ক সদস্যরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা স্বল্প-বয়সী সদস্যদের দায়-দায়িত্ব

সমাজবিজ্ঞানী রবার্টসন (Robertson) পরিবারের একটা পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। তার মতে পরিবার হচ্ছে আপেক্ষিক অর্থে এমন একটি স্থায়ী গোষ্ঠী, যার সদস্যরা রক্ত, বিবাহ এবং দত্তকগ্রহণ সূত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে একত্রে বসবাস করে এবং এমন একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে গড়ে ওঠে, যার বয়স্ক সদস্যরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা স্বল্প-বয়সী সদস্যদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে ("Family is a relatively permanent group of people related by ancestry, marriage, or adoption, who live together and form an economic unit and whose adult members assume responsibility for the young").

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

রবার্টসন প্রদত্ত পরিবারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে পরিবারের চারটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ

১) পরিবার গঠিত হয় এমন কতক লোক নিয়ে যারা রক্ত, বৈবাহিক বা দত্তকসূত্রে সম্পর্কযুক্ত।

www.swapno.in

২) পরিবার আপেক্ষিক অর্থে একটি স্থায়ী সংগঠন। এর সদস্যরা দীর্ঘদিন একত্রে বসবাস করে।
৩) পরিবার হলো উৎপাদন ও ভোগের একটি মৌলিক একক (Productive and consumption unit) অর্থাৎ পরিবারের সক্ষম সদস্যরা উৎপাদন করে এবং সবাই মিলে ভোগ করে।
৪) পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের ভরণ-পোষণসহ অন্যান্য দায়-দায়িত্ব বহন করে।

সাধারণভাবে, বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার বলতে বুঝায় এমন একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন যেখানে বৈবাহিক এবং রক্ত সম্পর্ক সূত্রে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তানসহ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তানাদির স্ত্রী-পরিজনসহ বসবাস করে।

সম্প্রতি পরিবারের পাশাপাশি বাড়ী (Household) প্রত্যয়টি লক্ষ করা যায়। বস্তুত, পরিবারের চেয়ে বাড়ী অধিকতর সুস্পষ্ট। কেননা, বাড়ী বলতে একই চুলায় রান্না ও একই হাঁড়ি থেকে যারা একত্রে খাদ্য গ্রহণ করেন, যাদের পৃথক ট্যাক্স দিতে হয় এবং যাদের রয়েছে অভিন্ন আয় (Common income) এবং অভিন্ন ব্যয় (common expenditure) তথা আয়-ব্যয়ের একটি সুনির্দিষ্ট বাজেট। বস্তুত, একই বাড়ীতে যারা বসবাস করেন তারা একটি পরিবারই গঠন করেন। তাই অনেকে পরিবার এবং বাড়ীর তেমন কোন পার্থক্য নির্দেশ করেন না। তবে ঐতিহ্যগতভাবে পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্তুতি এবং কখনও নাতি-নাতনীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু সামাজিক গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য আজকাল অনেকে পরিবার নয়, বাড়ীকে (Household) গবেষণার একক হিসেবে গ্রহণ করেন।

অনুশীলন ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সমাজবিজ্ঞানী নিমকফ কর্তৃক প্রদত্ত পরিবার-এর সংজ্ঞাটি অনূর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

www.swapno.in

সারাংশ

পরিবার আমাদের সমাজের এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেকানে আমরা জন্মগ্রহণ করি, লালিত-পালিত হই, কর্মজীবনের শেষে সেখানে ফিরে আসি। পরিবারে যে কোন সময় আসা-যাওয়া করা যায় অর্থাৎ পরিবার যেকোন সময় আপনাকে সাদরে গ্রহণ করে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীগণ পরিবারের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। তবে সব সংজ্ঞাই এক একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেটি হল এই যে, পরিবার একটি সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তানেরা বসবাস করবে। তবে কোন কোন পরিবারে দাদা-দাদীসহ বিবাহিত ছেলেমেয়েরা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সাধারণত পরিবারের মুখ্য সদস্য কারা থাকেন?

ক) স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তানরা খ) মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী

গ) মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী ঘ) মা-বাবা, ভাই-বোন, নানা-নানী

২। পরিবার কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

ক) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান খ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

গ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঘ) সামাজিক সংঘ

www.swapno.in

www.swapno.in

পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পাঠ ২

মূলধারণা

- পরিবারের উৎপত্তি
- পরিবারের ক্রমবিকাশ
- মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের উৎপত্তি
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি

১. বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত পরিবারের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
২. পরিবারের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৩. মাতৃতান্ত্রিক পরিবার নাকি পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আগে এসেছে- এ সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

১৮৬১ সালে নৃবিজ্ঞানে আগ্রহী একজন সুইজ আইনবিদ ব্যাকোফেন (Bachofen) তাঁর **Mother Right** নামক গ্রন্থে অবাধ যৌনাচার (Sexual Promiscuity) তত্ত্ব প্রদান করেন। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা প্রাচীন সমাজ থেকে গৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে তিনি বলেন যে, আদিতে যৌন জীবনের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সেযুগে বিবাহ-ভিত্তিক কোন পরিবার ছিল না। তাঁর মতে তখন সন্তান জন্মদানের জন্য মাতাকে চিহ্নিত করা গেলেও পিতাকে চিহ্নিত করা যেত না। অতএব বলা যায় মাতাই তার সন্তানদের নিয়ে মাতৃপ্রধান পরিবারের প্রথম সূত্রপাত করে এবং পরে পিতৃপ্রধান পরিবারের আবির্ভাব ঘটে। তিনি বলেন যে, পিতৃপ্রধান পরিবার উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। তাঁর মতে আদি মাতৃপ্রধান পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই রোমান পিতৃপ্রধান পরিবারের উদ্ভব ঘটে।

রবার্ট ব্রিফল্ট (R. Briffault) তাঁর **The Mothers** নামক গ্রন্থে প্রাক-একক পরিবারের নানা রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সরোরাল পলিজিনি (sororal polygyny) তথা স্ত্রীর একাধিক বোনকে বিবাহ করার রীতির অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন। এটাকেই শালিকা বিবাহ (Sororate marriage) বলে। পশ্চিম অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের মধ্যে কেউ বড় বোন বিবাহ করলে সে স্ত্রীর অন্যান্য বোনদেরও স্বামী বলে পরিগণিত হত। একই প্রথা মেলানেশীয়াতেও লক্ষ করা গিয়েছে। উত্তর আমেরিকান আদিবাসী ও ক্যালিফোর্নিয়ার আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ প্রথার অস্তিত্ব খোঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, নিউ গ্রানাডার আদিবাসী, কালাহারীর বুশম্যান, দক্ষিণ আফ্রিকার কাফির, মোজাম্বিকের

www.swapno.in

দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকীয় আদিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ইন্দো-আর্যদের মধ্যে এ প্রথা চালু ছিল। প্রথাটি পাঞ্জাবেও প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে।
ব্রিফল্ট বলেন যে, তিব্বতীয়দের মধ্যে যৌথ বিবাহ বলতে দু'টি পরিবারের দুই বা তিনজন পুরুষ ও দুই বা তিনজন মহিলার মধ্যকার যৌন সম্পর্ককে বুঝায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একজন মহিলার দুইজন স্বামী থাকে। তিব্বত, আসাম, হিমালয় এলাকা, আফ্রিকা, ভারতের টোডা, নাইজেরিয়া, নিউগিনি ইত্যাদি অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের বিবাহ সম্পর্কের কথা ব্রিফল্ট উল্লেখ করেন। ব্রিফল্টের মতে অবাধ যৌনচারের পর সন্তানদের নিয়ে মায়েরাই প্রথমে পরিবার ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করে। শুধু তাই নয়, মেয়েরাই সকল শিল্প কলারও সূচনা করে।

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার না পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কোন্‌টি আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

বেশ কিছু নৃবিজ্ঞানী যেমন ব্যাকোফেন, মর্গান, মেকলেনান, ব্রিফল্ট মানব সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের পূর্ব অস্তিত্বের (Prior existence) কথা বলেছেন। তাঁদের মতে মানব সমাজে প্রথম যে পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে মায়ের বা মহিলাদের কর্তৃত্বই স্বীকৃত ছিল। অর্থাৎ পিতৃতন্ত্রের আগে মাতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
ব্যাকোফেন বলেন যে, আদি মাতৃতন্ত্রে মেয়েরাই সমাজে নেতৃত্ব দিতো।

মাতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি ঃ

বস্তুত, যেসব নৃবিজ্ঞানী আদিম সমাজে অবাধ যৌনাচারের কথা বলেন তাঁরাই সমাজে পিতৃতন্ত্রের আগে মাতৃতন্ত্রের আবির্ভাবের কথা বলেছেন।

প্রথমত ঃ এদের অনেকের মতে মানব সমাজের সুচনা পর্বে আজকের অর্থে না ছিল রাষ্ট্র, না ছিল পরিবার। জ্ঞাতিগোষ্ঠী মিলে ছিল ক্ষুদ্র সমাজ। সব বয়স্কা মহিলা ছিল মাতা এবং সব বয়স্ক পুরুষরা ছিল পিতা। তাঁদের মতে এ সময়ের অবাধ যৌনচার জীবনে সন্তান প্রসবের দায়ে মাতাকে চিহ্নিত করা গেলেও পিতাকে চিহ্নিত করা যায়নি। তাই সন্তানের জন্মের পর মাতাকেই শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত। সে কারণে বলা যায়, যে মাতা তার সন্তানদের নিয়ে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথমে গড়ে উঠেছে।

এ ধরনের পরিবারে সন্তানদের অচিহ্নিত পিতা থাকে অনুপস্থিত। সন্তানসন্ততিসহ মাতা যে পরিবার গড়ে তুলে তাতে মাতাই নেতৃত্ব দেবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব এ ধরনের পরিবারকে মাতৃতন্ত্র বলাই সঙ্গত, যা পরিবারের প্রথম রূপ।

দ্বিতীয়ত ঃ মাতৃতন্ত্রের পূর্ব বিদ্যমানতার উক্ত যুক্তির উপর নির্ভর করে এটাও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবার ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মায়েদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। বস্তুত, পরিবার ও রাষ্ট্রবিহীন জ্ঞাতিগোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের নেতৃত্ব মেয়েদের হাতেই ন্যস্ত ছিল ।

তৃতীয়ত ঃ মাতৃতন্ত্রের পূর্বঅস্তিত্বের সমর্থক নৃবিজ্ঞানীরা আরো বলেন যে, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে (Family based on group marriage) মহিলাদের

www.swapno.in

ক্ষমতাই প্রাধান্য পায়। কেননা তখনও পিতাকে নির্দিষ্ট করা যায়নি। তবে মর্গান বর্ণিত পরিবারের তৃতীয় স্তরে যাকে সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার বলে। মাতার পরিবর্তে পিতার নেতৃত্ব শুরু হয়। এধরনের পরিবারে অবশ্য পিতা ও মাতা উভয়কে চিহ্নিত করা ছিল সহজ। তবে নৃবিজ্ঞানী মর্গান বলেন যে, সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার ছিল অস্থায়ী। অস্থায়ী হলেও নেতৃত্ব তখন পুরুষের হাতে ন্যস্ত হওয়া শুরু হয়। উল্লেখ্য, মর্গানের মতে পরিবার ব্যবস্থার বিবর্তনের ধারায় উক্ত পর্যায়টি একটি ক্রান্তি পর্ব। অর্থা এ পর্যায় থেকেই মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

পিতৃতন্ত্রের পূর্বঅস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি ঃ

প্রথমত ঃ ১৮৬১ সালে সুইজ আইনবিদ ব্যাকোফেন অবাধ যৌনাচার ও মাতৃতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেন। পক্ষান্তরে, ঐ একই বছর ইংরেজ আইনবিদ হেন্‌রী মেইন **Ancient Law** নামক গ্রন্থে বলেন যে, পিতৃপ্রধান পরিবারই হচ্ছে মানব সমাজের আদি পরিবার। কেননা তিনি প্রাচীন রোম এবং ভারতীয় সমাজে পিতৃতন্ত্রই দেখতে পান।

দ্বিতীয়ত ঃ অবাধ যৌনাচার তত্ত্বের ঘোর বিরোধী নৃবিজ্ঞানী ওয়েস্টারমার্ক যুক্তিতর্ক সহকারে বলেন যে, শুরু থেকেই সমাজে স্বামী-স্ত্রীর যুগল পরিবারের অস্তিত্ব ছিল এবং সেখানে পিতাকে চিহ্নিত না করার কোন কারণ নেই। ঐ সময়ের আদি পরিবারেও ক্ষমতা ছিল পিতার হাতেই ন্যস্ত।

ওয়েস্টারমার্কের মতে, সন্তানের জন্মের পর মাতা ও পিতা অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও একত্রে বাস করতে বাধ্য। কেননা সন্তানের জন্মের পর মাতা ও সন্তানের যত্ন নেওয়া অবশ্যই জরুরী। এ সময়ে পিতাই তথাকথিত ক্ষণস্থায়ী পরিবারেরও প্রধান।

তৃতীয়ত ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তির নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক পর্যায়ের মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের নেতৃত্ব মাতার হাতেই ন্যস্ত ছিল। পক্ষান্তরে, এটা বলা হয় যে, রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনায় মাঝে-মধ্যে যে কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয় তা মহিলাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তাই মাতৃতন্ত্র নয়, পিতৃতন্ত্রের উপস্থিতিই হলো রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল উৎস।

চতুর্থত ঃ পশু শিকার ও যুদ্ধ বিগ্রহে পুরুষরাই প্রাগৈতিহাসকাল থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। কারণ, এসব কাজে মহিলারা নেতৃত্ব দিতে দৈহিক দিক থেকে ছিল অক্ষম। ধর্মীয় কাজেও ছিল পুরুষের প্রাধান্য। কেননা অনেকে মনে করেন যে, মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে তারা অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন।

এসব কারণে আধুনিক অনেক নৃবিজ্ঞানীই মাতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, ম্যালিনোস্কী মাতৃতন্ত্রের পূর্ববিদ্যমানতা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন।

www.swapno.in

অনুশীলন ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

“মানব সমাজের প্রথম মাতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠিত হয়েছিল” এ উক্তির পক্ষে দু’টি যুক্তি দেখান।

১.
২.

সারাংশ

ব্যাকোফেনের মতে আদিম সমাজে যৌন জীবনের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ফলে তখন পরিবারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। কিন্তু এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা বেশিদিন টিকেনি। বিবাহ প্রথা শুরু হয়। তবে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এভাবে পরিবারের উৎপত্তি হয়। তবে মাতৃতান্ত্রিক না, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার আগে এসেছে- এ নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। বেশ কিছু নৃবিজ্ঞানী যেমন, ব্যাকোফেন, মর্গান, মেকলেনান, ব্রিফল্ট এর মতে মানব সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে, হেনরী মেইন, ওয়েস্টারমার্ক ও ম্যালিনোস্কীর মতে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই মানব সমাজের সূচনালগ্ন থেকে বিদ্যমান।

www.swapno.in

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ব্যাকোফেন কোন গ্রন্থে অবাধ যৌনাচার তত্ত্ব দিয়েছেন?

ক) Mother Right　　খ) The Mothers
গ) Ancient Law　　ঘ) Ancient Society

২। কার মতে মেয়েরাই সকল শিল্প কলার সূচনা করে?

ক) ব্যাকোফেন　　খ) মেকলেনান
গ) মর্গান　　ঘ) ব্রিফল্ট

৩। কে সর্বপ্রথম পিতৃতন্ত্রের পূর্ব অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেন?

ক) হেন্‌রী মেইন　　খ) ম্যালিনোস্কী
গ) ওয়েস্টারমার্ক　　ঘ) মেরেট

www.swapno.in

www.swapno.in

মর্গান ও ওয়েষ্টারমার্কের তত্ত্ব

পাঠ ৩

মূল ধারণা

- পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত মর্গানের তত্ত্ব
- পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত ওয়েষ্টারমার্কের তত্ত্ব
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পাঠ করে আপনি-

১. কালক্রমে কিভাবে অবাধ যৌন জীবন থেকে বিবাহ এবং বিবাহ থেকে পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয়েছে সে সম্পর্কে মর্গানের তত্ত্ব জানতে পারবেন।
২. পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কিত ওয়েষ্টারমার্কের তত্ত্ব জানতে পারবেন।
৩. বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে পরিবার গঠনের কারণসমূহ জানতে পারবেন।

৩.১ মর্গানের তত্ত্ব

আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী মর্গানকে সামাজিক নৃবিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে Ancient society (1877) সর্বাপেক্ষা বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঐ গ্রন্থে মর্গান পরিবার, সম্পত্তি, রাষ্ট্র ও সরকারের উৎপত্তি এবং সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্ক বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মর্গানের মতে আধুনিক এক বিবাহভিত্তিক পরিবার (monogamian family) এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল। তিনি বলেন কালক্রমে অবাধ যৌন জীবন থেকে বিবাহ এবং বিবাহ থেকে পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। নিম্নে মর্গান বর্ণিত পরিবারের বিবর্তন তত্ত্ব আলোচনা করা হলো ঃ

মর্গানের মতে অবাধ যৌনাচারের পর যে পাঁচটি পরিবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রত্যেকটি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক এক ধরনের বিবাহ পদ্ধতি। অর্থাৎ তিনি বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবার নামক মুখ্যগোষ্ঠী (সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়) কিংবা সংঘের বিভিন্ন রূপ চিহ্নিত করেছেন।

অবাধ যৌনাচার (Sexual Promiscuity)

ব্যাকোফেনকে সমর্থন করে মর্গান বলেন যে, শুরুতে মানব সমাজে অবাধ যৌনাচার বিদ্যমান ছিল। তখন যৌন জীবনের ওপর কোন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। মর্গানের মতে এটাই ছিল যৌন জীবনের প্রথম স্তর। যৌন জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ের অপর নাম হচ্ছে প্রাক-বিবাহ ও প্রাক-পরিবার ব্যবস্থা। আদিম গোষ্ঠীজীবনে যৌন জীবন ছিল অনিয়ন্ত্রিত। সেটা ছিল অবাধ যৌনাচারের যুগ।

মর্গান-বর্ণিত সামাজিক বিবর্তনের বন্য দশার নিম্ন পর্যায়ে অবাধ যৌনাচারের অস্তিত্ব ছিল বলে ‘অনুমান‘ করা হয়েছে।

www.swapno.in

১। সগোত্র পরিবার (Consanguine family)

গঠন ঃ সগোত্র পরিবার একটি গোষ্ঠীর আপন ভাইবোন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের বিহাহের মাধ্যমে গঠিত হয়। অবাধ যৌন জীবনের স্তর অতিক্রম করে মানব সমাজ যখন পরিবার ব্যবস্থা গড়ে তুলে তখন প্রথম ধরনের পরিবার হিসেবে সগোত্র পরিবারের উদ্ভব ঘটে। এভাবে যৌন জীবনের ওপর প্রথম বারের মতো কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদাহরণ ঃ পলিনেশীয়দের মধ্যে সগোত্র পরিবারের আদিমতম রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। মর্গান একে মালয়ী ব্যবস্থা (Malayan System) বলে আখ্যা দেন। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে স্যান্ডউইচ দ্বীপে (Sandwich Island) আমেরিকান মিশনগুলোর প্রতিষ্ঠার সময় সেখানে ভাইবোনের মধ্যেও বিবাহের ভিত্তিতে সগোত্র পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সগোত্র পরিবারের দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে তুরানীয়ান ব্যবস্থা (Turanian System), যা এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান ছিল। উল্লেখ্য, মর্গানের মতে প্রাচ্যের দু'টি প্রাচীন সভ্যতা (নদী তীরবর্তী) যথা- ভারত ও চীনে সমাজ গঠনের আদিম পর্যায়ে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সময়কাল ঃ এই পরিবারের অস্তিত্ব ছিল মর্গান বর্ণিত বন্য দশার-নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে। ঐ যুগে সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানার অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ তখনও রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশ ঘটেনি।

২। পুনালুয়ান পরিবার (Punaluan family)

গঠন ঃ আপন বা জ্ঞাতি সম্পর্কের বহু সংখ্যক বোনের সঙ্গে একদল পুরুষের অথবা আপন বা জ্ঞাতি সম্পর্কের বহু সংখ্যক ভাইয়ের সঙ্গে একদল মহিলার আন্তবিবাহের (information) ভিত্তিতে পুনালুয়ান পরিবার গঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রথায় যৌথ স্বামীরা পরস্পর জ্ঞাতি নাও হতে পারে। তেমনি স্ত্রীরাও পরস্পর জ্ঞাতি নাও হতে পারে, যদিও সাধারণত উভয় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এরা জ্ঞাতি সম্পর্কিত। এটি আসলে একদল পুরুষের সঙ্গে একদল মহিলার বিবাহ ব্যবস্থা।

উদাহরণ ঃ পলিনেশীয়রা এই জ্ঞাতি সম্পর্কিত পরিবার থেকে পুনালুয়ান পরিবারে পরিবর্তিত হয়েছিল। তুরানী ও গ্যানোয়া (Ganowanian) গোষ্ঠীর লোকেরা পুনালুয়ান তথা দলগত বিবাহ পদ্ধতি গ্রহণ করে, কারণ তাদের মধ্যে গণের (Gentes) সৃষ্টি হয়ে গেছে। এর ফলে ভাইবোন বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

সময়কাল ঃ মর্গান বর্ণিত **বন্যদশার উচ্চ এবং বর্বর দশার নিম্ন পর্যায়ে** পুনালুয়ান পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। তখনও সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানাই বিদ্যমান ছিল।

৩। সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার (Syndyasmian family)

গঠন ঃ একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার মধ্যে অস্থায়ী বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে এ পরিবার গঠিত হয়। এ পরিবারের স্থায়িত্ব স্বামী-স্ত্রীর খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করতো। কারণ এ ধরনের পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহবাস চিরস্থায়ী রূপ লাভ করেনি। এটা স্বামী-স্ত্রীর এক ধরনের একান্তই স্বেচ্ছামূলক সাময়িক বিবাহ বন্ধন।

মর্গানের মতে এটাই হচ্ছে পরিবার ব্যবস্থার তৃতীয় স্তর, যার অপর নাম যুগল পরিবার। উল্লেখ্য, যেহেতু সিনডিয়াসমিয়ান পরিবার এক স্বামী এবং এক স্ত্রীর

www.swapno.in

পরিবার সেহেতু এটাই আধুনিক একক পরিবারের (Monogamian Family) ভিত্তি প্রস্তুত করে।

উদাহরণ ঃ আমেরিকান আদিবাসীরা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন দেখা যায় তারা দলগত বিবাহ পদ্ধতি থেকে জোড় বিবাহ পদ্ধতিতে পৌঁছেছে।

সময়কাল ঃ মর্গান কথিত **বর্বর দশার নিম্ন, মধ্য, এমনকি উচ্চ পর্যায়েও** সিনডিয়াসমিয়ান পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। সে সময়ে সম্পত্তিতে আংশিক ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ জোড় বিবাহ পদ্ধতিতে সম্পত্তির বীজ নিহিত ছিল, যা একক বিবাহ পদ্ধতিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

৪। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal family)

গঠন ঃ একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর বিবাহের ভিত্তিতে এই পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে। উক্ত পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে ক্ষমতা স্বামী, পিতা কিংবা বয়স্ক পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

আসলে মর্গান যেটাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal family) বলেছেন সেটার অপর নাম বহুস্ত্রী পরিবার (Polygynous family)। যেখানে বহু বিবাহ বিদ্যমান। তবে এক্ষেত্রে তবে সাধারণত স্ত্রীদের একত্রে রাখা হত না।

মর্গানের মতে এটা হচ্ছে চতুর্থ পর্যায়ের পরিবার এবং পঞ্চম স্তরের যৌন জীবন। মর্গান বলেন যে, সগোত্র পরিবার এবং পুনালুয়ান পরিবারে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ক্ষমতাই ছিল অধিকতর স্বীকৃত। সিনডিয়াসমিয়ানে পুরুষের কর্তৃত্ব দানা বেঁধে উঠে এবং পিতৃপ্রধান পরিবারে স্বামী, পিতা বা বয়স্ক পুরুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ ঃ রোমান সমাজে পিতৃপ্রধান পরিবারের নজির পাওয়া যায়। রোমান পরিবারের পিতা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

সময়কাল ঃ বর্বর দশার মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ে পিতৃপ্রধান পরিবারের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। তখন সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথ আরও সুগম হয়।

৫। একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার (Monogamian Family)

গঠন ঃ একজন পুরুষের সাথে অপর একজন মহিলার বিবাহের মাধ্যমে একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার গঠিত হয়। এটি পরিপূর্ণভাবে স্থায়ী যুগল পরিবার।

মর্গানের মতে একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারই আধুনিক পরিবারের সার্বজনীন রূপ। এটা পরিবারের বিবর্তন ধারায় পঞ্চম পর্যায়ের পরিবার। এখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহবাস একচেটিয়া (Exclusive) রূপ ধারণ করে।

উদাহরণ ঃ একজন স্বামী ও একজন স্ত্রীর পরিবার আধুনিককালের প্রায় সব সমাজেই লক্ষণীয়। শিল্প-সমাজে এটাই মোটামুটি সার্বজনীন বিবাহ রীতি। তবে প্রাক-শিল্প সমাজেও এর উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল।

সময়কাল ঃ মর্গানের মতে **বর্বর দশার উচ্চ পর্যায়** থেকে এ পরিবার ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করা যায়। তখন থেকেই ব্যক্তিগত মালিকানারও সূত্রপাত ঘটে। এটি আসলে মর্গান বর্ণিত সভ্যতার স্তরে বিশেষভাবে স্থায়ী রূপ ধারণ করে।

www.swapno.in

৩.২ ওয়েষ্টারমার্কের তত্ত্ব

ব্যাকোফেন, মর্গান, ব্রিফল্ট প্রমুখের অবাধ যৌনাচার তত্ত্বের (theory of sexual promiscuity) বিরোধিতা করে ওয়েস্টারমার্ক তাঁর **The History of Human Marriage** নামক গ্রন্থে পরিবার সম্পর্কে এক ভিন্নধর্মী তথা ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। মর্গান যেখানে অবাধ যৌনাচার থেকে শুরু করে পরিবারের এক বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, ওয়েষ্টারমার্ক সেখানে পরিবার সম্পর্কে বিবর্তনবাদ বিরোধী তথা ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ওয়েস্টারমার্কের মতে একক বিবাহভিত্তিক পরিবারই (Mongamlian family) হচ্ছে সার্বজনীন (universal)| এটি একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন। তিনি বলেন সর্বকালে এবং সর্বত্র মানুষ একক বিবাহভিত্তিক পরিবারেই বসবাস করে আসছে। অর্থাৎ ওয়েস্টারমার্ক মনে করেন না যে, অবাধ যৌনাচার, গোষ্ঠী বিবাহ (group marriage) ইত্যাদি স্তর পার হয়ে ক্রমান্বয়ে একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে। তার মতে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার সব সময়েই ছিল , আছে এবং থাকবে।

তাঁর ধারণা মানুষ স্বভাবগতভাবেই একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারে অভ্যস্ত। তিনি অবাধ যৌনাচারের ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবাধ যৌনাচারের কোন লক্ষণ যদি কোথাও থাকে তবে তা হবে নিয়মের বরখেলাপ, জীবধর্ম বিরোধী এবং ব্যতিক্রম। ওয়েষ্টারমার্ক প্রথমে অবাধ যৌনাচার সমর্থনকারীদের বক্তব্য উল্লেখ করেন এবং পরে তার সীমাবদ্ধতা ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেন। বস্তুত, তাঁর তত্ত্ব মর্গানের পরিবার তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী।

ওয়েস্টারমার্কের মতে দু'টি ভ্রান্ত ধারণার ওপর অবাধ যৌনাচারের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

(১) কিছু প্রাচীন লেখক ও আধুনিক পর্যটকগণ তাঁদের গ্রন্থ রচনাকালে এমন কিছু বন্য সমাজের পরিচয় পেয়েছেন যারা অবাধ যৌনাচারে অভ্যস্ত ছিল। ওয়েস্টারমার্কের মতে এগুলো অপর্যাপ্ত এবং অস্পষ্ট। ঐ সব লেখক সুদূর অতীতের প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি।

(২) কতকগুলো সামাজিক প্রথার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে একথা মনে হতে পারে যে, সভ্যতার উষালগ্নে হয়ত বিবাহের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তা ঠিক নয়। ওয়েস্টারমার্কের মতে, ঐসব প্রথা অন্য কারণে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় টিকে আছে। তাঁর মতে, যুগল বা অণুপরিবারই হলো সাধারণ নিয়ম। অবাধ যৌনাচার ব্যতিক্রম। তিনি অবশ্য মনে করেন যে, শুরুতে হয়ত আজকের সততা অনুপরিবার ছিল না। যুঁথবদ্ধ জীবনে সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, এদের স্বনির্ভর ও দায়িত্বান করে তোলা পর্যন্ত মা-বাবাকে অণু বা যুগল পরিবারেই বসবাস করতে হত। একথা বলাই বাহুল্য যে, আধুনিক কালের একক পরিবারও আপেক্ষিক অর্থে স্থায়ী।

নৃবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড বেলচার (Edward Belchar) বলেন যে, আন্দামান দ্বীপের স্বামী-স্ত্রী সন্তানের মায়ের দুধ খাওয়া ছাড়া পর্যন্ত একত্রে বসবাস করত এবং তারপর তারা উভয়ই ভিন্ন সঙ্গী খুঁজত। এটি অনেকটা মর্গান বর্ণিত সিনডিয়াসমিয়ান পরিবারের অনুরূপ বলা যায়। অপর দিকে, বেইজার্টের (Baegert) মতে ক্যালিফোনিয়ার উপদ্বীপবাসীরা অবাধ যৌন জীবনে অভ্যস্ত ছিল এবং 'বিবাহ' শব্দটি তাদের ভাষায় নেই।

www.swapno.in

ওয়েস্টারমার্ক উক্ত ধারণার সমালোচনা করেন। বেলচারের বিবৃতিতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আন্দামান দ্বীপবাসীরা যুগল পরিবার জীবনে অভ্যস্ত ছিল। বেইজার্টের মতামত সম্পর্কে ওয়েস্টারমার্ক বলেন যে, ক্যালিফোর্নিয়ার উপদ্বীপবাসীদের ভাষায় 'বিবাহ' শব্দটি না থাকার অর্থ এই নয় যে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ওয়েস্টারমার্ক এভাবে অনেকের যুক্তি খণ্ডন করে অবাধ যৌনাচারর বিরোধিতা করেন। নৃবিজ্ঞানী ম্যানের (Mann) গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়েস্টারমার্ক বলেন যে, আন্দামানীয়দের সম্পর্কে বেলচারের ধারণা সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা তাঁরা যে শুধু অনুপরিবার নির্ভর তাই নয়, বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। আমরণ যুগলজীবন ব্যতিক্রম নয়, এটা তাদের রীতি।

বহুস্বামী গ্রহণ প্রথা (Polyandry) সম্পর্কে ওয়েস্টারমার্কের ধারণা সম্পূর্ণ নেতিবাচক। তিব্বতীয়রা কয়েক ভাই মিলে এক স্ত্রী গ্রহণ করে বটে, কিন্তু একই সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে একাধিক স্বামী বসবাস করে না। টি.হুইলার (T. Wheeler) বলেন যে, বহুস্বামী গ্রহণ প্রথা পশুচারণ সমাজে দেখা দেয়। স্বামীরা দূরদেশে যাবার সময় স্ত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্য পুরুষের হেফাজতে রেখে যায়। বস্তুত, এসব প্রথাকে **অতিরঞ্জিত** করে দলমত বিবাহ ও অবাধ যৌনাচারের তত্ত্বকে যৌক্তিক করে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

অবাধ যৌনাচার তত্ত্বের সমালোচনায় ওয়েস্টারমার্ক কয়েকটি মৌলিক যুক্তির অবতারণা করেন। যথা ঃ

(১) তাঁর মতে স্তন্যপায়ী হোমোসেপিয়ান্সদের মধ্যে অণুপরিবারই দেখা যায়। পশু-পক্ষী, সিল মাছ ইত্যাদির মধ্যেও এমনটি লক্ষ করা যায়।

(২) স্যার হেনরী মেইনের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে ওয়েস্টারমার্ক বলেন যে, অবাধ যৌনাচার সন্তান ধারণক্ষমতা হ্রাস করে অনুর্বরতার জন্ম দেয়। ইহা জৈব-নিয়ম বিরোধী। এর কুফল অবশ্যম্ভাবী। অজাচার (Incest) এ জন্যই গর্হিত কাজ বলে গণ্য।

(৩) যৌনজীবনে ঈর্ষারপরায়ণতা অণুপরিবার গঠনে সহায়ক। নিজের স্বামী বা স্ত্রীর ওপর অন্যের কোনরূপ হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। অতএব অবাধ যৌনাচার যুক্তিহীন ধারণা। ওয়েস্টারমার্ক অনেক নৃবিজ্ঞানীর গবেষণামূলক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রাচীন সমাজে যৌন ঈর্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন। বেইলী (Bailey) সিংহলের ভেদ্দাদের মধ্যে যৌন ঈর্ষার অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার কোন উপজাতি সমাজের স্বামী যদি তার স্ত্রীকে পর পুরুষের সঙ্গে চলতে ফিরতে দেখত তাহলে প্রথমত তাকে সে অসতী বলে সাব্যস্ত করত। এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাকে সে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দিতে পারতো। এসব তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে ওয়েস্টারমার্ক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যৌথ যৌনজীবনের ধারণা একটি অলীক কল্পনা মাত্র।

কিন্তু ব্রিফল্ট জোরালোভাবে ওয়েস্টারমার্কের যুক্তি খণ্ডন করতে চেয়েছেন। ব্রিফল্ট মনে করেন যে, শুধু যেসব প্রাণীর মধ্যে অণুপরিবার রয়েছে ওয়েস্টারমার্ক শুধু সেগুলোর উদাহরণ দিয়ে নিজের ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। ব্রিফন্টের মতে অনেক স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যেও বহু-স্ত্রী গ্রহণ প্রথা প্রচলিত।

ব্রিফল্ট এ কথাও মনে করেন না যে, অবাধ যৌনাচার স্বাস্থ্যগত, জৈবিক ও সন্তান জন্মদান ক্ষমতার দিক থেকে ক্ষতিকর। তাঁর মতে আদিম সমাজে যৌনজীবনে

www.swapno.in

প্রবৃত্ত হবার সময় তারা ধারণাও করতে পারেনি যে, যৌনসুখ (Sex pleasure) সন্তান উৎপাদনে সক্ষম।

যৌনঈর্ষা সম্পর্কে ব্রিফল্ট মনে করেন যে, এ ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া আধুনিক কালের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে-প্রাচীন সমাজের জন্য নয়। যৌন জীবনের ওপর সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই যৌনঈর্যার মূল কারণ। ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের সঙ্গে ব্রিফল্টের ধারণার মিল রয়েছে। তাছাড়া, যৌন ঈর্ষাই যদি থাকবে তাহলে এস্কিমোরা কেন স্ত্রীর দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন করবে?

প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে যতটা জানা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে পরিবারবিহীন কৌমের কথা জানা যায়নি। সব আদিবাসী বা কৌমের মধ্যে সীমিত আকারে হলেও যৌন জীবনের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়। আসলে অবাধ যৌনাচারের কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুধু ওয়েস্টারমার্কই নন, অনেক প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানীই অবাধ যৌনাচার এবং যৌথ বিবাহের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। বিল্স ও হোয়জার (Beals and Hoijer) বলেন যে, প্রাচীনকালে বা অন্য কোন সময়ে অবাধ যৌনাচারের কোন প্রমাণ লিপিবদ্ধ হয়নি। টোডাদের মধ্যে কয়েক ভাই মিলে যে একটিমাত্র স্ত্রী গ্রহণ করে তার মূল কারণ হলো এই যে, মেয়ে শিশু হত্যাজনিত কারণে স্ত্রীলোকের ঘাটতি দেখা দেয়। তিব্বতীয়দের সম্পর্কে লিন্টনের (Linton) বক্তব্য হলোঃ যেখানে দরিদ্রের মধ্যে বহু স্বামী গ্রহণ, মধ্যবিত্তদের মধ্যে যুগল পরিবার এবং ধনীদের মধ্যে বহু স্ত্রী গ্রহণ প্রথা লক্ষ করা যায়।

বস্তুত, মানব সমাজে এমন কোন পর্যায় বা অবস্থা ছিল না যেখানে পরিবার অনুপস্থিত এবং এমন কোন পর্ব আসেনি যেখানে পরিবার সবেমাত্র আবির্ভূত হলো। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের ভাষায়, "The family has no origin in the sense that there never existed a stage of human life in which the family was absent or another stage in which it emerged".

পরিবারের নির্দিষ্ট কোন উৎপত্তি স্থল নেই। কোন বিশেষ একটি সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিবার সৃষ্টি হয়নি। ইহা বিভিন্ন পরিবেশে ও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেকোন একপেশে ব্যাখ্যা মূল বিষয়কে বিকৃত করবে।

পরিবারের উৎপত্তি নিয়ে উপরে অনেক যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবস্থা নিয়ে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মানুষ বিবাহ বা পরিবার গঠন করে কয়েকটি কারণে - (১) যৌনানুভূতি, (২) সন্তান লাভের আকাঙ্খা এবং সন্তানের প্রতি স্নেহানুভূতি (৩) পরবর্তী প্রজন্মে নিজের নাম-পরিচয় ও বিষয় সম্পত্তি বজায় রাখার বাসনা, (৪) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা, (৫) বার্ধক্যকালে অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা এবং (৬) আপন দুঃখ-বেদনা ও হাসি-কান্নার সাথী সংগ্রহ।

www.swapno.in

অনুশীলন ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

মর্গানের তত্ত্বানুযায়ী পুনালুয়ান পরিবারের ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

অনুশীলন ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

ওয়েষ্টারমার্কের তত্ত্বানুযায়ী একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সারাংশ ঃ

মর্গান সামাজিক নৃবিজ্ঞানের জনক। তাঁর মতে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার এক দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফল। তিনি তাঁর পরিবারের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্বে অবাধ যৌন জীবনের পর পর্যায়ক্রমে পাঁচ প্রকার পরিবার ব্যবস্থা বিকাশের কথা বলেছেন। কিন্তু ওয়েস্টার মার্ক পরিবারের গঠন ও বিবর্তন সম্পর্কিত মর্গানের তত্ত্বকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তিনি ব্যাকোফেন, মর্গান ও ব্রিফল্টের অবাধ যৌনাচার তত্ত্বের প্রবল বিরোধিতা করেন এবং পরিবার সম্পর্কে এক ভিন্নধর্মী তথা ক্রিয়াবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ওয়েষ্টারমার্কের মতে সর্বকালে এবং সর্বত্র মানুষ একক বিবাহভিত্তিক যুগল পরিবারেই বসবাস করে আসছে।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। মর্গানের পিতৃপ্রধান পরিবার বর্তমানের কোন পরিবারের সাথে তুলনা করা যায়?

ক) এক স্বামীর বহু স্ত্রী পরিবার
খ) এক স্ত্রীর বহু স্বামীর পরিবার
গ) একক স্বামী স্ত্রী পরিবার
ঘ) এক স্বামীর দুই স্ত্রী পরিবার

২। মর্গানের সিনডিয়াসমিয়ান পরিবারের সাথে আন্দামান দ্বীপের পরিবারের গঠনকে কে সর্বপ্রথম তুলনা করেন?

ক) বেইজার্ট
খ) ওয়েস্টারমার্ক
গ) এডওয়ার্ড বেলচার
ঘ) মর্গান

৩। টি হুইলার মতে বহু স্বামী গ্রহণ প্রথা কোন সমাজে প্রথম দেখা দেয়?

ক) কৃষিজীবী সমাজ
খ) আদিম সমাজ
গ) বণিক সমাজ
ঘ) পশুচারণ সমাজ

www.swapno.in

www.swapno.in

পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলী

পাঠ ৪

মূল ধারণা

- পরিবারের প্রকারভেদের নির্ণায়কসমূহ
- পরিবারের কার্যাবলী
- পরিবারের ভবিষ্যৎ
- বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো
- বাংলাদেশের পরিবারের উপর শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রভাব
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. পরিবার গঠনে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
২. বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে যে বিভিন্ন ধরনের পরিবার গঠিত হয় সে সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
৩. পরিবারের প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৪. পরিবারের কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৫. পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৬. বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
৭. বাংলাদেশের পরিবারের উপর শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রভাব কতটুকু সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৪.১ পরিবারের প্রকারভেদ (Types of family)

বিভিন্ন নির্ণায়ক (criteria) বা উপাদানের ভিত্তিতে পরিবারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে আমরা এ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

১. ক্ষমতা কিংবা কর্তৃতের মাত্রা ঃ (Degree of power or authority) ঃ ক্ষমতার মাত্রার ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃতান্ত্রিক (patriarchal) এবং মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। পরিবারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্ন রয়েছে। এই ক্ষমতা তথা নেতৃত্ব পিতা, স্বামী বা প্রধান পুরুষের ওপর ন্যস্ত থাকলে তাকে পিততান্ত্রিক পরিবার বলা হয়। অপরপক্ষে, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব যদি মাতা, স্ত্রী বা প্রধান মেয়েদের ওপর বর্তায় তাহলে তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে অভিহিত করা যায়।

> ক্ষমতা কিংবা কর্তৃতের মাত্রার ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃতান্ত্রিব (patriarchal) এবং মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

ব্যাকোফেন (Bachofen) এবং ব্রিফল্টের (Briffault) মতে মানবসমাজে প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা মনে করেন সন্তান-সন্ততিকে নিয়ে মাতাই প্রথম পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। মাতৃপ্রধান পরিবারকে মাতৃ

www.swapno.in

প্রধান কিংবা মাতৃ অধিকার বিশিষ্ট (mother-right) পরিবার বলা হয়। ময়মনসিংহের গারো উপজাতি সমাজে মহিলাদের ক্ষমতা পুরুষের তুলনায় বেশি না হলেও কম নয়। বস্তুত, গারো পরিবার মাতৃতান্ত্রিক। অন্যদিকে ওয়েস্টারমার্ক বলেন যে, আদিমকালেই পরিবারের নেতৃত্ব পুরুষের হাতেই ন্যস্ত ছিল। পুরুষের মধ্যে সৃজনশীলতা বিদ্যমান থাকায় এবং তাদের দুঃসাহসিকতার কারণে প্রথমেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার গড়ে উঠেছে।

সমাজবিজ্ঞানী Metta Spencer বলেন, আসলে মাতৃতন্ত্র পৃথিবীর কোন সমাজেই নেই। আমাদের সমাজের পরিবার মূলত পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে পিতৃপ্রধান কিংবা পিতৃ-অধিকার (Father-right) বলেও অভিহিত করা হয়। এখানে পিতাই পরিবারের সম্পত্তির মালিক ও প্রশাসক। সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী এবং ভাই-বোনেরা পিতার অধীনস্থ পারিবারিক সদস্য। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতার অবর্তমানে তার ক্ষমতা জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তানের ওপর অর্পিত হয়।

প্রাচীন রোমান সমাজে পিতা কেবল গৃহের কর্তা ব্যক্তিই ছিলেন ছিলেন না। তিনি ছিলেন ধর্মীয় প্রধান ও শাসক। তিনি রাষ্ট্র ও বিচারকার্য পরিচালনায় পরিবারের প্রতিনিধি রূপে কাজ করেন। রোমান পিতা নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি সন্তানদের শাস্তি দিতে, ত্যাগ করতে, বিক্রি করতে, বিক্রি করতে, এমনকি, জন্মক্ষণে হত্যা করতেও পারতেন।

অপরপক্ষে, রোমান পিতা ছিলেন বিশ্বস্ত স্বামী, পরিশ্রমী ও সৎ। তিনি বহু স্ত্রী গ্রহণ করতেন না উপপত্নীও রাখতেন না। তিনি স্ত্রীকে কদাচিত তালাক দিতেন। স্ত্রী ছিলেন তার সাহায্যকারী এবং পরামর্শ করার সাথী। রোমান আইন ব্যবস্থা রোমান পিতাকে এ ক্ষমতা প্রদান করেছিল।

২. বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান ঃ (Post-marital place of residence) ঃ

বিবাহোত্তর বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃবাস, (Patrilocal), মাতৃবাস (Matrilocal) এবং নব্যবাস (Neolocal) এই তিন ভাগে বিভক্ত

বিবাহোত্তর বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃবাস (Patrilocal), মাতৃবাস (Matrilocal) এবং নব্যবাস (Neolocal)–এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। পিতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নব দম্পতি স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাস করে। অপরপক্ষে, মাতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নব দম্পতি স্ত্রীর পিতৃগৃহে বসবাস করে। নব্যবাস পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত নব দম্পতি তাদের কারো পিতৃগৃহে বসবাস না করে সম্পূর্ণভাবে তাদের নতুন বাড়িতে বসতি স্থাপন করে। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে এই প্রথাই চালু রয়েছে।

আমাদের সমাজে পিতৃবাস পরিবারের প্রাধান্য বিদ্যমান। বিশেষ ক্ষেত্রে, এর ব্যতিক্রম তথা মাতৃবাস ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। সাধারণত, কোন পরিবারের পুরুষ সন্তান না থাকলে পরিবার প্রধান তার কোন এক কন্যার স্বামীকে নিজ গৃহে বসবাস করার আমন্ত্রণ জানায়। এ ক্ষেত্রে স্বামীর ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং স্বামী-স্ত্রীর পক্ষের লোকজনের কাছে অসহায় বোধ করে। এ প্রথাটিকে তাই অনেকে ব্যঙ্গ বা ঠাট্টা করে এবং ‘ঘর জামাই’ শব্দটি কদর্থে ব্যবহার করা হয়। গারো সমাজে মাতৃবাস পরিবার দেখা যায়। নব্যবাস পরিবারের সংখ্যা আমাদের দেশের নগর-জীবনে ক্রমাগত বাড়ছে। আমাদের দেশে অনেকেই বিয়ের পরেই স্ত্রীসহ নিজের কর্মস্থলে এসে পারিবারিক জীবন গড়ে তুলে। চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতি সমাজে পিতৃবাসের পাশাপাশি নব্যবাস পরিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

www.swapno.in

অবশ্য কিছু আদিবাসী সমাজে দ্বিবাস প্রথা bilocal rules রয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজ নব দম্পত্তির ওপর বসবাসের বিষয়টি ছেড়ে দেয়। তারা ইচ্ছা করলে পিতা কিংবা মাতার যেকোন পরিবারে বসবাস করতে পারে।

ইদানিং Patrilocal এবং Matrilocal প্রত্যয় দু'টির স্থলে Virilocal এবং Uxorilocal প্রত্যয় দুটি ব্যবহৃত হয়। Vrilocal পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত দম্পতি স্বামীর পিতার গৃহেই বসবাস করবে এমন কথা নেই। স্বামীর জ্ঞাতি গোষ্ঠীর (kin) বাড়িতে বা নিজ বাড়িতেও বসবাস করতে পারে। দম্পতিটি যদি স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাস করে তাহলে তাকে Viri patriolocal বা Patri-virilocal বলা হয়। অপরপক্ষে, দম্পতিটি যদি স্বামীর মামার বাড়িতে বসবাস শুরু করে তাহলে তাকে Viri-avunculocal বা Avuncu-virilocal বলা হয়। আবার Uxorilocal পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহিত দম্পত্তি স্ত্রীর পিতার গৃহেই বসবাস করবে এমন কথা নেই। জ্ঞাতি গোষ্ঠীর (kin) সঙ্গে বা স্ত্রীর বাড়িতেও বসবাস করতে পারে।

> বংশ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃসূত্রীয় (Patrilineal) এবং মাতৃসূত্রীয় (Matrilineal)-এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

৩. বংশ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার (Desecnt and property inheritance) ঃ বংশ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারকে পিতৃসূত্রীয় (Patrilineal) এবং মাতৃসূত্রীয় (Matrilineal)-এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। পিতৃসূত্রীয় পরিবারের ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততি পিতৃধারায় সম্পত্তি এবং পারিবারিক নাম (Surname) উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করে। এ প্রথায় কোন ব্যক্তি পিতা, দাদা, পিতার ভাইদেরকে তার মাতা, নানা, মামার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। অপরপক্ষে, মাতৃসূত্রীয় পরিবারের ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততি মাতৃধারায় সম্পত্তি এবং পারিবারিক নাম (Surname) উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে এবং মা, মামা ও নানাকে, পিতা, চাচা ও দাদার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত, পিতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রেই পিতৃসূত্রীয় নীতি পরিলক্ষিত হয়। অপরপক্ষে, মাতৃবাস পরিবারের ক্ষেত্রে মাতৃসূত্রীয় নীতি লক্ষণীয়।

যেহেতু পরিবার পিতৃসূত্রীয় অথবা মাতৃসূত্রীয় যেকোন একটি রূপ নিতে পারে সেহেতু উত্তরাধিকার, বংশ এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক (Kinship) একসূত্রীয় (Unilateral) ধারায় (পিতা বা মাতার দিক থেকে) লক্ষ করা যায়। তবে পাশ্চাত্যের সমাজ এবং বিশেষ করে, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে মাতা ও পিতার দিকে থেকে দ্বি-সূত্রীয় (Bilateral) জ্ঞাতিসম্পর্ক দেখা যায়। হিন্দু সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের দিক থেকে বলা যায় যে, এখানে পিতৃসূত্রীয় নীতিই বলবৎ থাকে। কেননা সাধারণত, হিন্দু মেয়েরা বাবার সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেত না। সম্পত্তি কেবল পিতৃধারায় উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র সন্তানে বর্তায়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে আজও এ প্রথা বিদ্যমান থাকলেও ভারতের হিন্দুসমাজে ১৯৫৫ সাল থেকে হিন্দু পারিবারিক আইন মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে ভারতের হিন্দু পরিবারের পিতৃসম্পত্তি সকল ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হচ্ছে। এর সাথে বিবাহবিচ্ছেদের (যা আগে অনানুষ্ঠিক ছিল) আইনও পাস হয়েছে। এখন বিবাহ সামাজিকভাবে অনুষ্ঠিত হলেও রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে নিবন্ধন (Registration) করতে হয়। তা না হলে কোন বিবাহই আইনসিদ্ধ বলে গণ্য হয় না। মুসলিম সমাজে বাবা ও মায়ের সম্পত্তি পুত্র ও কন্যা সন্তানেরা পেয়ে থাকে। তাছাড়া এক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততি বাবা ও মায়ের উভয়ের বংশকে সমভাবে গুরুত্ব দেয়। তবে পিতার পারিবারিক নামটিই (Surname) কার্যত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য,

www.swapno.in

পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারের দিক থেকে মুসলিম পারিবারিক আইনের চেয়ে ভারতের হিন্দু পারিবারিক আইন এখন কার্যত অধিকতর ক্ষমতা সম্পন্ন। কেননা মুসলিম পরিবার এখনও মেয়ে ছেলের সমান সম্পত্তি পায় না, যা ভারতের হিন্দু পরিবারে ১৯৫৫ সন থেকে কার্যকর।

> পরিবারের আকৃতির (size) ভিত্তিতে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ অণু পরিবার (Nuclear or single), যৌথ পরিবার (Joint family) এবং বর্ধিত পরিবার (Extended family)

৪. পরিবারের আকৃতি (Size of family) ঃ পরিবারের আকৃতির (size) দিক থেকে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ অণু পরিবার (Nuclear or single), যৌথ পরিবার (Joint family) এবং বর্ধিত পরিবার (Extended family)

অণুপরিবার বলতে বুঝায় একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান নিয়ে গঠিত পরিবার। কিন্তু যৌথ পরিবার অণুপরিবারের তুলনায় আকারে বড়। এখানে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও নাতী-নাতনী একত্রে বসবাস করে। এ ধরনের পরিবার মূলত অণুপরিবারের বর্ধিত রূপ বিধায় একে Extended family - ও বলা হয়। অর্থাৎ তিন পুরুষের পরিবারই বর্ধিত পরিবার। আবার এই পরিবারের কর্তার সঙ্গে যদি এক বা একাধিক ভাই ও তাদের সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয় বসবাস করে তাহলে তাকে যৌথ পরিবার বলা হয়। ভারত এবং বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে বর্তমানে যৌথ পরিবারে ভাঙন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরে অনুপরিবারের সংখ্যা বেশি। গ্রামে অবশ্য যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব এখনও কিছু বিদ্যমান তবে ইদানিং পরিবারের কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে এবং কি মুসলিম, কি হিন্দু সব ধরনের সমাজেই যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে।

গ্রাম-বাংলার যৌথপরিবার কিংবা বর্ধিত পরিবার ছেড়ে যারা নব্যবাস (Neolocal) রীতিতে নগরে বসবাস করেন তারা কেবল অণুপরিবার (Single or nuclear) গড়ে তোলেন এমন কথা বলা চলে না। শহরেও তথাকথিত অণুপরিবারে অনেক ক্ষেত্রেই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকজন নান কারণে পরিবারের সদস্যের মতই বসবাস করে। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অনেকেই চিকিৎসা, লেখা-পড়া, চাকরির সন্ধানে নগরের অণুপরিবারে এসে থাকে। আমাদের নগরে এমন অণুপরিবার কমই পাওয়া যাবে যেখানে কেবল পিতা-মাতা ও তাদের অবিবাহিত সন্তানেরা বাস করে। জ্ঞাতি সম্পর্ক ভিত্তিক নানা প্রয়োজনে, এমনকি মানবিক প্রয়োজনেও অনেক অণুপরিবারে অতিরিক্ত সদস্য অনেকটা স্থায়ীভাবেই বসবাস করে।

> স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা - একক বিবাহভিত্তিক পরিবার (monogamian family), বহু-স্ত্রী-বিবাহভিত্তিক পরিবার (polygynous family). বহু-স্বামী-বিবাহভিত্তিক পরিবার (polyandrous family), এবং দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার (family based on

৫. স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা (Numer of spouses) ঃ স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবারকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা - একক বিবাহভিত্তিক পরিবার (monogamian family) বহু-স্ত্রী-বিবাহভিত্তিক পরিবার (polygynous family), বহু-স্বামী-বিবাহভিত্তিক পরিবার (polyandrous family) এবং দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার (family based on group marriage)।

একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে উঠে তার নাম একক বিবাহভিত্তিক পরিবার। আধুনিক সভ্য সমাজে এর অস্তিত্ব সর্বত্র লক্ষ করা যায়। একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক স্ত্রীলোকের বিবাহের ভিত্তিতে বহু-স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠে। Polygyny শব্দের অর্থ একাধিক স্ত্রীলোক। এর বিপরীত ব্যবস্থায় একাধিক পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে

www.swapno.in

বিয়ে করে যে পরিবার গঠন করে তার নাম বহু-স্বামী-বিবাহভিত্তিক পরিবার। Polyandry শব্দের অর্থই কতিপয় পুরুষ লোক। বহু-স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার আমাদের সমাজে দুর্বল নয়। গ্রামীণ মুসলিম সমাজে ধনী কৃষক পরিবারে সাধারণত বহু-স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার বিদ্যমান। বড় বা ধনী কৃষক পরিবারে কাজ-কর্মের লোকের প্রয়োজনেও অনেকে বহু স্ত্রী গ্রহণ করে থাকেন।

বহু-স্বামী বিবাহভিত্তিক পরিবারের উদাহরণ বেশ বিরল। বস্তুত, এটা নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে অদ্যাবধি একটি গবেষণা ও কৌতূহলের বিষয়। তিব্বতীয় সমাজে এর উপস্থিতির কথা বলা হলেও পরবর্তীকালের গবেষণা রিপোর্টে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে উত্তর ভারতের জুনাগার-বাওয়ার থেকে ক্যাংরা উপত্যকা ও হিন্দুকুশ পর্বত অঞ্চলে Polyandry-র উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছে বলে জানা যায়। ঐ এলাকাকে Polyandrous belt বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে কয়েক ভাই মিলে একই স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ ভারতের টোডা এবং পলিনেশিয়ার মারকুইসানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলে নৃবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন। এ প্রথার নাম কতিপয় ভ্রাতার একই স্ত্রী বিবাহ (Fraternal Polyandry)।

একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাধিক পুরুষের বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে উঠে তাকে বলা হয় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। কতিপয় আদিম সমাজে এর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে বলে নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন। উল্লেখ্য যে, পরিবারের বিবর্তন ধারায় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল বলে মর্গান তাঁর পরিবারের উৎপত্তি তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন। মর্গান কথিত সগোত্র পরিবার এবং পুনালুয়ান পরিবার দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের এক একটি উদাহরণ।

৬. পাত্র-পাত্রী নির্বাচন রীতি (Principles of the selection of spouse) ঃ

> পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে (Selection of spouse) পরিবারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা ঃ বহিগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার (exogamous family) এবং আন্তঃগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে (Selection of spouse) পরিবারকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা ঃ বর্হিগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার (exogamous family) এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার (endogamous family) । প্রথমটির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সামাজিক বিধি অনুসারে অবশ্যই আপন গোত্রের বাইরে বিবাহ করতে হয়। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ধরনের পরিবারের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সামাজিক বিধি অনুযায়ী অবশ্যই আপন জাতিবর্ণের মধ্যে বিবাহ করতে হয়। বহিগোত্রে বিবাহের অন্যতম কারণ হলো অজাচারের (Incest) ওপর নিষেধাজ্ঞা (Taboo) আরোপ। এখানে উল্লেখ্য যে অজাচার বলতে বুঝায় আপন ভাই-বোন, মা-বাবা এবং অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন যার ওপর কঠোর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা (Taboo) আরোপিত। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, আদিম সমাজে অজাচার (Incest) বন্ধ করতে সর্বপ্রথম বহির্গোত্র বিবাহের প্রচলন শুরু হয়।

বহিগোষ্ঠী বিবাহকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। হিন্দু সমাজে উঁচু বর্ণের পাত্রের সঙ্গে নিচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহকে **অনুলোম বিবাহ** (Hypergamy) বলে। গুজরাট, কেরালা, রাজপুতনায় এর উদাহরণ মিলে। বিপরীত প্রথায় নিচু বর্ণের পাত্রের সঙ্গে উঁচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহকে **প্রতিলোম বিবাহ** (Hypogamy) বলে। আন্তঃগোষ্ঠী বা বহিগোষ্ঠীর নিয়মাধীন নয় এমন ধরনের পরিবারের নাম সমতাভিত্তিক পরিবার (Homogamian family), যেখানে পাত্র-পাত্রী একই সামাজিক বংশ মর্যাদা সম্পন্ন বংশ বা পরিবার থেকে আগত। এটা যদিও ধরা-

www.swapno.in

বাঁধা নিয়ম নয়, তথাপি সবক্ষেত্রেই বিয়েতে উক্ত সমতার নীতি সকলেই অনুসরণ করতে চান।

অনেকেই কৌলিন্য রক্ষার জন্য অস্পন জাতিবর্ণের মধ্যে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন যেমন - হিন্দু সমাজে আপন জাতি-বর্ণের (Caste) মধ্যেই বিবাহ বাঞ্ছনীয়। বস্তুত, হিন্দু সমাজে বহির্গোষ্ঠী বিবাহ উভয়ই ও আন্তঃগোষ্ঠী বিবাহ প্রচলিত। পাত্র-পাত্রী অভিন্ন জাতিবর্ণ (Caste) ভুক্ত হলেও যদি উভয়ের পরিবার সমগোত্রের (Caste) হয় তাহলে এক্ষেত্রে সামাজিক বিবাহ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ হিন্দু বিবাহ একদিকে হবে স্ববর্ণের (Caste) মধ্যে, আবার অন্যদিকে হবে ভিন্ন গোত্রের (Caste) মধ্যে। পক্ষান্তরে মুসলিম সমাজে এরূপ ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নেই। অন্যদিক থেকে এ সমাজেও উভয় ধরনের বিবাহ প্রথা বিদ্যমান। তবে হিন্দু সমাজের মতো জাতিবর্ণ ও গোত্রের গুরুত্ব মুসলিম সমাজে নেই। এখানে একই পরিবারে ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যেমন ছেলেমেয়ের বিয়ে হতে পারে তেমনি বাইরের যেকোন দুই পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। যে সে যা হোক, আজকাল শিক্ষা-সংস্কৃতি, এমন কি পেশাগত সমতাভিত্তিক পরিবারের প্রতি প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

> সাধারণভাবে বলা যায় মানুষ কয়েকটি মৌলিক প্রয়োজনে পরিবার গঠন করে। এগুলো হলো - যৌনানুভূতি, সন্তান লাভের বাসনা, উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা এবং সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা।

৪.২ পরিবারের কার্যাবলী (Functions of family)

পরিবারের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে পরিবার কিজন্য সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে বলা যায়, মানুষ কয়েকটি মৌলিক প্রয়োজনে পরিবার গঠন করে। এগুলো হলো -

ক) যৌনানুভূতি।

খ) সন্তান লাভের বাসনা।

গ) উত্তরাধিকার সংরক্ষণ।

ঘ) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার।

ঙ) সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ।

যুগের বিবর্তনে পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যেও পরিবর্তন আসে। একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিবেশে পরিবারকে যেসব কাজ করতে হয় পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় হয়তো তা করতে হয় না। আবার নতুন অবস্থায় ভিন্ন ধরনের কাজও করতে হয়। আদিম যুগে এবং মধ্যযুগের পরিবারের কার্যাবলীর এবং আধুনিক যুগের পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা এবং জটিল শ্রমবিভাগের যুগে পরিবারের কার্যাবলীতে এসেছে ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ বৈচিত্র্যও পরিবর্তন। সমাজবিজ্ঞানে ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজের সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান কোন না কোন ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। সমাজের পরিবর্তনের ফলে ঐসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও রূপ বদলাতে পারে। তবে সব প্রতিষ্ঠানই তার ভূমিকা ও কার্যাবলী পালনের মাধ্যমেই টিকে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিবার তার ভূমিকা ও কার্যাবলীর মধ্যে বৈচিত্র্য এনে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সমাজ জীবনের এই ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত মৌলিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও অবদান তাই অনস্বীকার্য।

পরিবারের কার্যাবলীর পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখে আমরা উহার আটটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়ার প্রয়াস পাব।

www.swapno.in

১. জৈবিক কার্য (Biological function) ঃ পরিবারের জৈবিক কাজ প্রধানত দুটি : যথা (ক) স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক এবং (খ) সন্তান জন্মদান। পরিবারের এ দুটি কাজের মধ্যে প্রথমটিতে তেমন পরিবর্তন আসেনি। তবে সন্তান জন্মদানের কাজ থেকে আধুনিক কিছু সংখ্যক পরিবার বিরত থাকছে অথবা সন্তান জন্মদানের কাজে এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে যাতে কম সন্তান জন্ম লাভ করে। আধুনিককালে অনেক সমাজই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতি এবং সচেতন ও শিক্ষিত পরিবার জনসংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে সচেষ্ট হচ্ছে। তবু বলা চলে যে, আধুনিক যুগের পরিবারে সন্তান জন্মদানের জৈবিক কাজটি একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি। মানব সভ্যতার ধারা বজায় রাখতে, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে তবে শ্রমের চাহিদা মেটাতে সন্তান জন্মদানের কাজটি বাদ দেওয়া যাবে না। অপরপক্ষে, সমাজের মূল্যবোধ পরিবর্তনে যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা থেকে না কোন পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক সম্ভবত বজায় থাকবে।

শিশুর প্রতি পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আর, স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি যতটা জৈবিক তার চেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক।

২. মনস্তাত্ত্বিক কার্য (Psychological function) ঃ শিশুর প্রতি পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের স্নেহ-ভালবাসা যতটা না জৈবিক তার চেয়ে বেশি মনস্তাত্ত্বিক। শিশুর লালন-পালনের দায়-দায়িত্বের ভিত্তি হলো শিশুর প্রতি মমত্ববোধ। শিশুর স্নান, খাদ্যদান, পরিচর্যা, চিত্তবিনোদন, ব্যায়াম, আদর এবং সর্বোপরি, তাকে স্নেহের পরশে লালন-পালনের কাজটি পরিবারই করে থাকে। এসব কাজ শিশুর প্রতি স্নেহ, আদর, আবেগ ও ভালবাসার মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। আধুনিক সব সামাজিক মনোবিজ্ঞানীই এ কথা স্বীকার করেন যে, ব্যক্তিত্ব গঠনে শিশুর পারিবারিক অভিজ্ঞতা এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। এছাড়া, পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ তথা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনে যে যত্নবান থাকেন সেটাও পরিবারের মনস্তাত্তিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

শুধু শৈশবকেই নয়, বাল্যকালে, কৈশোরে, এমনকি যৌবনেও মানুষের চিত্তের অস্থিরতা বেশ প্রকাশ পায়। শিশু-কিশোরেরা অতিশয় আবেগপ্রবণ হয়। জগতের নানা রহস্য নিয়ে তাদের মনে অনেক প্রশ্ন। তারা ক্ষেত্র বিশেষ হয় স্পর্শকাতর। স্নেহাকাঙ্খী শিশু-কিশোর-যুবকদের মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিবার যে মনস্তাত্ত্বিক কাজটি পালন করে তার কোন বিকল্প নেই।

এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিককালে শিল্পায়িত দেশসমূহে আর্থিক প্রয়োজনে কিংবা মর্যাদা অর্জনে স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীরাও ঘরের বাইরে কাজ করছে। এ কারণে শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র বা নার্সারীতে রাখার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। বাংলাদেশেও এমনটি সীমিত পরিসরে হলেও লক্ষ করা যাচ্ছে। নার্সারীগুলো পরিবারের কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক কাজ করার দায়িত্ব নিচ্ছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে ইতোমধ্যেই গবেষণার ফলে দেখা গিয়েছে যে, নার্সারীতে রাখা শিশুদের সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের বিকাশ হচ্ছে না। তাদের কেহ কেই পরবর্তীকালে হীনমন্যতায় ভোগে, কেহ কেহ কিশোর অপরাধীতে পরিণত হয়। বস্তুত, পরিবারের স্নেহ-শাসনের কোন বিকল্প নেই। সেজন্য, নার্সারীর মত কিছু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেই যে পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এমনটি বলা যায় না। তা ছাড়া, প্রায় ক্ষেত্রেই নার্সারী হচ্ছে শিশু লালন-পালনের একটি খণ্ডকালীন ব্যবস্থা। কাজ শেষে পিতা-মাতা নার্সারী থেকে তাদের ছেলেমেয়েদের নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায় অর্থাৎ পরিবারকেই শিশুর লালন-পালনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

পরিবারের জৈবিক কাজ প্রধানত দু'টি ; যথা (ক) স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক এবং (খ) সন্তান

www.swapno.in

৩. নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষাণাবেক্ষণমূলক কাজ (Function of Security and maintenance) ঃ পরিবারের পূর্বোক্ত কার্যাবলী ছাড়া আরও অনেক কাজ রয়েছে। পরিবারের আরেক ধরনের কাজ হলো নিরাপত্তামূলক এবং শিশুর রক্ষাণাবেক্ষণ। শিশু খুবই অসহায়। সে পরিবারের বাইরে অজানা-অচেনা যেকোন ব্যক্তিকে ভয় পেতে পারে। সন্ধ্যায় বা রাতের অন্ধকারকে ভয় পেতে পারে, বিদ্যুৎ চমকালে বা প্লেনের শব্দে ভীত হতে পারে। খেলাধূলার সামগ্রী নিয়ে খেলতে গিয়েও উৎসুক্যবশত বাড়িতে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় আহত হতে পারে। বিষাক্ত কোন ঔষধ সেবন করলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। এমনকি, অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে সন্তান-সন্তুতির জীবন বিপন্ন হতে পারে অথবা ভয়ে মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারে। সেজন্য পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এই যে, এ ধরনের সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে সন্তানদের রক্ষা করা তথা তাদের নিরাপত্তা বিধান করা। গ্রামের যৌথ পরিবারে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে দাদা দাদী, নিকট আত্মীয়-স্বজন এমনকি প্রতিবেশীরাও সহযোগিতা করে। কিন্তু শহরের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অণুপরিবারে শিশুদের রক্ষাণাবেক্ষণের কাজে পিতা-মাতাকে সাহায্য করে ঘরের চাকর-বাকর ও আয়া।

পরিবারের এ কাজটির তেমন বিকল্প নেই। নার্সারীকেন্দ্রগুলো কতক্ষণই বা এ কাজে সহযোগিতা করতে পারে ? মূলত, অনেক শিশুই বাল্যকালে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সেক্ষেত্রে একমাত্র পরিবারই শিশুর নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করতে পারে।

৪. অর্থনৈতিক কার্য (Economic function) ঃ অনেক নৃবিজ্ঞানীর মতে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজনে আদিম সমাজে পরিবার গড়ে উঠেছিল। তখনকার সমাজে জৈবিক চাহিদার চেয়ে আর্থিক প্রয়োজনটাই ছিল জরুরী। কেননা তখন নারী-পুরুষ দলবদ্ধভাবে খাদ্য সংগ্রহ, পশু পালন এবং কৃষি কাজ করত। বিবাহিত নব দম্পতি যে পরিবার গঠন করতো তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জীবিকা নির্বাহ। খাদ্যের অনিশ্চয়তা তাদেরকে সর্বদা ব্যস্ত রাখতো।

কৃষি সভ্যতার উদ্ভবের পর থেকে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পায়। ফসল উৎপাদন, উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বন্টন ইত্যাদি কাজকর্ম পরিবারের সদস্যের উপর বর্তায়। মধ্যযুগে শিল্পের কাজও পরিবারেই সম্পন্ন হত। পরিবারের সবাই মিলে কুটির শিল্পে কাজ করতো। এখনও অনেক পেশাজীবী, যেমন - তাঁতি, কুমার ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের পরিবারেই কুটির শিল্প দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে। বস্তুত, কৃষি সভ্যতার যুগে পরিবার একটি উৎপাদনের এককে (unit of production) পরিণত হয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলো অদ্যাবধি উৎপাদন (Production), বন্টন (distibution) এবং ভোগের (Consumption) একক। সেখানে নারী-পুরুষ সবাই মিলে কৃষি ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

> পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্তিতিদের শিক্ষা দান। আদিম ও মধ্য যুগে পারিবারিক পরিমণ্ডলেই মানুষ বিদ্যার্জন করতো।

৫. শিক্ষাদান কার্য (Educational function) ঃ পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্তিতিদের শিক্ষাদান। আদিম ও মধ্যযুগে পারিবারিক পরিমণ্ডলেই মানুষ বিদ্যার্জন করতো। পরিবার সন্তান-সন্ততির লেখাপড়ার জন্য শিক্ষক নিয়ুক্ত করতো এবং অনানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতো। এখানে উল্লেখ্য, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগে গুরুগৃহে থেকে বিশেষ করে, ছেলেরা জ্ঞানার্জন

www.swapno.in

করত। আধুনিক সভ্য সমাজে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের কাজটি গ্রহণ করেছে। তবে, প্রাথমিক শিক্ষাদানের কাজটি আজও মূলত পরিবারেই সম্পন্ন হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশু-শিক্ষা সমাজের অনভিজ্ঞ পিতা-মাতা বা অন্যান্য পরিবারের সদস্যের হাতে ন্যস্ত করা সমীচীন হবে না। কেননা, এর ফলে সুষ্ঠু সমাজ গঠন সম্ভব না। এ ধরনের বক্তব্যে যুক্তি থাকলেও পাশ্চাত্যের কোন দেশেই এমন আদর্শ শিশু শিক্ষা পরিবেশ গড়ে এখনও উঠেনি, যা শিক্ষাদানের দায়িত্ব থেকে পরিবাকে মুক্তি দিতে পারে।

আমাদের দেশে গ্রাম ও শহরে শিশুর শিক্ষাদানের কাজটি পরিবারই সম্পন্ন করে। পরিবারই অনানুষ্ঠানিক পন্থায় সন্তানদের ধর্মীয় ও সামাজিক নীতিবোধ শিক্ষা দেয়, বিদ্যালয়ে ভর্তি করে, বাড়িতে নিয়মিত পড়ার ওপর নজর রাখে, বাবা-মা বা পরিবারের অন্য কোন সদস্য এ দায়িত্ব পালন করেন। অথবা পরিবারের প্রাইভেট শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

পরিবারের গন্ডির মধ্যেই সন্তান-সন্ততি নেতৃত্ব, দায়িত্ব-কর্তব্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে।

৬. রাজনৈতিক কার্য (Political function) ঃ পরিবারের গন্ডির মধ্যেই সন্তান-সন্ততি নেতৃত্ব, দায়িত্ব-কর্তব্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততিদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। আর এ কাজটি কেবলমাত্র পরিবারের পক্ষেই সম্ভব। পরিবারকে একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, পিতা কিংবা মাতাই পরিবার নামক রাষ্ট্রের প্রধান। পারিবারিক পরিমণ্ডলেই শিশু পরিবার প্রধানের আদেশ মেনে চলতে, আপন অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা লাভ করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করতে শেখে। পরিবার অধিকার ও কর্তব্যবোধের পাশাপাশি শিশুদের শৃঙ্খলাবোধও শিক্ষা দেয় যা সুনাগরিক হওয়ার জন্য এক অতীব প্রয়োজনীয় গুণ। মূলত পরিবারই হচ্ছে শিশুদের সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আর এসব দায়-দায়িত্বকেই পরিবারের নৈতিক কাজ বলে গণ্য করা হয়।

পরিবারই তার শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-প্রথা, রীতি-নীতি তথা সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান

৭. সামাজিকীকরণ ও সামজিক নিয়ন্ত্রণমূলক কার্য (Function of Socialization and Social control) ঃ পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সন্তান-সন্ততিদের উপযুক্ত সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে তোলা। এ কাজটি প্রাথমিকভাবে পরিবারের ওপরই বর্তায়। সমাজের কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ অনুযায়ী পরিবার শিশুকে গড়ে তোলে। পরিবারই তার শিশু-কিশোরদের সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-প্রথা, রীতি-নীতি তথা সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দান করে। পরিবার তার শিশু-কিশোরদের সামাজিক গুণাবলী অর্জন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যাকে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সামাজিকীকরণ বলে।

সমাজকর্তৃক নিন্দিত কিংবা শিশুদের সমাজবিরোধী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বও প্রাথমিকভাবে পরিবারই পালন করে। শিশুকিশোরেরা সাধারণত চঞ্চল হয়। পরিবার সামাজিক অনুশাসন তথা সামাজিক বিধি-নিষেধের মাধ্যমে শিশুদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

পারিবারিক পরিমণ্ডলে যথার্থ সামাজিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে শিশুদের অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত রাখা যায় না। ফলে সে কিশোর অপরাধী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। আধুনিক যুগে অবশ্য এসব কাজ রাষ্ট্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে থাকে। তবে তা পরিবারের বিকল্প হতে পারে না। বিকল্প যে নয় তার প্রমাণ মেলে

www.swapno.in

যখন কোন কিশোর অপরাধীর সংশোধনের জন্য প্যারোল (Parole) বা প্রবেশন (Probation) কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের সাহায্য কামনা করেন। আরও প্রমাণ মেলে যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অবাধ্য ছাত্রের সংশোধনের জন্য ছাত্রের অভিভাবকের সহযোগিতা কামনা করেন।

৮. চিত্তবিনোদনমূলক কাজ (Recreational function) ঃ পরিবারের অপর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে সদস্যদের অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিশ্রাম কাজেরই অংগ। কাজের অবসরে বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকলে ক্লান্তি এবং একঘেঁয়েমি দূর হয়। এ কারণেই অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের এত প্রয়োজনীয়তা। পূর্বে মানুষ যখন বেশি অবকাশ পেত তখন গ্রামের পরিবার গুলো কবিগান, পালা গান, যাত্রা ইত্যাদির আয়োজন করতো। পারিবারিক পরিসরে কেচ্ছা-কাহিনী এবং পুঁথি পড়ার আয়োজন করা হতো।

আধুনিক গ্রামীণ পরিবার-জীবনে অবসর কাটানোর জন্য রেডিও এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যুতায়িত গ্রামে টেলিভিশনও চিত্তবিনোদনের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। বস্তুত, গ্রামীণ সংস্কৃতির ওপর নগর সংস্কৃতির প্রভাব এখন খুবই প্রবল।

গ্রামীণ সমাজের মানুষের চিত্তবিনোদনের আরেকটি কেন্দ্র হল হাট-বাজার, যেখানে তারা গল্প গুজব করে সময় কাটায়। গ্রামদেশে সাধারণত বিকেলবেলা হাট-বাজার বসে। কেননা সারাদিনের কাজ শেষে বিকেলেই গ্রামবাসী হাট-বাজার করার সুযোগ পায়। হাট-বাজারে সময় কাটানোর জন্য পরিবার তার সদস্যদের অনুমতি দিয়ে পরোক্ষভাবে চিত্তবিনোদনের কাজ করে।

শহরের অবকাশের সময় হচ্ছে বিকেল, রাত, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটির দিন। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ বিত্তের পরিবারে জন্মদিন ও বিবাহ বার্ষিকী চিত্তবিনোদনের এক একটি অনুষ্ঠান। সাম্প্রতিক কালে রেডিও, ক্যাসেট রেকর্ডার, টেলিভিশন, ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার ইত্যাদিও অবসরযাপন এবং চিত্তবিনোদনের অন্যতম সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ক্লাব, পার্ক, সিনেমা, হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদিও শহরের অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের এক একটি উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত। অবশ্য এখনও শহরের জনসংখ্যার তুলনায় এসবের সংখ্যা অনেক কম। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, বনভোজন ইত্যাদি শহরবাসীদের অবকাশ কাটানো এবং চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক সময় সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শিক্ষা ভ্রমণেরও ব্যবস্থা করে থাকে। শিক্ষা ভ্রমণ চিত্তবিনোদনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম বলে বিবেচিত হতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সেমিনার, সম্মেলন, খেলাধূলা, বিচিত্রানুষ্ঠান, মেলা (গ্রন্থ মেলা, রপ্তানি মেলা) ইত্যাদিও শহরে অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ হিসেবে কাজ করে। পরিবার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ঐসব চিত্তবিনোদনমূলক কাজে তার সদস্যদের অনুমতি দিয়ে সাহায্য করে।

পরিবারের কার্যাবলীর পরিবর্তন (Changes in the functions of family) ঃ সম্প্রতি শিল্পায়ন ও নগরায়ণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগের ফলে পরিবারের অনেক দায়িত্ব বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে। শিক্ষা, বিনোদন, অর্থনৈতিক উৎপাদন ইত্যাদি কাজগুলো এখন হয়তো পরিবার

www.swapno.in

পর্যায়ে তেমন সম্পন্ন হচ্ছে না। সে কারণেই অনেকে মনে করেন যে, পরিবার ক্রমশ বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এখন পরিবারের পরিবর্তনশীল কার্যাবলী সম্পর্কে কিছু আলোকপাতকরা যায়। লক্ষণীয় যে পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে পরিবারের কার্যাবলীর মধ্যে এসেছে কতক পরিবর্তন। কিন্তু পরিবারের কাজ একবারে লোপ পেয়ে যায়নি। বরং সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির কারণে ও সমাজের নতুন নতুন চাহিদা মেটাতে গিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে পরিবারকে আরো বেশি কাজ করতে হচ্ছে।

পরিবার হয়তো লোপ পাবে না। তবে তার গড়ন ও কার্যাবলীতে পরিবর্তন এসেছে ও আসবে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে পরিবারের কাঠামো ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে যেসব সুস্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে গ্রাম ও নগর উভয় স্থানের পরিবারের মধ্যে কমবেশী পরিবর্তন এসেছে।

> যেহেতু শিল্পায়ন ও নগরায়ণ কর্ম-সংস্থানের কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেহেতু গ্রামের যৌথ পরিবার থেকে অনেকে নগরে কাজ করতে গিয়ে অণুপরিবার গড়ে তুলছে। কিন্তু পরিবার বিলুপ্ত হচ্ছে না। বিলুপ্ত হতে পারে যৌথ পরিবার।

১. যেহেতু শিল্পায়ন ও নগরায়ন কর্ম-সংস্থানের কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে সেহেতু গ্রামের যৌথ পরিবার থেকে অনেকে নগরে কাজ করতে গিয়ে অণুপরিবার গড়ে তুলছে। অনেকে দেশের বাইরে চাকরি ও ব্যবসা করতে গিয়ে অণুপরিবারে বসবাস করছে। যৌথ পরিবারে তাই ভাঙন দেখা দিয়েছে এবং সে স্থলে গড়ে উঠেছে অণুপরিবার। এ জন্যই পরিবারের আকার এবং কাঠামোয় এসেছে পরিবর্তন। কিন্তু পরিবার বিলুপ্ত হচ্ছে না। বিলুপ্ত হতে পারে যৌথ পরিবার।

> জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ এবং শৈশব ও কৈশোরে সন্তান-সন্ততিদের নিরাপত্তাবিধান ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক কাজ অদ্যাবধি পরিবারই করে চলেছে এবং এসবের

২. জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজ এবং শৈশব ও কৈশোরে সন্তান-সন্ততিদের নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক কাজ অদ্যাবধি পরিবারই করে চলেছে এবং এসবের কোন যথাযথ বিকল্প নেই। অন্য কোন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ঐ কাজগুলো করছে না। রাষ্ট্র নিরাপত্তামূলক কাজ যেটা করছে সেটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। রাষ্ট্রীয় কোন যন্ত্র বা প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে কোন পরিবারের ঘরের মধ্যে এসে শিশু-কিশোরদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করছে না। মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাই শিশুদের প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখেন। নার্সারীর পক্ষে এ কাজ সব সময় সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বস্তুত, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসার কোন বিকল্প নেই।

৩. শিক্ষা এবং কিন্তু বিনোদনমূলক কাজ দু'টি আধুনিক পরিবার আগের মতো তেমন করছে না। আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের কাজটি পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু পরিবারই সন্তানদের শিক্ষা লাভের সব দায়-দায়িত্ব এখনও বহন করে থাকে। শিক্ষার অর্থ যোগান, প্রাইভেট শিক্ষক নিয়োগ এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের কাজটি পরিবারই করে। তবে এটা ঠিক যে, অবসর বিনোদনের কাজটি পরিবারের পক্ষে এককভাবে আর করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার একাজটির পুরাপুরি বিকল্পও নেই। জন্মদিন, বিবাহ উৎসব, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়ানো, রেডিও টেলিভিশন, ভি.সি.আর. ইত্যাদির ব্যবস্থা, গল্প গুজব, কেচ্ছা-কাহিনী সবই পারিবারিক পরিমণ্ডলেই হয়ে আসছে। পরিবার অবশ্য পার্ক, যাদুঘর ও চিড়িয়াখানার মতো বিনোদনমূলক ব্যবস্থার স্থান হতে পারে না। সে যা হোক, আমাদের দেশের অবসর বিনোদনমূলক কাজের অনেকটা এখনও পরিবারেই সম্পন্ন হচ্ছে।

> আমাদের গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলা আজও একাধারে উৎপাদন ও উপভোগের

৪. আমাদের গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলা আজও একাধারে উৎপাদন ও উপভোগের একক। তাই, গ্রামীণ পরিবারের মৌলিক কাজ লোপ পেয়ে

www.swapno.in

যায়নি। আর শহরের পরিবারগুলো আয় ও উপভোগের একক। তবে গ্রামের মতো পরিবারভিত্তিক কোন উৎপাদন ব্যবস্থা শহরে তেমন নেই। মূলত, এটা অর্থনৈতিক পেশার ওপর নির্ভর করে। সে কারণেই নগরের পরিবার উৎপাদনের একক না হলেও আয়ের (চাকরি, ব্যবসা) একক তো বটেই এবং সে কারণে পরিবার আয় ও উপভোগের একক হিসেবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এবং রাখবে বলেই অনুমান করা যায়।

৫. শিশুদের নীতিধর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও বাল্যকাল ও কৈশোরে নীতিধর্মজ্ঞান অর্জনের যে মানসিকতার প্রয়োজন হয় তার ব্যবস্থা একমাত্র পরিবারের পক্ষেই করা সম্ভব।

৬. পরিবার ছাড়াও রাজনৈতিক শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। তথাপি নিয়ম-শৃঙ্খলা, অধিকার-কর্তব্য ও নেতৃত্বের মূল ধারণা পরিবারেই দেওয়া হয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। যদিও বিদ্যালয়, পুলিশ, আইন-আদালত ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক পন্থায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে তবু তা পরিবারের ভূমিকাকে খাটো করে দেয় না। বরং ঐসব প্রতিষ্ঠান সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে পরিবারের সাহায্যই কামনা করে। তাছাড়া শিশুরা এসকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা সম্পর্কে পরিবারেই অবগত হয়ে থাকে।

বস্তুত, অদ্যাবধি আমাদের দেশে পরিবারের কাজ পরিবারই করে চলেছে। সমাজের পরিবর্তনের ফলে পরিবারের ভূমিকার ভেতর বৈচিত্র্য আসছে সন্দেহ নেই। তবে পরিবার যুগের চাহিদানুযায়ী তার রূপ পাল্টাচ্ছে এবং তার কাজের ধরনেরও পরিবর্তন আসছে। তা সত্ত্বেও বলা যায়, সামগ্রিকভাবে পাল্টাচ্ছে সব তার কাজের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে। পরিবার তার কাজের মাধ্যমেই অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। আগামীতেও এর অস্তিত্ব বজায় রাখবে বলেও আশা করা যায়।

> **রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি :** পরিবার সমাজের এক ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এতে যেকোন ধরনের চমকপ্রদ রাতারাতি পরিবর্তন শুভ হবে না।

৪.৩ পরিবারের ভবিষ্যৎ (Future of Family)

অনেকে মনে করেন যে, ভবিষ্যতে পরিবার ব্যবস্থা লোপ পাবে। অনেকে আবার বলেন যে, পরিবার বিলুপ্ত হবে না, তবে তার কাঠামো এবং কার্যাবলীতে পরিবর্তন আসবে মাত্র। অতএব পরিবারের ভবিষ্যৎ কি এ সম্পর্কে এখানে কতিপয় দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি (Conservative view) : এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আশা প্রকাশ করা হয় যে, পরিবার সমাজের এক ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এতে যেকোন ধরনের চমকপ্রদ ও রাতারাতি পরিবর্তন শুভ হবে না। তাই পরিবার অবশ্যই টিকে থাকবে এবং টিকিয়ে রাখাই হবে আমাদের কর্তব্য।

> পরিবার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি এমনই দুটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান, যা সমাজের এক শ্রেণীর জন্য অপরিহার্য এবং অন্য শ্রেণীর জন্য অপয়োজনীয় হতে পারে

২. চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি (The Radical view) : পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কেননা ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের জন্য চাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। দলগত বিবাহভিত্তিক যৌথ পরিবারে সম্পত্তিতে সকলের যৌথ মালিকানা ছিল বলে অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী মনে করেন। একক একক বিবাহভিত্তিক পরিবারের উদ্ভবের সাথে সাথে তার আর্থিক নিশ্চয়তার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ঘটে। তাই পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরস্পরের পরিপূরক একটির বিলুপ্তি অন্যটির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলতে পারে। উল্লেখ্য, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক Plato আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তাঁর The Republic নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 'আদর্শ রাষ্ট্রে' ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রজ্ঞার

www.swapno.in

অধিকারী দার্শনিক রাজা এবং বল-বীর্যের অধিকারী যোদ্ধা শ্রেণীর জন্য ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের অবসান চেয়েছেন। সে সঙ্গে এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিও তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। কেননা তাঁর মতে রাষ্ট্রের অভিভাবক, শ্রেণীর (রাজা ও সৈনিক) পরিবার ও সম্পত্তি থাকলে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থে বেশি তৎপর থাকবে এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য সময় দিতে পারবে না। অপরপক্ষে, তাদের যদি পরিবার ও সম্পত্তি না থাকে তাহলে তাদের একমাত্র চিন্তা থাকবে রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণ সাধন। Plato অবশ্য শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্য পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার প্রস্তাব রেখেছেন কেননা, তাদের সমাজ-কল্যাণের জন্য চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই। উল্লেখ্য Plato-র সুযোগ্য ছাত্র Aristotle, Plato প্রদত্ত পরিবার ও সম্পত্তি তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন।

মূলত, পরিবার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি এমনই দু'টি মৌলিক প্রতিষ্ঠান, যা সমাজের এক শ্রেণীর জন্য অপরিহার্য এবং অন্য শ্রেণীর জন্য অপয়োজনীয় হতে পারে না। শ্রেণী ভেদাভেদ যতই থাক না কেন তারা সকলই মানুষ এবং মানুষের জীবনে পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা সকল শ্রেণীর মানুষের থাকবে।

আধুনিক সাম্যবাদী সমাজে মনীষী কাল মার্কস ও এঙ্গেলস ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি ঘটার সম্ভাবনা স্বীকার করলেও পরিবার ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হলে ঐ সম্পত্তির মালিক হবে সমাজ, রাষ্ট্র নয়। কেননা বলা হয়েছে, সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রই থাকবে না। কারণ তাঁদের বিবেচনায় রাষ্ট্র একটি শোষণের যন্ত্র মাত্র। সে যা হোক, ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুলে দিলে সামাজিক কিংবা যৌথ মালিকানার প্রশ্ন আসবে।

এটা মনে করা হয় যে, পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পরিবার। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতেই পরিবার টিকে আছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা ব্যক্তিগত আয় না থাকলে পরিবার পরিচালনা কি করে সম্ভব? তাই এটা আজ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি তিরোহিত হলে পরিবারের ভবিষ্যৎ কি হবে? তবে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলো যখন একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে তখন সেসব দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বহাল তবিয়তেই আছে, কিন্তু পরিবার ব্যবস্থা প্রায় সমূহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বাংলাদেশের মতো বিকাশশীল দেশেও যে এর প্রভাব পড়বে না তা বলা যায় না।

৩. **উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি (Liberal View)** ঃ মূলত, ক্রিয়াবাদী চিন্তাই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা। ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের মতে সমাজের সব ধরনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব ভূমিকা পালন করে টিকে আছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তার আবেদন, ও কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে । যেসব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজবদ্ধ মানুষের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হবে অথবা যার কোন ভূমিকা থাকবে না তাকে স্বাভাবিকভাবেই বিদায় নিতে হবে। পরিবারের কাজ যদি বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে এবং সফলভাবে তা পালন করতে পারে-পরিবার লোপ পেয়ে যাবে বৈ কি? কিন্তু বিকল্প প্রতিষ্ঠানগুলো কি পরিবারের কাজগুলো যথাযথ পালন করতে পারছে? অদ্যাবধি এর সুস্পষ্ট ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যায় নি।

www.swapno.in

৪.৪ বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো
(Family structure in Bangladesh)

প্রথমেই একথা বলে নেওয়া ভাল যে, তৃতীয়বিশ্বের একটি দেশ হিসাবে বাংলাদেশের পরিবারের অভিন্ন কাঠামোগত কোন রূপ নেই। কেননা ধর্ম গ্রাম, শহর, সমতল ও পাহাড়ি এলাকা অর্থনৈতিক শ্রেণী ও সামাজিক পদমর্যাদা ভেদে বাংলাদেশের পরিবারের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সমতল অঞ্চলের গ্রাম ও শহর এবং মূলত মুসলিম ও হিন্দু সমাজের দিকে লক্ষ রেখে যদি আমরা বাংলাদেশের পরিবারের কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করি তাহলে বলা চলে যে-

১. বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের পরিবারগুলো প্রধানত অণুপরিবার। ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। সাধারণভাবে গ্রামের পরিবাগুলো এক সময় যৌথ ধরনের ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আর্থিক দুরবস্থা, পেশাগত পরিবর্তন, সম্পত্তির সিলিং নীতি, মানুষের মন সম্প্রতি মেজাজের তারতম্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের কারণে যৌথ পরিবারে দ্রুত ভাঙন দেখা দিয়েছে। তবু বিশেষ করে হিন্দু সমাজে ঐতিহ্যগত কারণে কতক যৌথ পরিবার এখনও বিদ্যমান। উল্লেখ্য, হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের মধ্যে যৌথ পরিবার খুবই কম।

২. বাংলাদেশে একক বিবাহভিত্তিক পরিবারই এখন বেশি। তবে গ্রামীণ ধনী হিন্দু ও মুসলিম পরিবারে একাধিক বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। অবশ্য ইদানিং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এর সংখ্যা ক্রমশ কমে এসেছে। শহরে বহু বিবাহভিত্তিক পরিবার একেবারেই নেই এমনটি বলা যাবে না। তবে তার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারে যে সকল স্বামী অল্প বয়সে স্ত্রী হারায় বা তালাক দেয় তারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহেরও বেশ প্রচলন রয়েছে। তবে ইদানিং বিধবা বিবাহ এবং পরিত্যক্তা বা তালাক প্রাপ্তদের বিবাহ ক্রমেই এক কঠিন সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে আনুষ্ঠানিক বিবাহবিচ্ছেদের রীতি এখনও নেই। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অভিযোজন অসম্ভব হলে স্ত্রী তার বাপের কিংবা ভাই-এর বাড়ী চলে যায়। অর্থাৎ আলাদা বসবাস করে। সেক্ষেত্রে কখনও কখনও আবার বিয়ে করে পরিবার গড়ে তুলে।

৩. বাংলাদেশের পরিবার মূলত পিতৃপ্রধান। তবে শহরের কিছু উচ্চ শিক্ষিত ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমতার নীতি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর মতামতের উপর গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশে ইদানিং নারী মুক্তি আন্দোলনের যে কর্মসূচী রয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে পিতৃপ্রধান পরিবারেই স্ত্রীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়।

৪. বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে পিতৃবাস ভিত্তিক। যে পরিবারে ছেলে সন্তান নেই সেখানে কেউ একটি মেয়েকে এমন পাত্রের সাথে বিবাহ দেয় যে তার স্ত্রীর বাবার বাড়িতে বসবাস করতে আসে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঐ পরিবারে যদি কখনও পুত্র সন্তান জন্মে বা কোন মন-মালিন্য সৃষ্টি হয় তাহলে জামাতা তার স্ত্রীসহ ঐ পরিবার ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়। অবশ্য বর্তমানে শিল্পায়ন নগরায়নের ফলে অনেকেই শহর ও শিল্প এলাকায় বিবাহোত্তর জীবনে নয়াবাস গড়ে তুলে। এ অবস্থায় তারা শুধু স্বামীর বাবার গৃহেও বসবাস করে না, স্ত্রীর বাবার গৃহেও বাসা বাধে না। তাই নয়াবাস ব্যবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.swapno.in

৫. বাংলাদেশের পরিবার মূলত দ্বি-সূত্রীয় নীতি অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ পিতৃ এবং মাতৃ উভয় কুলের আত্মীয়দের প্রায় সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৬. পাশ্চাত্যের চেয়ে বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো ঐতিহ্যগতভাবে এখনও অধিকতর শক্তিশালী। এখানে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আজও আবেগ-ভালোবাসা এবং মানসিক বন্ধন অতি দৃঢ়। পরিবার যে ধরনেরই হোক না কেন জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধন এতই প্রবল যে, অনেক সময়ই তা অযৌক্তিক মনে হয়। জ্ঞতি-সম্পর্ক আমাদের সমাজ এবং জাতীয় জীবনে এতই প্রবল যে, তা না থাকলে যেন সমাজ অচল। বাংলাদেশে যুক্তিসিদ্ধ (rational) কোন নীতি ও আইনের বিকাশ এ কারণে ব্যাহত হচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা যে স্বজনপ্রীতি দেখতে পাই তার মূলে রয়েছে উক্ত আদিম আনুগত্য। তবে শিক্ষার প্রসার, ব্যক্তি স্বতন্ত্র্যবোধের বিকাশ, আর্থিক অভাব-অনটন, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে পরিবারের বন্ধন দ্রুত শিথিল হয়ে পড়েছে, যদিও এটা পরিবারের মূল কাঠামোকে এখনও তেমন দুর্বল করতে পারেনি।

৪.৫ বাংলাদেশের পরিবারের উপর শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রভাব

Impact of industrialization and urbanization on family in Bangladesh

বাংলাদেশে এখনও ব্যাপক শিল্পায়ন এবং নগরায়ন হয়নি। নগরায়ন যা হয়েছে সে অনুযায়ী শিল্পায়ন হয়নি এবং কর্মক্ষেত্রের সুযোগ যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাও জনসংখ্যার অনুপাতে অতি সামান্য। কেননা অদ্যাবধি ৮৫% লোকই গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষিকাজের উপরই তারা প্রধানত নির্ভরশীল। এতদ্‌সত্ত্বেও শিল্পায়ন ও নগরায়ন পরিবারের কাঠামো ও কর্মকান্ডের উপর প্রভাব ফেলছে।

প্রথমত ঃ শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ফলে কর্মক্ষেত্রে যতটুকু সুযোগ বেড়েছে তাতে দেখা যায় যে, গ্রামে যৌথ পরিবারের শিক্ষিত ব্যক্তিরা শহরে অণুপরিবার গড়ে তুলছে। গ্রামীণ যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন সৃষ্টির ক্ষেত্রে নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ নগরায়নের ফলে পরিবার ব্যবস্থায় নয়াবাস (Neolocal) নীতি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কেননা কর্মজীবী পুরুষ ও মেয়েরা বিয়ের পর কর্মক্ষেত্রে বাসা পায় কিংবা ভাড়া বাড়ীতে থাকে। শহুরে পরিবারে মাতৃবাস (Matrilocal) পরিবার প্রায় অকল্পনীয়। অর্থাৎ নগরে ঘরজামাই প্রথা নেই বললেই চলে।

তৃতীয়ত ঃ নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে পরিবাগুলো আকারে ছোট হয়ে আসছে। সাধারণত শহরাঞ্চলে স্বামী-স্ত্রী পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তুলতে আগ্রহী। সীমিত আয় এবং বাসস্থান সমস্যার কারণেও ক্ষুদ্র পরিবারই হচ্ছে শহুরে পরিবারের প্রধান রূপ।

নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে যে অণুপরিবার গড়ে উঠেছে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশেই কিছু জ্ঞাতিগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ফলে এধরনের পরিবার এক নতুন বৈশিষ্ট্য করছে। যাকে সীমিত অর্থে কেবল অণুপরিবার বলা যেতে পারে। এসব অণুপরিবারে বৃদ্ধ পিতা-

www.swapno.in

মাতা, স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং মানবিক কারণে অন্যান্য জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকজনও বসবাস করে। এর ফলে শহরে পরিবার কিছুটা যৌথ রূপ নিচ্ছে বলা যায়।

চতুর্থত ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে পরিবারের জ্ঞাতি-প্রথার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। শিল্পায়িত নগর সমাজে যারা অণুপরিবার গড়ে তুলছে তাদের একটি অংশ গ্রামের পিতৃ-পরিবার বা যৌথ পরিবারের সঙ্গে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বিষয় সম্পত্তির মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রেখেছে, আবার অন্যদিকে আরেকটি অংশের মধ্যে ক্রমে সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

পঞ্চমত ঃ সম্প্রতি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পিতৃপ্রধান পরিবারের প্রকৃতির ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। যেমন, শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের পরিবারে এখন নেতৃত্ব চূড়ান্তভাবে কেবল স্বামীর হাতেই ন্যস্ত নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শহুরে পরিবারের স্বামীরা স্ত্রীর মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। এমন কি, কতক পরিবারে স্বামীর নেতৃত্ব গৌণ হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, পরিবারের কোন কোন কাজে স্বামীর সিদ্ধান্তের তেমন মূল্যও আগের মতো নেই। শহরের পবিারে নারী-মুক্তি আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে, যা পরিবারকে করে তুলেছে আরো গণতান্ত্রিক এবং সমতাভিত্তিক (egalitarian)।

ষষ্ঠত ঃ নগরায়নের ফলে পরিবারের পূর্বেকার কতক দায়-দায়িত্ব আর তেমন পালিত হচ্ছে না। অবসর যাপন, শিক্ষাদান, চিত্তবিনোদন, সন্তান-সন্ততি রক্ষাণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ পরিবারের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত হচ্ছে।

সপ্তমত ঃ শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে পরিবারের সাংস্কৃতিক জীবনে এসেছে পরিবর্তন। নগর জীবনের পারিবারিক সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী গ্রামীণ পারিবারিক জীবনেও এনেছে পরিবর্তন। এ পরিবর্তন তৈজসপত্র, খানাপিনা, বেশভূষা, চলন-বলন, খেলাধুলা, সংগীত চর্চা, গল্প-গুজব, অনুষ্ঠান-পার্বন তথা অবসর জীবনের সকল ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। অবশ্য এই পরিবর্তন সকল শহুরে পরিবার এবং সকল গ্রামীণ পরিবারে একই মাত্রায় আসেনি।

www.swapno.in

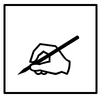

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

বাংলাদেশের পরিবারের উপর শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে যেসব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তন্মধ্যে ৫টি পরিবর্তন উল্লেখ করুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

অনুশীলন ২(Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

কি কি মৌলিক প্রয়োজনে মানুষ পরিবার গঠন করে? (অনূর্ধ ৫০টি শব্দ) ঃ

সারাংশ ঃ

বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের পরিবার গঠিত হয়। যেসব নির্ণায়ক পরিবার গঠনে সহায়তা করে তন্মধ্যে ক্ষমতার মাত্রা, বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান, বংশ মর্যাদা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পরিবারের আকার স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন রীতি ইত্যাদিই হচ্ছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিবার গঠনের মৌলিক প্রয়োজন মুলে হল ঃ যৌনানুভূতি, সন্তান লাভের বাসনা, উত্তরাধিকার সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তথা জীবনের নিরাপত্তা বোধ। পরিবার গঠনে নিয়ামক ও মৌলিক প্রয়োজনগুলো অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। পরিবারের কার্যাবলী পরিবর্তনশীল। পূর্বে পরিবারের মধ্যে শিক্ষা, বিনোদন, উৎপাদন ইত্যাদি প্রায় সকল কর্মকাণ্ড সংগঠিত হত। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন, নগরায়ন তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগের ফলে পরিবারের অনেক দায়িত্ব বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে এবং এর প্রভাব বাংলাদেশের পারিবারিক ব্যবস্থায়ও পড়েছে।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। ক্ষমতার মাত্রার ভিত্তিতে পরিবারকে কোন্ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক খ) পিতৃবাস ও মাতৃবাস
গ) অনুপরিবার ও বর্ধিত পরিবার ঘ) পিতৃসূত্রীয় ও মাতৃসূত্রীয়

২। উঁচু বর্ণের পাত্রের সাথে নিচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহকে কি বলে?
ক) প্রতিলোম বিবাহ খ) অনুলোম বিবাহ
গ) সমতা বিবাহ ঘ) অসম বিবাহ

৩। পরিবারের জৈবিক কাজ কয়টি?
ক) ৪টি খ) ৩টি
গ) ২টি ঘ) ৫টি

৪। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি কি?
ক) ক্রিয়াবাদ খ) উপযোগিতাবাদ
গ) প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন ঘ) অপ্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন

www.swapno.in

www.swapno.in

বিবাহের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

পাঠ ৫

মূল ধারণা

- বিবাহ ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা
- বিবাহের প্রকারভেদ
- অজাচার
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

১. বিবাহের সংজ্ঞা ও ধারণা জানতে পারবেন।
২. বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব জানতে পারবেন।
৩. বিভিন্ন প্রকার বিবাহ যেমন একক বিবাহ, বহু স্ত্রী বিবাহ, একাধিক শ্যালিকা বিবাহ, বহু স্বামী বিবাহ, গোষ্ঠী বিবাহ, ভ্রাতৃবিধবা-বিবাহ ও শ্যালিকা বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৪. বহির্বিবাহ, অন্তর্বিবাহ ও অজাচার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

৫.১ বিবাহের সংজ্ঞা

লুসি মেয়ারের (Lucy Mair) এর মতে বিবাহ হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সমাজস্বীকৃত এমন যুগল বন্ধন যার মাধ্যমে ঐ মহিলা যেসব সন্তানের জন্ম দেবে সেসব সন্তান বিবাহিত ঐ পিতা-মাতার বৈধ সন্তানের স্বীকৃতি লাভ করবে।

লুসি মেয়ারের (Lucy Mair) এর মতে বিবাহ হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার সমাজস্বীকৃত এমন যুগল বন্ধন, যার মাধ্যমে ঐ মহিলা যেসব সন্তানের জন্ম দিবে সেসব সন্তান বিবাহিত ঐ পিতা-মাতার বৈধ সন্তানের স্বীকৃতি লাভ

স্কট (W. P. Scott) তাঁর **Dictionary of Sociology** নামক গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন বিবাহ হলো এমন একটি অনুষ্ঠান কিংবা সামাজিক রীতি নীতির এক জটিল রূপ যা একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং যা পারিবারিক জীবন পরিচালনায় অপরিহার্য ("Marriage is an institution or complex of social norms that sanctions the relationship of a man and woman and binds them in a system of mutual obligations and rights essential to the functioning of family life") ।

মূলত, বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন এক চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার বৈধ ক্ষমতা লাভ করে, অর্জন করে পরিবার গঠনের যোগ্যতা, যা পরিণামে কতক অপরিহার্য পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের বিকাশ ঘটায়।

মূলত, বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন এক চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার বৈধ ক্ষমতা লাভ করে, অর্জন করে পরিবার গঠনের যোগ্যতা, যা পরিনামে কতক পারস্পারিক অপরিহার্য অধিকার ও কর্তব্যের বিকাশ ঘটায়। বিবাহ ব্যবস্থা সদ্য বিবাহিতদের জন্য নতুন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর পক্ষের এবং স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর পক্ষের ব্যাপক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এছাড়া, বিবাহ ব্যবস্থা স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক

www.swapno.in

ওসামাজিক অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক এবং সম্ভাব্য সন্তানের সঙ্গে সম্ভাব্য পিতা-মাতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

বিবাহের একটি অন্যতম সামাজিক গুরুত্ব হলো এই যে, ইহা যে কোন মানব শিশুকে তার সমাজস্বীকৃত তথা **সামাজিক পিতা-মাতা পাওয়ার সুযোগ** (Socially recognized or social parents)

বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব ঃ

বিবাহের একটি অন্যতম সামাজিক গুরুত্ব হলো এই যে, ইহা যে কোন মানব শিশুকে তার সমাজস্বীকৃত তথা **সামাজিক পিতা মাতা পাওয়ার সুযোগ** (Socially recognized or social parents) প্রদান করে। কোন শিশুর সমাজস্বীকৃত পিতা বা মাতা না থাকলে ঐ শিশু পিতা বা মাতা কারও বংশেরই সদস্য হতে পারে না। যেমন, বিবাহ ছাড়া কোন স্ত্রীলোক সন্তান লাভ করলে তা প্রায় সকল সমাজেই অবৈধ সন্তান বলে পরিচিত হবে। এই সন্তান তার **জৈবিক পিতা বা জৈবিক মাতার** (biological father or mother) কারও বংশের সদস্য বিবেচিত নাও হতে পারে। বিবাহের আরেকটি সামাজিক তাৎপর্য হলো এই যে, ইহা **জৈবিক-জীবনে শৃঙ্খলা** আনয়নে সাহায্য করে। অধিকন্তু, ইহা **নতুন সামাজিক সম্পর্ক** সৃষ্টি করে, যার পরিধি বেশ ব্যাপক। **সাধারণত, বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার গঠিত হয়**। যেমন, একক বিবাহভিত্তিক পরিবার (monogamian family), বহু-বিবাহ ভিত্তিক পরিবার (Polygamous family) ইত্যাদি।

৫.২ বিবাহের প্রকারভেদ ঃ

একজন পুরুষের ও একজন মহিলার মধ্যে বিবাহকে একক বিবাহ (Monogamy) বলে।

একক বিবাহ (Monogamy)

একজন পুরুষের ও একজন মহিলার মধ্যে সম্পাদিত বিবাহকে একক বিবাহ (Monogamy) বলে। আধুনিক যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একক বিবাহরীতি প্রচলিত। কোন কোন নৃবিজ্ঞানীর মতে কেবল উন্নত সমাজেই নয়, শিকার ও খাদ্য সংগ্রহমূলক অর্থনীতির সমাজেও কমবেশি একক বিবাহ রীতির প্রচলন ছিল। যেমন - ভেদ্দা এবং আন্দামানীয়দের মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নিউইয়র্কের ইরোকুয়া আদিবাসীরা একক বিবাহ রীতিতে অভ্যস্ত ছিল। বাংলাদেশের সমাজেও প্রধানত একক বিবাহ রীতিই বিদ্যমান।

গ্রীক ভাষায় পলিজিনি শব্দের অর্থ হচ্ছে একাধিক মহিলা’। অর্থাৎ একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক মহিলার বিবাহকে বহুস্ত্রী বিবাহ

বহুস্ত্রী বিবাহ (Polygyny)

গ্রীক ভাষায় পলিজিনি শব্দের অর্থ ‘একাধিক মহিলা’। একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক মহিলার বিবাহকে বহুস্ত্রী বিবাহ বলা হয়। একজন পুরুষ যদি মাত্র একজন মহিলাকে বিয়ে করার পর পাশাপাশি অন্য কোন মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে কিংবা উপপত্নীর (concubine) সঙ্গে সময় কাটায় তাহলে আমাদের সমাজের দৃষ্টিতে সেটি অবৈধ সম্পর্ক বলে গণ্য হবে। এ ধরনের ঘটনাকে বহুস্ত্রী বিবাহের উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যায় না। বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে বহুস্ত্রী বিবাহ প্রচলিত। যেমন, আফ্রিকা, নিকট প্রাচ্য, ভারত, চীন, মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক আদিবাসী সমাজে এর উদাহরণ মিলে। আরব, পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও এটি বিরল নয়। কৃষি নির্ভর সমাজে অর্থনৈতিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য অনেকেই বহুস্ত্রী গ্রহণ করে বলে মাঝে মাঝে যুক্তি দেওয়া হয়।

www.swapno.in

বাঙালি মুসলিম সমাজে বিবাহরীতি ইসলাম ধর্মানুযায়ী নির্ধারিত। ইসলামে কঠিন শর্তে একাধিক বিবাহের অনুমতি আছে। অনেকে ঐ শর্তের গুরুত্ব না বুঝতে পেরে বা তার নিজের মতলব হাসিল করতে ধর্মীয় অনুমোদনের দোহাই দেয় এবং একাধিক বিবাহ করে। এ বিষয়ে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে আগে যে পরিমাণ বহুস্ত্রী বিবাহ ছিল তা বর্তমানে শিক্ষার প্রসার ঘটায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক দুরবস্থার কারণে কমে গিয়েছে। তাই বহুস্ত্রী বিবাহ সীমিত হয়ে আসছে। তবে নতুন এক ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে; যেখানে, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের কোন পুরুষ একের পর এক বিবাহ করছে, আর স্ত্রীকে পরিত্যাগ (Divorce) করছে বা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ না করে আবার অন্যত্র বিবাহ করছে। এর কারণ মূলত আর্থ-সামাজিক। বিয়ের পর স্বামী সংসার চালাতে ব্যর্থ হয়ে এ ধরনের আচরণ করে চলেছে। একদিকে দারিদ্র্য আর অন্য দিকে যৌতুক সমস্যার কারণে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা-মাতা কন্যাকে বিয়ে দিয়েও দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারছে না। অনেক স্বামী বিয়ের পর স্ত্রীকে ঘরে তুলে নিচ্ছে না বা নিতে পারছে না। অথচ পুনরায় বিয়ে করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। উল্লেখ্য, বারবার বিবাহ এবং স্ত্রী বর্জন এবং একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী পরিবারে রাখা এক কথা নয়।

একাধিক শ্যালিকা বিবাহ বহুস্ত্রী বিবাহের এক বিশেষ রূপ। তবে একে বহু ভগ্নি বিবাহও বলা যেতে পারে। এ প্রথায় একজন পুরুষ কোন পরিবারের একাধিক মেয়েকে বিবাহ

একাধিক শ্যালিকাবিবাহ (Sororal Polygyny)

একাধিক শ্যালিকা বিবাহ বহুস্ত্রী বিবাহের একটি বিশেষ রূপ। এর অন্য নাম বহু ভগ্নি বিবাহ। এ প্রথায় একজন পুরুষ কোন পরিবারের একাধিক কন্যাকে বিয়ে করে। রেডইণ্ডিয়ানদের মধ্যে দেখা যায় যে, স্ত্রীরা যদি পরস্পর বোন হয় তবে তারা একই তাবুতে বসবাস করে। আর স্ত্রীরা যদি পরস্পর বোন না হয় হয় তাহলে তারা ভিন্ন ভিন্ন তাবুতে থাকে।

বহুস্ত্রী গ্রহণ প্রথা ক্রমশ সব সমাজ থেকেই বিলুপ্ত হচ্ছে। শিল্প সমৃদ্ধ দেশে এককবিবাহ রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি দেশে দেশে নারী মুক্তি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে বহুস্ত্রী গ্রহণ প্রথার পরিবর্তে এক স্ত্রী গ্রহণ রীতি প্রবর্তন। কঠোর শর্ত সাপেক্ষে ইসলাম বহুস্ত্রী গ্রহণ সমর্থন করলেও অধিকাংশ মুসলমানই এখন এক বিবাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। যেমন, এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, ১৯৩৭ সালে মিসর যখন আজকের তুলনায় আরো ঐতিহ্যবাহী ছিল তখনও বহুস্ত্রী গ্রহণের সংখ্যা বেশ কম ছিল। তখন ৯৬.৮৬% বিবাহই ছিল এক বিবাহভিত্তিক (monogamy), একজন পুরুষ চারটি বিয়ে করেছে এর সংখ্যা ছিল মাত্র ০.০২%।

ইংরেজী পলিয়াণ্ড্রী শব্দটির মূল হচ্ছে গ্রীক শব্দ, যার অর্থ একাধিক পুরুষ'। বিবাহের এ রীতি অনুযায়ী একজন মহিলার সঙ্গে যুগপৎ একাধিক পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত

বহুস্বামী গ্রহণ (Polyandry)

ইংরেজী পলিয়াণ্ড্রী এমন একটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ 'একাধিক পুরুষ'। বিবাহের এ রীতি অনুযায়ী একজন মহিলার সঙ্গে যুগপৎ একাধিক পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সাধারণভাবে এটা বলা হয় যে, বহুস্বামী গ্রহণ খুবই বিরল ঘটনা। কিন্তু প্রিন্স পিটার (Prince Peter) সমাজের এমন একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন যেখানে বহুস্বামী গ্রহণ প্রথা চালু রয়েছে। এই তালিকায় তিনি যেসব সমাজের নাম উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উত্তর নাইজেরীয় কিছু ট্রাইব, উত্তর আমেরিকার প্যাভিয়াটসো ইণ্ডিয়ান, শ্রীলঙ্কার কান্দিয়ান, ইন্দোচায়নার ডা-লা সমাজ, সিকিম, কাশ্মীর, তিব্বত ও ভারতের কতিপয়

www.swapno.in

জনগোষ্ঠীর নাম অন্তর্ভুক্ত। তিব্বতীয় সমাজেই বহু স্বামী গ্রহণ রীতি বেশি দেখা গিয়েছে।

বহুস্বামী গ্রহণ দুই প্রকার যথা ভ্রাতৃত্বমূলক (Fraternal) এবং অভ্রাতৃত্বমূলক (Non-fraternal)। ভ্রাতৃত্বমূলক বহুস্বামী গ্রহণ প্রথায় কয়েক ভাই মিলে এক স্ত্রী গ্রহণ করে। প্রথাটি একাধিক শ্যালিকা বিবাহরীতির (সরোরাল পলিজিনির) বিপরীত। অপরপক্ষে, অভ্রাতৃত্বমূলক বহুস্বামী গ্রহণ প্রথায় স্বামীরা পরস্পর ভাই বা ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিসম্পর্কিত নয়। তিব্বতীয়দের মধ্যে অবশ্য কয়েক ভাই মিলে এক স্ত্রী গ্রহণ করলে ভাইয়ে ভাইয়ে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু ঐ ভ্রাতারা তাদের একমাত্র স্ত্রীর যৌথ স্বামী সেহেতু ঐ স্ত্রীর সন্তানরা সব স্বামী-ভ্রাতার সন্তান।

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের মধ্যেও বহুস্বামী গ্রহণের প্রথা বিদ্যমান। সেখানে একটি শিশুর সমাজ-স্বীকৃত বা সামাজিক পিতা (Social Father) থাকে। তবে সে বাস্তবে জৈবিক পিতা (Biological Father) নাও হতে পারে।

একাধিক পুরুষ ও একাধিক মহিলার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহকে গোষ্ঠী বিবাহ বলে!

গোষ্ঠী বিবাহ (Group marriage)

একাধিক পুরুষ ও একাধিক মহিলার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহকে গোষ্ঠী বিবাহ বলে। গোষ্ঠী বিবাহ কদাচিৎ দেখা যায়। তবে তিব্বত এবং শ্রীলংকায় বহুস্বামী গ্রহণ রীতি থেকে ক্রমে ক্রমে গোষ্ঠী বিবাহরীতিতে পর্যবসিত হতে দেখা যায়। তিব্বতীয় ভ্রাতৃত্বমূলক বহুস্বামী গ্রহণের (Fraternal Polyandry) ক্ষেত্রে যখন একজন মহিলার যৌথ স্বামীরা (স্বামীরা পরস্পর ভাই) সন্তান লাভে ব্যর্থ হয় এবং ঐ অবস্থায় যদি মনে করা হয় যে, তাদের স্ত্রী বন্ধ্যা তাহলে স্বামীরা আরেকটি স্ত্রী গ্রহণ করে। দ্বিতীয় স্ত্রীও সবার স্ত্রী বলেই পরিগণিত। এ অবস্থায় এটা একধরনের গোষ্ঠী বিবাহের রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রাচীনকাল থেকে টোডাদের মধ্যে কন্যা শিশুকে প্রায়ই হত্যা করা হতো। যার ফলে বিয়ের পাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পায় এবং একাধিক পুরুষ একটি মহিলাকে বিয়ে করে। অর্থাৎ বহুস্বামী গ্রহণ রীতি প্রবর্তিত হয়। পরে বৃটিশ সরকার কন্যা শিশু হত্যা বন্ধ করার পদক্ষেপ নেয় এবং এতে ক্রমে কন্যা সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরফলে, কালক্রমে বৃটিশ যুগে সেখানে গোষ্ঠী বিবাহ রীতি হ্রাস পেতে দেখা যায়।

ভ্রাতৃ বিধবা বিবাহ (Levirate) ঃ মৃত স্বামীর যে কোন ভাইয়ের সঙ্গে বিধবা মহিলার বিবাহকে ভ্রাতৃ বিধবা বলা হয়।

ভ্রাতৃবিধবা-বিবাহ ও শ্যালিকা বিবাহ (Levirate and Sororate)

ভ্রাতৃ বিধবা বিবাহ ঃ এটি হচ্ছে মৃত স্বামীর যেকোন ভাইয়ের সঙ্গে বিধবা মহিলার বিবাহ। এ রীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর যে কোন ভাইকে বিবাহ করে। এ প্রথাটি যেন ভ্রাতৃত্বমূলক বহুস্বামী গ্রহণের (Fraternal Polyandry) অবশেষের (relics) অস্তিত্বের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা এতে একই মহিলার এমন দুজন স্বামীর কথা বলা হচ্ছে যারা পরস্পর ভাই।

কোন পুরুষের প্রথম স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে সে তার মৃত স্ত্রীর যেকোন বোনকে বিবাহ করবে - এমন বিবাহ রীতিকেই বলা হয় শ্যালিকা বিবাহ (Sororate)।

শ্যালিকা বিবাহ ঃ এটি হচ্ছে কোন ব্যক্তির স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে সে তার মৃত স্ত্রীর যেকোন বোনকে বিয়ে করবে। এ প্রথাটি যেন একাধিক শ্যালিকা বিবাহের (সরোরাল পলিজিনি) অবশেষের (Relics) কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

www.swapno.in

কেননা এ ধরনের বিবাহে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্ত্রীর মৃত্যুতে তার বোনকে বিবাহের সামাজিক স্বীকৃতি বা অনুমোদন পাচ্ছে।

অতএব দেখা যায় যে, লেভিরেট এবং সরোরেট শব্দ, দুটি যথাক্রমে মৃত স্বামীর ভাই এবং মৃত স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করার রীতিকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই বিবাহ অবশ্যই দ্বিতীয় বিবাহ (secondary marriage).

যদি মৃত স্বামীর কোন ভাই বা মৃত স্ত্রীর কোন বোন না থাকে তবে কি হবে? সেক্ষেত্রে মৃত স্বামী বা মৃত স্ত্রীর বংশ বা গোষ্ঠীর কাজ হবে বিকল্প কোন পাত্র বা পাত্রী যোগাড় করে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, আফ্রিকার কতিপয় সমাজে মৃত স্ত্রীর বোন না থাকলে তার ভাইয়ের মেয়েকে পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ শ্যালক বা সম্বন্ধীর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। এমন অবস্থা যে সমাজে বিদ্যামান সেখানে এটাই সুস্পষ্ট যে বিবাহ কেবল বিবাহিত দু'জন ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক নয়, বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে দু'টি, গোষ্ঠীর মধ্যে একটি **সেতু বন্ধন** রচনা করা অর্থাৎ মৃত স্বামীর ভাই বা স্ত্রীর বোন না থাকলে সমাজ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে দেয়। এতে দেখা যায় যে, স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পরপরই গোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যকার জ্ঞাতিসম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। সে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যই উক্ত বিবারীহির প্রচলন।

লেভিরেট এবং সরোরেট বিবাহ রীতি পৃথিবীর অনেক সমাজেই দেখা যায়। নৃবিজ্ঞানী মার্ডক তাঁর গবেষণাধীন ২৫০টি সমাজের ১২৭টিতেই লেভিরেট এবং ১০০টিতে সরোরেট বিবাহ রীতি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

বাঙালি মুসলিম সমাজে লেভিরেট এবং সরোরেট উভয় প্রথাই দেখা যায়। সাধারণত স্ত্রী যদি কোন নাবালক শিশু রেখে মারা যায় অথবা স্বামী ও স্ত্রী পক্ষের আত্মীয়রা আত্মীয়তার সম্পর্কটাকে নষ্ট হতে দিতে না চায় তা হলে সরোরেট প্রথাই উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। তবে তুলনামূলকভাবে লেভিরেট প্রথার প্রচলন কমই বলা যায়।

বহির্বিবাহ এবং অন্তর্বিবাহ (Exogamy and Endogamy)

> বহির্বিবাহ বলতে কোন ব্যক্তির নিজস্ব গোষ্ঠী, গোত্র বা গ্রামের বাইরে বিবাহকে বুঝায়। সেক্ষেত্রে এর নাম যথাক্রমে বহির্গোষ্ঠী, বহির্গোত্র এবং বহির্গ্রাম বিবাহ হতে পারে।

বহির্বিবাহ ঃ শব্দগত অর্থে Exogamy হচ্ছে বাইরে বিবাহ (exo = বাহির; gamy = বিবাহ)। বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় যখন কোন সমাজে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তিকে তার নিজগোষ্ঠীর বাইরে থেকে পাত্রী নির্বাচন করতে হচ্ছে তখন সে প্রথার নাম বহির্বিবাহ। অর্থাৎ পাত্র যে গোষ্ঠীর সদস্য সে গোষ্ঠীতে নয়, তাকে পাত্রী খুঁজতে হবে বাইরের কোন গোষ্ঠী থেকে।

বহির্বিবাহ প্রথা অজাচার এড়িয়ে চলার (incest avoidance) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অজাচার এড়িয়ে চলার অর্থ মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, আপন ভাই-বোনসহ অতিনিকট জ্ঞাতিজনের সঙ্গে যৌন সংগম বা বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে মেনে চলা। তাই এটা ঠিক যে, যেখানেই অজাচার নিষিদ্ধ সেখানেই নিকট-জ্ঞাতিদের মধ্যে বিবাহ হয় না। তাই নিকট-জ্ঞাতি বাদ দিয়ে বাইরে থেকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে হয়।

বহির্বিবাহ বলতে কোন ব্যক্তির নিজস্ব গোষ্ঠী, গোত্র বা গ্রামের বাইরে বিবাহকে বুঝায়। সেক্ষেত্রে এর নাম যথাক্রমে বহির্গোষ্ঠী, বহির্গোত্র এবং বহির্গ্রাম বিবাহ হতে পারে। উত্তর ভারতে একজন ব্যক্তিকে স্বগ্রামের বাইরে বিয়ের পাত্রী খুঁজতে হয়। অতএব এর নাম বহির্গ্রাম বিবাহ (Village Exogamy)। আবার

www.swapno.in

টোটেমভিত্তিক সমাজে নিজের গোত্রের (Clan) বাইরে বিবাহকে বলে বহির্গোত্র বিবাহ (clan exogamy)।

অন্তর্বিবাহ ঃ শব্দগত অর্থে Endogamy হচ্ছে ভিতরে বিবাহ (endo = ভিতর; gamy = বিবাহ)। এটা বিবাহের এমন একটা রীতি যেখানে পাত্র-পাত্রী অভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত। বস্তুত, এটা বহির্বিবাহ রীতির (exogamy) সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি।

উক্ত প্রথাটি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক এককের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। পেরু'র ইন্কা সমাজে কাউকে নিজের গ্রাম বা সম্প্রদায় থেকে বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে হয়। গ্রাম অভ্যন্তরে পাত্র-পাত্রী খুঁজলে তার নাম হবে অন্তর্গ্রাম বিবাহরীতি (Village engogamy)। আবার নিজস্ব সম্প্রদায় থেকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করলে তা হবে Local endogamy । যেহেতু হিন্দু জাতিবর্ণ প্রথায় নিজের জাতি-বর্ণের মধ্য থেকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে হয় সেহেতু জাতি-বর্ণ নির্ভর হিন্দু সমাজে অন্তর্বিবাহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

> চাচাত ভাইবোনের মধ্যে অথবা খালাত ভাইবোনের মধ্যে বিবাহকে বলা হয়

কাজিন বিবাহ ঃ প্যারালাল এবং ক্রস-কাজিন বিবাহ

Cousin marriage : Parallel and cross-cousin marriage

কাজিন বিবাহ প্রধানত দুই প্রকার। যথা ঃ

১. প্যারালাল কাজিন (Parallel Cousin) বিবাহ এবং

২. ক্রস কাজিন (Cross-Cousin) বিবাহ।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, পৃথিবীর প্রায় ৩০% সমাজে এই কাজিন বিবাহ প্রথাকেই পছন্দ করা হয়।

প্যারালাল কাজিন বিবাহ ঃ প্যারালাল কাজিন বলতে চাচাত ভাইবোন বা খালাত ভাইবোনকে বুঝায়। মনে রাখা দরকার যে, একই লিঙ্গের ভাই বা বোনের সন্তানেরা পরস্পর প্যারালাল কাজিন। চাচাত ভাইবোনের মধ্যে অথবা খালাত ভাইবোনের মধ্যে বিবাহকে বলা হয় প্যারালাল কাজিন বিবাহ।

মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় সমাজ এবং বাংলাদেশের মুসলিম সমাজসহ পৃথিবীর অনেক সমাজেই প্যারালাল কাজিন বিবাহ প্রথা প্রচলিত।

ক্রস কাজিন বিবাহ ঃ পিতার বোনের সন্তান-সন্ততি (বা ফুপাত ভাইবোন) এবং মাতার ভাইয়ের সন্তান-সন্ততি (বা মামাত ভাইবোন) হলো ক্রস কাজিন। অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের ভাইবোনের সন্তানেরাই ক্রস কাজিন। ফুপাত বা মামাত ভাইবোনের মধ্যকার বিবাহকে বলা হয় ক্রস কাজিন বিবাহ।

ক্রস কাজিন বিবাহ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এর ৪টি প্রধান কারণ রয়েছে, যথা ঃ

১. কাজিন বিবাহ রীতি জ্ঞাতিসম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।

২. এ ধরনের বিবাহে সম্পত্তি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত জটিলতা কদাচিৎ দেখা যায়। অর্থাৎ সম্পত্তি নিকট জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

৩. বিয়ের পাত্র-পাত্রী সবাই সবাইকে আগে জানতে পারে। ফলে, বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনায় (marriage negotiation) সময় লাগে কম; জটিলতার আশংকাও কম।

www.swapno.in

www.swapno.in

৪. কাজিন বিবাহে বৈবাহিক লেনদেন (marriage Payments) বা যৌতুক বা কন্যাপণ নিয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় না। কেননা কাজিন বিবাহে পাত্র-পাত্রী সবাই জ্ঞাতিগোষ্ঠীরই লোকজন। তাই এতে বিবাহের ব্যয় কম। তবে সব ক্ষেত্রে এটা পরিদৃষ্ট হয় না।

www.swapno.in

www.swapno.in

হিন্দু সমাজে উঁচু বর্ণের পাত্রের সঙ্গে নিচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহ কে অনুলোম বিবাহ (hypergamy) বলে। গুজরাট ও কেরালায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

হিন্দু সমাজে নিচু বর্ণের পাত্রের সঙ্গে উঁচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ (hypogamy) বলে। ভারতে এ ধরনের বিবাহ একেবারে বিরল নয়।

অনুলোম বিবাহ ঃ

হিন্দু সমাজে উঁচু বর্ণের পাত্রের সঙ্গে নিচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহকে অনুলোম বিবাহ (hypergamy) বলে। গুজরাট ও কেরালায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

প্রতিলোম বিবাহ ঃ

হিন্দু সমাজে নিচু বর্ণের পাত্রের সঙ্গে উঁচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ (hypogamy) বলে। ভারতে এ ধরনের বিবাহ একেবারে বিরল নয়।

অজাচার (Incest)

নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে অবৈধ যৌন সংগমকে অজাচার নামে আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণত পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র, আপন ভাই-বোন এবং এধরনের আরো কিছু নিকট জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেসংগমকে অজাচার বলে। বস্তুত, যেসব নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ সাধারণত সেসব গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যকার যৌন সংগমকে অজাচার বলে অভিহিত করা হয়, যা কেবল অসমর্থিতই নয়, অবৈধ তথা নিষিদ্ধও বটে।

অজাচার এবং বহির্বিবাহ রীতি (rules of exogamy) এক নয়। অজাচার রক্তসম্পর্কীয় নিকট জ্ঞাতি মধ্যে যৌন সম্পর্ককে নির্দেশ করে, যা সার্বজনীনভাবে নিষিদ্ধ। অপরপক্ষে, বহির্বিবাহ (Exogamy) এক ধরনের বিবাহরীতিকে নির্দেশ করে, যেখানে পাত্র বা পাত্রীকে স্বীয় বংশ বা গোত্রের বাইরে বিবাহ করতে হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, যার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ বা অবৈধ তার সঙ্গে কারো বিবাহ হতে পারে না।

www.swapno.in

www.swapno.in

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখুন

বহির্বিবাহ	অন্তর্বিবাহ

অনুশীলন ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

বিবাহের পাঁচটি ধরন উল্লেখ করুন।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সারাংশ ঃ

বিবাহ মানুষের পারিবারিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিবাহ হচ্ছে, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। বিবাহের একটি অন্যতম সামাজিক কাজ হলো এই যে, ইহা যে কোন মানব শিশুকে সমাজস্বীকৃত পিতা ও মাতা দান করে। তবে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে একক বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ, বহুপুরুষ বিবাহ, গোষ্ঠী বিবাহ অনুলোম বিবাহ, প্রতিলোম বিবাহ, বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.swapno.in

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বিবাহ কি ধরনের চুক্তি?

ক) সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত চুক্তি
খ) সমাজ ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত একটি চুক্তি
গ) রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত চুক্তি
ঘ) একটি পারিবারিক চুক্তি

২। যে রীতিতে নিজ গোত্রের বাইরে বিবাহ করতে হয় তাকে বলে

ক) অন্তর্গোত্র বিবাহ খ) অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ
গ) বহির্গোত্র বিবাহ ঘ) অন্তর্বিবাহ

৩। সরোরাল পলিজিনি কি?

ক) বহু স্বামী বিবাহ খ) এক ধরনের বহু স্ত্রী বিবাহ
গ) গোষ্ঠী বিবাহ ঘ) বহির্বিবাহ

৪। নিচু বর্ণের পাত্রের সাথে উঁচু বর্ণের পাত্রের বিবাহকে কি বলে?

ক) অনুলোম বিবাহ খ) অসবর্ণ বিবাহ
গ) প্রতিলোম বিবাহ ঘ) অস্বাভাবিক বিবাহ

www.swapno.in

www.swapno.in

পরিবারের সাথে বিবাহের সম্পর্ক

পাঠ ৬

মূলধারণা

- পরিবার ও বিবাহ সম্পর্ক
- বিবাহ ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ
- বিবাহ বিচ্ছেদ
- অনুশীলন
- স্বমূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. আধুনিক সমাজে পরিবারের সাথে বিবাহের সম্পর্ক জানতে পারবেন।
২. বাংলাদেশের সমাজে বিবাহ ব্যবস্থার স্বরূপ জানতে পারবেন।
৩. বিবাহ বিচ্ছেদের কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
৪. বাংলাদেশের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

> আধুনিক সমাজে পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক।

পরিবার এবং বিবাহ এক নয়। এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক সমাজে পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক। অর্থাৎ একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না।

(১) পরিবার হলো একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংঘ বা সংগঠন, যা স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, বিবাহ হলো পরিবার নামক সামাজিক সংঘের সাথে যুক্ত একটি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (institution), যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও মহিলা একত্রে বসবাস করার সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি পায়।

> আমরা পরিবার নামক সংগঠনের সদস্য, বিবাহের নয়। কেননা বিবাহ কোন সংগঠন

(২) আমরা পরিবার নামক সংগঠনের সদস্য, বিবাহের নয়। কেননা বিবাহ কোন সংগঠন নয়।

(৩) বিবাহে নানা ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হয়। যেমন, বাঙালী মুসলিম পরিবারে বিবাহে বর ও কনে দেখা, পান চিনি, গায়ে হলুদ, আক্‌ত, বৌভাত, ফিরানী ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রয়েছে সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে নানা বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান।

পক্ষান্তরে, পরিবারে এত সব আনুষ্ঠানিকতা নেই। পরিবারে আছে সদস্য, আছে পরিবারের কার্যাবলী ও সে সব কাজে নেতৃত্ব প্রদানের প্রশ্ন। এর লক্ষ্য পরিবারের সবার কল্যাণ, সুখ, সমৃদ্ধি ও খ্যাতি লাভের প্রয়াস।

(৪) কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে আদিম যুগে মানব সমাজে আজকের মতো বিবাহ বলতে কিছু ছিলনা। অবাধ যৌনাচার ছিল। তাই পরিবারও তখন গড়ে উঠতে পারেনি। তবে ছোট ছোট গোষ্ঠীজীবন ছিল। কখনও বা দলগত বিবাহ ভিত্তিক বড় আকারের পারিবারিক জীবন গড়ে ওঠতো।

www.swapno.in

আধুনিক যুগে বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা পরিবার গঠনে তৎপর হয়। অর্থাৎ বর্তমানে বিবাহ হলো পরিবারের পূর্বশর্ত।

(৫) অদ্যাবধি সাধারণত পরিবারই বিবাহ নামক সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। অর্থাৎ পরিবারের অন্যতম কাজ হলো প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে বিবাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৬.১ বাংলাদেশের সমাজে বিবাহ ব্যবস্থা
Marriage Systems in Bangladesh

> গ্রামে অল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কৃষক পরিবারে পুরুষের গড় বিবাহের বয়স-২০ বছর এবং মেয়েদের ১৫ বছর। শহরে শিক্ষিত পরিবারে তা যথাক্রমে ২৭ এবং ২২ বছরের

বাংলাদেশে অদ্যাবধি চিরকুমার বা চিরকুমারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। এতে প্রমাণিত হয় যে, বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের অধিকাংশই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পূর্বের বাল্যবিবাহ প্রথা আজকাল নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবেই কেবল টিকে আছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন পাসের কারণে বিবাহের বয়স এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে অল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কৃষক পরিবারে পুরুষের গড় বিবাহের বয়স-২০ বছর এবং মেয়েদের ১৫ বছর। শহরে শিক্ষিত পরিবারে তা যথাক্রমে ২৭ এবং ২২ বছরের মত। ইদানিং প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে এবং যৌতুক প্রথার প্রসারের ফলে অনেক পিতা-মাতাই তাদের কন্যা সন্তানের বিবাহ দিতে নিঃসম্বল হয়ে পড়ছেন। মা-বাবা যৌতুক দিতে অপারগ হলে মেয়ের বয়স বেড়ে যায়। অপরদিকে, পাত্রও জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে না বিধায় নিজের বয়স বাড়িয়ে ফেলছে। অবশ্য পাত্র-পাত্রী উভয়ই আজকাল অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে বলেও বিয়ের গড় বয়স একটু বৃদ্ধি পাচ্ছে।

> বাংলাদেশে বিবাহ অদ্যাবধি অভিভাবক কর্তৃক আয়োজিত। প্রেম-পরিণয়ের সংখ্যা খুবই কম। তবে ক্রমশ বাড়ছে।

বাংলাদেশে বিবাহ অদ্যাবধি অভিভাবক কর্তৃক আয়োজিত। প্রেম-পরিণয়ের সংখ্যা খুবই কম। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এটাকে তেমন সমর্থন করে না। তবে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের একটি নগণ্য অংশ প্রেম-পরিণয়ে আবদ্ধ হয়। অশিক্ষিত গ্রামীণ পরিবারে এটার নজির বেশ বিরল। সাধারণত পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকবৃন্দ নিজেরা অথবা মধ্যস্থতা রক্ষাকারী ঘটকের সাহায্যে বিবাহের কথাবার্তা চূড়ান্ত ও চুক্তি সম্পাদন করেন। তবে পাত্র পাত্রীর মতামতের গুরুত্ব দেবার প্রবণতা ইদানিং বৃদ্ধি পেয়েছে । পারিবারিক বংশমর্যাদা, চেহারা, বয়স, আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত মান ইত্যাদি পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আজও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। অর্থ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির আশায় কিছু সংখ্যক পিতা মাতা বিশেষ বিশেষ পরিবারে পাত্র ছেলে-মেয়ের দিয়ে থাকেন। পূর্বে মুসলিম সমাজে পাত্র পক্ষ কন্যাকে শুধু **যে মহরানা** দিতো তাই নয়, কন্যার মা বাবাকে টাকার অংকে **পণ** দিতে হতো। বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বাধীন ভারতীয় হিন্দু সমাজের মতো স্বীকৃত নয় বিধায় গতানুগতিকভাবে সেখানে পাত্রকে যৌতুক দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত। বেশ কয়েক দশক যাবত মুসলিম সমাজে যৌতুক প্রথা অনুপ্রবেশ করেছে । তবে ইসলাম ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী আজও মুসলিম পাত্র কনেকে *মহরানা দিয়ে* থাকে বা দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়।

> যৌতুকের ফলে যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তা নিরসনে দেশে যৌতুক বিরোধী আইন পাস হয়েছে এবং কিছু কিছু সুফল পাওয়া যাচ্ছে। তবে তা মূল সমস্যার সমাধানে তেমন ভুমিকা রাখতে পারছে না।

যৌতুকের ফলে যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তা নিরসনে দেশে যৌতুক বিরোধী আইন পাস হয়েছে এবং কিছু কিছু সুফলও পাওয়া

www.swapno.in

মুসলিম সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে অন্তর্গোত্র বা বহির্গোত্রে বিবাহ মোটেই বিবেচনার বিষয় নয়, তবে নির্দিষ্ট ১৪ রকমের ঘনিষ্ঠ মহিলা আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ

যাচ্ছে। তবে তা মূল সমস্যার সমাধানে তেমন ভুমিকা রাখতে পারছে না। কেননা সমাজের মৌল কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন না আনলে, কিংবা মেয়েদের কাজের অর্থনৈতিক মূল্য স্বীকৃত না হলে অথবা মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না করলে কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা-মাতা ও কন্যা নিজে যৌতুকের শিকার হওয়া স্বাভাবিক। সামাজিক সচেতনতা না থাকায় সমস্যাটি অহেতুক সবার উপর চেপে বসে আছে। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে ব্যক্তি যৌতুক চাচ্ছে তাকে একদিন তার বোন বা মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিতে হবে । তাই এ বাস্তবতাটি সবাই অনুধাবন করলে সমাধানের পন্থাটি সহজ হয়ে যেত। উল্লেখ্য যে, যৌতুক প্রথা নিম্নবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবারেই বেশি লক্ষ করা যায়। যৌতুক লেনদেন কোন কোন ধনী পরিবারের ক্ষেত্রে গর্বের ও শখের বিষয়। নিম্নবিত্তের ক্ষেত্রে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যৌতুক প্রথা জীবনে এনে দিয়েছে চরম দুশ্চিন্তা।

মুসলিম সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে অন্তর্গোত্র বা বহির্গোত্রে বিবাহ মোটেই বিবেচনার বিষয় নয়। তবে নির্দিষ্ট ১৪ রকমের ঘনিষ্ঠ মহিলা আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ বলে গণ্য। এছাড়া, যে কোন মুসলিম পাত্র যে কোন মুসলিম পাত্রীকে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণের দিক থেকে আন্ত বিবাহ প্রচলিত। তবে অভিন্ন গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ, যদিও বা পাত্রপক্ষ ও কন্যপক্ষ উভয়ই একই জাতবর্ণভুক্ত হয়। শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে বহু-স্ত্রী গ্রহণ প্রথা ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে।

৬.২ বিবাহ-বিচ্ছেদ

যদিও বিবাহ বিচ্ছেদ কোন যদিও অপরাপধমূলক কাজ নয় এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের পেছনে ধর্মীয় ও আইনগত সমর্থন রয়েছে তবু বিবাহ বিচ্ছেদ হলো একটি

বিবাহ-বিচ্ছেদ বাংলাদেশের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। সমস্যাটি দিন দিন আরো ব্যপকতা লাভ করছে। যদিও বিবাহ-বিচ্ছেদ কোন অপরাপধমূলক কাজ নয় এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের পেছনে ধর্মীয় ও আইনগত সমর্থন রয়েছে, তবু বিবাহ-বিচ্ছেদ হলো একটি "নিকৃষ্ট বৈধ কাজ"।
বিবাহ-বিচ্ছেদ আমাদের সমাজে নানাবিধ জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। নিম্নে বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলাফল ও উহার কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

বিবাহ বিচ্ছেদের ফলাফল

বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে কেবল যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কেরই অবসান ঘটে তাই নয়, স্বামী-স্ত্রীর বাবা-মা এবং নিকট জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যকার পারিবারিক সম্পর্কেরও অবসান

প্রথমত ঃ বিবাহ-বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে একটি দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে কেবল যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কেরই অবসান ঘটে তাই নয়, স্বামী-স্ত্রীর বাবা-মা এবং নিকট জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও টানাপোড়ন সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ বিবাহ-বিচ্ছেদের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর নানা প্রভাব পড়ে। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে দ্বিতীয়বার বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সমস্যার সম্মুখীন হয়। কারণ দ্বিতীয় বিবাহ খুব কম ক্ষেত্রেই সুখের হয় । যেহেতু আমাদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীরা পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করে এবং বিয়ের পর স্ত্রীরাই স্বামী-গৃহে (বা স্বামীর বাবার গৃহে) এসে বসবাস করে সেহেতু বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্বামীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? কেননা তার বাবা মা তখন হয়ত বেঁচে নেই নতুবা বৃদ্ধ।

www.swapno.in

ভায়েরা যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। এমন অবস্থায় একজন তালাক প্রাপ্ত মহিলা বড়ই অসহায় বোধ করে ।

তৃতীয়ত ঃ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সংশ্লিষ্ট স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সমাজ সন্দেহের চোখে দেখে। সমাজের বিবেচনায় উভয়ই দাম্পত্য জীবনে খাপ খাইয়ে চলতে ব্যর্থ। আমাদের সমাজে এ ক্ষেত্রে অবশ্য পুরুষের চেয়ে তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকেই নানা ধরনের কটুক্তি শুনতে হয় । যেমন, কপালপোড়া, পোড়ামুখী, অলক্ষী ইত্যাদি। খুব কম ক্ষেত্রেই স্বামীকে দোষারোপ করতে দেখা যায়।

চতুর্থত ঃ বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সন্তান-সন্ততি নিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। তাদের লালন পালন, অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনেক সময়ই এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়।

পঞ্চমত ঃ বিবাহ-বিচ্ছেদের মারাত্মক কুফল সন্তান সন্ততির প্রত্যক্ষভাবে পড়ে। তারা প্রায় ক্ষেত্রেই অবহেলিত হয় এবং মাতা-পিতার আদর, স্নেহ, যা তাদের জন্মগত অধিকার তা থেকে তারা বঞ্চিত হয়। ফলে সন্তান সন্ততি পরিবারে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে সামাজিকীকরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে অক্ষম হতে পারে। এর পরিণাম অনেক ক্ষেত্রেই শুভ হয় না। অপরাধ বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, কিশোর অপরাধীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই ভগ্ন পরিবার (borken family) থেকে আগত।

ষষ্ঠত ঃ প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে এমন স্বামী-স্ত্রী পরে বিয়ে করলে তাদের মধ্যে কেহ কেহ আবারও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটায়। কেননা অনেকের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রবণতার সৃষ্টি হয়। এটা একটা বদ-অভ্যাসে পরিণত হয়।

বিবাহ - বিচ্ছেদের কারণ

কোন কোন দম্পতি এক বা একাধিক কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের পথ বেছে নেয় বা নিতে বাধ্য হয়। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের সাধারণ বা সম্ভাব্য কারণ অনেক। নিম্নে বিবাহ-বিচ্ছেদের কতিপয় সাধারণ কারণ লিপিবদ্ধ করা হলো।

> ইদানিং বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ আর্থিক সংকট।

১. আর্থিক সংকট ঃ ইদানিং বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ আর্থিক সংকট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পরিবারের ভরণ পোষণে ব্যর্থ স্বামীরাই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছে।

২. যৌতুক ঃ অধিকাংশ নিম্নবিত্তের মধ্যে, এমনকি বিত্তবানদেরও একটি অংশের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হচ্ছে যৌতুক অনাদায়। নানা কারণে কন্যাদায়গ্রস্থ মা-বাবা যৌতুক প্রদানের প্রতিশ্রুতিসহ মেয়ে বিয়ে দিচ্ছেন বা এভাবে বিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু পরবর্তীতে সবার পক্ষেই সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব হয়ে উঠছে না । এমতাবস্থায় তাদের বিবাহিত মেয়েদের অনেকেই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হচ্ছে। কখনওবা প্রতিশ্রুতি না থাকলেও কোন কোন স্বামী যৌতুক দাবি করছে এবং তা না পেলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছে।

৩. ব্যক্তিত্বের সংঘাত ঃ অনেক সময় ব্যক্তিত্বের সংঘাতজনিত কারণেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি যার যার বিশ্বাস, রুচি ও ধ্যান-ধারণায়

www.swapno.in

অচল-অটল থাকে তবে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ কারণেই দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অনেকেই এক অপরের সঙ্গে খাপখাইয়ে চলতে ব্যর্থ হয় । বস্তত, এটাকেই সহজ কথায় বলা হয় 'বনিবনা' না হওয়া। যদিও সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের সংঘাত কম বেশি বিদ্যমান তবু দেখা যায় যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মধ্যে বেশির ভাগ বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ ব্যক্তিত্বের সংঘাত। এই দু'টি শ্রেণীর স্বামী-স্ত্রীর মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব অনেক ক্ষেত্রেই অনমনীয় (rigid)। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনমনীয় মনোভাব ও আচরণ বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

৪. পারস্পরিক সন্দেহ বা ভুল বুঝাবুঝি ঃ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সন্দেহ করতে বা ভুল বুঝতে পারে। উভয়ে একে অপরের আচরণ বা অন্যান্য উপসর্গ থেকে এটা মনে করতে পারে যে, তার স্বামী বা স্ত্রী অন্যত্র কোন অবৈধ জৈবিক সম্পর্কে লিপ্ত। এ ধরনের সন্দেহ কখনও সত্য, কখনও বা সত্য নয়। তবে এ ধরনের সন্দেহমূলক পরিস্থিতিও বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য কম দায়ী নয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সন্দেহটা কখনও বা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ত্বরান্বিত হওয়া স্বাভাবিক।

৫. যৌন অসামঞ্জস্যতা ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ যৌন অসামঞ্জস্যতা (sexual maladjustment) । স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান খুব বেশি হলে কিংবা অন্যান্য শারীরিক ত্রুটির কারণে এ সমস্যাটি দেখা দিতে পারে।

৬. ঝগড়া-বিবাদ ঃ স্বামী বা স্ত্রীপক্ষের কোন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সব সময়ই ঝগড়া-বিবাদের ফলে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে দারুণ অবনতি ঘটতে পারে, যা কখনও বা বিবাহ-বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে তুলে।

৭. সাংস্কৃতিক সংঘাত ঃ অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী একে অপরের আচরণ, চাল-চলন, পেশা বা আয়ের উৎস অপছন্দ করতে পারে। এটা ক্রমে দাম্পত্য কলহের কারণ হতে পারে এবং এর ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটতে পারে।

৮. দৈহিক নির্যাতন ঃ এমন কিছু লোক আছে যারা কারণে-অকারণে স্ত্রীদের মারধোর করে। এটা কারোবা স্বভাবজাত আচরণ, কারোবা মানসিক বিকারগ্রস্থতার ফল। এমন অবস্থায় কখনও স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারে।

> সন্তানের প্রতি ভালবাসা, তাদের প্রতি কর্তব্যবোধ, এবং একটি আদর্শ পারিবারিক তথা দাম্পত্য জীবনের প্রতিশ্রুতি না থাকলে, এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি তথা ত্যাগ-স্বীকারের মনোভাব পোষণ না করলে বিবাহ বিচ্ছেদ তথা পারিবারিক

বস্তুতঃ সুখী দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি কেবল যৌন সম্পর্ক হতে পারে না। অর্থাৎ কেবল যৌন-আকর্ষণই স্বামী-স্ত্রীকে আজীবন একত্রে রাখতে পারে না। সন্তানের প্রতি ভালবাসা, তাদের প্রতি কর্তব্যবোধ, এবং একটি আদর্শ পারিবারিক তথা দাম্পত্য জীবনের প্রতিশ্রুতি না থাকলে, এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি তথা ত্যাগ-স্বীকারের পোষণ না করলে বিবাহ বিচ্ছেদ তথা পারিবারিক ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে পড়তে পারে।

৬.৩ বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদ
Divorce in Bangladesh

বাংলাদেশে বিবাহবিচ্ছেদ সমস্যা ক্রমেই চরম রূপ ধারণ করছে। পরিবারের বন্ধন যদি শক্ত হয় এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মুল্যবোধ যদি সে বন্ধনকে দৃঢ় রাখে তাহলে বিবাহবিচ্ছেদ কমই দেখা দেয়। তবে নিম্নবিত্তের মধ্যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে এবং যৌতুক অনাদায়ে বিবাহবিচ্ছেদের মাত্রা ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। ফলে বারবার বিয়ে করছে এবং স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে এমন নিম্নবিত্ত পুরুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

www.swapno.in

> নিম্নবিত্তের মধ্যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে এবং যৌতুক অনাদায়ে বিবাহবিচ্ছেদের মাত্রা ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। ফলে বারবার বিয়ে করছে এবং স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে এমন নিম্নবিত্ত পুরুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে।

> স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনমনীয় মনোভাব ও আচরণ বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের কারণ প্রধানত ব্যক্তিত্বের সংঘাত ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব। উচ্চবিত্তের মধ্যেও বিবাহবিচ্ছেদের মুল কারণ ব্যক্তিত্বের সংঘাত, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের সংঘাত। তবে সব শ্রেণীর পরিবারেই দম্পত্তির ব্যক্তিগত মেজাজ ও আচরণ এবং জৈবিক ত্রুটি বিবাহ-বিচ্ছেদের এক একটি কারণ হিসাবে কমবেশী গণ্য।

নিম্নবিত্ত পরিবারে সাধারণত স্বামীই স্ত্রীকে তালাক দেয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারেও মূলত একই রীতি প্রচলিত। তবে তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তদের মধ্যে স্ত্রীরাও স্বামীকে তালাক দিতে পারে। উল্লেখ্য, মুসলিম সমাজে তালাক দেবার ক্ষমতা স্ত্রীর থাকবে কিনা তা বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনে (কাবিনে) উল্লেখ থাকতে হবে।

অনুশীলন ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

বাংলাদেশের সমাজে বিবাহের মুখ্য ৪টি বৈশিষ্ট্য লিখুন

১.

২.

৩.

৪.

অনুশীলন ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

বিবাহ বিচ্ছেদের ৫টি কারণ উল্লেখ করুন।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সারাংশ

www.swapno.in

আধুনিক সমাজে পরিবার ও বিবাহ পরস্পর পরিপূরক। পরিবার হলো একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন, যা স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে, বিবাহ হলো পরিবার নামক সামাজিক সংঘের সাথে যুক্ত একটি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও মহিলা একত্রে বসবাস করার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীপুরুষই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পূর্বে এদেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। বর্তমানে শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বাল্য বিবাহ অনেকাংশে রোধ হয়েছে। তবে যৌতুক প্রথা এদেশে এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ফলে অহরহ বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে। নীচু স্তরের লোকদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের মাত্রা বেশী। সাধারণত আর্থিক সংকট, যৌতুক প্রদানে অক্ষমতা, ঝগড়া-বিবাদ ও সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্যহীনতা ইত্যাদি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

৬। পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্য হলো -

ক) পরিবার বিলুপ্ত হয়ে যাবে

খ) পরিবার ব্যবস্থায় রাতারাতি চমকপ্রদ পরিবর্তন আনা শুভ হবেনা

গ) পরিবার তার সামাজিক ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপখাইয়ে টিকে থাকবে।

ঘ) পরিবারের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর বিলুপ্তি কখনই হবে না।

২। মুসলিম সমাজে কত রকমের ঘনিষ্ঠ মহিলাকে বিয়ে করা যায় না?

ক) ১৪ রকমের　　খ) ১৫ রকমের

গ) ১৬ রকমের　　ঘ) ১৭ রকমের

৩। বিবাহ বিচ্ছেদ কি ধরনের কাজ?

ক) অবৈধ কাজ　　খ) নিকৃষ্ট বৈধ কাজ

গ) অপরাধমূলক কাজ　　ঘ) বৈধ কাজ

৪। গ্রাম বাংলায় পুরুষের বিবাহের গড় বয়স কত?

ক) ২০ বছর　　খ) ২১ বছর

গ) ১৯ বছর　　ঘ) ২২ বছর

www.swapno.in

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবারের সংজ্ঞা দিন। পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে মর্গানের তত্ত্ব আলোচনা করুন।

২। পরিবারের উৎপত্তি সম্পর্কে ওয়েস্টারমার্কের তত্ত্ব আলোচনা করুন।

৩। পরিবার বলতে কি বোঝায় ? পরিবারের প্রকাভেদ আলোচনা করুন।

৪। পরিবারের সংজ্ঞা দিন। পরিবারের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৫। পরিবার কি ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে ? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দিন।

৬। বিবাহের সংজ্ঞা দিন। বিবাহের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৭। পরিবারের সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৮। বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণগুলো চিহ্নিত করুন। বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে সমাজে কি কি সমস্যা দেখা দেয় তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

১। ক ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

১। ক ২। খ ৩। গ ৪।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

১। ২। ৩। ৩। ৪।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪

১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫

১। ক, ২। গ, ৩। ৪।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬

১। ক ২। গ ৩। খ ৪। গ

www.swapno.in

www.swapno.in

ভূমিকা

মানব সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্পত্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মানুষের সম্পত্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা সার্বজনীন। কারো কারো মতে সম্পত্তি অর্জনের স্পৃহা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই অঙ্গ। কেউবা যুক্তি দেন যে, সম্পত্তি যেহেতু সমাজে মর্যাদা নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে সেহেতু সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং সে কারণেই সম্পত্তি অর্জনের স্পৃহা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি। উভয় মতই বিবেচনার দাবী রাখে।

সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের অন্যতম মুখ্য, আলোচ্য বিষয় হলো সম্পত্তি। এর প্রধান কারণ হলো দুটো। **প্রথমত** সম্পত্তি সামাজিক স্তর বিন্যাসের তথা শ্রেণী বিন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । মানব সমাজে এবং মানুষের মধ্যে সম্পত্তি প্রায় সর্বকালেই অসমভাবে বন্টিত ছিল, আছে এবং হয়ত থাকবে। মানুষের মেধাগত ও পেশাগত পার্থক্যের কারণে এই বৈষম্য অনস্বীকার্য। তবে সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানাজনিত বৈষম্য কমিয়ে আনা যেতে পারে। **দ্বিতীয়ত** সম্পত্তি মানব সম্পর্ক নির্ধারণে তথা সামাজিক মর্যাদার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে, সামাজিক বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পত্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ ইউনিটটি পড়ে আপনি সম্পত্তির সংজ্ঞা, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, সম্পত্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

www.swapno.in

www.swapno.in

সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও বিবর্তন

পাঠ
১

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. সম্পত্তির সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. সম্পত্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. সম্পত্তির মালিকানা, যেমন সমষ্টিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত মালিকানা, যৌথ মালিকানা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৪. আদিম সাম্যবাদে সম্পত্তির মালিকানার ধরন জানতে পারবেন।
৫. আদিম সাম্যবাদে সম্পত্তির স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৬. ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৭. সম্পত্তির বিবর্তন তত্ত্ব জানতে পারবেন।
৮. সম্পত্তির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে অবহিত হবেন।

সম্পত্তির সংজ্ঞা

স্কট (W. P. Scott) তাঁর **Dictionary of Sociology** নামক গ্রন্থে বলেছেন সম্পত্তি হলো কোন বস্তুগত সম্পদ বা কর্মে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অধিকার এবং সে সবকে ঘিরে কতক সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব-কর্তব্যকে বোঝায়, যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ("A socially sanctioned recognition of a group or individual's rights, privileges, and responsibilities with relation to an object, resource or activity").

সম্পত্তি বলতে কি বুঝায় তা জানার আগে সম্পদ (Wealth) সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সম্পদ বলতে বুঝায় কোন বিষয় বা বস্তু, যার উপযোগিতা (utility) রয়েছে। মানুষ যখন কোন প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে তখন তা সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সম্পদ সম্পত্তিতে পরিণত হবার সাথে সাথে এর মালিকানার প্রশ্ন দেখা দেয়। কেননা তখন প্রশ্ন উঠে কে ব্যবহার উপযোগী করে তুললো, এ কাজের জন্য তার পারিশ্রমিক বা অধিকার কতটুকু? কার ব্যবস্থাপনায়, কার নিয়ন্ত্রণে, কার সহযোগিতায়, কার বুদ্ধিমত্তার সুবাদে সম্পদ ব্যবহারউপযোগী হয়ে সম্পত্তিতে পরিণত হলো ? ঐ ব্যবস্থাপক বা নিয়ন্ত্রকেরই পারিশ্রমিক বা অধিকার কতটুকু ?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রাক-কৃষি যুগে ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদ হলেও তা সম্পত্তি হিসাবে গণ্য ছিল না। ভূমির ব্যবহার বা কৃষি কাজের সূচনা হতেই ভূমি সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তখন ভূসম্পত্তি মালিকানার প্রশ্ন দেখা দেয়।

মূলত সম্পত্তি বলতে বুঝায় এমন বিষয় বা বস্তু, যার চূড়ান্ত মালিকানা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত (Property is a socially recognized right of absolute ownership of any objects or ideas)। সম্পত্তি তাই একাধারে কোন বিষয়বস্তু এবং তার মালিকানার অধিকারকে বুঝায় । এই অধিকার সমাজ-কর্তৃক স্বীকৃত। অতএব সম্পত্তির তিনটি উপাদান থাকা আবশ্যক। যথাঃ (১) **কোন বিষয়বস্তু** (২)

www.swapno.in

চূড়ান্ত মালিকানা, এবং (৩) **সামাজিক অনুমোদন**। সম্পত্তি বলতে বুঝায় এমন কোন বিষয় বা বস্তু যার উপযোগিতা (utility) রয়েছে এবং যার উপর সমাজ কর্তৃক মানুষের অধিকার (right) স্বীকৃত।

বস্তুগত ও অবস্তুগত সব ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী বা বিষয়াদি যে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বলে বিবেচিত। খাদ্য সংগ্রহ এবং খাদ্য উৎপাদনের উপায় যেমন সম্পত্তি তেমনি উৎপাদন কৌশলের ব্যবহারের ফলে অর্জিত পণ্য বা বিষয়বস্তুও সম্পত্তি । বন-বাগান- জলাশয়, তীর-ধনুক , সংগৃহীত ফল, শিকার লব্ধ মাছ বা প্রাণী যেমন সম্পত্তি, কৃষিভূমি কৃষি যন্ত্রপাতি, ফসলাদিও সম্পত্তি। শিল্প কল-কারখানা ও শিল্প উৎপাদিত পণ্য দ্রব্যদিও সম্পত্তি । অর্থ, পোশাক, অলংকার, ব্যবহার্য দ্রব্য, যানবাহন, বাড়ি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র সবই যেমন সম্পত্তি; ব্যক্তির সংগীত-নৃত্য, গ্রন্থ স্বত্ব তথা তার বুদ্ধি - জ্ঞান, কলা কৌশলও সম্পত্তি। এমন কি, গ্রীক ও রোমান সমাজে দাসকেও সম্পত্তি বলেই মনে করা হতো । ঐ সমাজে দাস ক্রয়-বিক্রয় ছিল লাভজনক ব্যবসা । দাসদের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হতো।

সম্পত্তি বস্তুগত বা অবস্তুগত হতে পারে। সম্পত্তি স্থানান্তরযোগ্য হতে পারে, আবার কেবল মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানে সম্পত্তির তিনটি ধারণার সন্ধান মিলে, যথা-

১) Property is a matter of instant` - সম্পত্তি সহজাত প্রবৃত্তির বিষয়,

২) 'Property is a matter of culture - সম্পত্তি সংস্কৃতির তথা সমাজ সৃষ্টির উপাদান বা প্রতিষ্ঠান, এবং

৩) 'Property is theft- সম্পত্তি চৌর্যবৃত্তির ফল।

প্রথমটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের রচনায় এ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে মানব সমাজের সর্বস্তরে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ভিত্তিক সম্পত্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান সম্পত্তি কখনও বিলুপ্ত হবে না। দ্বিতীয়টিকে মার্কসীয় ধারণা বলা হয়। মার্কসের মতে, মানব সমাজে যত রকম শ্রম বিভাগ বিদ্যমান সম্পত্তির রূপও ততটি। অর্থাৎ শ্রমই সম্পত্তির স্রষ্টা। মার্কসের ধারণানুসারে উপজাতি সমাজ (tribal society) থেকে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ পর্যন্ত, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে সম্পত্তির ক্রমবিকাশ শ্রম বিভাজনের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর তৃতীয় ধারণার প্রবক্তা হচ্ছেন ফরাসী নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক প্রুধো (Proudhou)। তিনি 'Worning to propritors নামক একটি পুস্তিকা লিখে ফ্রান্সের শাসক শ্রেণীর বিভাগভাজন হন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। জুরীর মতামতের ভিত্তিতে তিনি মুক্তি পান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সংস্কৃতে একটি কথা প্রচলিত আছে- ‘ধন পাপাশ্রিত’। অর্থাৎ পাপ বা অসদুপায় অবলম্বন না করে কেউ ধনী হতে পারে না। একথা কি আজও অসত্য বলে মনে হয়? বাংলাদেশের সম্পত্তি ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে কি এ কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় না?

সম্পত্তি মালিকানার ধরন

সম্পত্তির মালিকানাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আমরা এখন সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে আলোচনা করব। সম্পত্তির মালিকানাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

www.swapno.in

(১) সমষ্টিগত মালিকানা বা সামাজিক মালিকানা (Communal or social ownership)
(২) ব্যক্তিগত মালিকানা (Private ownership)
(৩) যৌথ মালিকানা (Joint ownership)
যৌথ মালিকানাকে আবার দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়। -
(ক) যৌথ পারিবারিক মালিকানা (Joint family ownership)
(খ) শেয়ার ক্রয় বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দলগতভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের মালিকানা (Collective or jointstock company ownership)

সম্পত্তির ব্যবহার ও উপযোগিতার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দু'ধরনের হতে পারে। যথা-
(ক) ব্যক্তির নিজস্ব ব্যবহার্য দ্রব্য বা সম্পত্তি (Personal effect or personal property) এবং
(খ) ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private property)

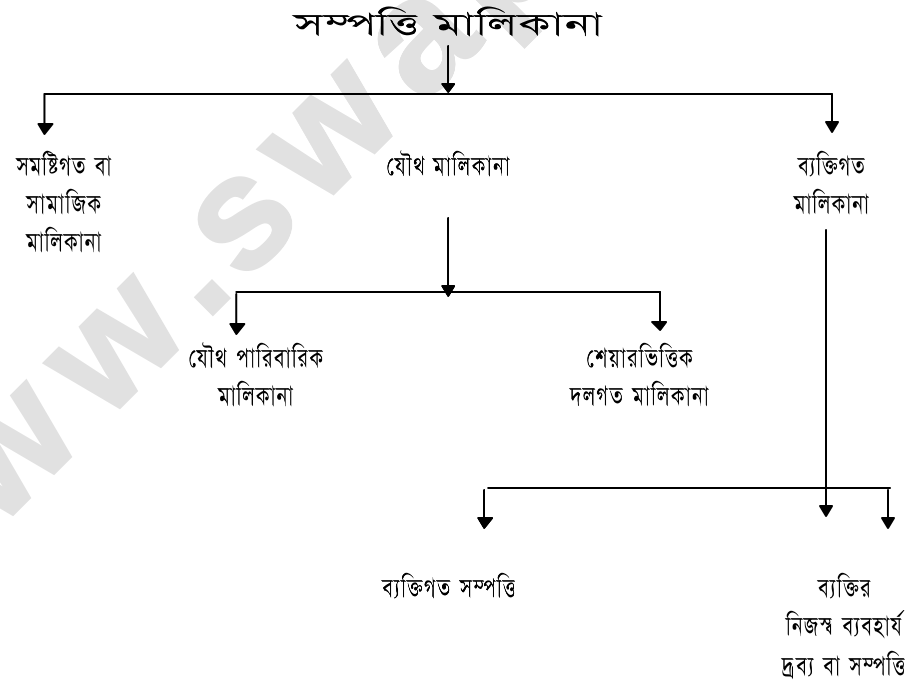

সমষ্টিগত মালিকানা

সমাজতান্ত্রিক সমাজে দেখা যায় যে, কৃষি জমি, শিল্প- কারখানা ইত্যাদি উৎপাদনের উপায়গুলো তথা উৎপাদনের উপকরণসমূহ সামাজিক মালিকানাধীন। আমাদের সমাজে কিছু শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক মালিকানায় বা রাষ্ট্রীয়

www.swapno.in

মালিকানায় রয়েছে। যে কোন জাতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি হলো পাবলিক প্রপার্টি বা জনগণের সম্পত্তি। বস্তুত জনগণের সম্পত্তিই সমাজ বা রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকে।

যৌথ পারিবারিক মালিকানা

এমন সম্পত্তি রয়েছে যার মালিকানা পরিবারের হাতেই ন্যস্ত। পরিবারের সব সদস্যই তার মালিক। যদিও পরিবারের স্বামী বা স্ত্রী জমিজমা বা অন্যান্য সম্পত্তির মালিক, তবু পরিবারের সবাই সেগুলো ভোগ করার অধিকার রাখে । পরিবারের কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের সে অধিকার প্রদান করে।

শেয়ারভিত্তিক দলগত মালিকানা

একদল ব্যক্তি যৌথ প্রচেষ্টায় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে যার যার শেয়ার বা মূলধন অনুযায়ী লাভ লোকসানের ভাগী হতে পারে। বস্তুত এক্ষেত্রে ঐ সকল ব্যক্তি দলগতভাবে ঐ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের যৌথমালিকানার অধিকারী । বাংলাদেশে এধরনের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যার মালিক একাধিক ব্যক্তি।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকানা

ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তি তার জমিজমা, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি উৎপাদনের উপায়ের যন্ত্রের মালিক হতে পারে। মালিক হতে পারে একাধিক বাড়ি, ট্রাক, লঞ্চ বা অন্য যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যেসব থেকে বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে কিছু কিছু সম্পত্তিতে সামাজিক মালিকানা থাকলেও অধিকাংশ ব্যক্তিই কোন না কোন সম্পত্তির একক মালিক । ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার ইচ্ছানুযায়ী ভোগ, দান বিক্রি, লগ্নী ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির সর্বোচ্চ ভোগাধিকার ক্ষমতা থাকে, যা সমাজকর্তৃক স্বীকৃত। এ জন্যই বলা হয় "Private property is the absolute right of ownership recognized by society".

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বনাম ব্যক্তির নিজস্ব ব্যবহার্য দ্রব্য

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে বুঝায় যেকোন বিষয়বস্তু বা সম্পত্তি যার উপর রয়েছে ব্যক্তির সমাজ স্বীকৃত এমন এক ধরনের চূড়ান্ত মালিকানা ও অধিকার, যার বলে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার ও ক্ষমতা অর্জন করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মোটামুটিভাবে স্থায়ী এবং চূড়ান্ত। এই অধিকার বলে ব্যক্তি তার সম্পত্তিকে ইচ্ছানুযায়ী ভোগ দখল করতে পারে । এ ছাড়া, সে দান, উপহার বা বিক্রির মাধ্যমে মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে। এমন কি, ব্যক্তি তার সম্পত্তি অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখতে বা পরিস্থিতি অনুযায়ী কারও ক্ষতি না করে সে তার সম্পত্তি ধ্বংস করে ফেলতে পারে।

পক্ষান্তরে, ব্যক্তির ব্যবহার্য দ্রব্য বা সম্পত্তি বলতে ঐসব বিষয়বস্তু বা দ্রব্যকে বুঝায় যা ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে বাড়তি কোন উৎপাদনের জন্য ব্যবহার না করে নেহায়েৎ নিজের ব্যবহারের জন্যই ব্যবহার করে । ব্যক্তির নিজস্ব 'নাম' থেকে শুরু করে জামা-কাপড়, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি ব্যক্তির ব্যবহার্য সম্পত্তি।

www.swapno.in

ব্যক্তির ব্যবহার্য দ্রব্য একদিকে যেমন কোন বাড়তি উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত হয় না, অন্যদিকে এর ব্যবহার করার মাধ্যমে কাউকে শোষণের সুযোগও তেমন নেই। অপরপক্ষে , ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেমন জমি, কলকারখানা, আয়ের জন্য বিনিয়োজিত যানবাহন বা অতিরিক্ত ঘরবাড়ি ইত্যাদি ব্যক্তিকে একদিকে যেমন বাড়তি আয়ের নিশ্চয়তা দেয় তেমনি এগুলো রাজনৈতিক অর্থনীতির (Political economy) পরিভাষায় বলা হয় উৎপাদনের উপায়। ব্যক্তি মালিকানায় উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে কেউ ইচ্ছা করলে অপরকে শোষণ করতে পারে । এতে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যবহার্য দ্রব্য বা সম্পত্তি দ্বারা শোষণ করা না গেলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি দ্বারা শোষণের সুযোগ থাকে ।উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থ সমাজে আর্থিক শ্রেণী বৈষম্যের উপস্থিতি।

আদিম সাম্যবাদ (Primitive Communism)

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকায় বলা হয়েছে যে, জার্মান দার্শনিক এঙ্গেলস (F. Engels) আদিম সাম্যবাদ প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠাতা। পক্ষান্তরে, মস্কো পাব্লিকেশন গ্রন্থ Political Economy তে লিওনটিয়েভ (Leontyev) বলেন যে,আদিম সমাজকে মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন আদিম সাম্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বৃটানিকায় দাবি করা হয়েছে যে, কতিপয় আদিম সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আংশিক বা পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এঙ্গেলস আদিম সাম্যবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৃটানিকায় আরো বলা হয়েছে যে, এঙ্গেলসের গবেষণা যতটা না বিজ্ঞানভিত্তিক তার চেয়ে এটি অধিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অদ্যাবধি এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া অব্যাহত রয়েছে এবং বৃটানিকার মতে আধুনিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, আদিম সমাজকে পুরাপুরি সাম্যবাদী বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী কোনটাই স্পষ্টভাবে বলা যায় না।

লিওনটিয়েভ অবশ্য বলেছেন যে, হাজার হাজার বছর আদিম সমাজে কোন ব্যক্তিগত মালিকানা লক্ষ করা যায়নি। কি কি বিষয় বিচার করে আদিম সমাজকে সাম্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। নিম্নে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব।

আদিম সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Primitive Communism

প্রথমত, আদিম সাম্যবাদের তাত্ত্বিকেরা এবং সমর্থকেরা বলেন যে, আদিম সমাজে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, ছিল গোষ্ঠীগত বা যৌথ মালিকানা।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকার কারণে আদিম সমাজ ছিল শ্রেণীহীন। অর্থাৎ সে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য ছিল না । ছিল না শ্রেণী দ্বন্দ্ব বা শ্রেণী সংঘাত।

তৃতীয়ত, সাম্যবাদী আদিম সমাজ ছিল সহযোগিতার সমাজ । সহমর্মিতা ও সহযোগিতা ছিল সে সমাজের অন্যতম ভিত্তি। সামাজিক সংহতিবোধও ছিল শক্তিশালী। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির আলাদা কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত না। ব্যক্তি

www.swapno.in

স্বাতন্ত্র্যবোধ তখনও অবিকশিত। সমাজের স্বার্থের মধ্যেই ব্যক্তিস্বার্থ নিহিত থাকত।

চতুর্থত, খাদ্য সংগ্রহের কাজে যেমন আদিম সমাজের সকলই একত্রে অংশ গ্রহণ করতো , খাদ্যবন্টন ও ভোগেও সবার সমান অংশ থাকত অর্থাৎ তখন ছিল যৌথশ্রম ও যৌথ উপভোগ। তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মিনু মাসানী নামে একজন ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসবিদ বলেছেন যে, জীবন ছিল হয় ভুরি ভোজে আনন্দ মুখর নতুবা উপবাসে জর্জরিত ('life was either a feast or a fast') অর্থাৎ খাবার মিললে সবাই ভুরি ভোজন করতো-না মিললে সবাই উপবাসে থাকতো । আদিম সমাজ ছিল দারিদ্র্যের মধ্যে সাম্য, প্রাচুর্যের মধ্যে নয়, যা মার্কস বর্ণিত আধুনিক সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চমত, আদিম সাম্যবাদে পারস্পরিক আদান- প্রদান (reciprocity) ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কারও কোন সামান্য উদ্বৃত্ত থাকলে তা জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে দান, উপহার-উপঢৌকনের মাধ্যমে বিলি বন্টন হত।

আদিম সাম্যবাদের সমালোচনা

আধুনিক সাম্যবাদের ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে আদিম সাম্যবাদী সমাজের ধারণা মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে । কিন্তু আদিম সাম্যবাদী সমাজের তত্ত্বকে অ- মার্কসীয় লেখকেরা সমর্থন করেন না। নৃবিজ্ঞানী লোঈ (Lowie) তাঁর **Primitive Society** এবং **Social Organization** নামক গ্রন্থ দুটিতে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

আদিম সমাজে কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না; সব কিছুতেই ছিল সকলের মালিকানা; সমাজব্যবস্থা ছিল সাম্যবাদী-এসব ধারণার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লোঈ বলেন, 'This assumption is demonstratively false' অর্থাৎ এই অনুমান সুস্পষ্টভাবেই সম্পূর্ণ মিথ্যা।

স্যার হেনরী মেইন (Sir Henry Maine) তাঁর **Ancient Law** নামক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা ছিল বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু লোঈ বলেন যে, যৌথ মালিকানা বলতে সম্প্রদায়গত মালিকানা বা সাম্যবাদ বুঝাবে এমন কোন কথা নেই। এই যৌথ মালিকরা এক পরস্পর অংশীদার, একটি পরিবার; একটি সংঘ বা একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হতে পারে । কিন্তু এর দ্বারা সাম্যবাদ বুঝায় না।

একজন দক্ষ মিশনারী কর্মী লক্ষ করেছেন যে, নিউগিনির কাইরা (Kai) হলো সাম্যবাদী। কিন্তু মজার বিয়ষ হলো এই যে, ঐ মিশনারী কর্মী পরবর্তী পর্যায়ে লিখেছেন যে, কারও জমিতে চোর ধরা পড়লে চোরকে হত্যা করা যেত। এক্ষেত্রে চোরের আত্মীয়-স্বজনের প্রতিশোধের কোন ভয় করা হতো না। এ কথা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জমিতে মালিকানা স্বত্ব এতই প্রবল যে, সে তার জমিতে ধৃত চোরকে শাস্তি দেবে-তাতে সে কারও ভয় করবে কেন?

সেখানে প্রতিটি ফল বৃক্ষের মালিক রয়েছে। একজন কাই কারও জমিতে ফল গাছ লাগাতে পারলেও জমির মালিকের অনুমতি ছাড়া সেখানে ঘর তৈরি করতে পারত না। লোঈ বলেন, যে ব্যক্তি কোন শিকার প্রথমে দেখবে সেই ঐ শিকারের মালিক; একইভাবে যে ব্যক্তি কোন পাখির বাসা খুঁজে পাবে তার মালিক সে

www.swapno.in

নিজে। এসব তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাইদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বেশ প্রবলই ছিল।

লোঈ অবশ্য বলেন যে, পশুপালকদের মধ্যে গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে এ পর্যায়ে ভূমিতে প্রায় সাম্যবাদী অবস্থা কিংবা সম্প্রদায়গত মালিকানা লক্ষ করা গিয়েছে। কেননা তখনও কৃষির আবিষ্কার হয়নি। শীত ঋতুতে তুষারপাতে চারণ ভূমির অভাব দেখা দিলে খিরগীজরা ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে। অথচ, গ্রীষ্মকালে চারণ ক্ষেত্রের তেমন অভাব না থাকায় তারা যৌথ মালিকানার নীতি অনুসরণ করে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রাকৃতিক কারণে চাহিদানুযায়ী জিনিসের প্রাচুর্য থাকলে সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্ন দেখা দেয় না।

অবস্তুগত সম্পত্তিতেও আদিম সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় বলে লোঈ মনে করেন। যখন কোন জাদুকর (Soccer) মহিলা একটি তন্ত্রমন্ত্র বিক্রি করে তখন সে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা করবে যে, সে ঐ তন্ত্রমন্ত্র আর নিজে ব্যবহার করবে না, সম্পূর্ণভাবেই তা বিক্রি করা হলো। ক্রেতা তখন এই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার একমাত্র মালিক বলে বিবেচিত হবে। শিকারী জীবনে তীর, ধনুক, হাতিয়ার, বল্লম ইত্যাদি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকাই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে, পশু পালন সমাজে গৃহপালিত পশু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকা বিচিত্র নয়। অথচ এ সময়ে যেহেতু কৃষির আবিষ্কার হয়নি- সেহেতু ভূমিতে হয়ত সম্প্রদায়গত মালিকানা বা সাম্যবাদের নীতি পরিলক্ষিত হতে পারে। কিন্তু কৃষির আবিষ্কারের পর ভূমিতে চাপ পড়ায় সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দেয়।

ফ্রাঞ্জ বোয়াস (Fronz Boas) দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন যে, “ব্যাক্তিগত সম্পত্তি নেই এমন কোন ট্রাইবের কথা আমরা জানিনা। একজন মানুষ তার তৈরি হাতিয়ার ও বাসনপত্র, যা সে ব্যবহার করে, কার্যত তা তারই সম্পত্তি। এই সম্পত্তি সে তার পরিবারের কারও জীবনের ক্ষতি সাধন না করে কাউকে দান করতে পারে, নিজে ব্যবহার করতে পারে কিংবা ধ্বংস করে দিতে পারে। বোয়াসের ভাষায় - "We do not know of any single tribe that does not recognize individual property; the tools and utensil which a person makes and uses are practically always his individual property which he may use, give away or destroy provided he does not damage the life of his family by so doing.”

বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী গোল্ডেন ওয়েজার golden weiser বলেন যে, আদিম মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই - ধারণাটি ভুল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা মানুষের উৎপত্তির ইতিহাসের মতই পুরাতন। এমনকি, অবস্তুগত সম্পত্তি যেমন সংগীত, নৃত্য, গল্প, যাদু সবই ‘আদিম’ সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল।

এখানে আমাদের মূল আলোচনার জের টেনে বলতে পারি যে, খাদ্য সংগ্রহ ও শিকার অর্থনীতির যুগে তীর-ধনুক, হাতিয়ার, বল্লম, পোশাক, সংগীত, নৃত্য, পৌরাণিক কাহিনী, গৃহের আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যক্তি মালিকানায় থাকলেও এ সময়ে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা তখনও কৃষির আবিষ্কার হয়নি। আবার পশুপালন অর্থনীতিতে পশু সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকৃত হলেও কৃষি জমিতে সম্প্রদায়গত মালিকানাই লক্ষ

www.swapno.in

করা যায়। অবশ্য কৃষির আবিষ্কার ও তা প্রসারের সাথে সাথে কৃষি জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ থেকে আমরা যে সূত্রটি পাচ্ছি তা হলো ঃ কোন জিনিসের আর্থ-সামাজিক গুরুত্বের পার্থক্যের ওপর নির্ভর করছে ঐ জিনিসের মালিকানার প্রকৃতি। আমাদের এই বিশ্বের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও ব্যবহার-উপযোগী হয়নি। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে জল-সম্পদ ও মহাশূন্য-সম্পদে মালিকানার প্রশ্ন ভবিষ্যতে দেখা দিবে এতে সন্দেহ নেই। এসব সম্পদে এখনও মালিকানার প্রশ্ন বড় করে দেখা দেয়নি। কারণ তা ব্যবহার উপযোগী হয়ে সম্পত্তিতে পরিণত হয়নি। এ সমস্যা হয়ত একদিন মানুষকে ভাবিয়ে তুলবে। কোন্ তত্ত্ব দিয়ে এসব সম্পদের মালিকানা নির্ণয় করা হবে তা ভাবীকালের সমাজবিজ্ঞানীরাই নির্ধারণ করবেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকানার উৎপত্তি

(Origin of Private property)

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা কিভাবে সৃষ্টি হয়, তা বুঝাতে নৃবিজ্ঞানী হোবেল (Hoebel) একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। মনে করি কুঠারের মত দেখতে এক খণ্ড পাথর অব্যবহৃত অবস্থায় অনেকটা অলক্ষ্যে পথিমধ্যে পড়ে আছে। এমতাবস্থায় এটি সম্পদ হলেও সম্পত্তি নয়। পথ চলতে চলতে পাথর টুকরাটি ট্রাইবের কোন একজন লোকের দৃষ্টিতে পড়ল। এটাকে সে কুড়িয়ে নিয়ে বাড়িতে কুঠার হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। বস্তুত, এ অবস্থায় পাথর টুকরাটি ব্যক্তির দখলের বস্তুমাত্র। এই ব্যক্তিটির সমাজে যদি এমন প্রথা বা আচরণ-বিধি থাকে যে, সমাজের অন্য কেউ পাথর টুকরাটি ইচ্ছা করলেই নিয়ে যেতে পারবে তখনও তা পূর্বোক্ত ব্যক্তির দখলের বস্তুই মাত্র। কিন্তু সেখানকার সামাজিক প্রথা যদি এমন হয় যে, অন্যরা তাকে কুড়িয়ে পাওয়া ব্যক্তিরই মনে করে এবং তাদের উচিত তাকেই তা ভোগ করতে দেওয়া, তখন পাথর টুকরাটি কুড়িয়ে আনা ব্যক্তির সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। লক্ষণীয় যে, বস্তুটির কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু একে ঘিরে যে **সামাজিক সম্পর্ক** সৃষ্টি হলো তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূলে কাজ করছে। অতএব **সামাজিক সম্পর্কই পাথর টুকরাটিকে সম্পত্তিতে পরিণত করল। তাই সম্পত্তি সমাজেরই সৃষ্টি** (Property is a social creation) । অতএব, সম্পত্তি বলতে বুঝতে হবে কোন বস্তু এবং তাকে ঘিরে গড়ে উঠা দায়িত্ব-কর্তব্যের এক সামাজিক সম্পর্ক। এটি একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

এখানে লক্ষণীয় যে, ব্যক্তি নয়, সমাজই সম্পত্তি সৃষ্টি ও তা রক্ষা করে। সমাজ ব্যক্তিগত বস্তুটিকে সৃষ্টি করেনি। বস্তুর মালিকানা, ভোগ ও বস্তুটিকে কেন্দ্র করে সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ সমাজের স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে।

'আদিম' সমাজে প্রাকৃতিক সম্পদের কোন অভাব ছিল না। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার উপযোগী হবার পর সমাজ, রাষ্ট্র ও আইনের স্বীকৃতিতে তা সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়।

মর্গান তাঁর **Ancient Society** নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে অনগ্রসর আদিম সমাজে তেমন কোন সম্পত্তিও ছিল না, আর তাই কারও মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নটিও তেমন গুরুত্ব পায়নি। প্রায় ক্ষেত্রেই মৃতের সম্পত্তি হয় মৃতদেহের সাথে কবরে পুঁতে দেওয়া হতো, নতুবা জ্বালিয়ে ফেলা

www.swapno.in

হতো। কখনওবা তা নিকট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার কথা জানা যায়। কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতি যতই অগ্রসর হতে লাগল, সম্পত্তির পরিমাণ ও প্রকার ততই বৃদ্ধি ও বিচিত্র হতে থাকে এবং উত্তরাধিকারের প্রশ্নটিও তখন গুরুত্ব লাভ করে।

মর্গান উত্তরাধিকারের তিনটি প্রধান নিয়মের (Three great rules of inheritance) কথা উল্লেখ করেন। **প্রথম পর্যায়ে** মৃতের সম্পত্তি তার গোত্রের (clan or gens) সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হতো। সম্পত্তি গোত্রের বাইরে যাবে না-এটাই ছিল প্রথম রেওয়াজ। **দ্বিতীয় পর্যায়ে** গোত্রের অতি নিকটতম আত্মীয়দের (among agnates) সন্তানদের মধ্যে বন্টিত হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সাধারণত এদের মধ্যেই সম্পত্তি বন্টিত হতো। কালের বিবর্তনে **তৃতীয় পর্যায়ে** মৃতের সম্পত্তি শুধু সন্তান সন্ততিদের মধ্যে (among offspring) বিতরণ করার রীতি প্রবর্তিত হয়। **এ পর্যায়েই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে**। তাঁর মতে প্রাক্ যুগল পরিবার ব্যবস্থায় (দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার) সম্পত্তিতে দলগত মালিকানা থাকাই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে, যুগল বা একক পরিবারের উদ্ভবের সাথে সাথে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব প্রবর্তিত হয়। ব্যক্তিগত যুগল পরিবারের পরিচালনার জন্য চাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাই মর্গান পরিবারকে সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার সংগঠন ("Property making organization") বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জবাসীদের মধ্যে কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূত্রপাত হয় তা র‍্যাডক্লীফ ব্রাউন (Radcliffe Brown) চমৎকারভাবে একটি উপমা দিয়ে বর্ণনা করেছেন। "স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কেউ হয়ত নৌকা তৈরীর উপযুক্ত একটি গাছ জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পেল। সে লোকালয়ে এসে ঐ গাছ সম্পর্কে অন্যদের সঙ্গে গল্প করলে এবং গাছটির পরিচয় দিয়ে রাখল। তখন থেকে ঐ গাছটি তার সম্পত্তিতে পরিণত ছিল। সে যদি কয়েক বছর ঐ গাছটি নাও ব্যবহার করে তবু অন্য কেউ তার বিনা অনুমতিতে ঐ গাছ কাটতে কিংবা ব্যবহার করতে পারবে না।

'আদিম' সমাজে কি করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হলো তা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার ফলে কয়েকটি দার্শনিক মতামতের সৃষ্টি হয়। **প্রথমত,** ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে দখলীয় স্বত্ব। যে যেমনটি পেয়েছে সে তা শক্তি ও বুদ্ধিবলে সম্পত্তি রূপে করায়ত্ত করেছে। **দ্বিতীয়ত,** সম্পত্তির অধিকার জন্মগত। মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) যখন বসবাস করত তখন তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির চেতনা এবং তার প্রয়োজনবোধ জাগার সাথে সাথে সামাজিক সংগঠনের রূপ বদলে যায়। ব্যক্তির সম্মান-সম্পত্তি-স্বাধীনতা ইত্যাদি রক্ষার্থে রাষ্ট্র ও আইনের সৃষ্টি হয়। এভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয় এবং তা রাষ্ট্রীয় অনুমোদন লাভ করে।

প্রাচীন রোমান দার্শনিক সিসারোর (cecero : 106-43bc) মতে প্রকৃতি সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি করেনি। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে দীর্ঘদিন **ভোগ দখলের** মধ্য দিয়ে অথবা **যুদ্ধ জয়ের** ফলে অথবা **আইন, চুক্তি, ক্রয় বা বিলিবন্টনের** মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বাভাবিকভাবে নয়, বরং আইন, প্রথা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। আর তা যুক্তিসিদ্ধভাবেই হয়েছে বলে রিচার্ড স্লাটার (R.Schlatter) মনে করেন। কারণ মানুষ পরবর্তী

www.swapno.in

সময়ে দুষ্টু ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছিল। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সামাজিক রীতি-রেওয়াজ ও অবদমনের প্রয়োজন হয়েছিল।

সমাজ দার্শনিক জন লক (John Locke) ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের তত্ত্ব দিয়েছেন এভাবে ঃ প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তিময়। সহযোগিতা ও বন্ধুত্বভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গিই সেখানে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। মানবিক অধিকার প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। কিন্তু সরকার বা রাষ্ট্র না থাকায় প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁর মতে বিশ্ব-প্রকৃতি মানুষকে মুক্ত হস্তে এ পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদ দান করেছে। প্রকৃতির রাজ্যে এসব সম্পদে সবারই সমান অধিকার। কিন্তু তা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় কিভাবে? লক বলেন যে, একজন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই তার স্বীয় 'শ্রম' ও 'হাতের কাজের' মালিক। প্রকৃতির সম্পদের সঙ্গে 'শ্রম' মিশিয়ে মানুষ তা ব্যবহার উপযোগী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে। কাজ ও শ্রমের মাধ্যমেই ব্যক্তি ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। যে যতটা ভূমি চাষ করে, সে তার মালিকানা লাভ করবে-এটাই স্বাভাবিক। অন্যান্য সম্পদের বেলায়ও একথাটি প্রযোজ্য। লকের সামাজিক দর্শন তাঁর দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধে "Toro Treatises on civil government" প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন, "Though the earth, and all inferior creatures be common to all men, yet everyman has a property in his own person. The 'labour' of his body and the 'work' of his hands, we may say, are property his - he had mixed his labour with, and joined to it something that is his own, and thereby makes his property."

সম্পত্তির বিবর্তন তত্ত্ব

Theories of the evolution of property

১. হবহাউসের তত্ত্ব (Hobhouse's theory) ঃ সম্পত্তি ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে বেশ কিছু লেখক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেছেন। হবহাউসের মতে সম্পত্তি বিবর্তনের তিনটি প্রধান পর্যায় রয়েছে। যথা ঃ

প্রথম পর্যায়ে সমাজে খুবই সামান্য সামাজিক ভেদাভেদ ছিল। সামাজিক বৈষম্য ও অসমতাও ছিল অত্যন্ত নগণ্য। কেননা তখন অর্থনৈতিক সম্পদ যৌথ মালিকানায় ছিল এবং তা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হতো।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে অসমতা ও বৈষম্য দেখা দেয়। সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অলক্ষ্যে ক্রমে সম্পত্তিকে ব্যক্তি বা যৌথ পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। আর্থিক বৈষম্য তখন বাড়তে থাকে।

তৃতীয় পর্যায়ে এমন সচেতন প্রয়াস নেওয়া হয় যার উদ্দেশ্য হচ্ছে অসাম্য তিরোহিত করা বা কমিয়ে আনা এবং সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্প্রদায়ের হাতে পুনরায় অর্পণ করা।

২. মার্কসীয় তত্ত্ব (Marxian theory) ঃ হবহাউসের সম্পত্তি বিবর্তনের ঐ পর্যায়গুলোর সঙ্গে সম্পত্তি বিবর্তনের মার্কসীয় ব্যাখ্যার কিছুটা মিল রয়েছে।

www.swapno.in

সম্পত্তি বিবর্তনের মার্কসীয় পর্যায়গুলো হলো এমন ঃ

ক) আদিম শ্রেণীহীন সমাজে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বলতে কিছু ছিল না; ছিল সামাজিক মালিকানা।

খ) পরবর্তী পর্যায়ে সমাজে অসাম্য, সামাজিক ভেদাভেদ তথা শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি হয় যার মূল ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকানার উদ্ভব।

গ) মার্কসের মতে শ্রেণীহীন সমাজের অভ্যুদয় ঘটবে, যার লক্ষ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার অবসান তথা উৎপাদন যন্ত্রে সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৩. ভিনোগ্রাডফের তত্ত্ব (Vinogradoff's theory) ঃ Vinogradoff তাঁর **Historical Jurisprudence** (1920) নামক গ্রন্থে সম্পত্তি বিবর্তনের চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। **প্রথম পর্যায়ে** সম্পত্তিতে সমষ্টিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। **দ্বিতীয় পর্যায়ে** ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হয়, **তৃতীয় স্তরে** ব্যক্তিগত সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং সমাজে শোষণ শুরু হয়। **চতুর্থ পর্যায়ে** আধুনিক সমষ্টিগত ধারণার আশ্রয়ে শোষণ ও আত্মসাতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। উল্লেখ্য, যে হবহাউস, মার্কস এবং ভিনোগ্রাডফের তত্ত্বগুলোর মূল বক্তব্য অভিন্ন। সেটা হলো **সম্পত্তির বিবর্তনে প্রথমে গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণ, এরপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সবশেষে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।**

সম্পত্তির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়

Irodual development of propurty in deferent stages

১. আদিম যুগ (Primitive) ঃ আদিম যুগের প্রথম দিকে প্রকৃতিতে অজস্র সম্পদ থাকলেও তা তেমন ব্যবহার উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি। কেননা আদিম মানুষের প্রযুক্তি বা কলাকৌশল ছিল খুবই নিম্নমানের। তীর-ধনুক, বর্শা ছুঁড়ে মারার জন্য পাথর বা মৃত্তিকাখণ্ড, গাছের ডাল ইত্যাদি হচ্ছে সে যুগের অর্থনৈতিক উপকরণ **সংগ্রহের কৌশল**। উৎপাদন কৌশল নয়। এটি যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদকে তেমন একটা ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায়নি বা প্রয়োজনও হয়নি সেহেতু সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের মতে সেখানে সম্পত্তি বলতে যা ছিল তা হলো বন-জঙ্গল থেকে সংগৃহীত ফল-মূল, খাদ্যোপযাগী লতা-পাতা, সব্জি, শিকারলব্ধ পশু-পক্ষী, পাখির ডিম, মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী। সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের মতে আদিম যুগের তীর-ধনুক, বর্শা, প্রস্তর ইত্যাদি হাতিয়ার যা অর্থনৈতিক বস্তু বা জীবনধারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হতো তা মূলত ছিল ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে বা অধিকারে। তবে সংগৃহীত ফলমূল, সব্জি বা শিকারলব্ধ পশু-পক্ষী, মাছ ইত্যাদিতে ব্যক্তিগত মালিকানা তেমন ছিল না। কেননা, তখন দলবদ্ধভাবে সবাই মিলে প্রকৃতির ঐসব খাদ্য-দ্রব্য ও পশু-প্রাণী সংগ্রহ করতো বা শিকার করতো। সংগৃহীত বা শিকারলব্ধ খাদ্যদ্রব্য দলের সবাই ভাগ বাটোয়ারা করে নিতো বা একত্রে আহার করতো। সংগ্রহ বা শিকার না মিললে সবাই উপবাসে দিন কাটাতো। তখনকার অর্থনৈতিক জীবনের এহেন অবস্থাকে বুঝানোর জন্য মিনু মাসানী নামক ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসবিদ বলেছেন, “Life was either a

www.swapno.in

feast or a fast” অর্থাৎ **জীবন ছিল ভুরিভোজে উৎসবমুখর নতুবা অনাহারে জর্জরিত।**

তবে অনেক সামাজিক নৃবিজ্ঞানী বলেছেন যে, শিকার বা খাদ্যও সংগ্রহে যারা নেতৃত্ব দিতো বা যার হাতে বেশি শিকার ধরা পড়তো সে শিকারকৃত পশুর মাথা পেত। এটা তার দক্ষতার পারিশ্রমিকের চেয়ে সম্মানী হিসেবেই প্রথায় পরিণত হয়।

তখনকার সমাজে সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য জিনিসপত্র প্রায়ই জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যেে দান বা উপহার হিসেবে লেনদেন চলতো।

২. পশুপালন যুগ (Pastoral) ঃ আদিম যুগের সমাজ বিবর্তিত হয়ে পশুচারণ বা পশুপালন সমাজে রূপান্তরিত হয়। কেননা বনের পশুকে তারা ক্রমে গৃহপালিত করতে শিখে। বস্তুত, প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ না করে তা থেকে বাড়তি উৎপাদনের এই কৌশলটি তখনকার সমাজে এক **বৈপ্লবিক** পরিবর্তন আনে। পশু-পাখি শিকার করে ভক্ষণ করতে থাকলে প্রকৃতিতে তার ঘাটতি দেখা দিতে বাধ্য। পশুপালন সমাজে তাই পশুকে গৃহপালিত করে তার দুধ, মাংস, চামড়া ও পশমের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। দুধ ও মাংসের তৈরি খাদ্যে বৈচিত্র্য আসে। তাই এ যুগের অর্থনীতিকে এক অর্থে **উৎপাদনমূলক অর্থনীতি** বলা চলে। কেননা, পশু পালনের মাধ্যমে এক থেকে একাধিক পশু উৎপাদন সম্ভব হয়। আসলে পশুপালন যুগ হচ্ছে আদিম খাদ্য সংগ্রহমূলক অর্থনীতি ও পরবর্তী খাদ্য উৎপাদনমূলক অর্থনীতির অন্তবর্তীকালীন অবস্থা।

এ যুগে অবশ্য খাদ্যসংগ্রহমূলক কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে তখন পশুচারণই অর্থনৈতিক জীবনেরমূল ভিত্তি হিসেবে দেখা দেয়। পশুচারণের জন্য চাই বিশাল এলাকা। তাই চারণ ক্ষেত্রের জন্য তখন মানুষ যাযাবরের ন্যায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটতো। সে কারণে মানুষ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ীভাবে কিছু দিন এক জায়গায় বসবাস করতো।

পশু পালনের এই যাযাবর জীবনেই প্রথমবারের মত ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব ঘটে বলে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। দক্ষতা ও সামর্থ্য মানুষ অনুযায়ী পশুপালন শুরু করে। তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়নি। তবে তারা **দ্রব্য বিনিময়** (Barter system) প্রথার উদ্ভব ঘটায়। গৃহপালিত পশু-পক্ষী বিনিময় শুরু হয় এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এ পর্যায়েই সীমিত পরিসরে ব্যবসা-বাণিজ্যের ও প্রচলন ঘটে। পশু পালনার্থে চারণ ক্ষেত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ফলে চারণ ক্ষেত্রগুলোতে ব্যক্তিগত না হলেও যৌথ পারিবারিক বা জ্ঞাতিভিত্তিক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মালিকানা দেখা দেয়। তবে চারণক্ষেত্রের অভাব দেখা দিলে তাতে সমষ্টিগত মালিকানাই লক্ষ করা যায়। তখনও কৃষির আবিষ্কার হয়নি বিধায় চারণ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা যায়নি।

যেহেতু পশুচারণ ব্যক্তিগত মালিকানার উন্মেষ ঘটে সেহেতু ঐ পর্যায়ে কতক সামাজিক বৈষম্য দেখা দেয় এবং মার্কসীয়দের কথিত আদিম সাম্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে থাকে। পশুপালন পর্যায়ে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হওয়ায় দান, উত্তরাধিকার, বন্ধক, লগ্নি ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শুরু হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশুচারণ ভিত্তিক সমাজ স্থিতিশীল নয়, বরং এটি একটি যাযাবর সমাজ। এ সমাজেই পরবর্তী কৃষিসমাজের বীজ অংকুরিত হয়। এ

www.swapno.in

অবস্থাটি আদিম যুগেও লক্ষ করা যায়। কেননা পশুকে গৃহপালিতকরণ হঠাৎ করেই শুরু হয়নি । প্রথমে শিকার লব্ধ কোন জীবিত পশুকে কিছু দিন রাখার পরে মানুষ খেয়ে ফেলতো এবং ক্রমে যখন তারা দেখল যে, কোন পশু বাচ্চা প্রসব করছে তখন তারা পশুকে গৃহপালিত করার উপযোগিতা বুঝতে পারে।

পশু পালন সমাজে তাই ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে বাগ বাগিচা করার অভ্যেস আয়ত্ত হয়। বনের ফল-মূলের বীজ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রোপণ করার মাধ্যমে কৃষি কাজের উদ্ভব ঘটে। অনেকে মনে করেন যে **পুরুষেরা বাইরে যখন পশুচারণ কাজে ব্যস্ত তখন মেয়েরাই উৎসুক্যবশত বীজ বপন, গাছপালা রোপণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় কৃষিকাজের উদ্ভব ঘটায়। আজও মেয়েরাই বাড়ীর আশা-পাশে শাক্ সব্জির বাগান করতে বেশ আগ্রহী**। অবশ্যএ অনুমান কতটা সত্য তা বলা যায় না। তবে এটাই অনেকের ধারণা যে পশুচারণ সমাজে ধীরে ধীরে উদ্যান চাষ ও বাগ- বাগিচা করার মাধ্যমে কৃষিকাজের সূচনা হয়।

৩. কৃষি যুগ (Agricultural) কৃষির আবিষ্কার মানব সমাজের বিকাশে এক বিরাট **বৈপ্লবিক ঘটনা**। কেননা প্রাক-কৃষি যুগে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করতে পারেনি। যাযাবর মানুষ পশু পালনের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে ফিরতো। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই প্রথম দিকে এক বিশেষ ধরনের সহজ পন্থায় কৃষিকাজের আবির্ভাব ঘটে, যা যাযাবর মানুষ ক্রমে আয়ত্ত করে। এটাকে Shifting cultivation, Slash and Burn আবার কখনও Swidden cultivation বলা হয়েছে। আমাদের দেশের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে এটাকে **'জুম চাষ'** নামে অভিহিত করা হয়। **'জুমচাষ'** হালচাষের চেয়ে সহজতর এক অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা। এতে প্রথমে পাহাড়ের গাছপালা কেটে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এতে যে ছাই হয় তা সারের কাজ করে। পরে সময় মত বৃষ্টি পেলেই জমিতে ধান, তুলা, তিল, সব্জি ইত্যাদির বীজ রোপণ বা বপন করা হয়। এর পর যথাসময়ে ঘরে ফসল তোলা হয়। উল্লেখ্য, একবার যে জমিতে জুমচাষ করা হয়, বড় জোর পরবর্তী বছরও সেখানে বীজ বপন করা যেতে পারে। কিন্তু তৃতীয়বার সে জমিতে ফসল করতে হলে ১০/১৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ঐ স্থানে আবার উর্বর মাটি পেতে হলে গাছপালা জন্মানো প্রয়োজন। তাই লক্ষ করা যায় যে জুমচাষের জন্য অনেক জমি প্রয়োজন। পর পর একই জমিতে দুই বারের বেশি জুম চাষ করা যায় না। জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় একই স্থানে মাত্র ৪/৫ বছরের ব্যবধানে বারংবার পৃথিবীর অনেক বড় বড় গাছপালায় ঘেরা বনাঞ্চল এখন লতাপাতা ও ঘাসের জমিতে পরিণত হয়েছে।

কৃষিযুগে প্রধান সম্পত্তি হলো জমি। জমির মালিকানাকে কেন্দ্র করে সমাজে শ্রেণীবৈষম্য বৃদ্ধি পায়। যারা বেশি জমির মালিক তারা স্বল্প জমির মালিক বা ভূমিহীনদের মজুরির বিনিময়ে খাটাতে থাকে। কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজিত পক্ষকে ভূমিদাসে পরিণত করা হতো বলে জানা যায়। রোমান সমাজে এর অস্তিত্ব মেলে।

কৃষি অর্থনীতিতে মানুষ **স্থায়ীভাবে** বসবাস শুরু করে। কেননা বীজ বপনের পর তার ফল লাভ করতে হলে বেশ কয়েকটি মাস অন্তত অপেক্ষা করতে হয়। কৃষিকাজ মানুষের খাদ্যের সরবরাহ আরো নিশ্চিত করে। কোন কোন অঞ্চলে উদ্বৃত্ত ফসল ফলতে থাকে। এতে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বৃত্ত ফসলের উপর নির্ভরশীল একটি অবসর জীবনযাপনকারী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এরা সংগীত, শিল্প তথা শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা করার অবকাশ পায়। এরাই ক্রমে কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ ও নগর জীবনের বিকাশ ঘটাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফসল

www.swapno.in

সভ্যতার সূচনা করে। এই জন্যই বলা হয় যে, civilization is an agricultural phenomenon. অর্থাৎ সভ্যতা হচ্ছে কৃষির অবদান তথা কৃষি মূলক প্রপঞ্চ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কৃষি যুগে যদিও জমিই প্রধান সম্পত্তি তথাপি শিকার, খাদ্য সংগ্রহ ও পশুপালন একেবারে লোপ পেয়ে যায় নি। এমনকি, শিল্পায়িত সমাজেও এটা কম-বেশি লক্ষ করা যায়। তবে পূর্বতন সমাজের কৌশলগুলো ক্রমেই গুরুত্ব হারায়।

কৃষি অর্থনীতিকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা - (ক) দাস যুগের কৃষি অর্থনীতি, (খ) সামন্ত যুগের কৃষি অর্থনীতি এবং (গ) যান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতি। নিম্নে এ তিন ধরনের কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

পাশ্চাত্যে বিশেষ করে গ্রীস ও রোমান সমাজে দাসদের কৃষিকাজে নিয়োগ করা হয়। জমির পাশাপাশি দাসও সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। দাস ও মনিব (Slave and Master) হচ্ছে দাস যুগের কৃষি অর্থনীতি নির্ভর সমাজের দুটি প্রধান শ্রেণী। ভূমির মালিকেরা আবার দাসেরও মালিক। ভারতীয় সমাজে দাস ক্রয়-বিক্রয় চলতো। এমনকি, ভারতীয় সমাজ থেকেও দাস অন্যত্র কিনে নেওয়া হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যে দাস শ্রমের ওপর ভিত্তি করে কৃষির বিকাশ অব্যাহত থাকে।

পরে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং দাস ও সাধারণ গরীব কৃষকদের সাথে মনিবেরা 'সেবা ও রক্ষা' নামে চুক্তি সম্পাদন করে। সামাজিক ইতিহাসে এই চুক্তির নাম সামন্ত চুক্তি (feudal contract)। এই চুক্তি অনুযায়ী সামন্ত প্রভুরা কৃষক ও দাসদের নানা আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করবে ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে, বিনিময়ে কৃষকরা সামন্তপ্রভুদের পক্ষে যুদ্ধ ও নানাবিধ কাজ-কর্ম করে এদের সাহায্য করে।

এভাবে পাশ্চাত্যে সামন্ত প্রভুরা দাসদের কিছুটা মুক্ত করে দেয় বটে, তবে বছরের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যেসব এবং সামন্ত চুক্তিভক্ত কৃষকেরা সামন্তপ্রভুদের হয়ে তাদের জমিতে কাজ করবে, যুদ্ধে সাহায্য করবে, সামন্তপতিদের আপ্যায়নে এবং তাদের যে কোন ডাকে সাড়া দেবে বলে চুক্তি হয়। তা সত্ত্বেও সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দাস ও কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। যেসব প্রায়ই অবশ্য ব্যর্থ হয়। তবে ইতোমধ্যে ইউরোপীয় শহুরে সমাজে একটি বুর্জোয়া ব্যবসায়ী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এরাই কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফসলের উপর নির্ভরশীল। এদের অপ্রত্যক্ষ সহায়তায় কৃষক-দাসেরা সামন্তপ্রভুদের নির্যাতন থেকে মুক্তিপেতে সক্ষম হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প ও কারখানার কাজে যোগ দেয়। অতএব লক্ষণীয় যে, কৃষিযুগে জমি, ভূমি-দাস, কুটিরশিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ ইত্যাদি হলো প্রধান সম্পত্তি, যার উপর ভিত্তি করে সমাজে শ্রেণীবৈষম্য বেড়ে যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষিযুগে জমিই ছিল প্রধান উৎপাদনের উপায়। গোড়ার দিকের এক পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থা হিন্দু প্রথাগত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো বলে জানা যায়। তবে মনুর বিধানে (Code of Monu) ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ছিল কিনা তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে দেখা যায় যে, রাজা উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ পেতেন। কৃষককে ভূমি ভোগ-দখলের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল, যা মৃত কৃষকের উত্তরাধিকারীরা ভোগ দখল করতে পারতো। এরপর দ্বাদশ শতকে মুসলিম আইন ভূমিতে কিছুটা ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি দেয়। তবে ১৭৯৩ সালে বৃটিশ সরকার বাংলায় এবং পরবর্তীতে ভারতীয় অন্যান্য

www.swapno.in

অঞ্চলে **চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের** মাধ্যমে ভূমিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি করে। পূর্বে যারা এদেশের মুসলিম শাসকদের অধীনে নেহায়েত খাজনা আদায়কারী শ্রেণী হিসেবে কাজ করতো তাদের অনেককেই বৃটিশ সরকার জমির মালিকে পরিণত করে। এভাবে বৃটিশ প্রশাসন ভূমিকে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তি তথা ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত করে। বস্তুত, এভাবে বৃটিশ এ উপমহাদেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত তৈরি করে। উল্লেখ্য, প্রাক-বৃটিশ ভারতে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উপস্থিতি নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে মতামত রয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলস ফরাসী পরিব্রাজক বার্ণিয়ের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেন যে, এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির (Asiatic mode of Production) অন্তগত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য অর্থে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি ছিল না। অন্যদিকে, অনেক ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের লেখক বলেন যে, ভারতেও প্রাচীন কৃষি যুগে এক ধরনের সামন্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হত। তবে এ বির্তকের আজও অবসান হয়নি।

সামন্ত কৃষি ব্যবস্থার অবক্ষয়ে এবং শিল্প বিপ্লবের পরে যান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতির গোড়াপত্তন হয়। এ সময়ে শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। উৎপাদন যায় বেড়ে - সামাজিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কৃষি নির্ভর সমাজ শিল্প সমাজে রূপান্তরিত হয়। শিল্প সমাজে ভূমি চাষ পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। তবে শিল্প সমাজে সম্পত্তি বিচিত্র রূপ ধারণ করে।

৪. **শিল্পযুগ (Industrial)** ঃ কৃষিযুগের সম্পত্তির তালিকার সঙ্গে শিল্পযুগে যা যোগ হয় তাহলো ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত কলকারখানা, ছোট ও বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে লগ্নিকৃত ঘরবাড়ি, উন্নত যানবাহন ইত্যাদি।

পুঁজিবাদী যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের আবার তিনটি স্তর রয়েছে ; যথা ঃ (ক) বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ (commercial capitlism), (খ) শিল্প পুঁজিবাদ (Industrial capitalism) এবং (গ) লগ্নি পুঁজিবাদ (Finance capitalism)।

বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের ভিত্তি হলো আন্তঃআঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য। বাণিজ্যিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত পুঁজি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ করে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায়। এতে আরো শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। এটাই শিল্প নির্ভর পুঁজিবাদের যুগ। পুঁজিবাদী যুগের সর্বশেষ পর্যায় হল লগ্নি পুঁজিবাদ (finance capitalism) এ পর্যায়ে কলকারখানার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ব্যবস্থাপক শ্রেণী(Managerial class) তথা প্রযুক্তিবিদদের (Technocrats) উপর বর্তায়। পক্ষান্তরে, প্রকৃত পুঁজিপতিরা নগদ অর্থ লগ্নি ও অর্থ নিয়ন্ত্রণ করেই মুনাফা অর্জন করতে ব্যস্ত থাকে।

শিল্প উৎপাদন ভিত্তিক মানব সমাজের দ্বিতীয় পর্যায় হলো সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের মুখ্য উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ এবং ১৯৪৯ সালে যথাক্রমে রাশিয়া ও চীনে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে পুঁজিবাদী ধরনের শোষণমূলক ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তন ঘটে ও মুনাফা অর্জনের সুযোগ সুবিধা সীমিত হয়ে পড়ে। নব্বই এর দশকে রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে। বর্তমানে চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া ও কিউবা বিশ্ব অর্থনীতির সাথে খাপ খাইয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

www.swapno.in

মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই পুঁজিবাদের ধ্বংস বীজ নিহিত। কতিপয় পুঁজিপতির হাতে সম্পদ জমা হতে থাকার অর্থ হলো জনসাধারণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি। মার্কসের ধারণা ছিল পুঁজিবাদী সমাজে মধ্যবিত্ত

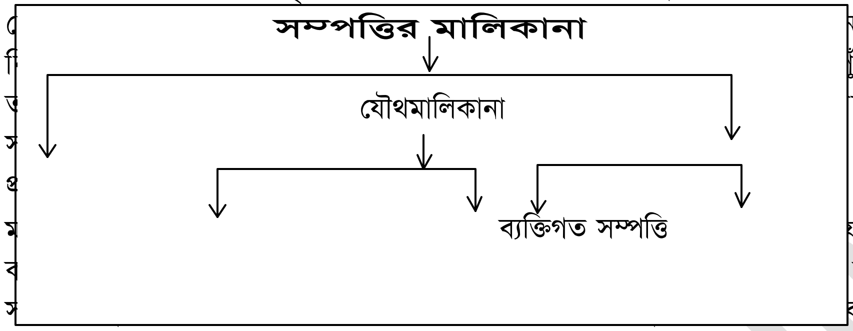

... শ্রেণীতে ... পুঁজিপতিরা ... সমাজতান্ত্রিক ... মালিকানা ... স্থায়ী কাজ ... সাম্যবাদে ... র। মার্কস কল্পিত সাম্যবাদী সমাজ অবশ্য কোথাও অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সম্পত্তির মালিকানা ছকটি পূরণ করুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সারাংশ

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল সম্পত্তি ও সম্পত্তির মালিকানা। সম্পত্তি বলতে বুঝায় এমন বিষয় বা বস্তু যার উপর, সমাজ ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি প্রদান করে। সম্পত্তির মালিকানাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পরে, তন্মধ্যে সমষ্টিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত মালিকানা ও যৌথ মালিকানাই মুখ্য। আদিম সমাজে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, ছিল গোষ্ঠীগত বা যৌথ মালিকানা। ধীরে ধীরে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। মর্গানের মতে প্রথম পর্যায়ে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার গোত্রের অতি নিকটতম আত্মীয়ের

www.swapno.in

মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করা হতো; তৃতীয় পর্যায়ে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি শুধু সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বিতরণ করার রীতি প্রবর্তিত হয়। শিল্প যুগের আবির্ভাবের সাথে সাথে ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত কলকারখানা, ছোট ও বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য লগ্নিকৃত ঘরবাড়ি, উন্নত যানবাহন ইত্যাদির মালিকানাও ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

www.swapno.in

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সম্পত্তি হতে হলে কয়টি উপাদান থাকা চাই?

ক) একটি   খ) দুইটি
গ) তিনটি   ঘ) চারটি

২। যে কোন জাতীয় সম্পদ কি ধরনের সম্পত্তি?

ক) জনগণের সম্পত্তি   খ) জাতীয় সম্পত্তি
গ) সামাজিক মালিকানা   ঘ) রাষ্ট্রীয় মালিকানা

৩। "সকল ট্রাইবেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে"- কথাটি কার?

ক) গোল্ডেন ওয়েজার   খ) ফ্রাঞ্জ বোয়াস
গ) মর্গান   হবহাউস

৪। সম্পত্তির বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়টিকে কি নামে আখ্যায়িত করা হয়?

ক) আদিম যুগ   খ) পশুপালন যুগ
গ) কৃষিযুগ   ঘ) শিল্প যুগ

www.swapno.in

www.swapno.in

সম্পত্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি -

১. সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে পারবেন।
২. সম্পত্তির প্রকারভেদ, যেমন- বস্তুগত সম্পত্তি ও অবস্তুগত সম্পত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৩. ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সম্পত্তির স্বরূপ

ক) সম্পত্তি বলতে উপযোগিতা আছে এমন কোন বস্তুকে বুঝায়। যেমন, জমি, ঘরবাড়ী, কলকারখানা ইত্যাদি।

খ) সম্পত্তি বলতে কোন অবস্তুগত বিষয়কেও বুঝায়, যাকে কখনও বা বলা হয় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (Intellectual Property)। যেমন - মন্ত্র, যাদুকৌশল, সংগীত, গ্রন্থের কপি রাইট ইত্যাদি।

গ) সম্পত্তি প্রত্যয়টির সঙ্গে তার মালিকানার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সম্পত্তি বললেই "কার সম্পত্তি?" বা "কে মালিক ?" এসব প্রশ্ন ওঠে এবং স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজ সম্পত্তির মালিক হতে পারে।

ঘ) সম্পত্তিতে অবশ্যই মালিকানা থাকবে এবং সে মালিকানা প্রায় সব ক্ষেত্রেই হস্তান্তরযোগ্য। যেমন, ব্যক্তি তার সম্পত্তিকে বিক্রি বা দান করতে পারে। গোষ্ঠী বা শেয়ার হোল্ডারগণ তাদের যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিক্রী করতে পারেন। এমন কি, সরকারও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে সমাজ কল্যাণার্থে কোন কাজে লাগাতে পারে।

ঙ) প্রাকৃতিক সম্পদ (natural wealth) এবং সম্পত্তি কিন্তু এক জিনিষ নয়। সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার-উপযোগী হলেই তা সম্পত্তিতে পরিণত হয়। যেমন, আমাদের ভূগর্ভে ও জলাশয়ে হয়ত অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রয়েছে। ঐগুলো আবিষ্কারের পর ব্যবহার উপযোগী হলে তা হবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি বা পাবলিক প্রপার্টি।

চ) সম্পত্তির বিনিময় মূল্য থাকে। অর্থাৎ সম্পত্তি হস্তান্তর করলে তার বিনিময় মূল্য পাওয়া যাবে। সম্পত্তির বিনিময় মূল্য থাকার কারণ সম্পত্তির উপযোগিতা থাকা। যেহেতু সম্পত্তি আমাদের কাজে আসে সেহেতু সম্পত্তির বিনিময় মূল্য থাকবেই। এমনকি, সম্পত্তি দান করলে তার একটি প্রতিদান পাবার সম্ভাবনা থাকে।

সম্পত্তির প্রকারভেদ

www.swapno.in

সম্পত্তিকে **বস্তুগত** এবং **অবস্তুতগত**- এ দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। বস্তুগত সম্পত্তি বলতে এমন যে কোন "বস্তুকে" বুঝায় যার উপযোগিতা তথা বিনিময় মূল্য রয়েছে। এ অর্থে, জমি-জমা, কল-কারখানা, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি বস্তুগত সম্পত্তি।

বস্তুগত সম্পত্তি ঃ এমন কিছু বস্তুগত সম্পত্তি থাকে যা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হয়, যেমন জমি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। আবার এমন কিছু বস্তুগত সম্পত্তি থাকে যা বাড়তি আয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, বাস, ট্রাক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, দোকানপাট, টাকা পয়সা, পুঁজি ইত্যাদি। এছাড়া, এমনকিছু বস্তুগত সম্পত্তি থাকে যা উৎপাদন কাজে বা বাড়তি আয়ের কাজে ব্যবহার করা চলে না। যেমন, পোষাক-পরিচ্ছেদ, আংটি, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি।

অবস্তুগত সম্পত্তি ঃ যেসব সম্পত্তির কোন বস্তুগত রূপ নেই সেগুলোই হলো অবস্তুগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (Intellectual property)। যেমন, সংগীত, গ্রন্থের কপিরাইট, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি। অবস্তুগত সম্পত্তিরও উপযোগিতা ও বিনিময় মূল্য রয়েছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুবিধা ও অসুবিধা ঃ (পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি)

ব্যক্তি-মালিকানার পক্ষে যুক্তি ঃ

১. ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার (natural right).ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পবিত্র মনে করা হয় (Property is Sacred.)

সম্পত্তির প্রতি মানুষের সহজাত (instinctive) আকর্ষণ রয়েছে। ইহা মানুষের জন্মগত অধিকার (birth right)। শ্রেণী-চেতনাহীন অবোধ শিশুও অনেক কিছুই পেতে চায় এবং কিছু হাতে দিলে আঁকড়ে ধরে থাকে। তাই সম্পত্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের জন্মগত ও সহজাত প্রবৃত্তিগত ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী কোয়েনিগ (Koenig) বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে মানব প্রকৃতির সহযোগী (Concomitant of human nature)।

২. পুঁজিবাদী সমাজে সম্পত্তি হলো মানুষের আইনগত অধিকার (Legal right)।

সম্পত্তি সম্পর্কে পুঁজিবাদী ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে কোয়েনিগ বলেন যে, প্রাচীন রোমান যুগে সম্পত্তি ছিল আইন-স্বীকৃত অধিকার। পাশ্চাত্য সমাজে মধ্যযুগের প্রথম দিকে ভূ-সম্পত্তির অধিকার সামাজিক প্রথা ও শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে তা আইনের অনুমোদন লাভ করে। আধুনিক যুগে পুঁজিবাদী বিশ্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে একটি আইনগত অধিকার।

৩. ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার প্রতীক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলে তা মানুষ স্বাধীনভাবে প্রয়োজনের সময় তা ভোগ বা ব্যবহার করতে পারে। জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বাধীনতার প্রতীক। দু'জন ব্যক্তি যদি কোন জিনিসের সাধারণ মালিক হয় তবে স্বাধীনতা সীমিত হয়ে পড়ে। কারণ তাদের কেউ উক্ত জিনিস ইচ্ছানুযায়ী ভোগ বা ব্যবহার করতে পারে না। হেগেল

www.swapno.in

মনে করেন যে, সম্পত্তি অসমভাবেই মানুষের মধ্যে বন্টিত হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্র সে নীতি নির্ধারণে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

আপদে-বিপদে নিরাপত্তার প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই অন্যতম নির্ভরযোগ্য অবলম্বন।

৪. ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষকে উদার, পরোপকারী, সদাশয় তথা দানশীলতার গুণে ভূষিত করে। কেননা ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলেই কেবল কারও পক্ষে অপরের আপদে-বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। এভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষকে উদার ও দানশীল হবার সুযোগ দেয়। একারণেই বিভিন্ন সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক জনকল্যাণকর ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। মানব মনে যে উদারতা, পরোপকার ও দানশীলতার সুপ্ত বাসনা থাকে তা ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকলে মেটানো যায় না।

৫. ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষকে দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে।

যাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রয়েছে তারা তা রক্ষাণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলে। তাই দেখা যায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকেরা, বিশেষ করে বেশি সম্পদের মালিকরা সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা আবেগ তাড়িত কোন বিপ্লবের সমর্থক নন। কারণ অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যহীন বিপ্লব জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার প্রতি অহেতুক হুমকির সৃষ্টি করে।

৬. ব্যক্তিগত সম্পত্তি অগ্রগতির অনুপ্রেরণা যোগায়।

ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পত্তি, যেমন জমি বা কল-কারখানা থেকে অধিক উৎপাদন ও মুনাফা অর্জনের জন্য যতটা পরিশ্রম করতে এবং ঝুঁকি নিতে উৎসাহ দেখাবে সামাজিক মালিকানাধীন জমি বা কারখানায় ততটা উৎসাহ নিয়ে কাজ করবে বলে বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা মনে করেন না। তাঁরা আরো বলেন যে, ব্যক্তি-মালিকানা এবং ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ না থাকলে মানুষ সৃজনশীলতা হারাবে এবং মানুষ অলস হয়ে পড়বে।

ব্যক্তিগত মালিকানার বিপক্ষে যুক্তি

১. ফরাসী নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদ প্রুধোর মতে, সম্পত্তির অর্থ চুরি-ডাকাতি বা চৌর্য বৃত্তির ফল (Property is theft)

২. ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

প্রুধোর আগে রুশো তাঁর **Discourses on the Origin of Inequality** নামক গ্রন্থে বলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভবের সাথে সাথে আদিম সমাজে বা প্রকৃতির রাজ্যে (State of nature) শান্তি ও সাম্য বিঘ্নিত হয়। তাঁর মতে সামাজিক অসমতা সৃষ্টির মুলে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

৩. ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনুপার্জিত (unearned) ধন। কেননা,

শ্রমিক যা উৎপাদন করে তার মূল্য শ্রমিকের প্রাপ্য বেতনের তুলনায় অনেক বেশি। অতএব মালিক শ্রমিককে সামান্য মজুরি প্রদানের বিনিময়ে শ্রমিকের উৎপাদিত সব দ্রব্য-সামগ্রী সুকৌশলে আত্মসাৎ করে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত রয়েছে এমন সমাজে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে সন্তান-সন্ততিতে বর্তায়। ফলে সন্তান-সন্ততি যে-কোন বয়সে এবং বিনাশ্রমে বা উপার্জন

www.swapno.in

না করেই মৃত পিতামাতার বা নিকট জ্ঞাতির উত্তরাধিকারী হতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনেক সময়ই অনুপার্জিত ধন। এটার জন্য কোন পরিশ্রম করতে হয় না। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়।

৪. ব্যক্তিগত সম্পত্তি শোষণের জন্ম দেয়।

পুঁজিবাদী সমাজের দিকে লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, কিভাবে মালিক শ্রেণী শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে মুনাফা অর্জনের নামে শ্রমিককে শোষণ করে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর শ্রমিকের কাজের ঘন্টা বাড়িয়ে দিয়ে মালিক শ্রেণী তাদের শোষন করতো। এখন অবশ্য আই. এল. ও. শ্রমিকের কাজ করার সময়সীমা ৮ ঘন্টায় সীমিত করেছে। উল্লেখ্য, এটি অর্জন করতে শ্রমিকদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। আমেরিকার চিকাগো শহরে ১৮৮৬ সালের ১লা মে সংগ্রামী শ্রমিকদের আত্মদানের ফলে এ অধিকার অর্জিত হয়। সেজন্য ১লা মে সমগ্র বিশ্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে পালিত হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর গঠিত প্রথম সরকারই ১লা মে সরকারী ছুটি ঘোষণা করে।

৫. ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপচয়ের সৃষ্টি করে।

কারণ, ব্যক্তি তার সম্পত্তির চূড়ান্ত ভোগ দখলের মালিক। আইনানুযায়ী সে তার ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারে। এজন্য সে কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। ফলে দেখা যায় একদিকে বিলাস ব্যসন, আর অন্যদিকে ক্ষুধার্ত মানুষের করুণ আর্তনাদ।

৬. ব্যক্তিগত সম্পত্তি আলস্যের জন্ম দেয় এবং উন্নয়ন ব্যাহত করে।

অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি যখন তার সব ধরনের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয় তখন তার কলকারখানা থেকে অতিবেশি মুনাফা অর্জনে ভাঁটা পড়ে এবং তার মধ্যে আরামপ্রিয়তা এবং ক্রমে অলসতার জন্ম হয়। এতে কারখানার ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন হয় না।

৭. ব্যক্তিগত সম্পত্তি অত্যাচারের হাতিয়ার। কেননা

অর্থের জোরে ন্যায়বিচার ভুলুণ্ঠিত করা যায়। কেউ রিক্ত-নিঃস্বকে দয়া দেখায়, কেউ আবার দরিদ্রকে হেয় জ্ঞানও করে, করে 'ধরাকে সরাজ্ঞান।'

৮. ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিপ্লবের প্রতিবন্ধক। কেননা সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব নড়বড়ে হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, মার্কসবাদীদের মতে বিপ্লবের লক্ষ্য হলো সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সাধন এবং সম্পত্তিতে সমাজ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে-বিপক্ষে উপরে বর্ণিত উভয় প্রকারের যুক্তিই বেশ শক্তিশালী। কোন বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করা কষ্টসাধ্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে **পবিত্র জ্ঞান করা** কিংবা তাকে চৌর্যবৃত্তির ফল বলা দুটোই **চরমপন্থী** মত।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে আরো একটি মত দেওয়া যেতে পারে। যেমন, বলা যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি শ্রমার্জিত ফসল। জন লকের মতে ব্যক্তির শ্রমই সম্পত্তি সৃষ্টি করে। তাই এটাকে পবিত্র না বললেও ব্যক্তির সহজাত ও স্বাভাবিক অধিকার বলা যেতে পারে। সম্পত্তি চৌর্যবৃত্তির ফল একথা প্রমাণ করতে হলে প্রথমেই স্বীকার

www.swapno.in

করতে হয় যে ঐ সম্পত্তিতে নিশ্চয়ই কারও ন্যায্য অধিকার ছিল এবং ঐ অধিকার হয়ত হরন করছে। তাই সম্পত্তি চৌর্যবৃত্তির ফল। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় সম্পত্তিতে কার ন্যায্য অধিকার বিদ্যমান? এ অধিকারের ভিত্তি কি? সম্পত্তিই বা কার, আর কেইবা সেটা চুরি করেছে?

বস্তুত, মানুষের স্বাভাবিক ও মুক্ত জীবনের জন্য সম্পত্তির যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি সীমাহীন বিশাল সম্পত্তি ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হলেও সমাজে বৈষম্য, শোষণ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে পারে। এ কারণেই অনেকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পক্ষপাতি, যেখনে জীবনের মৌল প্রয়োজন মেটাতে রাষ্ট্র কেবল ভারী শিল্প বা উৎপাদন যন্ত্রকে সামাজিক মালিকানায় নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যক্তিকে সীমিত পরিসরে তার মালিকানা ভোগ করার এবং মুনাফা অর্জনের সুযোগ দেয়।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সম্পত্তির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

অনুশীলন ২(Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার পক্ষে দু'টি এবং বিপক্ষে দু'টি যুক্তি উল্লেখ করুন।

সারাংশ ঃ

www.swapno.in

সম্পত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর উপযোগিতা থাকতে হবে। বস্তুগত ও অবস্তুগত বিষয়াদিকে সম্পত্তি বলা হয়, যদি মানুষের কাছে এসবের উপযোগিতা থাকে। বস্তুগত সম্পত্তি বলতে এমন সব সম্পত্তিকে বুঝায় যাকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায় এবং বাড়তি আয়ের কাজে ও ব্যবহৃত হয়। আর যেসব সম্পত্তির বস্তুগত রূপ নেই সেগুলোই হল অবস্তুগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি। বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল সম্পত্তিই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে। তবে সমাজবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে ও বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তি মালিকানার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার; এটি পবিত্র। আবার এর বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজে বৈষম্যের জন্ম দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সম্পত্তির প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য কি কি?
- ক) উপযোগিতা, মালিকানা, হস্তান্তরযোগ্যতা
- খ) ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য, উপভোগ্য মালিকানা সমন্বিত
- গ) প্রাকৃতিক, হস্তান্তরযোগ্য, বিনিময়যোগ্য
- ঘ) মালিকানা, উপযোগিতা স্বাভাবিক

২। ট্রাক কে কেন বস্তুগত সম্পত্তি বলা হয়?
- ক) উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় বলে
- খ) বাড়তি আয়ের কাজে ব্যবহৃত হয় বলে
- গ) বস্তুগত উপযোগিতা আছে বলে
- ঘ) বিনিময় মূল্য আছে বলে

৩। ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিসের অনুপ্রেরণা যোগায়?
- ক) সৃজনশীলতা
- খ) অধিক উৎপাদন
- গ) অগ্রগতি
- ঘ) ব্যক্তিগত মুনাফা

www.swapno.in

সম্পত্তির উত্তরাধিকার

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

১. উত্তরাধিকার এর সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. উত্তরাধিকারের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. উত্তরাধিকার সম্পর্কে মর্গানের তত্ত্ব জানতে পারবেন।
৪. পিতা থেকে পুত্র, মাতা থেকে কন্যার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৫. উত্তরাধিকারের মাতৃসূত্রীয় ও পিতৃসূত্রীয় রীতি জানতে পারবেন।
৬. জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার ও কনিষ্ঠের উত্তরাধিকার সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

উত্তরাধিকার
Inheritance

জি. ডি. এইচ. কোলে্র (G. D.H. Cole) মতে, উত্তরাধিকার বলতে বুঝায় “মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ভোগ-দখলের ক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তির প্রবেশাধিকার "The entrance of living persons into the possession of dead person's property." সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ। কারণ সম্পত্তি বলতে বুঝায় - (১) কোন বস্তু বা বিষয়, এবং (২) ঐ বিষয়বস্তুকে ঘিরে এক ধরনের নির্দিষ্ট সামাজিক মর্যাদা ও সম্পর্ক। অতএব উত্তরাধিকার বলতে বুঝাবে কোন বিষয়বস্তু এবং তাকে ঘিরে যে সামাজিক পদমর্যাদা সৃষ্টি হয় তার হস্তান্তর। কোন সন্তান তার পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল পিতার সামাজিক মর্যাদারও অধিকারী হয়।

(ক) সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে মর্গানের তত্ত্ব

মর্গান তাঁর **Ancient Society** নামক গ্রন্থে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের কয়েকটি নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে আদিম সমাজে তেমন কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। মৃত্যুর পর তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রথম দিকে ধ্বংস করে ফেলা হতো। পরে গোত্রের সদস্যদের মধ্যে মৃতের সম্পত্তি বন্টন করার রীতি দেখা দেয়। এরও অনেক পরে নিকট আত্মীয়দের (Agnates) মধ্যে সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বন্টন শুরু হয়। মর্গানের মতে সমাজ বিকাশের আধুনিক যুগে যখন একক বিবাহভিত্তিক পরিবারের (Monogamian family) উদ্ভব হয় তখন থেকেই মৃত পিতামাতার সম্পত্তি তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে হওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ তখন থেকে সন্তান-সন্ততি পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হতে থাকে।

(খ) পিতা থেকে পুত্রে এবং মাতা থেকে কন্যার উপর সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্পন

www.swapno.in

নৃবিজ্ঞানী গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, আদিম সমাজে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম-বিভাগ ছিল। যে ব্যক্তি যেসব হাতিয়ার বা সম্পত্তি ব্যবহার করতো তার মালিক ছিল সে নিজে। এমতাবস্থায় উত্তরাধিকারের একটি সরল নিয়ম ছিল যে, পিতার ব্যবহৃত জিনিসপত্র পুত্র এবং মাতার ব্যবহার্য জিনিসপত্র কন্যা পাবে। স্বাভাবিক ভাবেই এ অবস্থায় স্বামীর ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং স্ত্রীর ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী স্বামী উত্তরাধিকারসূত্রে পেত না।

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে সাধারণত পিতার সম্পত্তি পুত্ররাই পায়। পক্ষান্তরে, মুসলিম সমাজে পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার উভয়েরই আনুপাতিক অংশ যথাক্রমে ২ ঃ ১ রয়েছে। এছাড়া, স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীরও অধিকার স্বীকৃত এমনকি, দাদার পূর্বে বাবা মারা গেলে দাদার সম্পত্তিতে নাতিদের অধিকার মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে স্বীকৃত। উল্লেখ্য, বর্তমান ভারতের হিন্দু সমাজে ১৯৫৫ সাল তেকে সকল ছেলেমেয়েরা সমানভাবে পিতামাতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি মালিক হয়, যা বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে আজও চালু হয়নি।

(গ) সম্পত্তি উত্তরাধিকারের মাতৃসূত্রীয় এবং পিতৃসূত্রীয় রীতি

কোন কোন সমাজ মাতৃসূত্রীয় অথবা পিতৃসূত্রীয়। মাতৃসূত্রীয় সমাজে বংশনাম, মর্যাদা এবং সম্পত্তি মাতৃধারায় সন্তানদের মধ্যে বর্তায়। অপরদিকে, পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থায় বংশনাম, মর্যাদা এবং সম্পত্তি পিতৃধারায় সন্তানদের মধ্যে বর্তায়। বাঙালী জাতি মূলত মাতৃতান্ত্রিক হলেও বর্তমানে পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতিই অধিকতর প্রচলিত। ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালী সমাজে পিতার পদবী সন্তান সন্ততি গ্রহণ করে। তবে মেয়েরা বিয়ে করার পর স্বামীর পারিবারিক পদবী ব্যবহার করে, যদিও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) জ্যেষ্ঠের অধিকার (Primogeniture or Senior right)

সীমিত কৃষি জমি ও বনজ সম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে উত্তরাধিকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। সম্পত্তির তুলনায় উত্তরাধিকারীর সংখ্যা বেশি হলে জ্যেষ্ঠের অধিকারের প্রশ্ন আসে। পরিবারের বড় সন্তান সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হয় এবং পরিবারের সবাইকে তাদের শ্রমের বিনিময়ে ভরণ-পোষণ করতে সে বাধ্য থাকে। পলিনেশীয়দের বিশ্বাস দলপতির 'মনা' (mana - নৈর্ব্যক্তিক শক্তি) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রথম সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরীদের (maori) মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব প্রথা এতই প্রবল ছিল যে, প্রথম সন্তান যদি মেয়ে হত তবে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঐ মেয়ে, পুরুষের একটি নাম গ্রহণ করত এবং এভাবে পরিবারের সমুদয় সম্পত্তি ও মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হত।

যে সব আদিম সমাজে জ্যেষ্ঠত্বের নীতি দেখা যায় সেখানে এমনটিও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, উত্তরাধিকারী বড় সন্তান তার অন্যান্য ভাইদেরকে দল-বল সহ পার্শ্ববর্তী জনপদকে আক্রমণ করার আদেশ দিত এবং এটি আদিম সমাজে উপনিবেশ বিস্তারে এক সহায়ক ভূমিকা পালন করত। মাওরী ও পলিনেশীয়ায় পিতামাতার ছোট সন্তানেরা বড় বা প্রথম সন্তানের নির্দেশে অভিযানে বের হয় এবং উপনিবেশ গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

www.swapno.in

ইউরোপীয় সামন্ত সমাজে জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারের অবশেষ বললেই বলে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে পাশ্চাত্য সমাজে জ্যেষ্ঠত্বের নীতি নেই। সামন্ত প্রথা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার প্রথা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।

(ঙ) কনিষ্ঠের অধিকার (Ultimogeniture or Junior right)

এমন কতক উপজাতি রয়েছে যেখানে জ্যেষ্ঠের অধিকারের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথা তথা কনিষ্ঠের অধিকার লক্ষ্য করা যায়। কনিষ্ঠের অধিকার নীতিতে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান পারিবারিক সম্পত্তির সিংহ ভাগের উত্তরাধিকারী হয়। এশিয়া ও আফ্রিকায় এ প্রথা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে যৌথ পরিবার যখন ভেঙ্গে ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হয়ে যায় তখন কনিষ্ঠ সন্তানকে নিয়ে অনেক মা-বাবা একত্রে বসবাস করেন। এমতাবস্থায় কনিষ্ঠ সন্তান অন্যান্য সন্তানের তুলনায় বেশ কিছুটা সুবিধা ভোগ করতে দেখা যায়।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) **৫ মিনিট**

'জ্যেষ্ঠ্যের অধিকার' অনূর্ধ্ব ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

কোন বিষয়বস্তু বা তাকে ঘিরে যে সামাজিক পদমর্যাদার সৃষ্টি হয় তার হস্তান্তরকেই উত্তরাধিকার বলে। সম্পত্তির উত্রাধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের মতবাদ বা রীতি রয়েছে। তন্মধ্যে মর্গানের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত তত্ত্বটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে আদিমকালে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি ছিল না, পরবর্তীতে সম্পত্তি একটি গোত্রভুক্ত সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা হতো এবং তারও অনেক পরে সম্পত্তি রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন যেমন- ভাই-বোন বা ছেলে মেয়েদের মধ্যে বন্টন করা হতো। তাছাড়া অন্যান্য তত্ত্বানুয়ায়ী, সম্পত্তি পিতার কাছ থেকে পুত্র এবং মাতার কাছে থেকে কন্যা পেত। কোন কোন সমাজে উত্তরাধিকারের মাতৃসূত্রীয় ও পিতৃসূত্রীয় রীতি প্রচলিত ছিল। আদিম সমাজে জ্যেষ্ঠ্যের অধিকার ও কনিষ্ঠ্যের অধিকার সংক্রান্ত উত্তরাধিকার প্রথাও প্রচলিত ছিল। সে যা হোক, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও তার অনুষঙ্গী উত্তরাধিকার প্রথা বিদ্যমান।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে (Ö) টিক দিন

১। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে

ক) রাষ্ট্রের স্বীকৃতির মাধ্যমে। খ) পরিবারের স্বীকৃতির মাধ্যমে।
গ) সমাজের স্বীকৃতির মাধ্যমে। ঘ) আইনের স্বীকৃতির মাধ্যমে

২। যাযাবর জীবন পরিহার করে মানুষ প্রথমে কোন্ যুগে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে ?

ক) প্রাক-কৃষি যুগে খ) কৃষি যুগে
গ) আধুনিক যুগে ঘ) প্রস্তর যুগে

৩। কৃষি যুগের প্রধান সম্পত্তি

ক) বন-বাগান খ) কলকারখানা
গ) জমি ঘ) লাঙ্গল

৪। সভ্যতা কিসের অবদান ?

ক) কৃষি কার্যের খ) শিকার বৃত্তির
গ) সাহিত্য সংস্কৃতির ঘ) শিল্প উৎপাদনের

৫। জন লকের মতে সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে

ক) বলপূর্বক আত্মসাৎ করে
খ) প্রকৃতির সম্পদকে শ্রম দ্বারা ব্যবহার উপযোগী করে তোলার মাধ্যমে
গ) উত্তরাধিকার সূত্রে
ঘ) কেনা-বেচার

৬। আদিম যুগে খাদ্য সংগ্রহের কৌশল কি ছিল ?

ক) লাঙ্গল খ) তীর-ধনুক বর্শা
গ) কলকারখানার সাজ সরঞ্জাম ঘ) আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি

৭। ‘উত্তরাধিকার হল মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে জীবিতদের প্রবেশাধিকার’-এ কথাটি কে বলেছেন?

www.swapno.in

ক) জি.ডি.এইচ কোল　　খ) মর্গান
গ) মার্কস　　ঘ) ম্যাকাইভার

৮। মর্গান রচিত Ancient Society নামক গ্রন্থে সমাজ বিকাশের কোন স্তরে প্রকৃত অর্থে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিলাভ করে?
ক) বর্বর দশার মধ্যস্তরে　　খ) বন্য দশার উচ্চস্তরে
গ) সভ্যদশার প্রথম স্তরে　　ঘ) মানব সভ্যতার আধুনিক স্তরে

৯। নিউজিল্যান্ডের মাওরীদের উত্তরাধিকারের কোন প্রথাটি বেশী প্রচলিত?
ক) জ্যেষ্ঠত্ব　　খ) কনিষ্ঠ
গ) মাতৃসূত্রীয়　　ঘ) পিতৃসূত্রীয়

১০। উত্তরাধিকা ব্যবস্থায় কনিষ্ঠের অধিকার প্রথাটি কোন্ দেশে তুলনামুলকভাবে বেশী দেখা যায়?
ক) ভূটান　　খ) শ্রীলংকা
গ) বাংলাদেশ　　ঘ) ভারত

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সম্পত্তির সংজ্ঞা দিন। সম্পত্তির মালিকানার স্বরূপ ও ধরন আলোচনা করুন।

২। মানব সমাজে সর্বপ্রথম কিভাবে সম্পত্তিতে মালিকানার উদ্ভব ঘটে ? এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত যুক্তিসমূহ আলোচনা করুন।

৩। সম্পত্তির প্রধান তিনটি ধারণা কি কি? সম্পত্তির বিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ আলোচনা করুন।

৪। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি দিন।

৫। উত্তরাধিকার বলতে কি বোঝায় ? উত্তরাধিকারের কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১ ঃ ১। গ　২। ক　৩। খ　৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২ ঃ ১। ক　২। খ　৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩ ঃ ১। গ　২। খ　৩। গ　৪। ক　৫। খ　৬। খ　৭। ক　৮। ঘ　৯। ক　১০। ঘ

www.swapno.in

www.swapno.in

www.swapno.in

রাষ্ট্র

ইউনিট ৯

ভূমিকা ঃ

রাষ্ট্র হলো এমন একটি সম্প্রদায় যা একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠী, সম্পদ ও সম্পত্তিকে একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সর্বময় অধিকার প্রয়োগ করে। সমাজতাত্ত্বিকভাবে অবশ্যই বলা যায় যে, রাষ্ট্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহন যার দায়িত্ব আইন-কানুনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অবশ্য এর পেছনে থাকে মূলত দৈহিক শক্তি (Physical)। আরো উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্র হলো সমাজের একটি সংঘ; বলা যেতে পারে শক্তিশালী এক বৃহৎ সংঘ। তবে রাষ্ট্র বলতে সম্পূর্ণ সমাজকে বুঝায় না। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ওয়েবার বলেন যে, নির্দিষ্ট এলাকা হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে রাষ্ট্র একটি দেশের জনগোষ্ঠীকে সরকার নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে, চূড়ান্ত ক্ষমতাবলে অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। আসলে রাষ্ট্র নামক সংঘের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ। এ ইউনিট পাঠ করলে আপনি রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও ধারণা, উপাদান, উদ্দেশ্য, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য জানতে পারবেন।

www.swapno.in

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও ধারণা

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি

১. রাষ্ট্রের সংজ্ঞা জানতে পারবেন
২. রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ জানতে পারবেন।
৪. সমাজ জীবনে রাষ্ট্রের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৫. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৬. রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৭. গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য জানতে পারবেন।

> সমাজবিজ্ঞানী মেটা স্পেনসারের মতে রাষ্ট্র হলো এমন একটি সংগঠন যা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বৈধ ক্ষমতা প্রয়োগের

সমাজবিজ্ঞানী মেটা স্পেনসার (Metta.Spencer) তাঁর **Foundations of Modern Sociology** নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, রাষ্ট্র হলো এমন একটি সংগঠন যা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বৈধ ক্ষমতা প্রয়োগের একচেটিয়া ক্ষমতা রাখে ("State is the organization that has a monopoly on the legitimate use of force in a given territory").

> রাষ্ট্র হলো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সংগঠিত এমন এক সম্প্রদায় যেখানে জনগোষ্ঠী স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার ও ক্ষমতা অর্জন করে।

আধুনিককালে রাষ্ট্র বলতে বুঝায় এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টি যারা কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন নিজস্ব সরকারের অধীনে বসবাস করে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নিজস্ব স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারের অধীনে সংগঠিত জনসমষ্টি গড়ে তোলে রাষ্ট্র।

সহজ কথায়- রাষ্ট্র হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সরকারের অধীনে সংগঠিত এমন একটি জনসমষ্টি যারা স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার ও ক্ষমতা অর্জন করে।

রাষ্ট্রের উপাদান

> রাষ্ট্রের চারটি মুখ্য উপাদান হচ্ছে; জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

রাষ্ট্রের প্রধান চারটি উপাদানের কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। রাষ্ট্রের উপাদানগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১। **জনসংখ্যা** ঃ জনসংখ্যা নিয়েই রাষ্ট্র এবং জনসংখ্যাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য। তবে জনসংখ্যার কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। রাষ্ট্রভেদে জনসংখ্যা কম বা বেশি পরিলক্ষিত হয়।

২। **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** ঃ জনসংখ্যার পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও রাষ্ট্রের সীমারেখা অবশ্যই নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে। সেজন্য রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা বৈশিষ্ট্য হলো এর নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আর ঐ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অনির্দিষ্ট জনসংখ্যা বসবাস করে যারা গড়ে তোলে রাষ্ট্র।

৩। **সরকার** ঃ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত জনসংখ্যাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংগঠিত করা, জনকল্যাণের জন্য কাজ করা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা, দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনকারীর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নাম সরকার।

www.swapno.in

প্লেটো এবং এরিষ্টোটলের মতে কেবল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই মানব কল্যাণ নিহিত। তাঁদের মতে ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রই বেশি

৪। **সার্বভৌম ক্ষমতা ঃ** সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে অবিভাজ্য ও নিরংকুশ এমন এক ক্ষমতাকে বুঝায় যার দ্বারা রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বাইরের যে কোন শক্তি ও শত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করা যায়। যদিও বলা হয়, জনগণই সার্বভৌম ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তবু এটাও ঠিক যে, জনসমর্থনপুষ্ট সরকারই ঐ ক্ষমতার প্রতীক এবং সরকারের কাছে সার্বভৌম ক্ষমতা হলো জনগণ কর্তৃক অর্পিত এক অতীব মূল্যবান ও বৈধ শক্তি। গণতান্ত্রিক সরকার এই শক্তি প্রয়োগের আইনগত অধিকার লাভ করে।

রাষ্ট্রের গুরুত্ব

Importance of State

রাষ্ট্র কি নিজেই একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য, না এটি নাগরিকদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনের একটি মাত্র। (whether the state is an end in itself or merely a means to an end) এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। রাষ্ট্রের গুরুত্বই বেশি, না নাগরিকের গুরুত্ব বেশি সে সম্পর্কেও দুটো পরস্পরবিরোধী মত রয়েছে। নিম্নে তা আলোচিত হলো।

১. **ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বই অধিক** (State is more important than individual) ঃ প্রাচীন লেখকেরা সাধারণত নাগরিকের চেয়ে রাষ্ট্রকেই বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁদের মতে মানুষের সর্বোত্তম লক্ষ্য রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই উদ্দেশ্য। প্লেটো এবং এরিষ্টোটলের মতে কেবল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই মানব কল্যাণ নিহিত। তাঁদের মতে ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রই বেশি বাস্তব। রাষ্ট্র যেন একটা জীবন্ত ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বোচ্চ সম্প্রদায় (State is the highest form of -----) ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যাকে বিরোধিতা করে জার্মান ও ইংরেজ আদর্শবাদী দার্শনিকেরা রাষ্ট্রের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। যেহেতু রাষ্ট্র হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল সেহেতু রাষ্ট্র একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান। জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel) ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্র স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। রাষ্ট্রই বাস্তব, রাষ্ট্রের ইচ্ছাই (will)নাগরিকদের সঠিক বুদ্ধিবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। মানুষের অস্তিত্ব কেবল রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবেই। শুধু আদর্শবাদীরাই নয়, ইটালিতে ফ্যাসিস্ট এবং জার্মানীতে নাৎসিরাও (নাজ স্বীকৃত) রাষ্ট্রকেই উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তিকে তারা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন।

২. **রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তির গুরুত্বই অধিক** (Individual is more important than State) ঃ নৈরাজ্যবাদীরা (anarchists) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। মধ্যযুগে খৃস্ট ধর্মের যাজকরা বলতেন রাষ্ট্রের চেয়ে চার্চই অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা রাষ্ট্রকে একটি প্রয়োজনীয় ক্ষতিকর (necessary evil) প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যা গণ্য করতেন। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবীরা রাষ্ট্রের অধিক ক্ষমতার বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্র হলো একটি কৃত্রিম রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এটা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল নয়। তাঁরা মানুষের স্বাধীনতা ও প্রাকৃতিক অধিকারের ওপর জোর দেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্র মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংকুচিত করেছে। ইদানিং আন্তর্জাতিকতাবাদীরা রাষ্ট্রের চেয়ে বিশ্ব সংস্থাকে বেশি গুরুত্ব দেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরাও রাষ্ট্রের অতিরিক্ত যার দায়িত্বের বিরোধিতা করেন।

www.swapno.in

অতীতের তুলনায় আধুনিক যুগে অবশ্য নাগরিকের মঙ্গলের দিকেই রাষ্ট্র বেশি দৃষ্টি দিয়েছে। রাষ্ট্র যদি কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হয়েও থাকে অথবা অতীতে রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তিকে যদি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েও থাকে বর্তমানে রাষ্ট্র মানব কল্যাণেই বেশি তৎপর।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(Objective of State)

বিভিন্ন পণ্ডিত রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এডাম স্মিথ (Adam Smith) ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তিনটি। যথা -

১. অন্য রাষ্ট্র ও সমাজের আক্রমণ ও হস্তক্ষেপ থেকে স্বীয় সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা;

২. একই রাষ্ট্র-অভ্যন্তরে বসবাসরত এক নাগরিকের অত্যাচার ও অবিচার থেকে অন্যকে রক্ষা; এবং

৩. জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক এবং নাগরিকদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যাকীয় কাজের গতিধারা নির্ধারণ করে।

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্ণার (Garner) রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেন। যথা; **প্রথমত,** রাষ্ট্র অবশ্যই তার নাগরিকদের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখবে। সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। এজন্য আইন প্রণয়ন ও বিচারব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবে। **দ্বিতীয়ত,** রাষ্ট্র ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির স্বার্থ রক্ষায় বেশি তৎপর থাকবে। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র থাকবে সদা সচেষ্ট। **তৃতীয়ত,** রাষ্ট্রের পরম লক্ষ্য হবে মানব সভ্যতার অগ্রগতি সাধন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গেটেল বলেন যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নির্ভর করে সভ্যতার অগ্রগতির মাত্রার ওপর, রাজনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়ের ওপর এবং সমকালীন সমতার ওপর। বস্তুত, এটা ঠিক যে, রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো মানব স্বার্থ-রক্ষা ও মানব কল্যাণ। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মানব স্বার্থ কোন্গুলো? কিসে মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণ নিহিত? কেইবা তা নির্ধারণ করবে? রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দল-মত থাকতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন্ মতেরইবা প্রাধান্য দেবে ? কেননা, বিভিন্ন দল বিভিন্ন পন্থায় নাগরিক কল্যাণের কর্মসূচী গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

(Functions of State)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করেন। যথা -

১. অত্যাবশ্যকীয় কাজ (Essential functions); এবং

২. ঐচ্ছিক কাজ (Optional functions)।

নিম্নে উভয় প্রকার কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

১. রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজ ঃ যেসব কাজ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য খুবই জরুরী সেগুলো হলো রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজ। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক এবং নাগরিকদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যাকীয় কাজের গতিধারা নির্ধারণ করে।

প্রথমত, যুদ্ধ, জরুরী পরিস্থিতিতে এবং শান্তিকালীন সময়ে কোন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কি সম্পর্ক বজায় রাখবে তা রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজ

www.swapno.in

হলো দেশকে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে বা অহেতুক হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষ করা। প্রয়োজনে যুদ্ধ বা সন্ধির পথ বেছে নেওয়া। এজন্য রাষ্ট্রকে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রসহ সেনাবহিনী গড়ে তুলতে হয় এবং দেশ রক্ষার জন্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে **ক্ষমতার ভারসাম্য** রক্ষার্থে অন্যান্য জরুরী কাজ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের আইনগত সম্পর্ক রক্ষা করাও রাষ্ট্রের আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ। এ পর্যায়ে রাষ্ট্রের কাজ হলো নাগরিকের আইনগত অধিকার ও কর্তব্য সুনিশ্চিত করা। কর প্রদানে নাগরিকদের বাধ্য করা, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে নাগরিকদের বাধ্য করা তথা রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি নাগরিকদের অনুগত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া রাষ্ট্রের অন্যতম জরুরী কাজ। এজন্য রাষ্ট্রকে যথাবিহিত আইন প্রণয়ন এবং অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খল রক্ষা করার কাজে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য পালনের পরিবেশের পাশাপাশি নাগরিকদের আইনগত অধিকার সুনিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের জরুরী কাজের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্র যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না, তেমনি ব্যক্তিও যেন রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ না করে তা নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বস্তুত, রাষ্ট্রের আইনগত সুযোগের ন্যায্য বন্টন হচ্ছে রাষ্ট্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ।

তৃতীয়ত, নাগরিকদের মধ্যে পরস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার অর্থ দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করা। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা যেন অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অত্যাচারিত বা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত না হয় সে দিকে লক্ষ রাখা রাষ্ট্রের জরুরী কাজের অংশ। একারণেই নাগরিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রেখে ও সুবিচার নিশ্চিত করে রাষ্ট্র শক্তিশালী প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা গড়ে তুলে। বস্তুত, **জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি** রক্ষাণাবেক্ষণ রাষ্ট্রের জরুরী কাজের মধ্যে পড়ে।

২. রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা গৌণ কাজ ঃ ঐচ্ছিক কাজগুলো রাষ্ট্রকে এ কারণে করতে হয় যে, সেগুলো না করলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বা নাগরিকের স্বাধীনতা বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। বরং ঐচ্ছিক কাজের মাধ্যমে এটা আশা করা হয় যে, তাতে দেশবাসীর নৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নতি হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আজকের যুগে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজগুলো এতই গুরুত্ব পাচ্ছে যে, রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যকীয় কাজ ও ঐচ্ছিক কাজের মাঝে ভেদ রেখা টানা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। অবশ্য ঐচ্ছিক কাজগুলো রাষ্ট্রকেই করতে হয়। কেননা, ঐচ্ছিক কাজগুলো করার দায়িত্ব ব্যক্তি বা কোন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে দিলে তা সুচারুভাবে সম্পন্ন নাও হতে পারে।

রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজকে **অসমাজতান্ত্রিক** (non-socialistic) এবং **সমাজতান্ত্রিক** (socialistic) নামে বিভক্ত করা হয়।

(ক) নন-অসমাজতান্ত্রিক কাজ হচ্ছে যেগুলো অত্যাবশ্যকীয় নয় তবু তা রাষ্ট্রের জন্য খুবই স্বাভাবিক। কেননা, রাষ্ট্র যদি এ কাজগুলো না করে তবে তা হয়ত মোটেই করা হবে না বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করবে না। আর যদি অন্য কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে করেও ফেলে তবে তা হয়তো রাষ্ট্রের মত সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। তাই, রাষ্ট্রকেই এসব করতে হয়, যদিও তা ঐচ্ছিক বা গৌণ পর্যায়ের কাজ।

ঐচ্ছিক কাজের মাধ্যমে এটা আশা করা হয় যে, তাতে দেশবাসীর নৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নতি হবে।

যে সব কাজকে অসমাজতান্ত্রিক বলে বিবেচনা করা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গেটেল তার একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন। যেমন, দরিদ্র এবং অক্ষমদের যত্ন নেওয়া, জনহিতকর

www.swapno.in

কাজ, সেনিটেশন, প্রাথমিক শিক্ষা, পরিসংখ্যান গ্রহণ ও গবেষণা-কর্ম যা উন্নয়নের কাজে লাগবে। এ ছাড়া, ডাক বিভাগীয় কাজ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু, খাল, পোতাশ্রয় নির্মাণ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধাদি প্রদান।

(খ) সমাজতান্ত্রিক কাজ হচ্ছে যেগুলো হয়ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা যেতে পারে তবে রাষ্ট্রই এগুলো করতে ইচ্ছুক। কেননা, রাষ্ট্র মনে করে এগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা হলে তাতে কিছু ক্ষতিকর ফল দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, রাষ্ট্রই সেগুলো দক্ষতার সঙ্গে করতে পারবে বলে রাষ্ট্র মনে করে। এসব কাজের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গেটেল যেগুলোকে তালিকাভুক্ত করেছেন-সেগুলো হলো রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, গ্যাস, পানি এবং বিদ্যুতের সরকারী মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা। এছাড়া থিয়েটার, বিশ্বদ্যিালয়, যাদুঘর, চাকরি, পেনশন এবং অন্যান্য এমন সব কাজ যা সমাজ উন্নয়নমূলক এবং যা সমাজের সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের সুষম বন্টনের নিশ্চয়তা দেয়।

গণতন্ত্রে জনগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের শাসক নির্বাচন করে। এই শাসকের ক্ষমতার উৎস জনগণ।

আসলে অসমাজতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই কষ্টকর। তবে এই উভয় ধরনের কাজই রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্গত।

আরো উল্লেখ্য যে, কালের বিবর্তনে রাষ্ট্রের কাজের ধরনও প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসতে পারে। বলা বাহুল্য, আজকের যুগে অনেক কাজ ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন করে চলেছে, তেমনি নতুন নতুন এমন সব পরিবেশ-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজ বরং বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কাজ কি তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের কাঠামোর উপর, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যের ওপর, রাষ্ট্র কোন্ দর্শন বা আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার ওপর। তাই, রাষ্ট্রের কাঠামো, উদ্দেশ্য, আদর্শ ইত্যাদি র ওপর রাষ্ট্রের কার্যাবলী অনেকটা নির্ভরশীল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ এক ধরনের নয়। কেননা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাঠামো ও উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো ও উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে আদর্শগত অমিল রয়েছে। তাই, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাজ হবে পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী কাজ করা - যেখানে ব্যক্তিমালিকানা রক্ষিত হয় এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ সমুন্নত থাকে। পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে উৎপাদন যন্ত্রে সামাজিক মালিকানা নিশ্চিত করা এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করা।

গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র (Democracy and Autocracy)

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার তথা সরকার পরিচালনার দুটো বিপরীত-মুখী ব্যবস্থার নাম গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো ঃ

১। গণতন্ত্রে জনগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের শাসক নির্বাচন করে। এই শাসকের ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণের কাছে এই ধরনের শাসকবর্গ জবাবদিহি থাকতে বাধ্য। জনগণের আস্থা হারালে এই শাসক আর ক্ষমতায় থাকতে পারে না।

পক্ষান্তরে, একনায়কতন্ত্রে জনসমর্থনের প্রশ্ন অবান্তর। জনসমর্থন নয়, বরং শক্তির উপরই এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। একনায়ক শাসক জনগণের উপর নিজস্ব ইচ্ছানুয়ায়ী শাসন বা কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়। যেহেতু একনায়ক শাসক জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয় সেহেতু তার কাজকর্মের জন্য জনগণের কাছে তাকে জবাবদিহিও করতে হয় না।

www.swapno.in

২। গণতন্ত্রে বাক-স্বাধীনতাসহ অনেক মৌলিক অধিকার স্বীকৃত। জনগন সরকারের বৈধতা সম্পর্কে অথবা সরকার টিকে থাকা উচিত, কি অনুচিত সে ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতে পারে। অনাস্থা জ্ঞাপন করতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এ সব সম্ভব নয়। অর্থাৎ একনায়কতন্ত্রে জনগণ বেশ কিছু মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে।

৩। গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংকল্পবদ্ধ। সরকার ও নাগরিক সবাই আইনের দৃষ্টিতে সমান। পক্ষান্তরে, একনায়কতান্ত্রিক সরকার নিজেকে আইনের উর্ধ্বে মনে করে এবং প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় কেবল প্রশাসনিক ঘোষণা দিয়ে স্বীয় স্বার্থে আইন রচনা করে।

৪। গণতন্ত্রে একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দল থাকতে পারে। বস্তুত এ সব দল সরকারের কাজের মূল্যায়ন করে এবং সরকারকে তাই যথাসম্ভব নিরপেক্ষতার সাথে জনস্বার্থে কাজ করতে হয়। পক্ষান্তরে, একনায়কতন্ত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে না।

> একনায়কতন্ত্রে জনসমর্থনের প্রশ্ন অবান্তর। জনসমর্থন নয়, বরং শক্তির উপরই এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।

৫। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের যেকোন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে।

৬। গণতান্ত্রিক সমাজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে, একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার আপন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বীয় ক্ষমতার বলয় বৃদ্ধি করে উগ্র জাতীয়তাবাদী মন-মানসিকতার পরিচয় দেয়।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) **সময় ২ মিনিট**

রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদনসমূহ লিখুন

অনুশীলনী ২ (Activity 2) **সময় ২ মিনিট**

রাষ্ট্রের তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য লিখুন ঃ

১.

২.

www.swapno.in

সারাংশ

রাষ্ট্র হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি সরকারের অধীন সংগঠিত এমন এক জনগোষ্ঠী যারা স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার ও ক্ষমতা রাখে। রাষ্ট্রের চারটি মুখ্য উপাদান জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এ চারটি উপাদানের যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে তখন তাকে রাষ্ট্র বলা যাবে না। রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রতিটি নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করা, নিরাপত্তা রক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করা। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটি সরকার থাকে। সাধারণত সরকার গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক ধরনের হয়ে থাকে।

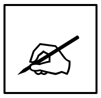

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান কয়টি?

ক) ২টি　　খ) ৩টি

গ) ৪টি　　ঘ) ৫টি

২। রাষ্ট্রের পরম লক্ষ্য কি?

ক) শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা

খ) মানব সভ্যতার অগ্রগতি সাধন

গ) আইন-প্রণয়ন

ঘ) বিচার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা

৩। কোন্ রাষ্ট্রর ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষিত হয়?

ক) সমাজতন্ত্র　　খ) গণতন্ত্র

গ) একনায়কতন্ত্র　　ঘ) রাজতন্ত্র

৪। গণতন্ত্রের মৌলিক অর্থ কি?

ক) স্বেচ্ছা চলাফেরা　　খ) সভা-সমিতি করা

গ) আইন অমান্য করা　　ঘ) বাক-স্বাধীনতা

www.swapno.in

www.swapno.in

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ তত্ত্ব

পাঠ ২

উদ্দেশ

এ পাঠ পড়ে আপনি

১. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
২. রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৩. রাষ্ট্রের বিবর্তনে ক্রিয়াশীল উপাদানসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তিতত্ত্ব

Theories of the Origin of the State

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে অনেক মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যে চারটি প্রধান মতবাদেরকথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয় সেগুলো হলো -

ক) রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি (Divine theory)
খ) রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগের প্রতক্ষ ফল (Force theory)
গ) রাষ্ট্র সামাজিক চুক্তির অনিবার্য পরিণতি (Social contract theory)
ঘ) রাষ্ট্র বিবর্তনে ধারায় উদ্ভুত (Evolutionary theory)

ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তার পরিচালনার জন্য তিনি তার নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগ

ক. রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি ঃ এ মতবাদে রাষ্ট্রকে ঈশ্বর সৃষ্টি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হয়। ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তার পরিচালনার জন্য তিনি তার নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। যেহেতু রাষ্ট্রের পরিচালক বা রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং যেহেতু রাজা ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন; সেহেতু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী জনগণের উচিত রাজার নির্দেশ মেনে চলা এবং রাজার কাছে অনুগত থাকা। **রাজার অবাধ্য হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া।** এ মতবাদ অনুসারে **রাজা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি - জনগণের প্রতিনিধি নন।**

রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগের প্রত্যক্ষফল-এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং শক্তি দ্বারাই রাষ্ট্রকে শাসন করা হয় এবং রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থেও শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন

রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি এ মতবাদকে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই অযৌক্তিক মনে করেন। কেননা, এ মতবাদ আধুনিক গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী এবং তা মূলত একনায়কতন্ত্রকেই উৎসাহিত করে। এ ধরনের ব্যাখ্যা স্বৈর শাসনের পক্ষে সমর্থন যোগায়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির পিছনে বল বা শক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

খ. রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ফল ঃ এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তির পিছনে রয়েছে শক্তির বিশেষ ভূমিকা। মানুষের অন্যতম প্রবৃত্তি হলো ক্ষমতা লিপ্সা এবং অন্যদের ওপর প্রভুত্ব তথা কর্তৃত্ব আরোপ। বশীভূত করে স্বীয় ক্ষমতাবলে সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিচালনার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই অংশ।

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রবিহীন আদিম সমাজে শক্তি প্রয়োগের কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ। যথা-

www.swapno.in

ক) সবল কর্তৃক দুর্বলের উপর অত্যাচার এবং দুর্বলকে বশীভূত ও অনুগত করার প্রয়াস।

খ) বংশ-প্রধান কর্তৃক স্বীয় বংশের সকলকে শাসনে রাখার প্রবণতা।

গ) গোত্রপতির নেতৃত্বে আন্তঃগোত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং এক গোত্র কর্তৃক অন্য গোত্রকে পদানত ও বশীভূত করার প্রয়াস।

ঘ) আন্তঃ উপজাতি যুদ্ধবিগ্রহ এবং একউপজাতি কর্তৃক অন্য উপজাতি পদানত কিংবা বশীভূত করার প্রয়াস।

বস্তুত 'রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রয়েছে 'শক্তি'- এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো বল প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, শক্তির দ্বারা রাষ্ট্র শাসিত হয় এবং রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শক্তির প্রয়োজন।

যেহেতু রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে শক্তি ছিল ক্রিয়াশীল এবং যেহেতু শক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন কার্যাবলী পরিচালিত হয় তাই আগামীতে রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

মানুষ আদিম যুগে প্রকৃতির রাজ্যে (state of nature) বাস করতো এবং প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতো। পরে বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

তবে যদিও রাষ্ট্রের উৎপত্তির পিছনে শক্তি কম-বেশি ক্রিয়াশীল থাকতে পারে তথাপি **শাসিতের সম্মতি ছাড়া শাসকের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়।** মূলত কেবল শক্তিই মানুষকে কোন বিশেষ রাষ্ট্র নায়কের অধিনে একত্রিত করতে পারে না। এর জন্য চাই জন সমর্থন অর্থাৎ **জনসমর্থনই রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি - শক্তি নয়।**

গ. সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঃ (Social contract theories) কয়েকজন সমাজচিন্তাবিদ (Hobbes, Locke and Rousseau) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব দিয়েছেন যেগুলোকে এক কথায় সামাজিক চুক্তি মতবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। হব্স, লক এবং রুশো সবাই মনে করেন যে, রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের চুক্তির মাধ্যমে। তবে কোন্ ধরনের চুক্তি হয়েছিল সেসব বিষয় নিয়ে হব্স, লক এবং রুশো অভিন্ন মত পোষণ করেন না। কিন্তু, তারা সকলই এ বিষয়ে বলেছেন যে মানুষ আদিম যুগে প্রকৃতির রাজ্যে (state of nature) বাস করতো এবং প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতো। পরে বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

হব্সের সামাজিক চুক্তি মতবাদ

হব্সের মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল সংঘাতময়। মানুষে মানুষে শত্রুতা ও হানাহানি লেগেই থাকত। তাঁর মতে মানুষের তখনকার জীবন ছিল Solitary, poor, nasty, brutish and short - "নিঃসঙ্গ, নি:স্ব, ঘৃণ্য, পাশব এবং সংক্ষিপ্ত"। এহেন সংঘাতময় পরিবেশ থেকে উত্তরণের জন্য সেখানকার মানুষ একটি চুক্তিতে আসে। চুক্তিটি ছিল এমন ঃ একদল লোক আরেকদলের কাছে গিয়ে বল্ল 'আমরা আমাদেরকে শাসন করার ক্ষমতা ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গের ওপর এই শর্তে অর্পণ করলাম যে তোমারাও তোমাদেরকে শাসন করার ক্ষমতা ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গের ওপর অর্পণ করবে'। এর ফলে তারা সবাই এক বা কতিপয় ব্যক্তির শাসনের অধীনে আসে এবং রাষ্ট্র গড়ে তোলে। উল্লেখ্য যে, যার বা যাদের ওপর শাসন

www.swapno.in

করার ক্ষমতা প্রদান করা হল - তিনি বা তারা চুক্তির বাইরে থাকলেন এবং এভাবে শাসক শাসন করার নিরংকুশ ক্ষমতা লাভ করে।

হব্‌স তাঁর **Leviathan** নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। আসলে ইংল্যান্ডে তখন ছিল রাজনৈতিক সংকট। হব্‌স সেই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সবাইকে রাজার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐ ধরণের একটা ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বাস্তবে এধরনের চুক্তি হয়েছিল কিনা সেটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না।

জন লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ

জন লকের মতে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ শান্তিতেই বসবাস করছিল। জীবন ছিল সুন্দর ও শান্তিময়। তবে তিনি বলেন প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যা এবং জীবনের নানাবিধ ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতে থাকে এবং এতে সমস্যা বাড়তে থাকে। এ সব সমস্যা দূর করতে এবং নিরপেক্ষ বিচার ত্বরান্বিত করতে প্রাকৃতিক রাজ্যের মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র গঠন করল। তারা একটি ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হল যে, দন্ড বা শাস্তি দেবার ক্ষমতা তাদেরই মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তির হাতে অর্পিত হবে, যিনি সর্বসম্মত আইন দ্বারা তা কার্যকর করবেন। এভাবে তারা প্রথমে নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করল যা civil society গঠনে ছিল সহায়ক। পরে তারা সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে সরকারও রাজনৈতিক সংস্থা তথা রাষ্ট্র গঠন করে। লক তার ঐ তত্ত্বকে Two Treatises on civil government” - শীর্ষক দু’টি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ

রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল সুখ-শান্তি আর আনন্দে পরিপূর্ণ। হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি কিছুই ছিলনা। মানুষ ছিল মহান হৃদয়ের অধিকারী, সাহসী ও দৃঢ় প্রত্যয়ী। কিন্তু তাদের সুখের দিন স্থায়ী হয়নি। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। প্রাকৃতিক সম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ঘটল। এতে কেউ কম, কেউ বেশি সম্পদের মালিক হল এবং সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হল। রেষা-রেষি দেখা দিল ও তারা ঈর্ষা পরায়ন হয়ে পড়ল। এতে শান্তি বিঘ্নিত হবার উপক্রম হল।

এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তারা পরস্পর মিলিত হয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্র গঠন করে। তার মতে চুক্তি ছিল এমনঃ “আমরা সবাই আমাদের সমগ্র ক্ষমতা একত্রিত করে **সাধারণ ইচ্ছা** (General will)-র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধীনে রাখতে অঙ্গীকার করি।” এভাবে তারা সমাজের ‘সাধারণ ইচ্ছার’ অধীনে রাষ্ট্র গঠন করে। ‘সাধারণ ইচ্ছা’ বলতে কি বোঝায় সেটা নিয়ে মতভেদ আছে। এটা সবার ইচ্ছা অথবা সমাজের মঙ্গলের জন্য হলে একজনের ইচ্ছাও সাধারণ ইচ্ছা হতে পারে। বস্তুত সর্বসম্মত ইচ্ছার অধীনে সমবেত হওয়া এবং সকলের মতামত নিয়ে পরিচালিত হবার মানসিকতাই রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করে। রুশোর এই তত্ত্ব তাঁর **Social contract** নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. বিবর্তনবাদী মতবাদ ঃ এই তত্ত্বের মূলকথা হলো রাষ্ট্র আকস্মিকভাবে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে উৎপত্তি লাভ করেনি। বরং সমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন উপাদানের ক্রিয়াশীল ভূমিকার ফলে মানব সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। তাই এই

www.swapno.in

তত্ত্বের আলোচনায় আমরা রাষ্ট্রের বিবর্তনে বিভিন্ন ক্রিয়াশীল উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করব।

রাষ্ট্রের বিবর্তনে ক্রিয়াশীল উপাদান সমূহ

Factors responsible for the evolution of State

রাষ্ট্র উৎপত্তির মূলে বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা স্বীকার করা হয়। যেমন - পরিবার ও জ্ঞাতি সম্পর্ক, ধর্ম, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এই উপাদানগুলো কিভাবে রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা পালন করে সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

ক) পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক (Family and Kinship) ঃ কয়েকজন নৃবিজ্ঞানীর মতে মাতৃপ্রধান পরিবারই আদি পরিবার। এ অবস্থায় উত্তরাধিকার মাতৃসূত্রীয় রূপ নেয় এবং রাজনৈতিক চেতনা মাতৃতন্ত্রেই প্রথম দেখা দেয়। পশুপালন সমাজের আবির্ভাবের সাথে পিতৃপ্রধান পরিবার তথা পিতৃসূত্রীয় উত্তরাধিকারের সূত্রপাত ঘটে। এ সময় সমাজের বয়স্ক পুরুষের হাতে নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। পিতৃপ্রধান পরিবার পিতা, তার স্ত্রী, অবিবাহিত মেয়ে, পুরুষ সন্তান ও তাদের স্ত্রী পরিবারবর্গসহ দাস-দাসী ও সম্পত্তি নিয়ে গঠিত। পিতার কর্তৃত্ব ছিল নিরংকুশ। পিতার অনুদান ও অনুকম্পা ছাড়া সন্তান-সন্ততিদের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। আধুনিক রাষ্ট্রের আইন যেসব ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে তা আদিম যুগে পরিবার প্রধানই করে থাকত এবং পরিবারের যে কোন সদস্যের ভুল বা অপরাধের জন্য পরিবার প্রধানই সমাজের কাছে দায়ী থাকতেন।

বস্তুত, **নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক চেতনা পিতৃপ্রধান পরিবারেই লক্ষ করা যায়।** রোমান পিতা পরিবার ও কৌম প্রধান হিসাবে নগর রাষ্ট্রে আইনগত কর্তৃত্ব লাভ করত এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে তাঁর অনুমতি নেওয়া হতো।

তিনি কেবল পরিবার প্রধানই নন, ধর্মীয় নেতা এবং শাসকও বটে। পরিবারের পক্ষে তিনি পূজা দিতেন। তিনিই শাসক এবং আইনগত পরিবার প্রতিনিধি। তিনি নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি তার সন্তানদের শাস্তি দিতে পারতেন; ত্যাগ, বিক্রি এবং অন্য যেকোনভাবে হস্তান্তর করতে পারতেন। এমন কি, জন্মের মুহূর্তে হত্যাও করতে পারতেন।

জ্ঞাতিসম্পর্ক রাজনৈতিক জীবনের সংহতি বিধানে সহায়ক ছিল। কৌম বা গোষ্ঠী প্রধান গোলযোগ মিটাতে পরিবার প্রধানের ভূমিকাই পালন করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি পরিবার ও কৌম প্রধানের দায়িত্ব পালন করতেন।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (Maciver) মনে করেন যে, **পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি করেছে।** তার মতে পরিবারই মানব সমাজে যৌন জীবনের ওপর প্রথম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করে। পরিবার যৌন জীবন, সম্পত্তি ও তারুণ্যপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা লক্ষ করলে বুঝা যাবে কেন সর্বত্রই **পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্রের সূতিকাগার।** তিনি বলেন, "The existence of the family requires the regulation of sex, the regulation of property, and the regulation of the youth. If we briefly examine what is involved in those types of regulation we shall see why the family is everwhere the

www.swapno.in

matrix of government." (The Web of **Government**. N. Y. 1949).

খ) ধর্ম (Religion) ঃ ধর্ম, 'আদিম' গোষ্ঠী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। আদিবাসীরা প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা, জন্ম, মৃত্যু, ঘুম, স্বপ্ন, ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে ভেবে কোন সদুত্তর পায়নি। নৃবিজ্ঞানীদের মতে এসব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা নানা ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও পূজা পার্বণের সৃষ্টি করে। তাঁদের মতে অনেক কৌমের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান ছিল। কৌম বা গোত্রপতি নিজে অথবা অন্যকে দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতেন। এভাবে ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি জনগণ শ্রদ্ধাশীল হতে থাকে এবং তা রাজনৈতিক সংগঠনের সংহতি রক্ষায় আনুগত্যের সৃষ্টি করে। কৌম বা গোত্রপতির আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদি অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করা। শুধু 'আদিম' সমাজ কেন, মধ্যযুগেও অনেক রাজাই ঈশ্বর মনোনীত বলে দাবি করে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও তার সংহতি বিধান করেন বলে জানা যায়। জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধন ভুলে গেলে বা তা জাতীয়তাবাদের রূপ নিলেও **সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাস জনগণকে একত্রিত করতে, রাজবংশ টিকিয়ে রাখতে এবং রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।**

গ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (Economic Activities) ঃ আদিতে জ্ঞাতিসম্পর্ক ও ধর্মীয় বন্ধন সংঘবদ্ধ জীবন ও নেতৃত্বের সৃষ্টি করে এতে সন্দেহ নেই। সহযোগিতা, যোগাযোগ রক্ষা বা সমিতি গঠন ছাড়া মানুষ বসবাস করতে পারে না। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে জ্ঞাতিসম্পর্ক ও ধর্মীয় বন্ধন ছাড়া কিছু প্রথা ও নিয়ম-কানুন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পশু পালন ও কৃষি আবিষ্কারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও সম্পদ-সম্পত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে, সম্পদের উত্তরাধিকার নীতি, শ্রমবিভাগ ও সামাজিক শ্রেণীসমূহের সৃষ্টি হয়। **ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও তাকে ঘিরে উত্তরাধিকার আইন, বন্টন রীতি, জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা ইত্যাদি গোত্রপতির রাজনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষাণাবেক্ষণ ও তাকে ঘিরে যেসব অধিকার, কর্তব্য ও দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হয় তা মীমাংসার জন্যই রাষ্ট্র-যন্ত্রের উদ্ভব।** এভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রীয় চেতনা, আইন ও নেতৃত্বের ধারণা গড়ে উঠে তা রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলে কাজ করে।

ঘ) যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত (War, Conflict and Contradiction) ঃ পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক, ধর্ম ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নির্ভর সামাজিক সংগঠনগুলো মানুষের স্থানান্তর-গমন ও যুদ্ধ জয়ের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ রাজনৈতিক মর্যাদা পায়। **যুদ্ধ ও অবদমনের ফলে বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি হয় এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের স্থলে এলাকাভিত্তিক ঐক্য-অনুভূতি প্রবল হতে থাকে।** পিতৃপ্রধান পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব বংশ পরম্পরায় চলত এবং তা ছিল জন্মগত অধিকার। কিন্তু, এলাকাভিত্তিক কৌম বা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে কৌম সদস্য কর্তৃক 'নেতা' নির্বাচিত হতো। নির্বাচিত কৌম-প্রধান বা গোষ্ঠীপতি ধর্ম, যুদ্ধ ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদির 'নেতৃত্ব' দিতেন। এভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রসার ঘটে এবং তা ক্রমে অন্যান্য সংঘ-সমিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সেগুলোর আনুগত্য আদায় করতে সক্ষম হয়।

www.swapno.in

রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ

বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে রাষ্ট্র উদ্ভুত হয়েছে। এসব পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সহযোগিতা (Conflict & Cooperation) বিভিন্নভাবে কার্যকর ছিল। এ প্রসঙ্গে এখানে কয়েকজন চিন্তাবিদের মতবাদ উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ওয়াল্টার বেজহট (Walter Bagehot) তাঁর **Physics and Politics** নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

(১) প্রথা ও রীতি-নীতি নির্ভর যুগ-সমাজ; বস্তুত এখানে কোন সরকারের অস্তিত্ব ছিল না।

(২) প্রথা ও লোকাচার নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে ‘দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যুগ’ যা একদল অন্য দলসমূহকে পদানত করে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটায়।

(৩) আলাপ-আলোচনা ও আপোস নিস্পত্তির যুগ, যা রাজনৈতিক জীবনের উচ্চতর পর্যায়ের সূচনা করে।

হার্বাট স্পেন্সার (Herbert Spencer) তাঁর **Principles of Sociology** গ্রন্থে অনেকটা অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। স্পেন্সার প্রদত্ত রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত যুগগুলো হলো-

(ক) সরকারবিহীন অসংগঠিত কৌম জীবন,

(খ) সামরিক যুগ– দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং বংশ পরস্পরায় রাজতন্ত্রের যুগ; এবং

(গ) শ্রমশিল্পের যুগ, এ পর্যায়ে সামরিক কার্যকলাপের স্থলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রভাব বেশি কার্যকর হয়।

চতুর্দশ শতকে আরবের বিখ্যাত সমাজ দার্শনিক ইবনে খালদুন তাঁর **‘আল-মুকাদ্দিমায়’** পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, কৃষি নির্ভর স্থায়ী বাসিন্দাদেরকে পদানত করে যাযাবরেরা ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টির পক্ষে ইটালীয় রাষ্ট্র দার্শনিক ম্যাকিয়াভেলীও (Machiavelli) অভিন্ন মত প্রকাশ করতেন। ফরাসী চিন্তাবিদ জঁ বোঁদাও (Jean Bodin) এ ধরনের মত পোষণ করেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় মার্কসও (Marx) অনেকটা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের তত্ত্বের আশ্রয় নেন। তাঁর মতে সুবিধাভোগী অর্থনৈতিক শ্রেণী সাধারণ জনগণকে শোষণ করার নিমিত্ত রাষ্ট্র নামক যন্ত্রের উদ্ভাবন করে। রাষ্ট্র হচ্ছে শাসক তথা শোষক শ্রেণীর **হাতিয়ার**। লুডউইগ গামবিজপ্লোবিজ (Ludwig Gumplowse) একজন খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী। তিনি, **Struggle Among Races, Race and State, The Sociological Concept of the State, Outline of Sociology** ইত্যাদি গ্রন্থে রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে ‘আদিম’ সমাজের জনগোষ্ঠী জ্ঞাতিসম্পর্কের বন্ধনে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছিল। ক্রমে এক সময়ে স্বার্থ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে বিজয়ীরা পরাজিতদেরকে হত্যা করে ফেলত। পরে তাদেকে দাসে পরিণত করার প্রথা চালু হয়। সমাজে এভাবে শাসক ও শোষিতের সৃষ্টি হয়। শাসক শ্রেণী আইন-কানুনের সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন নরগোষ্ঠীকে একত্রিত করে শাসনব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে সচেষ্ট হয়। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে

> মার্কসের (Marx) মতে সুবিধাভোগী অর্থনৈতিক শ্রেণী সাধারণ জনগণকে শোষণ করার নিমিত্তে রাষ্ট্র নামক যন্ত্রের উদ্ভাবন করে।

www.swapno.in

চলতে থাকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থ। তবে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জনের প্রবণতা কম ছিল না। সে যা হোক, সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত কম ভূমিকা পালন করেনি। গামপ্লোভিজের তত্ত্বকে সমাজবিজ্ঞানীরা বেশ গুরুত্ব দেন। তবে তিনি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমিরেকান সমাজবিজ্ঞানী ওয়ার্ড (Lester F. Ward) এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন এবং বলেন যে, **রাষ্ট্র-সৃষ্টির শুরুতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ক্রিয়াশীল থাকলেও পরবর্তীকালে সহযোগিতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।**

নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক চেতনা ও নেতৃত্বের ধারণা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটায়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক মতবাদ

(Anthropological theories regarding the origin of state)

নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে হয় রাজনৈতিক চেতনা ও নেতৃত্বের ধারণা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটায়। অতি 'আদিম' যূথবদ্ধ (Horde life) জীবনে প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃত্বের অস্তিত্ব কোন ছিল না। কারণ যূথবদ্ধভাবে বসবাস করার তাড়না মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অনিবার্য ফল। কিন্তু যূথ জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে একসময় প্রয়োজনের তাগিদেই দলপতি ও নেতার আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক চেতনা। রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে দলপতিও রাজনৈতিক চেতনার আবির্ভাব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিম্নে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানীর প্রদত্ত নৃতাত্ত্বিক মতবাদ আলোচিত হলো।

মর্গান মনে করেন যে, সামাজিক সংগঠন থেকে রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তর অনিবার্য হয়ে পড়ে তখন পশু গৃহপালিতকরণ ও কৃষি এমন পর্যায়ে পৌছে যা নগরজীবনে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে সহায়ক হয় এবং এ পর্যায়েই মানব সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে।

মর্গানের মতবাদ

(Morgan's theory)

মর্গানের মতে মানব সমাজের প্রথম পর্যায়ের সংগঠনগুলো ছিল সামাজিক বা অরাজনৈতিক। এবং এসব ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, অঞ্চলভিত্তিক নয়। জৈবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মানব সমাজ গড়ে যেখানে পরে তা ধাপে ধাপে রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ ঘটে। জৈবিক সম্পর্কভিত্তিক উক্ত সংগঠনের বিলুপ্তি না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মর্গান মনে করেন যে, যখন **সামাজিক সংগঠন থেকে রাজনৈতিক সংগঠনে রূপান্তর অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন পশু গৃহপালিতকরণ ও কৃষি এমন পর্যায়ে পৌছে যা নগরজীবনে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে সহায়ক হয় এবং এ পর্যায়েই মানব সমাজকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ**

কৌম-জীবন যখন মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয় তখন নগর ও রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। আর এই নগরভিত্তিক রাষ্ট্রীয় জীবন গৃহপালিত পশু, কৃষি, ব্যবসা-পণ্যদ্রব্য, গৃহ ও জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ইত্যাদির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

লোঈর মতবাদ

(Lowie's theory)

নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব পণ্ডিত রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন তাদের মধ্যে লোঈর (Lowie) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোঈ

www.swapno.in

তাঁর **The Origin of the State** নামক গ্রন্থে 'আদিম' সমাজে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ঃ আদিম সমাজ কি এমনভাবে সংগঠিত যাকে 'রাষ্ট্র' বা এমনি কোন নামে আখ্যায়িত করা যায়?

লোঈর মতে, লিখিত ভাষার পূর্বে যেমন সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল; আদর্শ ও স্থায়ী একক বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের (Monogamian family) আগে যেমন পরিবারের অস্তিত্ব ছিল; তেমনি আধুনিক রাষ্ট্রের পূর্বেও রাজনৈতিক সংগঠনের মতো সমাজ তথা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। তার কথায় সামান্য হোক না কেন 'আদিম' সমাজে রাজনৈতিক চেতনা বিদ্যমান ছিল।

লোঈর ধারণায় এটা লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রীয় চেতনা, নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (হোক সে যত ক্ষুদ্র) মানব সমাজের শুরুতেই বিদ্যমান ছিল এবং তাই রাষ্ট্রকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যে, 'আদিম' সমাজের ঐ বৈশিষ্ট্যই রাষ্ট্র নামক সংস্থা সনাক্ত করা যায়। আর সে বৈশিষ্ট্য এত নগণ্য হবে কেন? সেখানে জনসংখ্যা, আঞ্চলিক সীমারেখার ধারণা; নেতা ও বয়স্কদের পরিষদ ও এক ধরনের সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্ব ছিল। লোঈ তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে বলেন যে, 'আদিম' সমাজে সব রাজনৈতিক কার্যকলাপের বীজ নিহিত ছিল। তদুপরি, 'আদিম' রাষ্ট্রীয় সংগঠন শুধু রক্তের ভিত্তিতে নয় আঞ্চলিকতার ধারণার ওপরও প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঐ 'আদিম' জনগোষ্ঠীর কৌম-সমাজগুলো আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় পড়ে না। সেগুলোকে ভিন্ন সংজ্ঞার আলোকে বিচার করতে হবে। লোঈ তার ওপরই গুরুত্ব দিয়েছেন।

লোঈ তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে বলেন যে, 'আদিম' সমাজে সব রাজনৈতিক কার্যকলাপের বীজ নিহিত ছিল। তদুপরি, 'আদিম' রাষ্ট্রীয় সংগঠন শুধু রক্তের ভিত্তিতে নয়, আঞ্চলিকতার ধারণার ওপরও প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ফ্রীডের তত্ত্ব

(Fried's theory)

সরকার ও রাষ্ট্র উৎপত্তি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী ফ্রীডের (M. H. Fried) তত্ত্ব অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফ্রীড মূলত দ্বান্দ্বিক মতবাদের ভিত্তিতেই তাঁর তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন।

ফ্রীডের মতে সামাজিক সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধার অসম অধিকার (unequal access) হচ্ছে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বশর্ত। সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধায় যাদের বেশি মাত্রায় এই অধিকার রয়েছে তাদেরকে সে অধিকার রক্ষা করতে হয়। আর এটা করতে হলে তাদের শক্তি বা ক্ষমতার ব্যবহার জরুরী হয় এবং একটি কেন্দ্রীয় সরকারী ব্যবস্থাপনায় সমাজের সম্পদে বিভিন্ন শ্রেণীর অসম অধিকারের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় যারা উদ্যোগী হন তারা মূলত একটি শাসক-এলিটে পরিণত হন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং স্থায়িত্বের জন্য চাই সামাজিক স্তরবিন্যাস বা শ্রেণী বৈষম্য। এই শ্রেণী বৈষম্য রক্ষার্থে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অবশ্যম্ভাবী।

ফ্রীড সমাজের আদিম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নাম দেন Pristine state বলে, যা ছিল স্থানীয় প্রথা-নির্ভর। একে বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ের রাষ্ট্র বলা যায়, যা মূলত এশিয়া, আফ্রিকা ও পশ্চিম গোলার্ধের দুই একটি স্থানে নদীর অববাহিকায় কৃষি সভ্যতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়। ফ্রীডের মতে প্রাথমিক রাষ্ট্রগুলো (Pristine state) স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অকৃত্রিমভাবে গড়ে উঠে। এগুলো ছাড়া অন্যত্র যেসব রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় তাকে তিনি নাম দেন Secondary state থাকে বাংলায় বলা যায় মধ্যম মাত্রার রাষ্ট্র।

www.swapno.in

সামাজিক স্তরবিন্যাস ও রাষ্ট্রের বিবর্তনে ফ্রীড কয়েকটি পর্যায় নির্দেশ করেন। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. স্তরবিহীন সমাজ (Non-rank or nonstratified society) ঃ এ সমাজ সমতাভিত্তিক সমাজ (egalitarian)। এ সমাজে তেমন শ্রমবিভাগ ছিল না। সবাই মিলে সব কাজই করতো। মুদ্রা অর্থনীতি ছিল না। লেনদেন ছিল জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্ষমতার পুনর্বন্টন (power redistribution) ব্যবস্থা দেখা যায় পরিবারের বয়স্কা মহিলার মধ্যে যিনি পরিবারের সকলের মধ্যে খাদ্য বন্টন ও পরিবেশন করেন। কেননা বাইরে থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে আনার পর মহিলারাই তা রান্না করে পরিবারের সব সদস্যের মধ্যে বন্টন ও পরিবেশন করেন। এভাবে সম্পদ ও সুযোগ বন্টন করার ক্ষমতার সূত্রপাত ঘটে।

২. মর্যাদাযুক্ত-সমাজ (Rank society) ঃ এ পর্যায়ে সত্যিকারের সমতাভিত্তিক সমাজের বিলুপ্তি ঘটে। জন্ম ও বংশমর্যাদার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। জ্যেষ্ঠপুত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। স্তর বিহীন সমাজে তাৎক্ষণিক পারস্পরিক লেনদেন ব্যবস্থা চালু ছিল। দান, উপহার, উপঢৌকন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আর মর্যাদাযুক্ত কর্মকে পুনর্বন্টন রীতি চালু হয়। পুনর্বন্টন বলতে সমাজের গচ্ছিত ধন বা সামাজিক সম্পদ বন্টন ব্যবস্থাকে বুঝায় যার ক্ষমতা কারো না কারো হাতে ন্যস্ত থাকে। বন্টনকারী ব্যক্তি মূলত এক ধরনের **ক্ষমতা** অর্জন করে এবং নেতৃত্ব দেয়।

৩. স্তরায়িত সমাজ (Stratified Society) ঃ এ সমাজে কর্তৃত্ব জ্ঞাতিগোষ্ঠী ব্যতীত এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শ্রম ও শ্রেণী বিভাগের বিকাশ ঘটে। অন্য সমাজের ওপর প্রাধান্য আরোপের প্রচেষ্টা শুরু হয়।

৪. রাষ্ট্র-সমাজ (State-Society) ঃ স্তরায়িত সমাজে যখন রাজনৈতিক সংগঠন আনুষ্ঠানিক রূপ নেয় তখনই রাষ্ট্র-সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ের আদি রাষ্ট্রের কর্তব্য ছিল ঃ জনসংখ্যার মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা, রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণ, বিচার কাজ, সার্বভৌম ক্ষমতা রক্ষা, অর্থনৈতিক কাজ তথা রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন।

গর্ডন চাইল্ডের মতবাদ

Childe's theory

বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ড (V. Gordon Childe) নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর তত্ত্ব অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চাইল্ড **নগর-বিপ্লবকে** (Urban Revolution) সভ্যতার স্বর্ণ-স্বাক্ষর (hall mark) হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে 'আদিম' সমাজে যখনই কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয় তখন সমাজে এমন একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যারা কৃষি কাজ না করেও ঐ উদ্বৃত্ত ফসলের ওপর নির্ভর করে আরাম-আয়াশে জীবন কাটাতে পারে, অথবা অকৃষি পেশা গ্রহণ করতে পারে। এরাই বস্তুত, সে যুগের অনুৎপাদক (Non-Producing) সামরিক-যোদ্ধা, রাজনৈতিক আমলা, শিল্পী, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী। কৃষিতে উদ্বৃত্ত ফসল জন্মায়। ফলে ঐ শ্রেণীগুলোকে আর কৃষিকাজে অংশ নিতে হয় না। চাইল্ডের মতে এই অনুৎপাদক শ্রেণীগুলোই সমাজ, সংস্কৃতি, নগর রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়ে ভাবতে অবকাশ পায়। তাঁর মতে এরাই রাষ্ট্রীয়

www.swapno.in

সংগঠনের অভ্যুদয় ঘটিয়ে তখনকার সামাজিক কাঠামো তথা স্তরবিন্যাস রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, চাইল্ডের এ তত্ত্বটি মার্কসবাদের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বের সংগে সম্পর্কযুক্ত। কেননা, চাইল্ডের মতে উদ্বৃত্ত ফসলের ওপর নির্ভরশীল অনুৎপাদক সামাজিক শ্রেণীই রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোয় অসম শ্রেণীর অবস্থানকে রক্ষা করতে তৎপর হয়।

সারভিসের মতবাদ

(Service's theory)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে দ্বন্দ্বমূলক মতবাদ বিরোধী এক ধরনের তত্ত্বের কথা জানা যায়, যাকে **সমন্বিত তত্ত্ব** (Integrative theory) নামে আখ্যায়িত করা যায়। নৃবিজ্ঞানী সারভিস (E. R. Service) দ্বন্দ্ববিরোধী এক ধরনের সমন্বিত মতবাদই প্রদান করেছেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাষ্ট্র হচ্ছে জ্ঞাতিসম্পর্ক ভিত্তিক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর তুলনায় বৃহদায়তন সংগঠন, যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে সমন্বয় সাধন(Integration)। কেননা, ব্যক্তি, শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ছাড়া রাষ্ট্রীয় সংগঠন অসম্ভব।

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বের মূলকথা হলো অবদমনের মাধ্যমে শক্তিশালী শাসক দল অন্যদের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে। পক্ষান্তরে, সমন্বয় তত্ত্বের মূল কথা হলো অবদমন নয়, বরং পারস্পরিক সমন্বয় সাধন ও সবার মঙ্গল কামনার্থে রাষ্ট্র কাজ করবে।

সারভিস কর্তৃক প্রদত্ত **সমন্বয় তত্ত্বে** বলা হয়েছে যে, **সরকার জনকল্যাণে এমন সব কাজ করে যার ফলে জনগণ সরকারের ক্ষমতাকে বৈধ বলে মেনে নেয়।** কেননা, কোন রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সরকার বা নেতৃবৃন্দ তাদের সংগঠনভুক্ত জনগণকে রক্ষা করে এবং নিরাপত্তা বিধান করে। জনগণের মধ্যে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি বা বিবাদ-বিসম্বাদের সুবিচারের নিশ্চয়তা দেয়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করে।

সারভিসের মতে রাষ্ট্র ভালো কিংবা মন্দ নয়। এটা একটা স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠার। ইহা মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট একটি ব্যবস্থা। রাষ্ট্র তার কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে জনগণের কাছে তার আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে। আর তাই, রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থে জনগণের এমন সমর্থন চায় যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বা নেতৃত্ব অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারে।

www.swapno.in

অনুশীলনী ১ (Activity 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

রাষ্ট্রের বিবর্তনে ক্রিয়াশীল উপাদানের নাম লিখুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

অনুশীলনী ২ (Activity 2) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

"রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় রাজনৈতিক চেতনা ও নেতৃত্বের ধারণা থেকে" - এউক্তিটি অনূর্ধ ৭০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

www.swapno.in

সারাংশ

রষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদ দিয়েছেন। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দেওয়া মতবাদসমূহের মধ্যে ঈশ্বরের সৃষ্ট মতবাদ, শক্তি-প্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ, বিবর্তনবাদী মতবাদই উল্লেখ্যযোগ্য। সমাজবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব মতবাদ উল্লেখ যোগ্য সেগুলো হল মর্গানের মতবাদ, লোঈর মতবাদ, ফ্রীডের মতবাদ ইত্যাদি। তবে রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির যেসব উপাদান সমূহ সম্বন্ধে অভিন্ন মত পোষণ করেন। সেগুলো হলঃ পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক, নেতৃত্ব, রাজনৈতিক চেতনা, ধর্ম, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি। তবে হঠাৎ করে কোন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়নি। আজকের দিনের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা সুদীর্ঘ

www.swapno.in

কয়েক হাজার বছরের ফসল। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যুগে প্রথা ও লোকাচার নিয়ে একদল অন্য দলসমূহকে পদানত করে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি রাষ্ট্রের বিবর্তনের ক্রিয়াশীল উপাদান।

ক) জ্ঞাতি সম্পর্ক　　খ) সামাজিক সম্পর্ক

গ) জৈবিক সম্পর্ক　　ঘ) সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

২। "আকস্মিকভাবে রাষ্ট্র উৎপত্তি হতে পারে না" - এটি কোন মতবাদের মূল কথা

ক) সামাজিক চুক্তি মতবাদ　　খ) হবসের মতবাদ

গ) লোঈর মতবাদ　　ঘ) বিবর্তনবাদী মতবাদ

৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কার্ল মার্কস কোন তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

ক) বিবর্তনবাদী তত্ত্ব　　খ) হব্সের তত্ত্ব

গ) দ্বন্দ্ব-সংঘাতমূলক তত্ত্ব　　ঘ) সামাজিক চুক্তি তত্ত্ব

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

১. রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসমূহ জানতে পারবেন।

২. রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক ও মৌলিক পার্থক্য সমূহ জানতে পারবেন।

সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র সমার্থক নয়। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়। তবে এই প্রত্যয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও বিদ্যমান। নিম্নে আমরা **রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকার** এবং **রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের** পার্থক্য ও সম্পর্ক আলোচনা করব।

রাষ্ট্র এবং সরকার

অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সরকার ও রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়।

(১) রাষ্ট্র ও সরকার এক নয়। রাষ্ট্র যে চারটি বৈশিষ্ট্য বা উপাদান (যেমন - জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা) নিয়ে গঠিত সরকার হলো তার একটি উপাদান মাত্র। রাষ্ট্রের প্রতীক, পরিচালক, বা প্রতিনিধি হলো সরকার। সরকার রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গগুলোর একটি অঙ্গ মাত্র।

(২) রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারের উত্থান-পতন সম্ভব। এক সরকার ক্ষমতায় আসে, অন্য সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে বিদায় নেয়। অত্রএব সরকারের পালাবদল একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কোন বিশেষ সরকারের পতনের অর্থ রাষ্ট্রের পতন নয়। কোন সরকারের পতন হলে অন্য সরকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ সরকার ক্ষণস্থায়ী। আর রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

(৩) রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ যুক্তিপূর্ণ এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে এবং প্রয়োজনে সরকারের কাজ কর্ম বা নীতিমালার বিরোধিতা করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটাই অন্যতম বিধান। তবে কোন নাগরিকই রাষ্ট্রের সমালোচনা করে না বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না। এমনটি করলে সে হবে রাষ্ট্রদ্রোহী, যার জন্য রাষ্ট্রে চরম শাস্তির বিধান রয়েছে। অতএব, গণতান্ত্রিক সমাজে সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ না হলেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারণ করা সব সমাজেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(৪) রাষ্ট্র হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংঘ, সরকার হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কিংবা নির্বাহী সংস্থা। সরকারই রাষ্ট্রনীতি স্থির করে এবং সরকারই জনগণের সাহায্যে তা বাস্তবায়িত করে।

(৫) আমরা সবাই রাষ্ট্রের নাগরিক, সরকারের নয়। সরকার সমর্থক দল এবং সরকার বিরোধীদল থাকতে পারে। তবে তারা সবাই রাষ্ট্রের নাগরিক।

(৬) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। একটি অন্যটির পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব অকল্পনীয়।

রাষ্ট্র ও সমাজ

www.swapno.in

আদিম সমাজে আজকের মত রাষ্ট্র ছিলনা। দাস সমাজে রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল অভিন্ন। এ দুটোকে আলাদা করে বিবেচনা করা হতনা। যেমন - প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্র (city state) গুলো ছিল একাধারে সমাজ ও রাষ্ট্র। একারণেই গ্রীক দার্শনিক, যেমন প্লেটো, এরিষ্টটল - সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করেন নি। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও আধুনিক কালে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১) সময়ের দিক থেকে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের অনেক আগেই সমাজের জন্ম। মানব সভ্যতার শৈশবাবস্থায় সমাজ থাকলেও রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। পরবর্তী কালে মানুষ তার নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতে রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটায়।

২) সমাজের বৃহত্তর পরিমন্ডলেই রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। সমাজের অনেক সংঘ, সমিতি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রাষ্ট্র সেসব সংস্থার মধ্যে একটি। এক কথায় রাষ্ট্র হলো সমাজের একটি অংশ মাত্র।

৩) রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। এর সীমানা সুনির্দিষ্ট। সমাজের প্রাকৃতিক সীমারেখা তথ্য ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা থাকলেও রাষ্ট্রের মতো, এতটা সুস্পষ্ট নয়। যেমন, পুঁজিবাদী সমাজ বললে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানাকে অতিক্রম করে।

৪) সমাজের তুলনায় রাষ্ট্র অধিকতর সুসংগঠিত। কেননা, রাষ্ট্র হলো একটি রাজনৈতিক সংস্থা, যা সমাজের সমর্থন পুষ্ট হয়ে একটি শক্তিশালী সরকার দ্বারা পরিচালিত। এদিক থেকে সমাজ তেমন সুসংগঠিত বা আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের মতো তত শক্তিশালী নয়।

৫) জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরি আইন ও শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় পক্ষান্তরে, সমাজ প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি ও ও রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে সমাজের কোন শাসনতন্ত্র নেই। আইন ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করলে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী তার বিচার হয়।

৬) রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ আছে, যেমন- আইন প্রণয়ন বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ ও বিচার বিভাগ। সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে উঠে। তাই তা মূল্যবোধ, প্রথা - ও আচার-বিশ্বাস ভিত্তিক। রাষ্ট্রের মত এর কোন আনুষ্ঠানিক আইন, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগ নেই।

যদিও সমাজ ও রাষ্ট্র এক নয় তবু সমাজ ও রাষ্ট্র একে অপরের পরিপূরক। সমাজ থেকেই রাষ্ট্রের জন্ম। সমাজে বসবাসরত মানুষের সমর্থন নিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার একটা বৈধ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাই, রাষ্ট্রকে সমাজের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্যই জনকল্যাণ তথা সমাজ কল্যাণ। এলক্ষ্যে প্রায় সব রাষ্ট্রেই সমাজ কল্যাণ বা সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্বে একটা পৃথক **মন্ত্রণালয়** থাকে।

অপরপক্ষে এটাও ঠিক যে, যেহেতু রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য জনকল্যাণ বা সমাজ কল্যাণ - সেহেতু সমাজও রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে সমর্থন যোগায় এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এ দুয়ের সহযোগিতায় মানুষ তার সামাজিক,

www.swapno.in

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। এ দুয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটলে সামাজিক অশান্তি ও অস্থিরতা দেখা দেয়।

অনুশীলনী ১ (Activity ১) **৩ মিনিট**

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলনী ২ (Activity ২)

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য নির্দেশ করুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে (Ö) টিক দিন

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদ দিয়েছেন

ক) সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিষ্টটল।
খ) হব্স, লক এবং রুশো।
গ) মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিন।
ঘ) লোলন, এঙ্গোলস, রুশো

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং স্থায়িত্বের জন্য চাই সামাজিক স্তরবিন্যাস বা শ্রেণী-বৈষম্য-কথাটি কে বলেছেন ?

ক) ফ্রিড
খ) মর্গান
গ) লোঈ
ঘ) ম্যাকাইভার

৩। পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্রের সূতিকাগার - কথাটি কে বলেছেন ?

ক) ফ্রয়েড
খ) গেটেল

www.swapno.in

গ) ম্যাকাইভার
ঘ) লোঈ

৪। ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বই অধিক - এ ধারণা কারা পোষণ করেন ?
ক) ইটালীর ফ্যাসিস্ট এবং জার্মানীর নাৎসীবাদীরা
খ) মার্কস, এঙ্গেলাস এবং সাম্যবাদীরা
গ) নৈরাজ্যবাদী এবং আন্তার্জাতিকতাবাদীরা
ঘ) পরিবেশবাদীরা

৫। যে সব কাজ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য খুবই জরুরী সেগুলো হলো -
ক) রাষ্ট্রের গৌণ কাজ
খ) মুখ্য কাজ
গ) সোসালিসটিক কাজ
ঘ) সাধারণ কাজ

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিন। রাষ্ট্রের উপাদান ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২। রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায় ? রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি আলোচনা করুন।
৪। রাষ্ট্রের বিবর্তনে ক্রিয়াশীল উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
৫। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মর্গান এবং ফ্রিডের তত্ত্ব আলোচনা করুন।
৬। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিন। রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।
৭। রাষ্ট্র কি ? রাষ্ট্র ও সরকার কি এক ? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন উত্তরমালা

পাঠ ১ ঃ (১) গ, (২) খ, (৩) খ, (৪) ঘ
পাঠ ২ ঃ (১) ক, (২) ঘ, (৩) গ,
পাঠ ৩ ঃ (১) খ, (২) ক, (৩) গ, (৪) ক

www.swapno.in

সংস্কৃতি

ইউনিট ১০

ভূমিকা ঃ

সংস্কৃতির ইংরেজি হলো কালচার(Culture)। বাংলায় সংস্কৃতিকে কৃষ্টি বলা হয়। কৃষ্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্ষণ বা চাষ। তাহলে সংস্কৃতির অর্থ কি? এই প্রশ্ন করার সাথে সাথেই একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। তার অর্থ মানুষ হিসাবে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতি; মানুষ এই সংস্কৃতি এবং কাজের জন্যই মানুষ হয়েছে, প্রকৃতির নিয়মও বুঝে উঠছে, বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করছে। যে কোন প্রাণীরই জীবনের মূল লক্ষ্য বেঁচে থাকা। মানুষ এইজন্য চায় নিজের পরিবেশের সঙ্গে বোঝা- পড়া করে টিকে থাকতে। অর্থাৎ মানুষ চায়, যতটা সম্ভব প্রকৃতির নিকট থেকে বেঁচে থাকার উপায় আয়ত্ত করতে। এরই নাম জীবিকার সন্ধান। তাহলে বলা যায় যে, মানুষের সংস্কৃতির মূল মর্মবস্তু হচ্ছে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি অর্থাৎ জীবিকার উপায় আয়ত্ত করা এবং তা সহজসাধ্য করা। বস্তুত দৈহিক ও মানসিক প্রয়াস- গুণে মানুষ এই জীবিকা ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করেছে। এই জীবিকা আয়ত্ত করতে মানুষের পরিশ্রম করতে হয়েছে। মূলত, এই পরিশ্রমের ফলেই মানুষ অন্য জীব থেকে উন্নত হয়েছে, স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে; পরিণামে সংস্কৃতিক ও সভ্যতার এক একটি উপাদান সৃষ্টি করেছে। তাই এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, সংস্কৃতির ভিত্তিমূল দুটি। যথা-

১। জীবিকা প্রয়াস;

২। শ্রমশক্তি

মূলত, সংস্কৃতি এমন একটা রূপ যা শুধু জীবন-সম্পৃক্ত হলেই তার স্বরূপ প্রকাশ পায় না, জীবন চর্চার মধ্যে এমন গুণ, যার জন্য সাধনার প্রয়োজন, যা তার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও উপলব্ধিযোগ্য করে তোলে। মানুষের মননশক্তি, চিন্তাশক্তি ও সৃজনশক্তির গুণেই মানব সংস্কৃতি বিকশিত করেছে। প্রাণীর ধর্মই হচ্ছে আত্মপ্রকাশ ও ক্রমবিকাশ। পশুপাখি, কীট পতঙ্গ, উদ্ভিদের মত মানুষ শুধু বেঁচে থাকে না, সে কিছু সংরক্ষণ করে। মানুষের এই বেঁচে থাকার রূপময়তা এবং বাঁচিয়ে রাখে। মানুষের এই বেঁচে থাকার ক্ষমতাও তাকে আরও শক্তি যোগায়। আর ঐ ক্ষমতা ও শক্তির সমন্বয়ে সংস্কৃতির জন্ম হয়। এদিক থেকে বলা যায়, সংস্কৃতি হল মানুষের জীবনাচার, আবার অন্যদিকে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় মানুষের জীবন ধারণের উদ্ভাবিত উপকরণ সমগ্র। সেজন্য সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতির অর্থ সর্বব্যাপক।

www.swapno.in

www.swapno.in

সংজ্ঞা ও ধারণা

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি

১. সংস্কৃতি কাকে বলে তা জানতে পারবেন।

২. বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীরা কিভাবে সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন তা জানতে পারবেন।

৩. মানব সমাজে কিভাবে সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে তা জানতে পারবেন।

৪. সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সংস্কৃতি কাকে বলে? (What is Called Culture)

সংস্কৃতি শব্দের অর্থ

উপরে সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভূমিকা থেকে আপনারা নিশ্চয়ই ও সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছেন। আসুন এবার আমরা জেনে নেই সংস্কৃতি শব্দের অর্থ কি?

বাংলা 'সংস্কৃতি' শব্দটির ইংরেজী হলো কাল্‌চার (Culture)। ষোল শতকের শেষার্ধে ফ্রান্সিস বেকন সর্বপ্রথম ইংরেজী সাহিত্যে Culture শব্দটা ব্যবহার করেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ওয়ালর্ড ইমার্সন Culture কে সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। সংস্কৃতিকে বাংলায় 'কৃষ্টি' বলা হয়। বাংলা কৃষ্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে 'কর্ষণ' বা চাষ। বর্তমান বিশ্বে সংস্কৃতির গুরুত্ব সর্বাধিক।

বাংলায় সংস্কৃতি শব্দের অর্থ হল 'কৃষ্টি'।

বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে বাংলায় 'কৃষ্টি' শব্দটি প্রচলিত ছিল সংস্কৃতির স্থলে। কিন্তু সে শব্দটি ঠিক মন:পুত না হওয়ায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সংস্কৃতিকে কৃষ্টির স্থলাভিষিক্ত করেন। কবি নিজে এই শব্দটি পছন্দ ও এর ব্যবহার শুরু করেছিলেন বলেই হয়তো 'সংস্কৃতি' কথাটি আজ এত বেশী জনপ্রিয়।

সংস্কৃতি হচ্ছে, A Way of life জীবন যাপন পদ্ধতি।

জীবন যেমন গতিশীল, তেমনি সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল।

সংস্কৃতি শব্দটি প্রায় প্রতিদিনই আমরা ব্যবহার করে থাকি। মূলত সংস্কৃতি হচ্ছে; A Way of life যাকে বাংলায় বলে জীবন যাপন পদ্ধতি অতএব কোন সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতিকে প্রণালীকে বুঝানো হয়। প্রকৃত পক্ষে, সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি। মানুষ তার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাই সংস্কৃতি। তাহলে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে বলা যায় যে, সংস্কৃতি হলো একটি জীবন যাপন পদ্ধতি(A Way of life) বস্তুত মানুষের সামাজিক জীবন যাত্রার উপকরণসমূহের এক অপূর্ব সমন্বয়ের ফল হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত- সে কারণে চিরন্তন কোন রূপ নেই। অর্থাৎ তা পরিবর্তনশীল। জীবন যেমন গতিশীল তেমনি সভ্যতা ও সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে;

১। মানুষের সামাজিক জীবন যাত্রার উপকরণসমূহের এক অপূর্ব সমন্বয়ের ফল হচ্ছে সংস্কৃতি।

২। জীবন যেমন গতিশীল তেমনি সভ্যতা ও সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল।

www.swapno.in

মানুষের সামাজিক জীবন যাত্রার উপকরণসমূহের এক অপূর্ণ সমন্বয়ের ফল হচ্ছে সংস্কৃতি।

আপাত দৃষ্টিতে 'সংস্কৃতি' শব্দটি খুব সরল সহজ মনে হলেও বিষয়টি খুবই ব্যাপক ও দার্শনিক ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত। সবচেয়ে সহজভাবে বলা যায় যে, মানুষ যা কিছু তৈরী করে, সে সবই তার সংস্কৃতি। ছোট একটা পেরেক থেকে শুরু করে সাহিত্য ও শিল্পকলা এবং আধুনিক আনবিক বিজ্ঞানের আশ্চর্যতম আবিষ্কার পর্যন্ত সবই মানুষের সৃষ্টি, সবই মানুষের সংস্কৃতি। ভৌগোলিক পরিবেশের এভাবে সংস্কৃতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, একটি দেশের মানুষের সংস্কৃতি বলতে তাদের ধ্যান-ধারণা, আস্থা-বিশ্বাস, মুল্যবোধ ও আদর্শ, আইন-কানুন, ভাষা, কারিগরি, দক্ষতা, হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যা পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের সমষ্টিকেই বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, মানব সমাজে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, চাল-চলন, কথা-বার্তা প্রভৃতির সমন্বয়ে যে বিশেষ পরিবেশ গড়ে উঠে তাকে সংস্কৃতি বলে।

সংস্কৃতির সাধারণ অর্থের সাথে সমাজতাত্ত্বিক অর্থের পার্থক্য রয়েছে।

সংস্কৃতি শব্দটি প্রায় প্রতিদিনই আমরা ব্যবহার করে থাকি। এমনকি, আমরা সংস্কৃতিবান ও অ-সংস্কৃতিবান এ ধরনের দুটি দলে মানুষকে ভাগ করে থাকে কিন্তু এ ধরনের বিভাজন সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে যথার্থ নয়। কেননা কোন জনগোষ্ঠীই সংস্কৃতিহীন হতে পারে না। সাধারণত সংস্কৃতি কোন ব্যক্তির মার্জিত রুচি আচার-আচরণকে বুঝাতে। সংস্কৃতি বলতে সাধানরণভাবে ভাষা-সাহিত্য সঙ্গীত ও শিল্প প্রভৃতি চারুকলার চর্চাকে বোঝানো হয়ে থকে। কিন্তু সংস্কৃতির এই সাধারণ অর্থের সাথে সমাজতাত্ত্বিক অর্থের অনেক পার্থক্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি বলতে কখনই কেবল ব্যক্তির রুচি বা সাহিত্য ও শিল্প কলাকে বুঝায় না। আমরা নৃবিজ্ঞানী ই.বি টাইলরের (E.B.Tylor) সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলেই পার্থক্যটি বুঝতে পারবো।

সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে, ভাষা-সাহিত্য ও শিল্প-কলা প্রভৃতিকে বুঝায় ।

সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি বলতে সমাজস্থ মানুষের পূর্ণ জীবন যাত্রা প্রণালীকে বুঝায়।

ই.বি টাইলরের মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি জটিল সামগ্রিক ব্যবস্থা যার অন্তর্গত রয়েছে সমস্ত মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, আস্থা-বিশ্বাস, শিল্পকলা আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, অভ্যাস, মূল্যবোধ প্রভৃতি যেসব মানুষ সমাজের একজন সদস্য হিসাবে অর্জন করে থাকে। টাইলরের সংজ্ঞাটি আরো সহজ করে বললে সমাজস্থ মানুষের সমগ্র জীবন যাত্রা প্রণালীকে সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা যায়। এখানে মার্জিত ও অমার্জিতের কোন স্থান নেই। সমাজস্থ মানুষের সমগ্র জীবনের প্রকাশ ঘটায় তাই তার সংস্কৃতি। এই অর্থে সব সমাজেরই সংস্কৃতি আছে, তবে কারোটা উন্নত আর কারোটা অনুন্নত। যেমন আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজের সংস্কৃতি অর্থাৎ ঐ সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, যোগ্যতা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা একটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর চেয়ে উন্নত। বস্তুত সংস্কৃতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ফল নয়– এটি মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফল, বহু দিনের অভিজ্ঞতা সজ্ঞাত। সমাজস্থ মানুষ তার সংস্কৃতি সৃষ্টি করে এবং পরে তার উন্নতি সাধন করে। সে কারণে প্রতিটি সমাজের সংস্কৃতি ভিন্ন। সংস্কৃতি যদি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ফল হত তাহলে প্রত্যেক সমাজের সংস্কৃতি অভিন্ন হত। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে মানুষের খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি গড়ে উঠে আর সে কারণেই সংস্কৃতির সতত পরিবর্তনশীল।

আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি। এদেশের সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থা, জলবায়ু ইত্যাদি সকল কিছুর সাথে আমাদের মানিয়ে চলতে হয়। বর্ষার সময় নৌকাই গ্রাম-বাংলার একমাত্র যানবাহন। ধান বা চাল আমাদের প্রধান শস্য। এসবের কারণ হচ্ছে এদেশের প্রকৃতি এবং এজন্য চাল থেকে তৈরী বিভিন্ন ধরনের পিঠা আমাদের অনেক অনুষ্ঠানের প্রধান সৌখিন খাদ্য। আমরা পিঠা দিয়ে অতিথিকেও আপ্যায়ন করি। এটাও আমাদের সংস্কৃতি। মরু অঞ্চলে যারা বসবাস করে তাদের জীবন ধারণ প্রণালী আমাদের থেকে ভিন্ন। যেহেতু পূর্ণ জীবনযাত্রা প্রণালী হল সংস্কৃতি সেহেতু এর বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিশ্বে। কারণ বিশ্বের সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু অভিন্ন নয়। যার ফলে জীবন-যাত্রা প্রণালীও ভিন্ন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরো একটি মূল্যবান কথা হচ্ছে এই যে, সংস্কৃতি সময়ের ফসল। দীর্ঘ অতীতের

www.swapno.in

সম্মিলিত সম্পত্তি। অতীত থেকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে আমাদের জীবন-যাত্রা প্রণালী বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেছে অর্থাৎ সংস্কৃতি বর্তমান রূপ নিয়েছে। বর্তমানের সংস্কৃতি দীর্ঘ অতীতের সমৃদ্ধ সমষ্টির একটি রূপমাত্র। তাই ভবিষ্যতেও এর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ সংস্কৃতির রূপ ও প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল। জীবন যাত্রাকে সহজতর করার প্রয়াসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরো প্রচুর ব্যবহার ঘটবে, পড়বে নতুন চিন্তার প্রভাব, নতুন বিজ্ঞানের আবিষ্কার। আর সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থকবে জীবনযাত্রা প্রণালী অর্থাৎ সমগ্র সংস্কৃতির রূপ ও আকৃতি নিত্য নতুন উপাদানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এটিই হলো সংস্কৃতির মূল কথা।

সংস্কৃতি সময়ের ফসল।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা

আমরা এবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদত্ত নৃবিজ্ঞানীর ও সমাজবিজ্ঞানীদের সংস্কৃতির সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করব। সংস্কৃতির স্বরূপের মত সংস্কৃতির সংজ্ঞাও খুব ব্যাপক। যেমন;

১) প্রথমত বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যাটের (Goethe) কথাই ধরা যাক। সংস্কৃতির আলোচনায় গ্যেটে সংস্কৃতিবান মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। গ্যেটের মতে, ‘One ought everyday, at least to hear a little song, read a good poem, see a fine picture and if it were possible, say a few reasonable words.' (অর্থাৎ কেউ সংস্কৃতিবান হতে হলে তাকে প্রতিদিন একটু গান শুনতে হবে, কমপক্ষে একখানা ভালো ছবি দেখতে হবে, একটি কবিতা পড়তে হবে, এবং সম্ভবপর হলে কিছু যুক্তিসংগত শব্দ উচ্চারণ করতে হবে ইত্যাদি)। আমেরিকান কবি এমার্সন হয়তো এর উত্তরে বলবেন, এটা সংস্কৃতি নয়- বাইরের চকচক ভাব। ('Culture is one thing and vanish another')।

২) সমাজবিজ্ঞানী কার্লাইল বলেছেন ঃ 'The great lan of culture is, let each become all that he was created capable of being` (অর্থাৎ মানবিক সত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ তথা তার জন্য সাধনা নামই সংস্কৃতি। তবে নিছক সাধনা কিন্তু সংস্কৃতি নয়। সংস্কৃতি হচ্ছে যা ইতিমধ্যে সাধন ক্রিয়ায় অর্জিত এবং তার ফলাফলে প্রতিফলিত।

৩) জোনস্ বলেন Culture is the sum of man's creations' (মানব সৃষ্ট সব কিছুর সমষ্টিই হল সংস্কৃতি)।

৪) সমাজবিজ্ঞানী রস বলেন Culture is the total acquired behaviour patterns transmitted by imitation or instruction' (শিক্ষা অথবা অনুকরণের মাধ্যমে অর্জিত সমগ্র আচরণের ধরনটাই সংস্কৃতি)।

৫) কুলি, এনজেল ও লার বলেন Culture is the sumtotal of the transmittable result of living together'. (সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সম্মিলিত জীবন যাপনের ফলাফলের সামগ্রিক রূপ)।

৬) সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা যা অর্জন করি তাই সংস্কৃতি। এ ধারণাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে সংজ্ঞাটি বহুল আলোচিত সেটা দিয়েছেন বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী টাইলর(E.B. Tylor)। তাঁর Primitive Culture নামক গ্রন্থে টাইলর বলেন Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capablities and habits acquired by man as a member of Society' অর্থাৎ সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত আচার আচরণ, দক্ষতা, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প-কলা, রীতি, নীতি প্রথা-পদ্ধতি ও আইন-কানুন ইত্যাদির জটিল রূপকেই বলা হয় সংস্কৃতি। মোট কথা, সংস্কৃতি জীবন সম্পৃক্ত এবং বস্তু সংলগ্ন বিষয়।

www.swapno.in

সংস্কৃতি একাধারে জীবন যাত্রার নিয়ম প্রণালী, যথা- আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি; অন্যদিকে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও উপকরণের সামগ্রিক রূপ। যেমন ঘরবাড়ি, খাদ্য দ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন প্রভৃতি সংস্কৃতির অঙ্গ।

৭) নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার (Kroeber) বলেন "প্রতিক্রিয়া, অভ্যাস, কৌশল ধারণা ও মূল্য প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্ট ব্যবহার সংস্কৃতি গঠন করে। সংস্কৃতি মানুষের বিশেষ, একচেটিয়া উপাদান।"

৮) হার্বার্ট স্পেনসার সংস্কৃতিকে মানুষের জৈবিক গঠনে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে যেসব দান অর্জন করে, সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে তাকে আরও কতকগুলি কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এই কৌশল আয়ত্তের শক্তিই হচ্ছে সংস্কৃতি। মূলত সংস্কৃতি মানুষকে জীবনের একটি কাঠামো বা রূপরেখা প্রদান করে। মানবেতর প্রাণীর কোন সংস্কৃতি নেই, মানুষের সামাজিক বা অজৈব সব চাহিদাই তার সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। উল্লেখ্য, ক্রোবার ও স্পেনসারের মতে সংস্কৃতি হচ্ছে অধি-জৈবিক প্রথাও।

৯) কার্ল মার্কস সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, "অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপরি কাঠামোই (Super Structure) হচ্ছে সংস্কৃতি।" মার্কসের মতে অর্থনীতির সংগে সংস্কৃতির রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সেজন্য তিনি মনে করেন যে অর্থনীতিই মূলত সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে।

১০) বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন যে, হীরক খন্ড হচ্ছে সভ্যতা, আর তার থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তাই সংস্কৃতি। মানুষের দেহের খাদ্য, আলো-হাওয়া যেমন রক্তে, জীবনরসে পরিণত, মানুষের সংস্কৃতিও তাই। সংস্কৃতি সকল জনগোষ্ঠীরই আছে। যেমন, মানুষের দেহে থকে রক্ত, কম অথবা বেশী, শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ, রুগ্ন কিংবা সবল।

১১) মানুষ তার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাই সংস্কৃতি। নৃ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব-সৃষ্ট সব বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানই হলো সংস্কৃতি, যা মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কাজে লাগায়। এ প্রসঙ্গে সংস্কৃতি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কির (Malinowski) সংজ্ঞাটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে "মানুষের এমন সব কর্মই সংস্কৃতি যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে।"

১২) সমাজবিজ্ঞানী নর্থ (E.C North) এর মতে "মানুষ তার অভাব দূর করার জন্য যে সব কলা-কৌশল উদ্ভাবন করেছে সেটাই তার সংস্কৃতি।

বস্তুত ম্যালিনোস্কি ও নর্থের সংজ্ঞা দুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিংবা অভাব দূর করার জন্য যা কিছু কলা কৌশল উদ্ভাবন করেছে বা যে সব কাজ কর্ম সম্পাদন করেছে তাই তার সংস্কৃতি।

তাহলে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের দেয়া সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সংস্কৃতির উপর গড়ে উঠা সমাজে মানুষ বাস করে। মূলত, সংস্কৃতি শিখতে ও অর্জন করতে হয়। সংস্কৃতি আধ জৈবিক সত্তা। মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বুঝাবার জন্য সংস্কৃতি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়। বস্তুত কোন জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, কাপড়-চোপড় পরা. রান্না-বান্না করা ইত্যাদির মাধ্যমে যে চিত্র ফুটে ওঠে তাকেই বলা হয় সেই গোষ্ঠীর সংস্কৃতি। অর্থাৎ মানুষের সামগ্রিক জীবন ধারাই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কোন ব্যক্তির নয়, সমগ্র সমাজের সম্পত্তি কিংবা অর্জন। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের সার্বিক রূপ। মূলত, কোন একটি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি আলোচনা করতে হলে সেই গোষ্ঠীর জীবন যাপনের প্রত্যেক উপাদান নিয়ে আলোচনা

www.swapno.in

করতে হবে। এরই সুত্র ধরে বলা যায় সংস্কৃতির ক্ষুদ্রতম অংশকে Culture trait বলা হয়। অর্থাৎ Culture trait হল সংস্কৃতির এক একটি মৌল উপাদান।

পরিশেষে বলা যায় যে, মানুষের জীবনাচরণের নানা ক্ষেত্রে মানব সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির প্রভাব অসামান্য। সংস্কৃতি সমগ্র সমাজ জীবনের ফল বহু যুগের অসংখ্য মানুষের সৃষ্টিগুলি সম্মিলিত হয়ে সংস্কৃতির রূপ নেয়। অর্থাৎ একক প্রচেষ্টায় সমাজ বিহীন জীবনে সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না।

কালচার ট্রেট হল সংস্কৃতির এক একটি মৌল বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা

সংস্কৃতি বহুল আলোচিত একটি প্রত্যয়। সংস্কৃতির বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা চলেছে। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে সংস্কৃতির সংজ্ঞা এক রকম নয়। তাই সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক অর্থে, সামজস্থ পূর্ণ জীবনযাত্রা প্রণালীই হল সংস্কৃতি। এখানে মার্জিত অ-মার্জিতের কোন স্থান নেই। সমাজস্থ যে প্রকারে তার পূর্ণ জীবনের প্রকাশ ঘটায় তাই তার সংস্কৃতি। এই অর্থে সব সমাজরেই সংস্কৃতি আছে, তবে কারোটা উন্নত আর কারোটা অনুন্নত। যেমন, আধুনিক শিল্প সমাজের সংস্কৃতি অর্থাৎ তার অর্জিত জ্ঞান, যোগ্যতা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা উপজাতীয় এলাকার অধিবাসীদের চেয়ে উন্নত। সংস্কৃতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ফলস নয় উহা সচেষ্ট যত্নের ফল। অর্থাৎবহু দিনের সঞ্চিত সম্পত্তি। মূলত সমাজস্থ মানুষ সংস্কৃতি অর্জন করে এবং পরে তার উন্নতি সাধন করে।

সংস্কৃতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ফসল নয়; উহা সচেষ্ট যত্নের ফল অর্থাৎ বহু দিনের সঞ্চিত সম্পত্তি।

এমন একদিন ছিল যখন মানুষ এবং সংস্কৃতি বলে কিছুই ছিল না। পৃথিবীতে যেদিন মানুষের সৃষ্টি হলো সেদিন থেকেই শুরু হলো তার বেঁচে থকার সংগ্রাম। বিনা পরিশ্রমে প্রকৃতির কাছ থেকে জীবনের অনেক উপকরণ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাঁচার তাগিদে মানুষ তেরী করল হাতিযার, উদ্ভাবন করলো তার জীবন-যাত্রার উপায় ও কৌশল, গড়ে তুললো তার সংস্কৃতি। মানুষ গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদী-নালা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে এনে কার্যোপযোগী করে তুললো, বেঁচে থাকার ভিত রচনা করলো। এসবই মানুষর সংস্কৃতির অন্তর্গত। সংস্কৃতির উন্নতি ঘটিয়ে মানুষ গোটা বিশ্বকে বশে আনতে চাইল এবং ক্রমে ক্রমে সে প্রকৃতিকে জয় করতে শুরু করল। একদিকে প্রয়োজনের তাগিদে, এবং অন্যদিকে, অজানাকে জানার নেশায় মানুষ শুরু করলো বিজ্ঞানের সাধনা।

আনুমানিক দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষ সংস্কৃতির বদৌলতে নিজকে অন্যান্য প্রাণী থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদ করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর উপর নিজের শ্রেষ্টত্ব বজায় রেখে চলেছে। আমরা প্রশ্ন করতে পারি কেমন করে তা সম্ভব হলো? স্নায়ুর বিকাশ হওয়ায় বিশেষ করে মানুষের মস্তিকের কাজের জটিলতা ও কর্মক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় সে শুধু দেখতে, ঘ্রাণ নিতে আর কাজ করতেই শিখলো না, মানুষ চিন্তা করতে ও কথা বলতেও শিখলো। মানুষ শিখলো তার অভিজ্ঞতাকে চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে। অঙ্গভঙ্গিও প্রায় অর্থহীন শব্দ দিয়ে সে তার অভিজ্ঞতাকে অপরের কাছে আদান-প্রদান শুরু করলো। সে অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে খতিয়ে দেখতে এবং বিশ্ব সংসারের চারদিকে চোখ মেলে অনেক কিছু আন্দাজ করে নিতে অভ্যস্ত হল। ক্রমে মানুষের বুদ্ধির প্রসারতা ও কর্মক্ষমতা বেড়ে চললো এবং মানুষ নিজে তার বাঁচার পথ খুঁজে নিল। সৃজনশীলতা জাগলো তার মনে। এভাবেই মানুষ সংস্কৃতি সৃষ্টি করলো আর ঐ সংস্কৃতিই মানুষের বাঁচার পথ সুগম করে তুললো। বলা যায় যে, জীবন যেমন সহজ সরল পর্যায় থেকে ক্রমে জটিল ও বৈচিত্র্যের দিকে এগিয়ে গেছে তেমনি সংস্কৃতি তার প্রাথমিক বৈচিত্র্যহীন পর্যায় অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে এবং জটিল রূপ পরিগ্রহ করছে।

বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ তৈরী করল হাতিয়ার, উদ্ভাবন করলো তার জীবন যাত্রার উপায় ও কৌশল, গড়ে তুললো তার সংস্কৃতি।

www.swapno.in

সংস্কৃতিই মানুষের বাঁচার পথ সুগম করে তোলে।

সংস্কৃতির এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার জীবদেহের সাথে সমাজের তুলনা করে ক্রমবিকাশের সূত্র খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। স্পেনসারের মতে জীবদেহে এবং সমাজে ক্রমাগত বিবর্তন চলেছে। হার্বার্ট স্পেনসার একে From inorganic to organic then to superorganic অর্থাৎ "অজৈব থেকে জৈব এবং তার থেকে অধিজৈবে" বিবর্তন বলে চিহ্নিত করেছেন। স্পেনসার সংস্কৃতি বলতে এই অধিজৈবিক সত্তাকেই (Super organic) বুঝিয়েছেন। ক্রোবারও ঐ একই কথা বলেছেন। আজকাল অবশ্য এদের সমর্থকগণ সংস্কৃতিকে অধিজৈব না বলে, বরং "মন-সাংস্কৃতিক জৈব (Psycho cultural organic) বলার পক্ষপাতী। ক্রোবার বলতে চান যে, জীবের ক্রমবিকাশের ধারায় একমাত্র মানুষই সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তাই সে সংস্কৃতিবান প্রাণী। বংশানুক্রমে জৈব গুণাবলীর মধ্যে সংস্কৃতির ধারা খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্ম, উৎপাদন যন্ত্র দর্শন, সাহিত্য এসব কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায় না। এসব সমাজে বসবাসের ফলে অর্জিত হয়। এ প্রসঙ্গে ক্রোবারের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ 'No religion, no tool, no idea was ever produced by heredity' অর্থাৎ বংশ বা রক্তধারা কখনও কোন ধর্ম, উৎপাদন কৌশল বা ধ্যান ধারণার জন্ম দিতে পারে না। সংস্কৃতি জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের চেয়েও আরও বেশি কিছুকে বোঝায়। মানুষের দেহ, মন, সমাজ ইত্যাদি সংস্কৃতির উপর ভিত্তিহীন হলেও সংস্কৃতি এর চেয়ে অনেক ব্যাপক। সমাজবদ্ধ মানুষের যা কিছু সৃষ্টি তাই তার সংস্কৃতি। বস্তুত সংস্কৃতি এমন এক শক্তি যা মানুষকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রভাবিত করে। সমাজে একত্রে বসবাস করার ফলে মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। তাদের একে অপরের উপর নির্ভরশীলতায় গড়ে উঠে একটি সমাজ-ব্যবস্থা। উৎপাদন-যন্ত্র ও কৌশল, বণ্টন-বিধি, ভোগ-বিলাস এবং জীবন ধারার প্রক্রিয়াই মানুষের সংস্কৃতি। মানুষ গড়ে তোলে বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান, ধর্ম, দর্শন, আইন ,বিধিনিষেধ ও সরকার। আবার তার মধ্যে জাগে সৌন্দর্য-চর্চার মনোবৃত্তি যা সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যে ফুটে উঠে। আর এভাবেই মূলত মানুষের সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে উৎপাদন যন্ত্র ও কৌশল, অর্জিত আচার-ব্যবহার জ্ঞান ,বিশ্বাস প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সংস্কৃতি সম্পর্কে বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী টাইলর তাই বলেন যে, সমাজের সদস্য হিসাবে অর্জিত আচার-ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস রীতি-নীতি, আইন, প্রথা ইত্যাদির জটিল সমাবেশই হোল সংস্কৃতি।

মানুষের সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে উৎপাদন যন্ত্র ও কৌশল, অর্জিত আচার-ব্যবহার, জ্ঞান-বিশ্বাস প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

মূলত মানব শিশু খাওয়া পরা লালন পালন, হাঁটা, কথা বলা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সংস্কৃতিবান জীবে পরিণত হয়।

মানুষের দেহ, মন সমাজ ইত্যাদি সংস্কৃতির ভিত্তি হলেও সংস্কৃতি এর চেয়ে আরও বেশী কিছু।

সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতি প্রত্যয়টি অনুধাবন করতে হলে তিনটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমতঃ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের স্থান কোথায় এবং বিশ্ব প্রকৃতিকে সে কতটা কাজে লাগিয়েছে তা জানা এছাড়া মানুষ কি কি হাতিয়ার ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করেছে এবং এগুলো কৃতকার্যতার সাথে কাজে লাগিয়ে সে তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে তা আমাদের জানতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা সংস্কৃতির অন্যতম কাজ। মূলত ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি ও ব্যক্তি বনাম সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই যে কোন সমাজের সংস্কৃতির পরিচয় নিহিত। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান এবং এগুলোর প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ সমাজে সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

তৃতীয়তঃ মনোজগতের বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে। সাহিত্য, শিল্প কলা, সৌন্দয্যবোধ, দর্শন ইত্যাদি সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত নীতিশাস্ত্র, প্রথা, আচার-আচরণ ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাও এর আওতাভুক্ত।

যেহেতু মানুষ তার ভাগ্য উন্নয়নে সদা তৎপর এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও কৌশলগত উন্নতি ঘটিয়ে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে মানুষ নতুন নতুন চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি বের করে চলেছে, সেকারণে সংস্কৃতি বলতে পরিবেশের উপযুক্ত উন্নত জীবন যাপনের জন্য সব রকম প্রচেষ্টাকেই বোঝায়। এছাড়া, নৃবিজ্ঞানীরা সংস্কৃতি পর্যালোচনায় মনের বিকাশের উপরও

www.swapno.in

বেশ গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারার ফলশ্রুতিকেও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এ মানসিক উৎকর্ষ কেবলমাত্র ব্যক্তির, নয়, গোটা সমাজের এবং সে কারণে বলা হয় সমাজ ব্যক্তিকে সংস্কৃতিবান করে এবং বলা যায় যে, মানব শিশু খাওয়া পরা, লালন-পালন, হাঁটা, কথা বলা থেকে শুরু করে সমগ্র সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সংস্কৃতিবান জীবে পরিণত হয়। আবার ব্যক্তি তার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়েও সমাজে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারে। তার এ সৃষ্টি পাথরের হাতিয়ার থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক আনবিক বোমায় এসে পৌঁছেছে। যতই মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই মানুষ অজানাকে জানবার প্রেরণা লাভ করেছে। মানুষের জানার অন্ত নেই এবং সে কারণে সংস্কৃতির বিকাশেরও শেষ নেই।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

সংস্কৃতি কেবলমাত্র শিল্প-কলা, সাহিত্য ও সংগীত সৃষ্টির কৌশল নয়; মৃৎপাত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ঘরবাড়ী তৈরীর করা কৌশল প্রভৃতিও সংস্কৃতির আওতাভুক্ত। সংস্কৃতির ফলশ্রুতি হিসেবে যেমন একদিকে আছে কৌতুক-নাটক, পথ চলতে চলতে গুণ গুণ গান করা, তেমনি আবার অন্যদিকে রয়েছে ইটালীর রেঁনেসা যুগের বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিনচীর অপূর্ব মোনালিসা চিত্রকর্ম। বস্তুত, পৃথিবীতে বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে নানা বসতি গড়ে উঠেছে। দেখা যায় যে, তুলনামূলকভাবে কারো হয়তো মানসিক উৎকর্ষ বেশী, কারো হয়তো বা কম। সে জন্যই অনেকে মনে করে যে, কেউ উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী, আবার কেউ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যা অন্য সমাজ থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, নিউ মেক্সিকোর নাভা হোরা আশি হাজার লোকের সমন্বয়ে একটি উপজাতি। এই নাভাহোরা উপজাতির আশে পাশে আরো কিছু উপজাতি আছে সত্য, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি রয়েছে। তাহলে আমরা এটা অনুমান করতে যে, পৃথিবীর প্রত্যেকিট উপজাতির সংস্কৃতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। এবার আসুন আমরা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনে নেই। সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) সংস্কৃতি শিক্ষণের বিষয় ঃ মূলত, মানুষের শিক্ষালব্ধ ব্যবহারই হচ্ছে সংস্কৃতি। কোন বংশের পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা সংস্কৃতির শিক্ষা গ্রহণ করে। সংস্কৃতি মানুষের জন্মসূত্রে লাভ করা ক্ষমতা বা জৈবিকভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্য নয়। নবজাত শিশুর কোন সাংস্কৃতিক ভিত্তি থাকে না। প্রত্যেকটি শিশু তার পরিবার থেকে সংস্কৃতি শিখে থাকে। মূলত বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পরিবেশে বাস করে বলে সংস্কৃতির মধ্যে ভিন্নতা বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়।

(২) সংস্কৃতি ধারণালব্ধ বিষয় ঃ সংস্কৃতি মূলত শিক্ষালব্ধ গুণ এবং ধারণালব্ধ জিনিস। যেমন, বলা যায় যে, শিশুরা মূলত সংস্কৃতি নিয়ে জন্মায় না সেজন্য জন্মের পর যখন কোন শিশু কেঁদে উঠে, তখন তাকে সংস্কৃতির একটি অংশ বলা যায় না। কারণ এই বিষয়টি জৈবিক দিক থেকে পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু বার বার আবৃত্তি করে যখন শিশু শিক্ষা লাভ করে 'মা' শব্দটি উচ্চারণ করতে শেখে, তখন তা সংস্কৃতির একটি অংশ। 'মা' শব্দটি শেখার পর আমরা বুঝতে পারি যে এই শব্দটি সম্বন্ধে শিশুর মধ্যে ধারণা জন্মান হয়েছে।

(৩) সংস্কৃতি সামাজিক বিষয় ঃ সংস্কৃতি হচ্ছে সার্বিক সমাজের রূপ। তাই সমাজ ছাড়া কোন সংস্কৃতি টিকতে পারে না। আন্ত: সম্পর্ক বিশিষ্ট স্বতন্ত্র লোকদের সমন্বয়ে গঠিত দলকে সমাজ বলা হয় এবং সমাজের অধিকাংশ লোক যখন কোন কাজ করতে অভ্যস্ত হয়, তখন তাকে সামাজিক বিষয় বলা যেতে পারে। বস্তুত, সাংস্কৃতিক অভ্যাস হচ্ছে কতিপয় ব্যবহারের সমাবেশ, সংস্কৃতি স্বতন্ত্র ব্যবহার বা অভ্যাস নয়। সমাজের সদস্যদের স্বতন্ত্র ব্যবহার থাকতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে বিবেচনা করলে সব ব্যবহারের সামগ্রিক রূপকে ধরা হয়।

www.swapno.in

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিন্ন আচরণ পরিলক্ষিত হতে পারে, কিন্তু শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষকের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ একরূপ নাও হতে পারে। তাই বলা যায় যে, সংস্কৃতি হচ্ছে একটা সামাজিক ব্যাপার, যা ঐ সমাজের সদস্যদের উপরই প্রধানত নির্ভরশীল।

(৪) ম্যাকাইভারের মতে, আমরা যা করি তাই সংস্কৃতি হলেও, সেটা আদর্শ সংস্কৃতি নয় ঃ মানুষের সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ ব্যাপক। মূলত, সমাজ সব সময় তার সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের আচরণে যে সচেতন মান প্রকাশ পায়, তাই আদর্শ সংস্কৃতি। ইদানিং দেখা যায়, বাংলাদেশের শহর-বন্দরের অনেক যুবক ছিনতাই কাজে লিপ্ত হয়। এখানে আমরা বলতে পারি যে, তারা সমাজে প্রকৃত পক্ষে যা ঘটেছিল, সে সবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাই বলা যায় যে, আমরা যা করি তা সংস্কৃতি, তবে তা আদর্শ সংস্কৃতি নয়। আমাদের সমাজ ছিনতাই অনুমোদন করে না, কিন্তু তবুও এ ধরনের কাজ সমাজে সংঘটিত হচ্ছে। তাই বলা যায় যে, কি ঘটছে তার প্রতি জোর না দিয়ে, যা সমাজে ঘটা উচিত ছিল, তার প্রতি জোর দেয়া উচিত।

(৫) সংস্কৃতি বাসনা-চরিতার্থকারী বিষয় ঃ মূলত প্রত্যেক সংস্কৃতির মধ্যে সমাজের কল্যাণ করার প্রবণতা আছে এবং সেটাই সংস্কৃতির বাসনা চরিতার্থ করবার গুণ। প্রত্যেক সংস্কৃতিরই শারীরবৃত্তীয় ও মনোবিদ্যাগত উভয় চাহিদা পূরণের ক্ষমতা থাকে। সংস্কৃতি সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে। মানুষের সমষ্টিগত ক্রিয়ার মাধ্যমে তা বিকশিত হয় এবং অন্যদের ভেতর সঞ্চারিত হয়। কিছু সচেতন ও অচেতন স্বতন্ত্র চাহিদা পূরণ করলে স্বতন্ত্র অভ্যাস প্রতিকূল অবস্থাতেও টিকে থাকে। সুতরাং সংস্কৃতির সামাজিক অভ্যাসগুলি অবশ্যই সমষ্টিগত চাহিদা পূরণ করবে।

(৬) সংস্কৃতি উপযোগীকরণযোগ্য ঃ আমরা জানি যে, সংস্কৃতি সমাজের বাসনা চরিতার্থ করে। আমরা বলতে পারি যে, সংস্কৃতিকে অবশ্যই সমাজের পরিবেশের সাথে উপযোগী হতে হবে। বস্তুত, একটি ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির পক্ষে উপযোগী নাও হতে পারে। কারণ, সব সংস্কৃতি সব পরিবেশের সাথে উপযোগী হয় না। তবে পরিবেশ সব সময় সংস্কৃতির গতির দিক নির্ধারিত করে এটা মনে করাও উচিত নয়। সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল সেহেতু সংস্কৃতিকে উপযোগীকরণ যোগ্য হতে হয়।

(৭) সংস্কৃতি অখণ্ড সত্তা ঃ মনে করা হয় যে সংস্কৃতির সব উপাদান পরস্পরসম্পর্ক বিশিষ্ট, বিশুদ্ধ ও অখণ্ড। সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, ভাষা প্রভৃতি আন্ত:সম্পর্ক বিশিষ্ট। মূলত, সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ণরূপপ্রাপ্ত বহু মনোনীত বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রত্যেক সংস্কৃতি গঠিত হয়। সংস্কৃতির কোন উপাদানই নিরর্থক নয়। একটি সামগ্রিক জীবনযাত্রা পথ নির্ধারণের জন্য সংস্কৃতি তার নিজস্ব ভূমিকা পালন করে। এটা বলা যায় যে, মানুষ সামাজিক জীব হিসেবেই তার সংস্কৃতি অর্জন করে এবং তার উন্নতি সাধন করে। সে কারণে প্রায় প্রতিটি সমাজের সংস্কৃতি ভিন্ন। সংস্কৃতি যদি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ফল হত, তাহলে সকল সমাজের সংস্কৃতি অভিন্ন হত। আসলে বিভিন্ন অবস্থার সাথে মানিয়ে নেবার চেষ্টায় মানুষের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আর সে কারণেই সংস্কৃতির রূপ ও প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

"আমরা যা করি তা সংস্কৃতি হলেও, সেটা আদর্শ সংস্কৃতি নয়" ব্যাখ্যা করুন (৫০টি শব্দ দ্বারা)

www.swapno.in

অনুশীলনী ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সংস্কৃতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সারাংশ ঃ

সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে সূক্ষ্ম শিল্প চর্চাকে বুঝায় । যেমন নাচ, গান, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃতির এই সাধারণ অর্থের সাথে সমাজতাত্ত্বিক অর্থের পার্থক্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি বলতে সমাজ মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের প্রকাশকে বোঝায়। সমাজতাত্ত্বিক অর্থে বলা যায় যে, সংস্কৃতি হলো একটি জীবন প্রণালী। তাই সমাজবিজ্ঞানে কোন সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালীকে বুঝানো হয়ে থাকে। সংস্কৃতি কোন ব্যক্তির নয়, সংস্কৃতি সার্বিক সমাজের রূপ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা এক নয়। সংস্কৃতি হচ্ছে "সামাজিক আমিত্ব", আর সভ্যতা হচ্ছে তার সৃষ্ট "সম্পদ"। অবশ্য সংস্কৃতি এবং সভ্যতা উভয়ই গতিশীল।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। সংস্কৃতিকে বাংলায় কি বলা হয়?

ক) কৃষ্টি খ) কালচার

গ) আচরণ ঘ) ব্যবহার

২। "মানুষের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের অপর নাম হল সংস্কৃতি" উক্তিটি কে করেছেন?

ক) জোনস্ খ) এনজেল

গ) কুলি ঘ) কার্লাইল

৩। সংস্কৃতির মুখ্য বৈশিষ্ট্য কোন্টি?

ক) শিক্ষালব্ধ বিষয় খ) আচার-আচরণ

গ) ধারণালব্ধ বিষয় ঘ) সামাজিক পরিবেশ

www.swapno.in

উপাদানসমূহ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটি পড়ে আপনি

- সংস্কৃতির উপাদানসমূহ বলতে কি বোঝায় তা জানতে পারবেন এবং
- বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি কি সেটাও জানতে পারবেন।

সংস্কৃতির উপাদানসমূহ

সংস্কৃতির উপাদানসমূহের মধ্যেই সামাজিক মানুষের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে।

সংস্কৃতির উপাদান বলতে বোঝায় কোন একটি দেশের বা সমাজের মানুষের মধ্যে কি ধরনের সংস্কৃতি রয়েছে এবং সেই সংস্কৃতি আচার-আচরণ, বিশ্বাস, ধর্মাচারণ, লোককাহিনী, সংগীত, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। কোন দেশের সংস্কৃতির উপাদান নির্ভর করে গোটা সামাজিক মানুষের সামগ্রিক সত্তার উপর নির্ভর করে। সংস্কৃতির উপদানসমূহের মধ্যেই সামাজিক মানুষের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। কারণ সংস্কৃতির উপাদান সমূহের মধ্যেই বাসগৃহের নমুনা, পোশাক-পরিচ্ছদের নমুনা, আচার-আচরণ খাদ্য-দ্রব্যের নমুনা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান আর বৃটেনের সাংস্কৃতিক উপাদান একরূপ নয়। কারণ বাংলাদেশের মানুষের জীবন-যাত্রা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও ধর্ম, বাসস্থান নির্মাণ কৌশল, পোশাক-পরিচ্ছদের রূপ ও বৈশিষ্ট্য, নাচ-গান, লোকগীতি, ভাষা ও সাহিত্যের রূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং কৃষি উৎপাদন কৌশল বৃটেনের সংস্কৃতির তুলনায় ভিন্ন ধরনের। কাজেই বলা যায় যে, সাংস্কৃতিক উপাদান বলতে আমরা বুঝি কোন অঞ্চলের বা জনগোষ্ঠীর বিশেষ জীবনপ্রণালী যার মাধ্যমে এ সকল মানুষের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ঐ জীবনপ্রণালী দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যখন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সমাজের বিকাশ সাধন করেছিল তখন তাদের সংস্কৃতির উপাদান তুলানমূলকভাবে ভিন্ন ধরনের হয়ে উঠলো। সে কারণে সব সমাজে একই ধরনের সংস্কৃতির উপাদান পাওয়া যায়নি। সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রণালী তুলানামূলকভাবে জানতে পারা যায়। সমাজে বসবাসকারী লোকদের আহার-বিহার, আচার-অনুষ্ঠান এবং চিন্তাধারার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আবার এক সমাজের আচার-ব্যবহার বা চিন্তাধারার সঙ্গে অন্য সমাজের আচার-ব্যবহার বা চিন্তাধারার যথেষ্ট পার্থক্যও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, উপমহাদেশের হিন্দু সমাজে অভিবাদন জানাবার রীতি হচ্ছে করজোড়ে নমস্কার করা বা নমস্তে বলে সম্বোধন করা, আর মুসলিম সমাজে মুখে সালাম জানানো। অপর পক্ষে, পাশ্চাত্যের সমাজে অভিবাদন জানাবার রীতি হচ্ছে করমর্দন করা অথবা Hallo বা How do you do বলে সম্বোধন করা। কেবল মাত্র অভিবাদন জানাবার ক্ষেত্রে নয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার -আচরণ, আহার, চিন্তাধারা মূল্যবোধ এবং জীবন দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক সমাজে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। বাংলাদেশীরা যেভাবে রান্না করেন, বর্মীরা সেভাবে করেন না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রান্নার রীতি অন্য রকম। তাই বিভিন্ন দেশের জীবন যাপনের রীতি-নীতি পাশাপাশি তুলনা করলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কমবেশী পার্থক্য ধরা পড়বে। কাজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে বিভিন্ন সমাজের সংস্কৃতির উপাদানসমূহের পার্থক্য বিদ্যমান।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান কথা হচ্ছে এই যে, সংস্কৃতির উপাদানসমূহ সময়ের ফসল। দীর্ঘ অতীতের সঞ্চিত সম্পদ। অতীত থেকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে আমাদের জীবন যাত্রা

www.swapno.in

বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ সংস্কৃতি নূতন রূপ নিয়েছে। বর্তমানের সংস্কৃতি দীর্ঘ অতীতের পরিবর্তিত রূপমাত্র। সংস্কৃতির উপাদানসমূহ নিয়ত পরিবর্তনশীল। চিন্তা করুন, আমরা যদি কয়েকটি মামুলি ও তুচ্ছ কাজকর্ম যথা জুতা পরা বাসে যাতায়াত, সাবান ব্যবহার, বিজলী বাতির ব্যবহার প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত হই, তাহলে আমাদের জীবন যাত্রা প্রণালীর উপর কি ভীষণ প্রতিক্রিয়া হবে! আবার আমাদের সংস্কৃতির সামগ্রিক অবয়বে একটি নতুন অবদান হলে, কি প্রতিক্রিয়া পারে আরও নানারকম দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। যেমন হয়েতো বলা যায় টেলিভিশন আজও খেলনার পর্যায় পার হয়নি। কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন টেলিভিশনের প্রচলন আরও বাড়বে, তখন টেলিভিশন আমাদের সামাজিক জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়বে। আমরা টেলিভিশনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বো এবং এর ব্যবহার বন্ধ করে দিলে আমাদের জীবনে ছন্দ পতন ঘটবে। যেমন, মোটর গাড়ীতে ভ্রমণ একদা একটি অর্থহীন অবসর বিনোদন ছিল; অতিরিক্ত সামাজিক আয়েশ বলে গণ্য হতো। কিন্তু আজ মোটর গাড়ী দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মোটর গাড়ী ছাড়া আমরা হয়তো কায়ক্লেশে চালিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু অতিকষ্টে কোন ক্রমে জীবন ধারণকারী আদিম সম্প্রদায়ের খাদ্যের উৎস বন্ধ হয়ে গেলে, সমাজের উপর দারুন প্রভাব পড়বে। তাই বলা যায় যে, সংস্কৃতির রূপ ও উপাদান সদা পরিবর্তনশীল। জীবনযাত্রাকে সহজ করার প্রয়াসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরো প্রচুর ব্যবহার ঘটবে, ঘটবে নতুন চিন্তার প্রভাব, নতুন বিজ্ঞানের আবিষ্কার, নতুন মতাদর্শের নতুন নতুন প্রসার । আর সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকবে জীবন যাত্রা প্রণালী - অর্থাৎ সমগ্র সংস্কৃতির রূপ ও আকৃতি নিত্যনতুন উপাদানে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে। সংস্কৃতির গভীর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে সমাজতত্ত্ববিদগণ সংস্কৃতির দুটি প্রকারভেদের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যথা ঃ -

> সমাজবিজ্ঞানীরা সংস্কৃতির দুটি রূপ চিহ্নিত করেছেন, যথা-
> ১। বস্তুগত সংস্কৃতি বা (Meterial culture)
> ২। অবস্তুগত সংস্কৃতি বা (non-material culture)

১। বস্তুগত সংস্কৃতি (Material culture) এবং
২। অবস্তুগত সংস্কৃতি (Non-Material culture)

বস্তুগত সংস্কৃতিকে পার্থিব সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। আর অবস্তুগত সংস্কৃতিকে অপার্থিব সংস্কৃতি বলে গণ্য করা হয়। মানুষের ঘরবাড়ি কাপড় চোপড়, বাসন পত্র, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, বইপুস্তক, চিত্রকর্ম প্রভৃতি সংস্কৃতির বস্তুগত রূপের অন্তর্গত। আর সংস্কৃতির অবস্তুগত দিকটার মধ্যে রয়েছে মানুষের চিন্তা, ভাবনা, প্রত্যয়, ভাষা, সাহিত্য. বিজ্ঞান আইন-শৃঙ্খলা ও ধর্ম ইত্যাদি। বস্তুত, সংস্কৃতির উপাদানসমূহের রূপান্তর ঘটে। এবং সে রূপান্তর কখনও থেমে থাকেনি যে সত্যটি অনেকে একেবারেই হয়ত মানতে চান না। যেমন, মানুষের অবস্তুগত সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ধর্মেরও অনেক রূপান্তর হয়েছে। কারণ এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিল। কালক্রমে তারা বহু ঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। সে যা হোক, সংস্কৃতির ধারণা নিয়েই মতভিন্নতা বিদ্যমান। যেমন, কেউ মনে করেন সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কাব্য, গান, নাচ, শিল্প, দর্শন, ধ্যান-ধারণা। কেউবা মনে করেন সংস্কৃতি হচ্ছে আচার-অনুষ্ঠান, ভদ্রতা শিষ্টাচার প্রভৃতি। কথাটি স্পষ্ট করে বললে এই দাঁড়ায় যে,, সংস্কৃতি শুধু মানব সম্পদ নয়। মানুষের বাস্তব প্রয়োজনে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে এবং সংস্কৃতি মানুষের জীব সংগ্রামে শক্তি জোগায়। সংস্কৃতির উপাদানসমূহ মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সাধন করে। জীবন যাত্রারই ঘাত প্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপ পরিবর্তিত হয়। তাই জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক নিবিড়। আর সংস্কৃতির কোন উপাদানই নিশ্চল নয়, অর্থাৎ সকল উপাদানেরই রূপান্তর ঘটে।

> সংকৃতির উপাদন সমূহের রূপান্তর ঘটে।

সংস্কৃতির অর্থ কি ? সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব কি? এসব প্রশ্ন করার সাথে সাথে একটা কথা আমাদের বুঝতে হবে যে কেবল মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলতে কিছু নেই। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে নিহিত।

www.swapno.in

সংস্কৃতি শুধুমাত্র মানব সম্পদ নয়

প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা বেঁচে থাকা। মানুষ এই তাগিদের কারণে আপন পরিবেশের সঙ্গে আন্দোলন করে টিকে থাকে। অর্থাৎ মানুষ বেঁচে থাকার উপায় যতটা সম্ভব প্রকৃতির নিকট থেকে আত্মস্থ করতে চায়। এর নামই জীবন-জীবিকার প্রয়াস। তাই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল প্রেরণা হচ্ছে অন্ধ থেকে মুক্তি লাভ, অর্থাৎ জীবিকা অর্জন করা,শুধু তাই নয়, জীবিকাকে সহজ সাধ্যও করা। দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে মানুষ ক্রমেই এই জীবিকা আয়ত্ত করেছে। আর এই পরিশ্রমের ফলেই মানুষের সংস্কৃতির উপাদানসমূহ বিকশিত হয়েছে। পরিশ্রমই মানুষকে অন্য জীব

সংস্কৃতির উপাদানসমূহ মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সাধন করে।

অপেক্ষা উন্নত করেছে - মানুষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। এভাবেই মানুষ সভ্যতার এক একটি উপাদান সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃতি মূলে রয়েছে মানুষের শ্রমশক্তি; আর সংস্কৃতির মৌল অর্থ হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির সহযোগে মানব প্রকৃতির এই স্বরাজ সাধনা।

সংস্কৃতির উপাদানসমূহের আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমরা বলতে পারি যে,সংস্কৃতির উপাদান বলতে শুধু ঘরবাড়ি, কাপড়-চোপড়, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বুঝায় না। সংস্কৃতির উপাদান বলতে মানব সম্পদকেও বোঝায়। অর্থাৎ চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান-ধারণা এ সবই সংস্কৃতির উপাদান। আসলে বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল উপাদান নিয়েই মানুষের সংস্কৃতি তথা মানুষের জীবন সংগ্রামের সার্বিক প্রচেষ্টার নামই সংস্কৃতি। এ কারণেই সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতির তিনটি উপকরণের কথা বলা হয়। প্রথমত, সংস্কৃতির মূল উপাদান হচ্ছে সমাজ জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (Material means); দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় হচ্ছে সমাজ কাঠামো(Social Structure); আর তৃতীয়ত, সংস্কৃতির সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে মানস সম্পদ যা সমাজ সৌধের 'শিখরচূড়া' মাত্র (Superstructure) তথা সহজ কথায় উপরিকাঠামো বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি সংস্কৃতি অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান এর কোনটাই সংস্কৃতির সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। মোট কথা হল সংস্কৃতির উপাদান সমাজদেহের শুধু লাবণ্য নয়, এটি তার সামগ্রিক রূপ। অতএব সমাজের সম্পূর্ণ সত্তাই সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। কারণ সংস্কৃতির উপাদানসমূহের মাধ্যমেই সমাজকে জানা যায়।

মানুষের পরিশ্রমের ফলেই তার সংস্কৃতির উপাদানসমূহ বিকশিত হয়েছে।

বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি

(Material culture and non material culture)

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে সমগ্র সৃষ্টির অপর নামই হচ্ছে সংস্কৃতি, যার রয়েছে প্রধান দুটো দিক। যথা-

১। বস্তুগত সংস্কৃতি বা পার্থিব সংস্কৃতি

২। অবস্তুগত সংস্কৃতি বা অপার্থিব সংস্কৃতি।

বস্তুত, মানুষের ঘরবাড়ি, কাপড়-চোপড়, বাসনকোসন, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতির অন্তর্গত। আর মানুষের ভাষা, সাহিত্য, মূল্যবোধ, ধর্ম, বিজ্ঞান ইত্যাদি অবস্তুগত সংস্কৃতির উপাদান। সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন কোন মানব গোষ্ঠীই সংস্কৃতি বিহীন নয়। সমাজস্থ মানুষ যেভাবে তার জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটায় তাই তার সংস্কৃতি। প্রথমে আমরা জেনে নেই বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি?

মানুষ তার জীবনচর্যার জন্য প্রযুক্তিবিদ্যাকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছে। দীর্ঘ দিনের নিরলস প্রচেষ্টা এবং প্রকৃতিকে জানবার ও জয় করবার অদম্য উৎসাহ মানুষকে নানা জিনিষ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রেরণা যুগিয়েছে। খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মানবজীবন পরিচালনায় অপরিহার্য। এই অপরিহার্য বিষয়টির জন্য মানুষ যেসব বস্তু তৈরি এবং ব্যবহার করে থাকে তাকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় বস্তুগত সংস্কৃতি। বস্তুগত সংস্কৃতির আলোচনার মধ্যেই সংশ্লিষ্ট মানব গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

www.swapno.in

মানুষ ও তার জীবন যাত্রার বিভিন্ন ধারা (Man and his different modes of living) প্রত্যক্ষ করলে জানা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ পশু ও মৎস্য শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। ক্রমশ তারা খাদ্য উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত করে। উল্লেখ্য, জীবিকার উপায়ই (Means of living) সমাজ জীবনের পরিচয় প্রদান করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রস্তর যুগের মানুষ পাথরের ছুরি, বল্লম ও কুঠার তৈরী করে ব্যবহার করত। অর্থাৎ এসব হাতিয়ারই ছিল তাদের।
জীবন ও জীবিকার প্রধান উপকরণ। তাম্রযুগের মানুষ পাথর ছাড়াও তামার ব্যবহার শিখেছিল। লৌহযুগের মানুষ লোহার ব্যবহার আয়ত্ত করে। প্রস্তর যুগের মানুষের অবস্তুগত সংস্কৃতির রূপ কি ছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও তারা যেসব উপকরণ দিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো সে সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে। আর এ সব উপাদান থেকেই তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা সম্ভব। মূলত শিকার এবং সংগ্রহ ছিল মানুষের জীবন ধারণের আদিম রূপ। শিকার যুগে ব্যবহৃত হাতিয়ার গুলোকে তাদের ব্যবহার বিধি অনুযায়ী মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

শিকারের হাতিয়ার

থেঁতলান ও পেষণ | ছেদন ও কর্তন | বিদ্ধকরণ

বাসগৃহ ও তার উদ্দেশ্য ঃ - বাসগৃহ নির্মাণ মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতির অন্যতম প্রমাণ। ঝড়-ঝঞ্ঝা ও তুষারপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আদিম মানুষ নানা ধরনের প্রাকৃতিক আশ্রয়ে জীবন রক্ষা করত। পরবর্তীতে মানুষ বুদ্ধিবলে আপন আশ্রয় তৈরি করছেন। প্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ যে তার আবাসস্থল তৈরি করেছেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বস্তুত, বাসগৃহ নির্মাণের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে ঃ ক) বাস করা; (খ) ঘরে বসে কাজ করা, (গ) বাসগৃহকে খাদ্য ভান্ডার হিসেবে ব্যবহার করা। বাসগৃহ যে ধরনেরই হোক না কেন সেগুলি মোটামুটি উক্ত কাজসমূহ কমবেশী সম্পন্ন করত। নিম্নে কয়েকটি বাসগৃহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তার সাথে ছবিও সংযোজিত যাতে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়।

১। বায়ু রোধ আবাস (Wind break shelter) - এই ধরনের আবাস খুবই সরল প্রকৃতির। কয়েকটি কাঠের খুঁটি অর্ধবৃত্তাকারে মাটিতে পুঁতে তার একদিকে জীবজন্তুর চামড়া, লতাপাতা প্রভৃতি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। আন্দামানবাসীরা বাঁশ-অথবা কাঠের খুঁটি দিয়ে এ ধরনের আবাস তৈরি করত।

২। গম্বুজ সম্বলিত কোণাকৃতি আবাস ঃ - এই ধরনের আবাসে প্রথমে বাঁশ অথবা কাঠ দিয়ে দেয়াল তৈরি হয়। তারপর সেই দেয়ালই ধীরে ধীরে উপরে উঠে কোণাকৃতি ছাদের সৃষ্টি করে। এটি হলো এমনি একটি কাঠামো যেখানে কখনও চামড়া, কখনও গাছের ছাল, অথবা ঘাস ও লতা পাতা দিয়ে আচ্ছাদন দেয়া হয়। ল্যাপ এবং এস্কিমোদের মধ্যে এ ধরনের আবাস দেখা যায়। উপমহাদেশের নাগপুর ও বিহারের আদিবাসীদের মধ্যে খুবই সরল কোণাকৃতি আবাস লক্ষ্য করা যায়।

৩। **ঢালু ছাদ বিশিষ্ট আয়তাকার আবাস ঃ** এ ধরনের আবাস নির্মাণে প্রথমে মাটি, পাথর অথবা ইট দিয়ে চারদিকে দেয়াল তোলা হয় এবং এর উপর বাঁশ বা কাঠের ঢালু কাঠামো গড়ে চাল দেওয়া হয়। এ কাঠামোটি খড়, তালপাতা অথবা এ ধরনের পাতা দিয়ে ঢাকা

www.swapno.in

হয়। এটি কখনও চার চালা অথবা দো-চালাও হয়ে থাকে। ভারতের আদিবাসী মুন্ডা, ওঁরাও এবং সাঁতালদের মধ্যেই শুধু এ ধরনের আবাস দেখা যায় না, গ্রামাঞ্চলেও এরূপ বাসগৃহ বিদ্যমান। পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামে আটচালা ঘরও দেখা যায়।

৪। **টোডাদের অর্ধবৃত্তাকার আবাস** ঃ দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে বসবাসকারী টোডাদের মধ্যে এ ধরনের আবাস দেখা যায়।

৫। **বৃক্ষাবাস** ঃ মধ্য ভারতের কড়োয়া আদিবাসীদের গাছের উপর নির্মিত আবাস খুবই আকর্ষণীয়। এ ধরনের আবাসে একটি কাঠের সিঁড়ির সাহায্যে মাটির সাথে সংযোগ রক্ষা করা হয়।

বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ছন-বাঁশের তৈরি ঘরে বাস করে এসেছে। এর কারণ বাঁশ ও উলুখড় আপনা থেকেই এদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আবার অনেক এলাকায় মাটির ঘরও দেখা যায়।

খাদ্য ঃ - খাদ্যাভ্যাস বস্তুগত সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য দিক আদিম শিকারজীবী মানুষ কাঁচা মাছ ও মাংস খেত। আগুনের ব্যবহার কৌশল আয়ত্ত করার পর থেকে মানুষ মাছ ও মাংস আগুনে পুড়িয়ে খাওয়া শুরু করে। বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ ও ডাল। তাছাড়া পোলাও, কোরমা, বিরিয়ানী ও নানা ধরনের পিঠা বাঙালীর খাদ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে।

অবস্তুগত সংস্কৃতি

সংস্কৃতির একটি অপার্থিব বা অবস্তুগত দিকও রয়েছে। মানুষের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, চিত্রকলা, গান প্রভৃতির মাঝে সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানের সন্ধান মিলে। আদিম মানুষের নৃত্য, গীত, চিত্রকলা তাদের জীবন ও জীবিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। তেমনি কৃষিজীবীর গান ও নাচ তার পশুপালন ও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্রকলা জীবিকা নির্বাহের সহায়ক রূপে স্বীকৃত। অতএব বলা যায়, সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদান মানুষের জীবনকে করছে সমৃদ্ধ ও পূর্নতর। সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান দ্বারা যেমন সমাজ জীবন অগ্রসর হয়েছে। তেমনি অবস্তুগত উপাদান মানস জগতে নতুন চেতনা ও নব-নব উপকরণ উদ্ভাবনে মানুষকে উৎসাহিত করেছে। এভাবেই সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান সক্রিয়ভাবে একে অন্যকে পরিপুষ্ট করে চলেছে। জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ ও মানস সম্পদ এই তিনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত প্রতিঘাতে যুগে সংস্কৃতির রূপ ফুটে উঠেছে। বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি সম্পর্কে পরিশেষে বলা যায় যে, কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি যেমন মানস সম্পদ তেমনি গাছের ফলমূল ও ফুল সংস্কৃতির অঙ্গ। এখানে সাম্প্রতিক কালে বিশেষ করে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুলের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের দিকটি আমরা বিবেচনা করতে পারি। এ কারণে গোলাপ, রজনীগন্ধা, গাঁদা, কামিনী ও যুঁই প্রভৃতি ফুল বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। রাজধানী ঢাকা শহরের শাহবাগ এলাকা(জাতীয় যাদুঘরের সামনে) ভোর বেলা বিরাট ফুলের দোকান বসে। মানুষের জীবনও জীবিকার সাথে যুক্ত রয়েছে খাদ্য সংগ্রহ ও প্রথা ও উৎপাদন প্রণালী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উৎপাদন প্রথা যেন গৃহের ভিত্তি, আর শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সৃষ্টি যেমন সে গৃহেরই কারুকার্যখচিত উপরতলা বা সৌধচূড়া।

দূর থেকে দেখলে উপরতলার রূপের প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথমে নিবদ্ধ, তারপর নীচের দিকেও দৃষ্টি যায়। কিন্তু ভিত্তির কথা মনে না রাখলে উপরিভাগের অর্থ বুঝা যাবে না। তাই বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক।

www.swapno.in

অনুশীলন ১ (Activity 1) সময় ঃ ৫ মিনিট

অনূর্ধ্ব ৫০টি শব্দ দ্বারা বস্তুগত সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করুন ঃ

অনুশীলন ১ (Activity 2) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

"সংস্কৃতির উপাদানসমূহের রূপান্তর ঘটে।"- এ উক্তিটি অনূর্ধ্ব ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন ঃ

www.swapno.in

সারাংশ ঃ

সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে মানুষের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। যেমন, বলা যায় বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপাদান আর ইংল্যান্ডের সংস্কৃতির উপাদান একরূপ নয়। প্রত্যেক দেশের মানুষের জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন প্রণালীর অঙ্গ। সাংস্কৃতিক উপাদানের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সমগ্র জীবন প্রণালীকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। সাংস্কৃতিক সম্পদ সম্পর্কে একটি মূল্যবান কথা হচ্ছে এই যে, সংস্কৃতির উপাদানসমূহ সময়ের ফসল। অর্থাৎ এসব দীর্ঘ অতীতের সম্মিলিত সম্পত্তি বলে গণ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। মানুষের সামাজিক বৈশিষ্ট্য কোন্‌টিতে প্রতিফলিত হয়?

ক) সংস্কৃতি খ) সংস্কৃতির উপাদান
গ) সভ্যতা ঘ) আচার-আচরণ

২। মানুষের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সংস্কৃতির কোন কোন দিককে নির্দেশকরে?

ক) অপার্থিব খ) বস্তুগত
গ) সামাজিক ঘ) অর্থনৈতিক

www.swapno.in

৩। খাদ্য কোন্ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত?

ক) অপার্থিব খ) মানবিক

গ) অবস্তুগত ঘ) বস্তুগত

www.swapno.in

www.swapno.in

লোকসংস্কৃতি, বিশ্বাস ও লোকাচার

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ অংশটি পাঠ করলে আপনি -

১. লোকসংস্কৃতি কি তা জানতে পারবেন;
২. মানব সমাজে লোকসংস্কৃতির প্রভাব কতটুকু তা জানতে পারবেন ; এবং
৩. বিশ্বাস ও লোকাচার কাকে বলে সে সম্পর্কে অবহিত হবেন।

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা (Definition of Folk Culture)

ভূমিকা

আমরা সাধারণত মনে করি যে, আমরা খুব আধুনিক; অতীতকে আমরা স্বীকার করিনা। কিন্তু অতীত আমাদের মাঝে বেঁচে আছে নানা রূপে, নানা ভাবে। আমাদের নিজেদের মধ্যে নিহিত অতীত সম্পর্কে জানতে পারি। মূলত যেকোন সমাজ সম্পর্কে জানতে হলে সে সমাজের লোকঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতি সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লোকসংস্কৃতিকে (Folk culture) বুঝতে হলে আমাদের লোকসাহিত্য (Folklore) সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে। আসুন এবার আমরা জেনে নেই লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য বলতে কি বোঝায়।

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা;

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে লোক বিদ্যা (Folkore) কাকে বলে? ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের উইলিয়াম থমস্ দি এ্যাথেনিয়াম পত্রিকায় লিখিত একটি পত্রে প্রথম folklore শব্দটি ব্যবহার করেন। মূলত, মানুষের মধ্যে (কেবল আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে নয় আধুনিক সমাজের লোকশ্রুতি, প্রথা ক্রিয়াকান্ড প্রভৃতি নিয়ে যে বিদ্যা বিশেষভাবে আলোচনা করে তাকে বলা হয় ফোকলোর (Folklore) বা লোকবিদ্যা। ইংরেজি "ফোক" মানে লোক আর "লোর" মানে বিদ্যা বা জ্ঞান। ফোকলোর এর গবেষণা সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছে। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের অনেক আবিষ্কারের সহায়ক হয়েছে এবং কিংবদন্তির অর্থ উদ্ধারের জন্য কাজে লেগেছে। নৃতত্ত্ব যেখানে প্রধানত আলোচনা করে আদিম সমাজের কথা, লোকবিদ্যা বিশারদরা সেখানে চান আধুনিক সমাজের মধ্যে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রচলিত অতীতের অলিখিত উত্তরাধিকার ও লোকবিশ্বাসকে বিচার বিশ্লেষণ লোক বিদ্যায় পাহাড়-পর্বত ও উপত্যাকা এবং সর্বোপরি, বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্পর্কে নানা কল্প কথা বিদ্যমান। বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত এ সবকে একযোগে লোক কাহিনী, লোক-বিশ্বাস বা লোকগাথা বলে।

> লোকসংস্কৃতিকে কোনভাবেই অনগ্রসর সংস্কৃতি বলা চলে না।

> মূলত, লোক-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষের জ্ঞান দীপ্ত বাণী শুনতে পাই।

লোক সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি ঐ সাংস্কৃতিকে যা গ্রামীণ জনগণের সংস্কৃতি এবং তা প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি বলা হয় যে, লোক সংস্কৃতি হলো কুসংস্কৃতি এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের শহুরে নাগরিক সংস্কৃতি হলো সু- সংস্কৃতি, তা হলে সংস্কৃতি কথাটির অপব্যাখ্যা করা হয়। লোক সংস্কৃতিকে মৌনভাবেই অনগ্রসর সংস্কৃতি বলা চলে না - লোক সংস্কৃতিরও নিজস্ব একটি শক্তি আছে, প্যার্টান আছে । এমন কি হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে লোক সংস্কৃতি নাগারিক সংস্কৃতির চেয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ। লোক সংস্কৃতি একটি দেশের একটি সমাজের বৃহত্তর সংস্কৃতিরই অঙ্গ - তা অনগ্রসরও নয়,

www.swapno.in

অপাংক্তেয়ও নয়। বস্তুত, আদিম ধ্যান-ধারণা কম বেশী সবার মধ্যেই আছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মনের তারতম্যের প্রশ্নটি তোলা উচিত নয়। কারণ আমাদের সংস্কৃতি আমার বিচারে শ্রেষ্ঠ হতে পারে অপরের সংস্কৃতি অপরের নিকট একই কারণে উত্তর হতে পারে। মূলত সংস্কৃতিকে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পূর্ব নির্ধারিত মানের নিরিখে নয়। পৃথিবীর কোন সংস্কৃতিই তুচ্ছ বিবেচিত হতে পারে না। মূলত লোক সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের বিস্মৃতি পিতামহদের জ্ঞানদীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। লোক সংস্কৃতি বলতে আমরা একদিকে যেমন জনগণের পরিশীলিত সৃষ্টি বা ঐতিহ্য কে বুঝতে চেষ্টা করি অন্যদিকে তেমনি জনজীবনের ব্যাপক পরিধিকেও যার মধ্যে রীতি-নীতি, আচর-আচরণ পোশাক পরিচ্ছদ, উৎসব-পার্বণ খেলাধূলা ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদদের মতে অবশ্য লোকসংস্কৃতি আরো ব্যাপক, অর্থাৎ জন জীবনের ও সমাজের সামগ্রিক জীবনাচরণ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের বিচিত্র জীবনের সামাগ্রিক প্রতিফলন ঘটে লোক-সংস্কৃতিতে। মুলত লোক-সংস্কৃতি লোক সমাজের সৃষ্টি - যা মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয় এবং যার মধ্য দিয়ে লৌকিক মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভা ভাবনা, মননশীল এবং জীবনাচারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। লোক-সংস্কৃতি সমাজের সার্বিক সংস্কৃতির রূপ সমাজ বিবর্তনের ধারায় প্রবহমান থাকে। আর ঐ প্রবহমান কাল স্রোতের বাঁকে বাঁকে লৌকিক মানুষের যে সৃজনশীল ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, জীবন-যাপনের মৌলিক পদ্ধতি, সেসবের সমন্বিত রূপই হচ্ছে লোক সংস্কৃতি। এদিক থেকে বলা যায় লোকসংস্কৃতি হচ্ছে যে কোন সমাজের অতীত ও বর্তমানের এক প্রাণশক্তি সম্পত্তি জনসাধারণের জীবন পদ্ধতি।

মানব সমাজের ক্রমবিকাশের লোকসংস্কৃতির ভূমিকা

লোক সংস্কৃতি কোন সময় থেকে শুরু হয়েছে, তা এক কথায় বলা যায় না। তবে এটা মনে করা হয় যে, এটি মানুষের মতই প্রাচীন। তবে আদিম সমাজে লোক-সংস্কৃতি আজকের মত ছিল না। গুহাবাসী আদিম মানুষের জীবন ছিল উদ্দাম। সে যুগের মানুষ নিজের প্রয়োজনের তাগিদে ফলমূল সংগ্রহ করেছে। নদী, খাল, বিল থেকে মাছ শিকার করেছে, পশু শিকার করেছে। তারপর কর্মক্লান্ত শিকারীরা একত্রিত হয়েছে আপন গুহার আঙ্গিনায়। বিজয়ের আনন্দ-উল্লাসে চলেছে তখন নাচ-গান। এখনও ভারত-বর্ষের নাগাদের মাঝে এই রীতি প্রচলিত আছে। এভাবেই আদিম জনগোষ্ঠীর সীমাবদ্ধ জীবনের মধ্যেই লোক সংস্কৃতির বীজ অংকুরিত হয়। মানুষ ক্রমে ক্রমে সামাজিক সংগঠনের (Social organization) মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হতে থাকে এবং তাদের জীবন যাত্রা প্রণালীতে আসতে থাকে পরিবর্তন। মানুষের আচার আচরণসহ জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আসতে থাকে বিবর্তনের (Evaluation) অপরিহার্য সূত্র ধরে। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ তার যে রুচি অভ্যাস চিন্তা চেতনা এবং সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছে লোক সংস্কৃতি সেটাকে বহন করে চলেছে। বলা যায়, লোক সংস্কৃতি মানুষের জীবন পথের অনুষঙ্গী। আদিম মানব সমাজেই লোক সংস্কৃতির উৎপত্তি; এবং মানব জীবনের বিবর্তনের স্রোত বেয়ে লোক সংস্কৃতি কালে কালে দেশে দেশে স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে। আর এভাবেই লোক সংস্কৃতি নতুন নতুন ডালপালা ও পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠেছে। লোক সংস্কৃতির জন্ম সুদূর অতীতে, কিন্তু কালের বিবর্তনে তা ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে বলে তাকে ছেদ পড়ে না। লোক সংস্কৃতির একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য এই যে এর ভিত্তিমূল অতীতে প্রোথিত হলেও ঐ সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে বর্তমানের সীমানা পর্যন্ত। লোক সংস্কৃতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটি সার্বজনীন এবং তা সকল মানুষের সম্মিলিত সম্পদ। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, লোক সংস্কৃতি ব্যক্তি পরম্পরায়, বংশ-পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়। এই হস্তান্তর প্রক্রিয়ায়ই এই (Transmission) লোক সংস্কৃতি বিকাশের প্রধান বাহন। বিপুল ও বিচিত্র উপাদানে আমাদের লোকসংস্কৃতির ভান্ডার পরিপূর্ণ। লোক সংস্কৃতির একটি প্রাচীন উপাদান ধাঁধা ও প্রবাদ। এই ধাঁধা ও প্রবাদের মধ্যে সমাজ-

www.swapno.in

জীবন প্রতিফলিত হয়। লোক সমাজে সাধারণভাবে ধাঁধা ও প্রবাদের ব্যবহার থাকলেও বিবাহ অনুষ্ঠানে অনেক সময় আবশ্যিক বিষয় ছিল ধাঁধা ও তার উত্তর প্রদান। গ্রাম -বাংলায় বিবাহ উৎসবে ধাঁধার উত্তর দিতে না পারলে বরপক্ষকে বড়ই নাজেহাল হতে হতো। আশ্চর্যের সাথে লক্ষ করা যায়। একই লোককাহিনী, ধাঁধা ছড়ার বিশ্বব্যাপী রূপান্তর দেখা যায়। আদিম মানব সমাজে অথবা তারও পরে যে বিশ্বাস কিংবা সর্বপ্রাণবাদের (Animism) জন্ম হয়েছিল তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা এখানে প্রশ্ন করতে পারি যে, লোক সংস্কৃতির এই বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতা কেমন করে সম্ভব পর হয়েছে? প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করত। এই স্থানান্তরিত মানুষের মাধ্যমেই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে লোকসংস্কৃতির আলো। সুতরাং লোকসংস্কৃতির প্রসারতার জন্য মানুষের বহির্মুখীনতারই মূলত দায়ী বলা যায়। এ কারণেই ইউরোপ ও আমেরিকার লোকসংস্কৃতির সাথে আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতির কতক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে মানুষের সমাজ জীবন প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম ধাঁধা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

"Four Feet it has in the morning,
yet first movemet is a lacking.
With about mid-day,
He can manage much better,
Though he gets at night-fall three,
He moves but solt and slow."

আমরা আশ্চর্যের সাথে দেখতে পাই যে, একটি বাংলা ধাঁধায় উপরে বর্ণিত ইংরেজী ধাঁধার অবিকল প্রতিধ্বনি। যেমন,

সকাল বেলায় চার পায়ে হাঁটে
দুপুর বেলায় তিন পায়ে হেটে
দেশে চলে বাবাজী। (অর্থ = মানুষ)

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লোকসংস্কৃতি এমনই এক বিষয় যাকে কোন ব্যক্তি বিশেষ বা অঞ্চলের একক সম্পদ বলা যাবে না। লোক সংস্কৃতির জন্ম যদিও প্রাচীন কালে, তবুও কালের অমোঘ নিয়মে লোক সংস্কৃতির মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। মানুষের বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান লোক সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখাকে সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করে দিয়েছে। এদিক থেকে বলা যায়, লোক সংস্কৃতি বিশ্বমানব সমাজের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য রাখী বন্ধনের ভূমিকা পালন করেছে। মূলত, লোক সংস্কৃতি লোক-সমাজেরই সৃষ্ট ঐতিহ্য। একটি সমাজও, সম্প্রদায়কে জানতে হলে তাদের লোকসংস্কৃতিকে প্রথমে অনুধাবন করতে হয়। কারণ আমরা আমাদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ কোন কিছুতেই আমরা লোকসংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত নই। মূলত, সমষ্টিগত চেতনা ও চিত্ত বিকাশের মাধ্যমে লোক সংস্কৃতির জন্ম। লোক সংস্কৃতি সমষ্টির মর্মবাণী বহন করে। সমাজবিজ্ঞান মানব সমাজকে তুলনামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করে। আর এ ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানকে সাহায্য করে। লোক সংস্কৃতি আসলে সমাজ জীবনের বৈচিত্র্যের ধারক ও বাহক। লোক সংস্কৃতিতে কৃত্রিমতা নেই। সেজন্য লোক সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজের যে ছবি আমরা পাই তা বাস্তব। উদাহরণস্বরূপ, ময়মনসিংহ গীতিকার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির এই বিশেষ ধারায় যাদের জীবন চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তারা মূলত হাজং কোচ ও গারোদের উত্তর পুরুষ। এসব আদি জনগোষ্ঠীর সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তাই কি স্বামী নির্বাচনে, কি গৃহাচারে জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীর অবাধ স্বাধীনতা বিদ্যমান। যে কোন জনগোষ্ঠীর

লোকসংস্কৃতি লোকসমাজেরই সৃষ্ট ঐতিহ্য।

www.swapno.in

সংস্কৃতি বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গড়ে উঠে। যেমন, ধর্ম, ভাষা, উৎপাদন ব্যবস্থা, খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতি। মূলত, সমাজ সত্তার রূপায়ণে লোক সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। লোক সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে মানুষের সমাজ বিন্যাসের ধারা এবং সামাজিক জীবনাচারের নানাবিধ উপকরণ সম্পর্কে আমরা ধারনা লাভ করতে পারি। যুগে যুগে লোক সংস্কৃতি সমাজ জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

সমাজবিজ্ঞান মানব সমাজকে তুলনামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করে। এ ক্ষেত্রে লোক সংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানকে সাহায্য করে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির চর্চাকে গভীরতর করতে হবে। আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনও নিরক্ষর। তবুও আশ্চর্যজনকভাবে এ কথা সত্য যে, ব্যাপক গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যগত লোক সংস্কৃতি থেকে যে জীবনরস, বিবেচনা-শক্তি ও বিশ্বদৃষ্টি লাভ করেছে তা তাদের মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ সমাজে ক্রিয়াশীল রয়েছে এক ধরনের সুস্থ সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, যা মানুষের ভেতর মিলন ও সংহতির ক্ষেত্রও প্রশস্ত করেছে। লোক সংস্কৃতি স্থবির (Static) নয়, গতিশীল (dynamic)। সমাজ বাস্তবতা এবং রূপান্তরই লোকসংস্কৃতির প্রাণ। লোকসংস্কৃতি যে আজকের সমাজেও কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভারের অজ্ঞাতনামা শহীদদের উদ্দেশ্যে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ সংলগ্ন অঞ্চল, বাংলা একাডেমী ও শিশু একাডেমীর কতক এলাকায় সারা বছর ধরে মৃৎশিল্পের যে পসরা সাজানো দেখা যায় তা মূলত লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যেরই পুনরাবির্ভাব বলা যায়। এরই সঙ্গে উল্লেখ্য, এলিফেন্ট রোড, সাকুরা মার্কেট, মহাখালি অঞ্চলে তামা কাঁসা ও পিতলের শিল্প নৈপূন্য ভাস্বর ও নব নব উদ্ভাবনাময় কাজের বিপুল সম্ভার। এক সময়ের এই সব প্রয়োজনের উপকরণ (Utilitarian Objects) এখন শৈল্পিক উপাদানে পরিণত হয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নান্দনিক চাহিদা মেটাচ্ছে। এই হলো হাজার বছরের বাঙ্গালী সংস্কৃতির লোক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। আবার বিশে ফেব্রুয়ারী রাত ও একুশের সকালে শহীদ মিনারে ফুল দেয়া প্রভাত ফেরি এসবই এখন একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। নতুন করে সৃষ্টি হয়ে ক্রমে বলবান হয়ে উঠেছে। কাজেই বলা চলে যুগে যুগে লোক সংস্কৃতি সমাজের ক্রমবিকাশে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বিশ্বাস হচ্ছে ব্যক্তির ধারণা ও জ্ঞান।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ভোগ ও ত্যাগ এবং মিলন ও বিরহ লোকসংস্কৃতির অবয়বে লিখিত অথবা অলিখিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হয়ত কোন গ্রন্থের মাধ্যমে নয়, কোন সুপরিকল্পিত পন্থায় নয় এই লোক সংস্কৃতি মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে এক পুরুষে থেকে অন্য পুরুষে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সঞ্চারিত হয়েছে এবং স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

www.swapno.in

বিশ্বাস ও লোকাচারের সংজ্ঞা এবং এ সম্পর্কে পর্যালোচনা

(Definition of Belief and Folkways and critical analysis)

এ পর্যায়ে প্রথমে আমরা জানতে চেষ্টা করবো বিশ্বাস (Beliefs) বলতে কি বোঝায় এবং মানুষের মধ্যে কি কি ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে।

আদিম যুগ থেকেই মানুষ সব সময় দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে আসছে। সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে কতকগুলি নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। মানুষ নিজেই তার সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলে। জন্মের পর থেকে মানব শিশু সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতির প্রভাবে

www.swapno.in

সামাজিক হওয়ার শিক্ষা পায়। মূলত সামাজিক রীতিনীতির ফলে সমাজে কিছু আস্থা বিশ্বাস, প্রথা এবং লোকাচারের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস, প্রথা, লোকাচার আসলে সমাজ ও সংস্কৃতিরই ফসল। তাই কোন সমাজকে জানতে হলে সেই সমাজের বিশ্বাস, লোকাচার সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। সে সমাজ হোক আদিম অথবা আধুনিক হতে পারে। সমাজের বিভিন্ন প্রথাগত আচার আচরণের মধ্যে দিয়ে মানুষের মনোজগৎ যেভাবে প্রস্ফুটিত হয়, অন্যকিছুর মাধ্যমে তা হয় না। তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই বিশ্বাস কি? বিশ্বাস বলতে পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে ব্যক্তির স্থায়ী ধারণা ও জ্ঞানকে বোঝায়। অন্য কথায় বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির উপলব্ধি ও জ্ঞানের সমন্বিত রূপকেই বিশ্বাস বলা যেতে পারে। যেমন, একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী গোলাকৃতি।

সমগ্র বিশ্বেই একথা বিশ্বাস করা হয় যে, নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্তপাত কোনদিন বৃথা যায় না।

১৩ যে একটি অশুভ নম্বর সমগ্র বিশ্বেতা একটি বিশ্বাস হিসেবে স্বীকৃত।

মানব সমাজের আদিম স্তর তেকে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত মানুষ তার প্রাচীন বিশ্বাস, মূল্যবোধও সংস্কারকে বর্জন করে এমন নতুন জ্ঞান, জীবনধারা ও সংস্কৃতি অর্জন করেছে- কিন্তু তবু সভ্যতার উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আজো মানুষ গর্ব করে বলতে পারে না যে, আদিম সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কারকে মানুষ সম্পূর্ণ বর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। এমন কি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত সমাজে ও বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও লোক সংস্কারের প্রভাব আজো বিদ্যমান। বহু ক্ষেত্রেই এই বিশ্বাসগুলোকে চেষ্টা করেও সমাজ থেকে সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়নি। অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে বর্জনের কোন চেষ্টাই হয়নি। বলা যায়, আধুনিক মানুষের অবচেতন মনে আদিম সমাজের বহু বিশ্বাস ও সংস্কার আজো বিরাজ করছে। যে-সমাজে মানুষের চেতনার বিকাশ এখনো নিম্নস্তরে যে সমাজে তার যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচনা শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ এবং সীমিত আর এ ধরনের সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোন কিছুর পশ্চাতে যে একটি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বিদ্যমান থাকে সেই কার্যকারণ সম্পর্কে বোধগম্যতার প্রকৃত ক্ষমতা না থাকায় মানুষের মনে নানরূপ দ্বিধা, সংকোচ ও আজগুবি চিন্তাধারার জন্ম হয়। যে সমাজে মানুষের এই ক্ষমতা যত সীমিত ও দুর্বল সে সমাজই এসবের প্রভাব বেশী। তবে এ প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় প্রয়োজন যে, সভ সমাজেও যেমন আজকের ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজেও বহু লোক বিশ্বাস করে হাত থেকে পড়ে আরশি ভাঙ্গা ও ছাতা পড়ে যাওয়া অমঙ্গলের লক্ষণ, রবিবারে জন্মগ্রহণ ছেলের ভাগ্য হবে ভাল; খালি দোলনা হঠাৎ দুললে দুলে ওঠার অর্থ হল ঘরে সুন্দর খোকা আসবে, নববিবাহিত দম্পতির যাত্রাকালে তাদের পেছনে ছেঁড়া জুতা ছুড়ে ফেললে তাদের জীবন হবে সুখী। নিউইয়র্কের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ীও ক্রয়-বিক্রয়ের দিনে তার সৌভাগ্যসূচক নেকটাই ব্যবহার করে থাকেন। হামবুর্গের একজন দোকানী দিনের প্রারম্ভিক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় শুরু করেন - বাংলাদেশের দোকানী এ জাতীয় বিক্রয়কে বলেন, সাইত করা কিংবা যাত্রা করা সাইতের সময় জিনিষের দাম নিয়ে তিনিও বেশী বাড়াবাড়ি করে না। আমেরিকার উত্তর-করোলিনাতে পাহাড়ে উঠতে একজন যুবক প্রথমে একটি গাছের শিকড়ে টান দেবে, অন্যথা তাকে হাঁপানি রোগে আক্রমন করতে পারে। একজন ইংরেজ জেলে প্রথমে পেছন দিক থেকে জাল ছুড়ে ফেলে, কেননা যে বিশ্বাস করে এতে সারাদিন তার জালে ভালো মাছ ধরা পড়বে। আমোরিকার জনৈক প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তার নির্বাচনী সফরের সময় পকেটে একটি খরগোশের পা রাখতেন; কেননা কেননা খরগোশের পা সৌজন্য নির্দেশক। সমগ্র বিশ্বেই একথা বিশ্বাস করা হয় যে, নিরপরাধ ব্যক্তিরদের রক্তপাত কোনদিন বৃথা যায় না। ১৩ যে একটি অশুভ নম্বর সমগ্র বিশ্বে তা একটি বিশ্বাস হিসেবে স্বীকৃত। তাই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের সমাজেই এ ধরনের বহু বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার প্রচলিত আছে।

বস্তুত, আমরা আরো অনেক কিছুতে বিশ্বাস করি। যদিও ইউরোপের উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা আমাদের মধ্যে সংস্কার কিছুটা কমাতে সক্ষম হয়েছে বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য দেশের মত আমাদের সংস্কৃতিও বলতে গেলে সংস্কারেরই সঞ্চিত রূপ। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, তাবিজ ব্যবহারের দিক থেকে আমরা আদিম উপজাতি থেকে এগিয়ে আছি একথা জোর করে বলা যায় না। শিক্ষিত মহিলারা এখনও আমাদের সমাজে তাদের শিশু সন্তানদের

www.swapno.in

কপালে এমনভাবে কাজলের টিপ দেন যাতে কারো কুনজর পড়ে ক্ষতি না হয়। আমাদের গ্রামদেশে যে সব মায়ের ছেলে পিলে জন্মের পর মারা যায়, তারা অনেক সময় মৃত্যুর হাত থেকে ছেলেকে বাঁচাবার জন্য আর একজনের কাছে শিশু জন্মাবার পর আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্রী করে দেন। তারপর খুদকুড়ো দিয়ে আবার কিনে আনেন এমন ছেলেকে বলা হয় 'খুদ'। বিশ্বাস করা হয় যে, এভাবে নিজের ছেলে অপরের সন্তান হয়ে গেল। কেনা ছেলে ঠিক নিজের নয়। আর নিজের নয় বলেই তা মরবে না। ধারণা করা হয়, ছেলে মরছে কোন অপ-আত্মার প্রভাবে। যে আত্মা কোন মেয়েকে আশ্রয় করে সুখী হতে চায়। আর তাই চায় না তার ছেলে পিলে বেঁচে থাক। অনেক শিক্ষিত স্বামী এখনও বিশ্বাস করেন স্ত্রীর হিস্টিরিয়া হলে অথবা তার ছেলে-পিলে হয়ে মরে গেলে তার উপর কোন অশরীরী শক্তির আশ্রয় ঘটেছে।

একসময় বিলেতের লোকেরাও ডাইনীতে বিশ্বাস করত। তাই ইউরোপের বহু মেয়েকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস আমাদের লোকের মনে এখনও নানভাবে কাজ করে চলছে। কেউ যাতে যাদু বিদ্যার দ্বারা ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য রাজমিস্ত্রিরা এখনও আমাদের দেশে ভাঙ্গা ঝুড়ি ও ঝাটা একটা বাঁশের মাথায় বেঁধে লটকিয়ে রাখে বাড়ি তৈরীর সময়। তাদের ধারণা, ঝাটার প্রতি নজর পড়লে অপশক্তি তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেবে। এধরনের বহু বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে আমাদের সমাজে।

বাংলাদেশের রাজশাহী এলাকায় রবিবারে কেউ বাঁশ কাটে না। মনে করা হয় যে, এই দিনে বাঁশ কাটা উচিৎ নয়। কারণ মানুষের বিশ্বাস রবিবার বাঁশের জন্মদিন। বিশ্বাসটা এত প্রবল যে, রবিবারে মানুষ মরলে যদি বাড়িতে কোন বাঁশ কাটা না থাকে তবে মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য সরণাপন্ন হয়। কেউ ঝাড় থেকে বাঁশ কাটে না। হিন্দু মুসলমান সবার মধ্যেই এ বিশ্বাস সমানভাবে চোখে পড়ে । মানুষ মরে গেলে ভূত (অপকারী আত্মা) হতে পারে এ বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রবল। বিশ্বাস না করলেও অনেক অন্ধকার রাতে একা ঘরে ভূতের ভয় পায়। এখনও আমাদের গ্রামে বহু লোকে বিশ্বাস করে স্যাওড়া গাছে ভূত থাকে। রাতে বিজন গ্রামে গাছের কাছ দিয়ে সাধারণত লোকে একা হেঁটে যেতে চায় না। এরকম অনেক কিছুই আমরা বিশ্বাস করি আমাদের লোক জীবনে। খালি কলস দেখলে ভাবা হয় অযাত্রা, কিন্তু কলস নিয়ে কাউকে পানি আনতে যেতে দেখলে ভাবা হয় শুভ লক্ষণ। হয়ত বিশ্বাস করা হয় শূণ্যতা অমঙ্গলের, আর পূর্ণতা মঙ্গলের প্রতীক। প্রাচীন মিশরীয়রা বিড়ালকে খুব পবিত্র ভাবত। কিন্তু যাত্রাকালে বিড়াল লাফ দিলে বহু বাঙ্গালীই ভাবে যাত্রা শুভ হবে না। অন্যদিকে অনেকে বিশ্বাস করেন কাউকে যদি ইলিশ মাছ নিয়ে যেতে দেখা গেলে তা যাত্রা শুভ হবে। কোন কিছু হবে না, একথা ভাববার সময় যদি টিকটিকি টিকটিক করে। সম্ভবত, টিকটিকি টিকটিক করে বলেই আমরা বিশ্বাস করি যা ভাবছি তা ঠিক হবে। এরকম বহু ধরনের বিশ্বাসের বেড়াজালে আমাদের সমাজ জীবন আবদ্ধ।

লক্ষ করলে দেখা যায় যাবে যে, আমাদের দেশে মানুষ রাতে বাঘ, সাপ এসবের নাম উচ্চারণ করতে চায় না। স্পেনেও মানুষ রাতে সাপের নাম উচ্চারণ করে না। বিশ্বাস করে, নাম করলে এরা ডাক শুনে সত্যি এসে পড়বে। ফলে বিপদ ঘটবে। কিন্তু মেয়েরা কোন স্বামীর নাম করতে চায় না তার নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া শক্ত। আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তারাও অনেকের নাম করে না। অনেকের সামনে আহার করে না। ভাবে, এসব করলে তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান হবে। নৃতত্ত্বে একে বলা হয় "এড়িয়ে চলা প্রথা" (Avoidance custom)। এর উল্টোটাও আবার দেখা যায়। যেমন, আদর করে নাম ধরে ডাকা। বিলাতে কোন কোন সময় বুড়ো বাপকে তার ছেলেরা নাম ধরে ডাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নৃবিজ্ঞানে সাধারণত দু'ধরনের সম্পর্কের কথা বলা হয়, যেমন, ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্ক (Joking relationship) নিষিদ্ধ (Avoidance relationship)। আত্মীয় সম্পর্ক এবং উদাহরণ উল্লেখ করা যায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ভাসুরের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সরাসরি কথা বলেন না, তার নাম উচ্চারণ করেন না। তাদের মধ্যে দৈহিক স্পর্শও [ভুলবশত হলেও] নিষিদ্ধ অর্থাৎ এটি ঘটলে তা মারাত্মক

www.swapno.in

অপরাধ বলে গণ্য। অপর দিকে, বিবাহিত স্ত্রীর ছোট ভাইবোনদের সাথে দুলাভাই বা জামাইবাবুর ঠাট্টা তামাসা ও পরিহাস রসিকতা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রথমটি নাগরিক জীবনে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ উক্ত নিষিদ্ধ আত্মীয় সম্পর্ককে আর আগের মতো তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে দ্বিতীয়টি এখনও কমবেশী আমাদের গ্রাম ও শহরে প্রচলিত।

একসময় মানুষ মৃত আত্মার পূজা করত। কিন্তু এ রীতি এখনও সম্পূর্ণ চলে যায় নি। ইউরোপে অনেক সাধুসন্তের আশ্রম আছে। আমাদের দেশেও আছে পীরের দরগা। আদিম যুগে মানুষ কবরের উপর পাথর স্থাপন করে তাতে ধরে রাখতে চেয়েছে মৃতের আত্মাকে। নৃবিজ্ঞানী এন্ডারসনের মতে, এটি সর্বপ্রাণবাদের (Animism) এক বিশেষ রূপ। এখানে সমাজ জীবনের আরো কয়েকটি বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমনঃ-

১। **স্থান সম্পর্কিত বিশ্বাস ঃ-** স্থানের নাম, পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে কল্পকাহিনী শোনা যায় তাকেই স্থান সম্পর্কিত বিশ্বাস বলে।

২। **ব্যক্তি সম্পৃক্ত বিশ্বাস ঃ-** ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে জনসাধারণ যে গল্পকাহিনী রচনা করে তাই ব্যক্তি সম্পৃক্ত বিশ্বাস বলে অভিহিত। রাজা মহারাজা, ঐতিহাসিক নারী-পুরুষ এ ধরণের বিশ্বাসের নায়ক - নায়িকা। যেমন ঢাকার অদূরে গাজীপুরস্থ ভাওয়াল রাজা সম্পর্কে নানা ধরনের গল্প-কাহিনী মানুষের মনে এখনও বিদ্যমান।

৩। **প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশ্বাস ঃ-** মাজার,মসজিদ, গোরস্থান, সমাধি, শ্মশান, জমিদার ভবন, নীলকুঠি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যেসব লোকবিশ্বাস প্রচলিত তাকে বলা হয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশ্বাস। যেমন, গভীর রাতে মাজার প্রাঙ্গনে খড়মের খটখটি শব্দ শোনা যায়, কোনো কোনো শ্মশান ঘাটে অমাবস্যার রাতে অদৃশ্য মানুষের মেলা বসে, কোনো কোনো মসজিদে জিন নামাজ আদায় করে।

৪। **বৃক্ষলতা সংক্রান্ত বিশ্বাস ঃ-** বন-উপবন, গাছ-গাছড়া, বিভিদ উদ্ভিদ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব বিশ্বাস প্রচলিত আছে সেগুলোকে বৃক্ষলতা সংক্রান্ত বিশ্বাস বলা যায়। বিস্তির্ণ মাঠের মধ্যে একটি গাছ কেমন করে হয়েছে, এক ধরনের ভয়ভীতি এর সাথে জড়িত আছে এবং ঐ গাছের ঐন্দ্রজালিক শক্তির কারণে গৃহবধু পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে ঘর ছাড়ে এ ধরনের কত যে কাহিনী এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে তার ইয়ত্তা নেই।

৫। **জলাশয় সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ঃ -** নদী, খাল, বিল, পুকুর, দিঘি প্রভৃতি সম্পর্কে যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে সেগুলোকেই বলা হয় জলাশয় সম্বন্ধীয় বিশ্বাস। যেমন, কোনো দিঘি খনন করার সময় হয়তো কোন জীবকে বলি দিতে হয়েছে এমন বিশ্বাসও প্রচলিত রয়েছে। এভাবে দেখা যায় মানব জীবন বিভিন্ন বিশ্বাস ও লোক সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আসুন এবার আমরা জেনে নেই লোকাচার (Folkways) কাকে বলে।

লোকাচার সমাজস্থ মানুষের ব্যবহার র অঙ্গ।

মানুষ নিয়মরীতি নিয়ন্ত্রিত সমাজে বাস করে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষ জানতে পেরেছে, কোনটা কাম্য, কোনটা শ্রেয়, কোনটা গ্রহণযোগ্য বা কোনটা বর্জনীয়। এভাবে নানরকম আচরণবিধি গড়ে উঠেছে এবং জীবন ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমাজ জীবন এইসব আচরণ বিধি দ্বারা নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সব আচরণবিধি সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন কোন আচরণ বিধি পালন করা প্রায় বাধ্যতামূলক। বাধ্যতামূলক আচরণ-বিধি লংঘন করলে নানারকম শাস্তি পেতে হয়। আবার কোন কোন আচরণ বিধি পালন করা বা না করা অনেকটা ইচ্ছাধীন। গুরুত্বের তারতম্যের ভিত্তিতে সমাজতত্ত্ববিদগণ সামাজিক আচরণ বিধিকে ভাগ করেছেন।

সাধারণত যেসব আচরণ বিধি লঘন করলে সমাজের পক্ষ থেকে কোন জোরজবরদস্তি করা খাটান হয় না, এই ধরনের আচরণ বিধিকে সমাজবিজ্ঞানী সামার (William Graham Summer) লোকাচার (folkways) বলে আখ্যায়িত করেছেন। ম্যাকাইভার বলেন

www.swapno.in

"Folkways are the recongnized or accepted ways of behaving in society" অর্থাৎ সমাজে স্বীকৃত আচরণ এবং গৃহীত পন্থা-পদ্ধতিকে বলা হয় লোকাচার। মানুষ সামাজিক প্রথা বা রেওয়াজ মেনে চলে এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের নিয়মরীতি অনুযায়ী আচরণ করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানীরা লোকাচার নামে এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ উদ্ভাবন করেছেন, যা সমাজসৃষ্ট এসব নানা আচার প্রথা, ব্যবহার প্রণালী, জীবনধারা প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সামনার তার Folkways নামক গ্রন্থে লোকাচারকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে সমাজের স্বাভাবিক গতিধারায় লোকাচার সৃষ্টি হয়। নতুন অবস্থার সঙ্গে লোকাচার খাপ খাইয়ে নেয়। দেখা গেছে যে, সর্বকালে ও সকল সমাজে মানুষ স্বীকৃত ব্যবহার-বিধি সাধারণত মেনে চলে। সামাজে প্রচলিত সাধারণ প্রথা, শিষ্টাচার, আদাব-কায়দা তথা মানুষের ব্যবহার বিধি এর অন্তর্ভুক্ত। সমাজভেদে অবশ্য লোকাচার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। লোকাচারকে যদি আমরা শুধুমাত্র ব্যবহার বিধি মনে না করে ব্যবহার নিয়ন্ত্রক বলে মনে করি তখন তা আবার হয়ে যাবে অবশ্য পালনীয় লোকরীতি বা মোরেজ (Mores)। মোরেজ মূলত ফোকওয়েজই বটে। মোরেজের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা পালনে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এট ঠিক, ওটা ঠিক নয়, এভাবে নয়, ঐভাবে, এটা পালনীয়, সেটা বর্জনীয় এ ধরনের বিধি নিষেধ সম্বলিত লোকরীতি হলো মোরেজ। এই মোরেজ আমাদের কিছু করতে বাধ্য করে আবার কিছু না করতে মানা করে।

মানব সমাজে লোকাচার অনেক সময় অসচেতনভাবে সৃষ্টি হয়। প্রায় সব সমাজের সকল মানুষের জীবনই লোকাচার দ্বারা কম-বেশী নিয়ন্ত্রিত হয়। লোকাচারের কোন কোন দিক অবশ্য ধর্ম দর্শন, নীতি বা প্রজ্ঞা দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়। লোকাচার বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। আবার সময়ের ব্যবধানে একই সমাজে লোকাচারের রূপ বদলায়। সামাজিক প্রথা ও লোকাচার সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, সামাজিক প্রথা, লোকাচর এবং লোকরীতি মানুষকে সমাজ-আকাংক্ষিত পন্থায় গড়ে তোলে। সমাজবদ্ধ মানুষকে সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি মেনে চলতে হয় এবং এশিক্ষা সে বাল্যকাল থেকেই পেয়ে থাকে। মোট কথা, প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতির বিরুদ্ধাচরণ করে সমাজে বসবাস করা কঠিন।

লোকাচারের প্রকারভেদ ঃ

১। **বেশভূষা সংক্রান্ত লোকাচার ঃ** বেশভূষা সংক্রান্ত লোকাচার আছে। কারণ যে ধরনের বেশভূষা করে মহিলারা বিবাহ বাসরে যান, ঠিক সেরকম সাজসজ্জা করে তারা কখনই কোন মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যান না। যদি কেউ যান তাহলে কেউ কিছু না বললেও কিংবা অনুযোগ না করলেও মনে মনে অপছন্দ করে থাকেন। কারণ কোন উপলক্ষে কি ধরনের সাজপোষাক করা হবে এটা হল লোকাচারের অন্তর্গত। তাই লোকাচার লংঘন করলে এরূপ আচরণকে স্বাভাবিক বিধি-বহির্ভূত আচরণ বলে গণ্য করা হয়।

২। **আচরন সম্পর্কিত লোকাচার ঃ** আচরণ সম্পর্কিত লোকাচারও অনেক আছে। যেমন, কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা যখন একই টেবিলে খেতে বসি, তখন সাধারণত আমরা এক সঙ্গে খেতে আরম্ভ করি এবং খাওয়ার শেষে প্রায় একই সঙ্গে টেবিল ত্যাগ করি। এটা হল সাধারণ রীতি বা লোকাচার। কেউ যদি খাবার টেবিল থেকে অনেক আগেই উঠে যায়, তাহলে হয়ত কেউ কিছু বলবে না। তবে সবাই সেই লোকটির দিকে আড় চোখে তাকাবে। অর্থাৎ এরূপ আচরণ সমাজের রীতি বিরুদ্ধ বলে নিন্দিত। এখানে আচরণ সম্পর্কিত লোকাচারের আরেকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, দুই ব্যক্তির পারস্পরিক বিরোধ যতই তীব্র হোক, সাধারণ রীতি বা লোকাচর হল কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলিত হলে তারা তাদের বিরোধ সম্পর্কিত কথাবার্তার জের পরি থেকে নষ্ট করবেন না।

লোকাচার সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

www.swapno.in

৩। **শিষ্টাচার সম্পর্কিত লোকাচার ঃ** শিষ্টাচার সম্পর্কিত লোকাচারও আছে। যেমন একজনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হওয়ার পরই তাকে তার উপার্জন কত জানতে চাওয়া লোকাচার বিরুদ্ধ আচরণ বলে গণ্য হয়। কেউ এরূপ প্রশ্ন করলে তিনি শিষ্টাচার জানেন না বলে অনুযোগ করা হবে। সমাজ-জীবনে আমাদের অনেক রকম শিষ্টাচার মেনে চলতে হয়। গৃহস্বামী তার বাড়িতে নিমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে এসে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন তাদের খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হয়েছে কিনা। এরূপ আচরণ শিষ্টাচারের অন্তর্গত। আবার আমন্ত্রিত অতিথিদের শিষ্টাচারসম্মত আচরণ হল সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করা। সাধারণত শিষ্টাচার একজন ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা ও পদমর্যাদার পরিচায়ক। এখানে সমাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। কিভাবে সমাজে লোকাচার গড়ে উঠে তা বলা কঠিন। সবসময় যুক্তিসঙ্গত কারণ খোঁজে পাওয়া কঠিন। এমন অনেক লোকাচার আছে যা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। যেমন,নব্য বিবাহিত বধুকে ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে রাখার রীতি প্রচলিত আছে। যুক্তি দিয়ে এরূপ রীতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। দীর্ঘকাল একত্রে বসবাস করার ফলে বিভিন্ন অবস্থায় নানা রীতি নীতি গড়ে উঠে। লোকাচার লংঘিত হলে পাড়া প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধব কানা ঘুষা করেই ক্ষান্ত হন না তাদের মৃদু অনুযোগ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হলেও কোন কিছু করার থাকে না।

সমাজবিজ্ঞানী সামনার সংস্কৃতিকে সমাজের সাধারণ ও অবশ্য পালনীয় লোকাচার প্রতিষ্ঠানে দিক থেকে বিবেচনা করেছেন। মূলত লোকাচার বলতে সামনার বুঝেছেন এসব আচার-আচরণ সেসব মানুষের সামাজিক জীবনের সমস্যার সংগে গভীরভাবে জড়িত। সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও লোকাচার বংশ পরপম্পরায় চলে। নবীনরা এসব প্রবীনদের নিকট থেকে শিক্ষা পায়। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শুধু লোকাচারের পরিবর্তন হয় না, নতুন নতুন আচার-আচরন ও সংস্কারেরও সৃষ্টি হয়। সামনারের মতে মানুষ লোকাচারের মাধ্যমে নিজেকে পরিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু মানবেতর প্রাণী ও উদ্ভিদাদি একমাত্র বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন পরিবেশের সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। মানুসের সামাজিক জীবনে এমন কতকগুলো লোকরীতি ও সংস্কার রয়েছে যেগুলো তাদের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। বলা যায়, আদিম সমাজে লোকাচারের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। কারন সে সময় মানুষ সামাজিক প্রথাকে অন্ধভাবে মেনে চলতো। কিন্তু সভ্য সমাজে মানুষ বিচার-বিবেচনার সাথে লোকাচার পালন করে। তবু সভ্য সমাজের মানুষকেও অনেক সময় সামাজিক লোকাচারকে চিরাচরিতভাবে মানতে হয়। আসলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই লোকাচারের প্রভাব রয়েছে। প্রত্যেক সমাজেই লোকাচার দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান সমাজে প্রচলিত কয়েকটি লোকাচারের নমুনা দেয়া হলো; যথা করমর্দন করা, দিনে তিনবার খাওয়া, রাস্তার ডানদিকে গাড়ি চালান, দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করা প্রভৃতি। লোকচারকে বাদ দিয়ে আমরা সমাজে সঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারি না।

তাই পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজ জীবনে লোকাচারের গুরুত্ব অনেক। সমাজের স্বচ্ছন্দ গতি অব্যাহত রাখতে লোকাচার সাহায্য করে। লোকাচার প্রচলিত থাকায় কে কি অবস্থায় কিভাবে আচরণ করবে এটা মোটামুটি সবারই জানা। ফলে সুশৃঙ্খল সমাজ জীবন যাপন করা সহজতর হয়। লোকাচার সমাজ-বন্ধনকে সুদৃঢ় করে এবং লোকাচারের মাধ্যমে মানুষের মনে নিরাপত্তা বোধ জন্মায়।

সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও লোকাচার বংশপরম্পরায় আবর্তিত হয়।

অনুশীলন ১ (Activity 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

www.swapno.in

"আমাদের সংস্কৃতি মূলত লোকসংস্কৃতি"-এ কথাটি অনূর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন -

অনুশীলন ২ (Activity 2) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

"বিশ্বাস" ও "লোকাচার"-এর মধ্যে বিদ্যমান পাঁচটি পার্থক্য লিপিবদ্ধ করুন ঃ

ক্রমঃ	বিশ্বাস	লোকাচার
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

সারাংশ ঃ

লোকসংস্কৃতি সমাজ-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লোকসংস্কৃতি একটি দেশের বৃহত্তর সংস্কৃতিরই অঙ্গ। লোকসংস্কৃতি অনগ্রসর নয়, আপাংক্তেয়ও নয়। লোক সংস্কৃতি কোন্ সময় থেকে জন্মলাভ করেছে তা এক কথায় বলা যায় না। তবে এটা মনে করা যায় হয় যে, লোকসংস্কৃতি মানুষের মতই প্রাচীন। অর্থাৎ লোক সংস্কতির ভিত্তি রচিত হয়েছিল অতীতে, কিন্তু তার শাখা–প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে বর্তমান কালে। তাই বলা যায় যে, বিপুল ও বিচিত্র উপাদানে লোকসংস্কৃতির ভান্ডার পরিপূর্ণ। বস্তুত, যে কোন সমাজ সম্পর্কে জানতে হলে সেই সমাজের লোক ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে। লোকসংস্কৃতি লোক সমাজেরই সৃষ্ট ঐতিহ্য। সমাজবিজ্ঞানের কাজ মানব সমাজকে তুলনামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। আর এ কাজে লোকসংস্কৃতি সমাজবিজ্ঞানকে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। "Folkore" শব্দটি কে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন?
- ক) উইলিয়াম থম্‌স
- খ) ম্যাকাইভার
- গ) মর্গান
- ঘ) রবীন্দ্রনাথ

২। সমষ্টিগত চেতনা ও চিত্ত চর্চায় কিসের জন্ম হয়?
- ক) সংস্কৃতি
- খ) লোকসংস্কৃতি
- গ) বস্তুগত সংস্কৃতি
- গ) মানব সংস্কৃতি

www.swapno.in

৩। ব্যবহার ও আচরণের স্বীকৃতি ও পার্থক্যকে কি বলে?

ক) লোকাচার　　　　খ) লোক সংস্কৃতি

গ) বিশ্বাস　　　　ঘ) সংস্কৃতি

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. সমাজের বিকাশ সাধনে সংস্কৃতি কি ভূমিকা পালন করে।
২. মানুষের সমাজ জীবনে সংস্কৃতি কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে তা জানতে পারবেন।
৩. সংস্কৃতি কিভাবে একদেশ থেকে অন্য দেশে, এক জাতি থেকে অন্য জাতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সে সম্পর্কেও আপনি অবহিত হবেন।

সংস্কৃতি ও সমাজ (Culture and Society)

সংস্কৃতি কি? এক কথায় এর উত্তর দেয়া সহজ নয়। সংস্কৃতি বা কালচার সম্পর্কে নানা ধরনের বক্তব্য বিদ্যমান। সংস্কৃতি ও সমাজ ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণ কথায় সংস্কৃতি বলতে আমরা মোটামুটি উন্নত মানের জীবন চর্চার ধারাকে বোঝাই। বুদ্ধি ও বিবেচনাভিত্তিক জটিল চিন্তাধারাই সংস্কৃতির রূপদান করে থাকে। মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনে নানা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার মেনে চলতে হয়। তাই সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ একটি মানুষের জন্মের পর থেকে যে সংস্কৃতি কার্যকর থাকে আমৃত্যু এর রেশ চলতে থাকে। শিক্ষা, দীক্ষা, বিবাহ অনুষ্ঠান, অন্তেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি কর্মকান্ড মানবজীবনে সংঘটিত হয়। মূলত, এসব সামাজিক সংস্কারের সমষ্টিগত ও বিধিবদ্ধ রূপই সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংস্কৃতি শব্দটি প্রায় প্রতিদিনই আমরা ব্যবহার করে থাকি। সাধারণভাবে সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার করা হয়ে থাকে ব্যক্তির মার্জিত রুচি ও ব্যবহারকে বোঝাতে। কিন্তু সংস্কৃতির এই সাধারণ অর্থের সাথে সমাজতাত্ত্বিক অর্থের পার্থক্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি বলতে শুধু একজন ব্যক্তির মার্জিত রুচি, শিল্পকলা বা সাহিত্যকে বুঝায় না। সমাজের মানুষ যেভাবে তার জীবনের বিকাশ ঘটায় তাই তার সংস্কৃতি। এ প্রসঙ্গে আমরা স্যার ই.বি টাইলরের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করতে পারি। টাইলরের মতে, "সংস্কৃতি হচ্ছে এক একটি সামগ্রিক জটিল ব্যবস্থা যার মধ্যে রয়েছে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, আইন-কানুন নীতিবোধ প্রথা এবং সমাজের একজন সদস্য হিসাবে মানুষের অবস্থিত সকল দক্ষতা ও অভ্যাস। অর্থাৎ তিনি সংস্কৃতি মানব -সমাজের সবকিছুর একটা মিশ্ররূপ হিসেবে গণ্য করেছেন। এ অর্থে সব সমাজেরই সংস্কৃতি আছে, তবে কারোটা উন্নত আর কারোটা অনুন্নত। যেমন আধুনিক শিল্প-সমাজের সংস্কৃতি অর্থাৎ সমাজে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, যোগ্যতা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি একটি উপজাতীয় সমাজের সংস্কৃতির চেয়ে উন্নত বলা যায়। সংস্কৃতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সৃষ্টি নয়, তার সচেতন প্রচেষ্টার ফল, সুদীর্ঘ দিনের সম্মিলিত সম্পদ যে কোন সমাজের মানুষ তার সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। সমাজের বিভিন্ন অবস্থার সাথে মানুষের খাপ খাইয়ে নেবার সতত প্রচেষ্টায় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। আর সে কারণেই এর রূপ ও প্রকৃতি সদা পরিবর্তনশীল। যেমন, আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা, জলবায়ু, আবহাওয়া প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এদেশের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বর্ষাকালে নৌকাই গ্রাম-বাংলার একমাত্র যানবাহন। নৌকার কথা বললেই আমাদের সামনে বাঙালী সংস্কৃতির চিত্র ফুটে উঠে। আবার আমাদের সংস্কৃতিতে অতিথিকে বরণ করা হয় পিঠা দিয়ে। এটাও বাঙালী সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের দর্পন। তবে সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম মৌল প্রত্যয় হচ্ছে

> সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের দর্পন।

www.swapno.in

সমাজ। সমাজ ব্যবস্থা কতকগুলি রীতি নীতি দ্বারা গড়ে উঠা একটা কাঠামো, যা একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং যার মাঝে পরস্পর সহযোগিতা বিদ্যমান; যেখানে বিভিন্ন দল ও শ্রেণী পাশা পাশি বাস করছে এবং পারস্পরিক ভাবের লেনদেন করছে। এসব ছাড়া মানুষকে পশু হতে পৃথক করে ভাবা যায় না। সমাজ এমন একটি ব্যবস্থা, যা প্রতিটি সদস্যকে সুযোগ দান করে আপন ক্ষতার বিকাশ ঘটাতে। আবার সমাজই তার সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে করে সমাজের সবল ও দুর্বল সদস্য সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পর সম্পর্ক দ্বারা গঠিত এই জাল বিশেষকে সমাজ বলে। সমাজ ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা গড়ে উঠা একটি জটিল ব্যবস্থা, যার মাঝে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে তার পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে। ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট এই ব্যবস্থার মাঝেই ব্যক্তি তার জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত অবাধ সময় কাটিয়ে দেয়। বস্তুত ব্যাপক অর্থে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সমগ্রককে সমাজ বলে। আবার সমাজ বলতে বিভিন্ন বয়সের এমন একদল নারী-পুরুষের সমষ্টিকেও বোঝায়, যারা একত্রে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে এবং বিভিন্ন প্রথা-প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়া পদ্ধতিতে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের ভাষায় সমাজ হল অনুভূতিক্ষম মানুষের একটি দল (A group of Sentient beings) জিস্‌বার্টের মতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সম্পর্কের জটিল জালই হচ্ছে সমাজ। এটা একটি মানসিক ব্যাপার। গিডিংস বলেন " একই মনোভাবাপন্ন কতিপয় মানুষ নিয়ে সমাজ গঠিত হয়। তারা নিজেদের অভিন্ন মনোভাবের কথা জানে ও উপভোগ করে এবং সমজাতীয় লক্ষ্যে পৌছার জন্যে সমবেতভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়"। ম্যাকাইভার বলেন, 'বিভিন্ন আচার ও কার্যপ্রণালী, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সাহায্য, নানা রকম সমবায় ও বিভাজন মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা - এই সব কিছু নিয়ে গঠিত নিয়ত পরিবর্তনশীল জটিল ব্যবস্থাই হচ্ছে সমাজ। এখানে বলা চলে যে, সমাজ-জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হচ্ছে সংস্কৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ থেকে সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। সমাজ ও সংস্কৃতি উভয়ই পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একটি কাগজের উভয় পিঠের মতো সমাজ ও সংস্কৃতি একে অপরের প্রতিরূপ। প্রত্যেক সংস্কৃতি অপরিহার্যভাবে ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি বিশেষ সমাজের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠে। হটেনটট সংস্কৃতির প্রতি হটেনটট জাতি এবং চৈনিক সংস্কৃতির প্রতি চীনা জনগণ আনুগত্য প্রকাশ করে। কোন লোক না থাকলে যেমন কোন সমাজের অস্তিত্ব ভাবা যায় না, তেমনি সমাজ ছাড়া সংস্কৃতিও থাকতে পারে না। আবার একইভাবে বলা যায় যে, সংস্কৃতি ছাড়া মানবতার বিকাশও ঘটে না। কারণ সংস্কৃতির মূল কথাই হল বিশ্ব-মানবের পক্ষে যা কল্যাণকর, যা "Light and Sweetness" তাকে বরণ করা। মূলত সাংস্কৃতিক উপলব্ধির ভেতর দিয়েই বিশ্ববোধের জন্ম হয়। কাজেই সংস্কৃতি চর্চা যত বেশী হয়, সমাজের পক্ষে ততই কল্যাণ।

সমাজ জীবনে সংস্কৃতি একটি অপরিহার্য অংগ।

সংস্কৃতির মূল কথাই হল বিশ্ব-মানবের পক্ষে যা কল্যাণকর যা 'Light and sweetness' তাকে বরণ করা।

অনেকে প্রায়ই বলেন যে, সমাজের জন্যে সংস্কৃতি গৌণ ও আপেক্ষিকভাবে অর্থনীতি, প্রযুক্তিবিদ্যা, জ্ঞান ও বিশ্বাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। মার্কসীয় সামবিজ্ঞানের দিক থেকে সংস্কৃতি হচ্ছে উপরিকাঠামো অর্থাৎ উহা অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে। শেষোক্তটি হচ্ছে সমাজের মৌল ভিত্তি।
প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃতি ও সমাজ পরস্পর এত সম্পর্কযুক্ত যে, এ দু'টি প্রত্যয়কে প্রায়ই পৃথক করা যায় না।

সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাষ্ট কঁৎ যখন এক শতাব্দীরও বেশী আগে (১৮৩৯) এই বিজ্ঞানটির নামকরণ করেন, তখন তিনি সামাজিক কর্মকান্ডের উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি বিবর্তনের ধারায় মানব সমাজকে স্তরায়িত করেন তখনই বিশ্বাস ও চিন্তার গুরুত্ব স্বীকৃতি পায়। তিনি মানব সমাজকে ধর্মকেন্দ্রিক (Theological), অতীন্দ্রিয় (Metaphysical) এবং

www.swapno.in

www.swapno.in

দৃষ্টবাদী (Positive) এই তিনস্তরে ভাগ করেছেন। অগাষ্ট কঁৎ এর মতে মানব সমাজের বিকাশের সাথে সাথে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। উল্লেখ্য, অগাষ্ট কঁৎ এর সমাজবিকাশের বিস্তারে সূত্রের ভিত্তি হচ্ছে মানব চিন্তা বা সংস্কৃতির অঙ্গ। আর এখানেই মার্কস ও কোঁৎ এর মধ্যে পার্থক্য। কেন না মার্কস যেখানে অর্থনীতিকে ভিত্তি করে সমাজবিকাশের পর্যায় চিহ্নিত করেছেন সেখানে কোঁৎ মানবচিন্তাকে সমাজবিকআশের ভিত্তি বলে বিবেচনা করেছেন। তবে তাঁদের বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরী মর্গান তাঁর Ancient Society নাম গ্রন্থে মানব সংস্কৃতির বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তিনি মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশধারাকে তিনটি জাতিতাত্ত্বিক যুগে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ

এই তিনভাবে ভাগ করেছেন। অগাষ্ট কঁৎ এর মতে মানব সমাজ বিকাশের সাথে সাথে মানুষের সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। কারণ সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের অলংকার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নৃবিজ্ঞানীর লুইস হেনরী মর্গান তাঁর গন্থে মানব সংস্কৃতির বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

> মর্গান মানুষের সংস্কৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ক) বন্য অবস্থা, খ) বর্বর অবস্থা, গ) সভ্যতা।

মর্গান সংস্কৃতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, মানব সংস্কৃতি স্থির বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বেকার রূপ লাভ করেছে। মর্গান মানব সমাজের সংস্কৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা

১। বন্য দশা (Savagery),
২। বর্বর দশা (Barbarism), এবং
৩। সভ্যতা (Civilization)।

১। বন্য দশা (Savagery) ঃ বন্য দশায় মানুষ জীবন ধারণ করত প্রধানত পশু ও মৎস্য শিকার করে ও ফলমূল আহরণ করে। মর্গান বন্য দশাকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন ঃ -

১। বন্য দশার নিম্ন পর্যায় (Lower states of savagery)
২। বন্য দশার মধ্য পর্যায় (Middle states savagery)
৩। বন্য দশার উচ্চ পর্যায় (Upper states of Barbarism)

২। **বর্বর দশা (Barbarism)** ঃ বর্বর অবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পশু পালন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের কৃষিকাজ। বর্বর অবস্থাকেও মর্গান আবার ৩টি ভাগে বিভক্ত করেছেন।
১। বর্বর দশার নিম্ন পর্যায় (Lower status of Barbarism)
২। বর্বর দশার মধ্য পর্যায় (Middle status of Barbarism)
৩। বর্বর দশার উচ্চ পর্যায় (Upper status of Barbarism)

৩। **সভ্যতা (Civilization)** ঃ মর্গানের মতে সভ্যতার সূচনা ঘটে বর্ণমালা ও নিয়ম পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে। তিনি সভ্যতাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।
ক) প্রাচীন সভ্যতা ঃ প্রচ্যের চারটি নদী তীরবর্তী সভ্যতা (প্রাচীন মিশর, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, প্রাচীন ভারত এবং প্রাচীন চীন) এবং পাশ্চাত্যের দু'টি সমুদ্রতীরবর্তী সভ্যতা (প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোম) তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উক্ত ছয়টি প্রাচীন সভ্যতা

www.swapno.in

মর্গান বর্ণিত মানবসভ্যতার প্রথম পর্বের অন্তর্ভুক্ত। আর এসব সভ্যতার প্রত্যেকটিতেই সংস্কৃতির বহুমাত্রিক বিকাশ ঘটেছিল।

খ) আধুনিক সভ্যতা ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে। সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত পঞ্চদশ শতকের পশ্চিম ইউরোপীয় রেঁনেসা, ঐ সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লব এবং সর্বোপরি অষ্টাদশ-উনিশ শতকের প্রজ্ঞাবাদের যুগ ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘটনা আধুনিক সভ্যতার যুগের এক একটি মাইল ফলক হিসাবে সুচিহ্নিত। মূলত মানুষের সংস্কৃতি সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সমাজের পরিবর্তন হলে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। মানবেতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে সেটাই ঘটেছে।

সামাজিক অভিন্নতা ও সাংস্কৃতিক অখন্ডতা যুগপৎ চলার প্রবণতা আছে। সেজন্য সামাজিক সংহতি কিংবা সাংস্কৃতিক অভিন্নতার বিরুদ্ধে বলবার মতো বিশেষ কিছু নেই। এটা প্রায়ই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রেণীমূলক সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণী অভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও কিছু স্বাতন্ত্রের অধিকারী হতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীর লোক কথা, আচার-আচরণ, পরিচ্ছেদ, আয় ও পেশা প্রায় অবশ্যম্ভাবীরূপে আলাদা। একটি সমাজের অংশ হওয়ায় আমরা সাধারণত শ্রেণী-সংস্কৃতিকে প্রকৃত সংস্কৃতি বলে মনে করি না। আধুনিক জীবনে জাতির বৃহত্তর রাজনৈতিক সত্তায় এ ধারার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীই তার চারপাশের সংস্কৃতি দ্বারা কমবেশী প্রভাবিত। পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে, প্রকৃতি মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে এবং মানুষ যতদিন তার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পেরেছে ততদিন প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। তবে পৃথিবীর সকল প্রান্তেই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উপাদান আছে; প্রকৃতি কোথাও নিষ্ফলা নয়। যেমন যে অঞ্চলে পশুপালন বা কৃষি কাজ অসম্ভব সে অঞ্চলে বাস করে এস্কিমো বা অষ্ট্রেলীয় উপজাতি যাদের পক্ষে পশুপালন বা কৃষিকাজ করা সম্ভব নয়। আসলে মানুষ তার পরিবশের উপর নির্ভরশীল। আর পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই মানুষের সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের কথাও আলোচনা করতে পারি। বলা হয়ে থাকে যে, 'Man is a culture building animal' অর্থাৎ মানুষ সংস্কৃতি-সৃজনকারী প্রাণী। মানুষ সামাজিক জীব, মানুষ প্রধানত সামাজিক ঐতিহ্য তথা বা সংস্কৃতির দ্বারা পরিচালিত; সহজাত প্রবৃত্তির ভূমিকা এক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

> Man is the produtct of his own culture.

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, সমাজবিহীন সংস্কৃতির কথা আমরা চিন্তা করতে পারিনা; আবার সংস্কৃতি ছাড়া সমাজের কথাও ভাবা যায় না। আজ একথা প্রমাণিত সত্য যে,মানুষ ধাপে-ধাপে অগ্রসর হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। নিম্ন পর্যায় থেকে শুরু হয়েছিল মানব সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রয়াস। আর আজ মহাকাশেও মানুষের কীর্তির বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ছে। মানব সমাজের প্রতিটি কীর্তিও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসই হচ্ছে এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস। সমাজ জীবনে সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের মধ্যেও এই পরিচয় মিলবে। লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, কিভাবে লক্ষ লক্ষ অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সমাজ এবং সভ্যতা।

মানুষের সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

সংস্কৃতি বলতে সমাজবিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানী মানব-সৃষ্ট সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত উপকরণকে বুঝিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, Culture is what man has created material and non material. মানব সংস্কৃতির দু'টি দিক আছে ক) পার্থিব (Material)এবং খ) অপার্থিব সংস্কৃতি (Non-material) তবে সংস্কৃতি বলতে সাধারণত সমাজের সুকুমার শিল্প ও জ্ঞান

www.swapno.in

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অবদানকে বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলা প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্প কর্মকে বোঝায়। অবশ্য নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা যে অর্থে সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন তা সংস্কৃতির প্রচলিত সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্নতর। সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি হল মানুষের চিন্তা ও কর্মের একটা সার্বিকরূপ। মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতি। আমরা যখন বলি, মানুষের সমাজ জীবনকে যে চারটি মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে তার মধ্যে 'সংস্কৃতি' অন্যতম। সংস্কৃতি সব সময়ই সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। আসুন আমরা এখন দেখি সংস্কৃতি কিভাবে সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করে। প্রথমেই আমরা বলতে পারি যে, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যা তার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। একজন মানুষ প্রথমত তার পরিবারের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরে মানুষের উপর তার সমাজের প্রভাব পড়ে। একথা আমরা সকলেই জানি যে, একটি সমাজের সংস্কৃতিতে যে সব বিষয় শালীনতাপূর্ণ আচরণ বলে গণ্য সেই একই আচরণ অন্য সমাজের সংস্কৃতিতে নিন্দিত হতে পারে। যেমন, বড়দের সামনে সিগারেট খাওয়া পাশ্চাত্য সমাজে এমন কিছু গর্হিত কাজ বলে মনে করা হয় না। কিন্তু গুরুজনের সামনে সিগারেট খাওয়া আমাদের সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এভাবেই সংস্কৃতি প্রতিনিয়তই মানুষের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। প্রত্যেক মানুষই একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশে মাঝে জন্মগ্রহণ করে। ম্যাকাইভার বলেছেন "মানুষ কখনও কখনও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃতিই মানুষকে প্রভাবিত করে। এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, কোন মানব শিশু যদি মানব সমাজের সংস্কৃতি বহির্ভূত পরিবেশে বড় হয়, তাহলে তার আচার আচরণ মানুষের মত না হওয়াই স্বাভাবিক। উদাহরণ স্বরূপ আমরা অমলা ও কমলার কাহিনীর কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে পাদ্রী জে,এ.এল সিংহ উত্তর ভারতে বেড়াতে গেলে তিনি এক অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখতে পান। তিনি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেন যে একটি নেকড়ে গুহা থেকে নেকড়ের মত হাতে পায়ে ভর করে চতুষ্পদ জন্তুর মত লাফাতে লাফাতে দু'টি বন্য মানব শিশু বের হলো। নেকড়ের গুহা থেকে উদ্ধার করে ঐ দুটি শিশুকে রেভারেন্ড পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুরে তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অনাথ আশ্রমে নিয়ে আসেন। একটি শিশুর নাম রাখেন অমলা এবং অপরটির নাম রাখেন কমলা। এই শিশু দুটিকে যখন জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় তখন তারা সম্পূর্ণ নেকড়ে শিশুর মতই ব্যবহার করতো। নেকড়ের মত মাঝে মাঝেই ডাকতো। উলঙ্গ ছিল বলে তাতে তাদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না। শিশু দুটি কাঁচা মাংস খেত। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের সংস্কৃতির সব কিছু তাদেরকে শেখানোর ফলে তারা মানব সংস্কৃতির সব কিছু আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়। মেদিনীপুরে নিয়ে আসার দশ মাসের ভেতরই ছোট শিশু অমলার মৃত্যু হয়; কিন্তু কমলা ১৯২০ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত নয় বছর জীবিত ছিল। পাদরী মিঃ কমলাকে মানব শিশু হিসাবে গড়ে তোলার কাজে কি ঘটে তা তিনি তার ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করেন। কমলা মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ফিরে আসবার দুই বৎসর পর অন্যের সহায়তায় ও তিন বৎসর পর বিনা সাহায্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। চার বৎসর পর নিজ হাতে গ্লাস ধরে পানি খেতে সমর্থ হয়। প্রায় ছয় বৎসর পর মানুষের ভাষায় ৩০টি শব্দ শিখে। প্রথম প্রথম তাকে কাপড় পরিয়ে দিলে ছিঁড়ে ফেলত। কিন্তু সাত বৎসর বয়সে তার ভেতরে বাঘিনীর চরিত্রের অবসান হয় এবং সে এক শান্ত-শিষ্ট বালিকায় পরিনত হয়। কমলা ও অমলার এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে উপযুক্ত সংস্কৃতি পরিবেশেই মানুষের স্বভাব চরিত্রের বিকাশ হয়। এখানে বলা যেতে পারে যে, কমলা ও অমলার জীবনের এই যে অবস্থা তার কারণ হচ্ছে তারা বহুদিন মানুষের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। আর মানুষের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বলেই তারা মানুষের সংস্কৃতির কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনি। কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশে ফিরে আসার পর ধীরে ধীরে তারা প্রায় সব কিছুই গ্রহণ করতে শেখে। তাই আমরা বলতে পারি যে Man is the product of his culture. অর্থাৎ মানুষ সংস্কৃতির ফসল। আর সামাজিক পরিবেশেরই অপর নাম সংস্কৃতি। বিভিন্ন দেশের

www.swapno.in

সংস্কৃতি বিভিন্নভাবে মানুষের সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ অর্থে, অবশ্য সংস্কৃতি বলতে সাহিত্যিক বা শৈল্পিক উৎকর্ষকে বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে সংস্কৃতি শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের ভাবধারা, বিশ্বাস, নীতিবোধ, আইন-কানুন ভাষা এবং তার ব্যবহৃত সকল হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি এমনকি বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে মানুষ যা কিছু অবলম্বন করে সে সব কিছু নিয়েই তার সংস্কৃতি গড়ে উঠে। প্রত্যেক মানুষ এই সংস্কৃতি তার পিতামাতার কাছ থেকে পায়। নৃবিজ্ঞানী লোঈ(Lowie)সংস্কৃতিকে "সামাজিক ঐতিহ্য" বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাই বলা যায় সংস্কৃতি যদি সামাজিক ঐতিহ্য হয় তবে সমাজ জীবন সামাজিক ঐতিহ্য দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়।

সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত সকল অঞ্চলের মানুষ অভিন্ন মৌলিক আবেগ অনুভব করে। সকল মানুষই খাদ্য চায়, বস্ত্র চায়, মাথা গোঁজার স্থান চায়। প্রতিটি মানুষ বংশ বৃদ্ধি করতে চায়, স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে রক্ষা করতে চায় এবং সর্বোপরি সান্ত্বনা ও স্বস্তির জন্য ধর্ম চায়। মোট কথা, বিশ্ব জুড়ে মানুষ একটি মানসিক ঐক্যের অধিকারী এবং বেঁচে থাকার জন্য পথ খুঁজে নেবার সহজাত বুদ্ধি সব মানুষের মধ্যেই আছে। মানুষ যে সংস্কৃতিবান প্রাণী, তার বড় প্রমাণ হল এই যে, মানুষ সব রকম জলবায়ূ ও পরিবেশের সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে এবং এখনও পারে। পৃথিবীর এমন স্থান বিরল যেখানে মানুষ খেয়ে পরে বাঁচতে পারেনি। পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার ফল নিশ্চিত মৃত্যু। কাজেই মানুষ পরিবেশ ও সংস্কৃতির সাথে অভিযোজনের ব্যাপারে সর্বত্রই কম বেশী প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অবশ্য কোন কোন নর গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা বেশী ফলদায়ক হয়েছে; আবার কেউ কেউ তেমন সফলতা দেখাতে পারেনি।

আমরা লক্ষ করলেই দেখতে পাবো যে, শুধু সভ্য মানুষের নয়, প্রতিটি আদিম উপজাতিরও সংস্কৃতি আছে এবং প্রতিটি উপজাতি তার সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। যেমন, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এস্কিমোদের সংস্কৃতির উপর তাদের বাসস্থানের জলবায়ু ও বাস্তু সংস্থানের (ecology) প্রবল বিদ্যমান। তারা যে সামান্য কটি জীবজন্তু শিকার করতে পারে, সেগুলি থেকেই তারা হাতিয়ার ও পরিধেয় প্রস্তুত করে। বলগা হরিণ ও শীল মাছের হাড় ও দাঁত দিয়ে বল্লমের ডগা ও তীর ধনুকের ফলা তৈরি হয়। সামুদ্রিক জন্তুদের চর্বি থেকে তারা আলে পায়। এবং রাঁধার আগুন যোগাড় করে। এছাড়া, এস্কিমোদের সংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এস্কিমোরা পড়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পেতে ওস্তাদ। যেমন, এক খন্ড ভাসমান কাঠের গুঁড়ি; একটুকরা লোহা বা অদ্ভুত গুণসম্পন্ন একটি পাথরের নুড়ি পেলে সে লুফে নেয় এবং তা যেকোন কাজে লাগায়। তারা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে খুবই সচেতন। এস্কিমোরা তাদের চাহিদা পূরণ করতে বিস্ময়কর তৎপরতা দেখিয়েছে, যেমন, তারা বরফ দিয়ে ঘর পর্যন্ত বানাতে শিখেছে।

সংস্কৃতি হল সামাজিক পরিবেশের নামান্তর।

আমরা ভাল করেই জানি যে, ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে মানুষের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যেমন, আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রভৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাঙ্গালী সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে। চাল বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য শস্য। এর মূলে রয়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাঙ্গালীদের প্রধান সৌখিন খাবার হচ্ছে পিঠা। প্রাচীন বাংলায় অতিথিকে বরণ করা হতো পিঠা দিয়ে। যারা মরু অঞ্চলে বসবাস করে তাদের জীবন ধারণ প্রণালী তথা সংস্কৃতি আমাদের চেয়ে ভিন্ন। কারণ বিশ্বের সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু অভিন্ন নয়।

www.swapno.in

এবারে আমরা দেখতে চেষ্টা করবো মানুষের পোশাক পরিচ্ছদের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বেশী, না সংস্কৃতির প্রভাব বেশি। লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে মানব সমাজে পোশাক পরিচ্ছদের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি সংস্কৃতির প্রভাবও বিদ্যমান।

আমর জানি যে আরবের লোকেরা লম্বা চওড়া আলখেল্লা পরিধান করে। সাধারণত প্রাচ্যের মহিলারা অন্দর মহলে আপদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকে। প্রত্যেক সংস্কৃতিতে পোশাক পরিচ্ছদের একটি সামাজিক এবং উপযোগিতামূলক তাৎপর্য আছে। বস্তুত সংস্কৃতির সকল বৈশিষ্ট্যেরই সামাজিক ও উপযোগিতামূলক মূল্য রয়েছে। নতুবা উত্তর ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা জলবায়ুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অপেক্ষাকৃত সাদা-সিধে ও কার্যোপযোগী পোশাক ব্যবহার করতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, আধুনিক ইংরেজ ও আমেরিকানদের পোশাকে ঐতিহ্য, ফ্যাশন ও সৌন্দর্যবোধের প্রভাব বেশি, আবহাওয়ার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। তানা হলে সুন্দরী মেয়েরা জানুয়ারী মাসের কনকনে শীতের বিকেলে ফিন ফিনে বাসন্তী রং এর ফ্রক পরিধান করেন কেন? প্রায় সব সমাজেই পোষাক-পরিচ্ছদে ফ্যাশন বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। আবহাওয়াগত পার্থক্যের ফলে স্থানভেদে পোশাক নির্বাচন করা হলেও যেকোন পোশাকই সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে এবং তার প্রভাব বুঝবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ প্রচুর সাহায্য করে। প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ব্যবহৃত নারী পুরুষের পোশাকের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে মানুষের শরীরের গঠন অনুসারে কোট, প্যান্ট, টাই প্রভৃতি ফিটফাট পোশাক; মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মস্তকাবরণীসহ ঢিলা আলখাল্লা জাতীয় সাদা পোশাক; এবং জাপানে কিমানো জাতীয় ঢিলা পোশাক ব্যবহৃত হয়। নেপালীদের পোশাক ও বাঙ্গালীদের পোশাকের মধ্যে কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। পাশাপাশি বাস করলেও চীনা স্কার্ট ও জাপানীদের কিমানোর পোশাকের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুসলিম সংস্কৃতির বাহক হওয়া স্বত্ত্বেও পাকিস্তানের সালোয়ার, কামিজ এবং বাংলাদেশের শাড়ী-ব্লাউজের ব্যবহার ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল অভিন্ন কোন জটিল স্থপত্যকে ভালভাবে বুঝতে যেমন তার নকশার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন তেমনি যে কোন সমাজের সংস্কৃতিকে উপযুক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সে সমাজ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব। একথা বলা যায় যে, কোন জাতি বা সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে তার ভবিষ্যত উন্নয়নে ফলপ্রসূ ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব। সংস্কৃতির মানদন্ডেই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব বলা যায়, সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব অপরিসীম।

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সাংস্কৃতিক জীব।

কোন সংস্কৃতির প্রকৃতি স্বরূপ উপলব্ধি করতে এবং তার প্রভাব বুঝবার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ সাহায্য করে।

আমরা জানি যে, মানুষ একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক জীব। মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক জীবন ধারায় যেসব কর্মপদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় তা কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত। মানবেতর প্রাণীদেরও কখনও কখনও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মিলে। যেমন, বানর ও বনমানুষের মধ্যে দলবদ্ধভাবে বসবাস করার প্রবণতা দেখা যায়। এদের মধ্যেও সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। বিবাদ-বিসম্বাদ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও এদের মধ্যে দুর্লভ নয়। কয়েক জাতের পতঙ্গ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও এ ধরনের সামাজিক প্রবণতা দেখা যায়। এরাও মানুষের মত বিভিন্ন কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের বাসস্থান রচনা করে, যার মধ্যে তাদের বিশেষ কুশলতা পরিলক্ষিত হয়। বহু পরিশ্রম করে বাবুই পাখি তার বাসা তৈরি করে - বাবুই পাখির এই বাসা তৈরির মধ্যে নানা সৃজনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পিঁপড়া এবং উইপোকা পরিকল্পিতভাবে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে। মানবেতর প্রাণী জীবনধারা মানব সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। মানুষের সামাজিকতাবোধ অনেকাংশে মানবেতর

www.swapno.in

প্রাণীর সংঘবদ্ধ জীবন ধারা থেকে বিকশিত হয়েছে বলা যায়। কিন্তু মানুষের সামাজিকতা ও মানবেতর প্রাণের সমাজবদ্ধতার মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। মানবেতর প্রাণীর সমাজবদ্ধ জীবন ধারায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে একইভাবে তাদের সমাজ জীবন প্রবাহিত হতে দেখা যায়। অপরদিকে, মানুষের সামাজিক কর্মপদ্ধতি যতটা পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তনই হল মানব সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং সেই পরিবর্তিত পদ্ধতিই মানুষের সংস্কৃতির সূচনা করে। প্রাণি জগতে সামাজিক জীবন ধারা আছে ঠিকই, কিন্তু কোন সূক্ষ্ম সংস্কৃতির লক্ষণ মানবেতর প্রাণিদের মধ্যে নেই। সেজন্য এদের কর্মপদ্ধতির মধ্যেও কোন পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয় না। তাছাড়া, পাখি বাসা তেরি করে, মৌমাছি মৌচাক রচনা করে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) বা প্রতিবর্তী ক্রিয়ার (reflexs) মাধ্যমে; পারস্পরিক শিক্ষাদানের ভিত্তিতে এগুলি সংঘটিত হয় না। অতএব পরিবর্তনশীল ধারায় সিঞ্চিত সমাজ ব্যবস্থার অনুসন্ধান করতে হলে একমাত্র মানব সমাজেই তা করতে হবে। সে কারণেই মানুষের সংগঠিত কর্মপদ্ধতিকে আমরা সংস্কৃতি বলে থাকি। কিন্তু মানবেতর প্রাণিদের কর্মধারার কোন সাংস্কৃতিক ভিত্তি নেই। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সাংস্কৃতিক জীব। আর সংস্কৃতি সব সময়ই মানব সমাজকে প্রভাবিত করে বলেছে। কারণ প্রতিটি মানুষ যে সমাজে বসবাস করে সেই সমাজের সংস্কৃতির দ্বারা সে প্রভাবিত হতে বাধ্য।

এক দেশের সংস্কৃতি যখন অন্য দেশে বিস্তৃতি লাভ করে তখন তাকে বলে সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই হল সংস্কৃতির চূড়ান্ত লক্ষ্য। এখানে একথাটিও যোগ করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি মানুষের সার্থক বিকাশের মধ্য দিয়েই প্রকৃত মানব সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে। সংস্কৃতির জাল মানুষের সমাজ জীবনকে বেষ্টন করে আছে। বস্তুত, প্রতিটি মানুষের সমাজ জীবন যে সংস্কৃতির মাধ্যমে বিকশিত হয় একথা বলাই বাহুল্য।

সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি (Culture Diffusionism)

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, কোন সংস্কৃতি এককভাবে টিকে থাকতে পারেনি। একটি জাতির মধ্যে হয়তো অন্য কোন সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে অথবা পরিকল্পিতভাবে বা অপরিকল্পিতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উক্ত প্রপঞ্চকেই বলা হয় সংস্কৃতি পরিব্যাপ্তি। বিশেষ করে, আধুনিক যুগের সংস্কৃতি পরিব্যাপ্তিবাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

লাঙ্গল শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে।

নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, কোন সংস্কৃতির বিশেষ উপাদান এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক জাতি থেকে অন্য জাতির মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করে। সে কারণে কোন কোন নৃবিজ্ঞানী মনে করেন যে, কোন দেশের সংস্কৃতিই অবিমিশ্র নয়। এর উদাহরণ খুবই বিরল। পোশাক-পরিচ্ছদ আচার-আচরণ ও বিশ্বাস প্রায়ই অন্য কোন সংস্কৃতির সংস্পর্শে পরিবর্তিত ও চুক্তির মাধ্যমে পরিব্যাপ্তি লাভ করে। যেমন, বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন থেকে বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান হারে ট্রাক্টর আমদানী করছে; ফলে কালক্রমে হয়তো দেশ থেকে লাঙ্গলের ব্যবহার উঠে যাবে। এ মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছেন স্যার ই.বি টেলর। পরবর্তী কালে তাঁর মতবাদের বিশিষ্ট রূপদান করেন নৃতাত্ত্বিক ফ্রিটি (Friry) স্মিথ (Smith) ও পেরি (Perry)। তাদের মতে, এক দেশের সংস্কৃতি জনগণেরও তার আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও অভ্যাস অন্য সংস্কৃতি স্পর্শে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তিবাদের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সংস্কৃতি কখনও যুগপৎ বিভিন্ন দেশে একইভাবে বিস্তারলাভ করে না। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, আমরা আমাদের বাঙ্গালী সংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে আমাদের দেশের কৃষি পদ্ধতিতে লাঙ্গলের ব্যবহার রয়েছে এবং লাঙ্গল শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষা

www.swapno.in

থেকে এসেছে। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, অষ্ট্রিকরা সর্বপ্রথম এ অঞ্চলে লাঙ্গলের ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতির জন্য ব্রিটেন থেকে ট্রাক্টর আমদানী করে চাষাবাদ করা হচ্ছে। তাহলে এখানে বলা যায় যে, ব্রিটিশ সংস্কৃতির বস্তুগত অবদান হলো ট্রাক্টর আর অষ্ট্রিক সংস্কৃতির বস্তুগত অবদান হলো লাঙ্গল। যদি আমরা সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তিবাদের ব্যাপারটি বুঝতে পারি তাহলে ব্রিটেনের ট্রাক্টরের প্রভাবের কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এছাড়া, আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশের শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্প-সাহিত্যে, সামাজিক রীতি-নীতিতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ব্যাপ্তিলাভ ঘটছে।

সংস্কৃতি এক দেশ থেকে অন্য দেশে এবং এক জাতি থেকে অন্য জাতির মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করে।

কোন সমাজের সংস্কৃতিতে নূতন কৃৎকৌশল কিংবা সামাজিক রীতি-নীতির উদ্ভব হলে অন্য সমাজের সংস্কৃতিতে তার ব্যাপ্তি ঘটতে পারে। সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির স্থান ও কালগত মাত্রা আছে। কোন একজন উদ্ভাবকের কাছ থেকে তাঁর উদ্ভাবিত জিনিস অন্য লোকের কাছে গেলে তখন তাকে আমরা বলি এটা তার সৃজনশীলতার স্বীকৃতি। সংস্কৃতি প্রায় সময়ই এক দেশ থেকে অন্য দেশে এবং এক জাতি থেকে অন্য জাতির মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে। কোন সমাজ ও সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিস, বিশ্বাস ও রীতি-নীতির প্রচলন অন্য এক বা একাধিক সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটতে পারে। আনুষ্ঠানিক চুক্তি, যাতায়াত কিংবা পারিবারিক সাংস্ককিত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি সংঘটি হতে পারে।সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তিকে এক কথায় বলা চলে অন্য কোন সংস্কৃতির উপাদানকে ধার করা। বস্তুত, এক দেশের সংস্কৃতি অন্য সকল দেশে অভিন্নভাবে বিস্তার লাভ করে না। যেকোন সংস্কৃতির উপাদান বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং নতুন জায়গায় নতুন রূপ পরিগ্রহ করে আর এটাই সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তবাদের বড় বৈশিষ্ট্য।

উইজলারের মতে সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি দুই প্রকার।

নৃবিজ্ঞানী উইজলারের মতে সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি দুই প্রকার, যথা ঃ (ক) সচেতন বা পরিকল্পিত পরিব্যাপ্তি; এবং (খ) অসচেতন বা অপরিকল্পিত পরিব্যাপ্তি।

কোথাও একবার কিছু আবিষ্কৃত হলে তা অন্যত্র অনুকরণের মাধ্যমে ব্যাপ্তি লাভ

বিদেশী আক্রমণকারী নতুন দেশ জয় করে বিজিত দেশের জনসাধারণের উপর তাদের রীতি-নীতি, বিশ্বাস, জীবন-যাত্রার কলা কৌশল বল প্রয়োগ করে চালু করলে তাকে সংস্কৃতির সচেতন বা পরিকল্পিত পরিব্যাপ্তি বলা হয়। অন্যভাবেও একই দেশের মধ্যে সমাজের প্রভাবশালী অংশ দুর্বল অংশের উপর তাদের সাংস্কৃতিক উপাদান পরিকল্পিতভাবে চাপিয়ে দিতে পারে। যেমন, পাকিস্তান আমলে জোরপূর্বক বাঙ্গালীদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। অন্যদিকে আক্রমণের ফলে পশ্চিম ভারত গ্রীক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। মুসলিম বিজেতাদের আগমনের ফলে হিন্দু প্রধান ভারতে মুসলিম সংস্কৃতির প্রসার ঘটে।

আর যখন কোন দেশে অন্য দেশের সংস্কৃতি জনগণের মনে অসচেতনভাবে প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে সংস্কৃতির অপরিকল্পিত অনুপ্রবেশ বলে। যেমন আমাদের দেশের জনগণ পাশ্চাত্যের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও রীতি-নীতি অনুকরণ করছে। বিদেশী ছায়াছবি দেখে বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সংগীত ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি ক্রমশ অনুরক্ত হয়ে পড়ছে। বর্তমান বিশ্বে সংস্কৃতি এমন এক জটিল রূপ ধারণ করছে যার ফলে সংস্কৃতির বিশেষ কোন একটি বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করা প্রকৃতপক্ষে কঠিন ব্যাপার। তিনটি পাশাপাশি দেশে সংস্কৃতির এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকলে কোন দেশে কোন বিশেষ অবস্থায় বা প্রয়োজনে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা কতিপয় বৈশিষ্ট্য ব্যাপ্তিলাভ করেছিল এবং কোন দেশের পর কোন দেশে সংস্কৃতির ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ না

www.swapno.in

থাকলে কিছুই সঠিকভাবে বলা যায় না। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রথম কোথায় পাথরের সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল এবং কিভাবে তা পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল তা এখনো আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়।
সংস্কৃতি কোন বাঁধাধরা নিয়ম বিকাশ লাভ করে না। বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন ধারার মধ্যে সংস্কৃতির অভিন্ন কোন একটি বৈশিষ্ট্য তখন তাকে বলা হয় সংস্কৃতির অবিরাম পরিব্যাপ্তি।

সমাজবিজ্ঞানে ভৌগোলিক মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা র‍্যাটজেল বিভিন্ন সমাজের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির নমুনা লক্ষ্য করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই সৃজনশীল নয়, বরং অনুকরণ প্রিয়। তাই কোথাও একবার কিছু আবিষ্কৃত হলে তা অন্যত্র অনুকরণের মাধ্যমে ব্যাপ্তি লাভ করে। র‍্যাটজেলের উক্ত ধারণা সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তিবাদের আরেকটি বিশেষ দিক।
বস্তুত, আধুনিক কালে যেমন এদেশের সংস্কৃতির প্রভাব অন্যদেশের সংস্কৃতির উপর লক্ষণীয় তেমনি আদিম যুগেও এক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অন্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করতে দেখা যায়। সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আদিম ধ্যান-ধারণা একস্থান থেকে অন্য স্থানে গৃহীত হয়েছে। কাজেই সংস্কৃতির ব্যাপ্তিবাদ শুধু আধুনিক যুগে নয়, আদিম যুগেও কার্যকর ছিল।

সংস্কৃতিকে তুলনামূলকভাবে পাঠ করলে দেখা যায় যে, কোন দেশের মানুষ তার জীবন-যাপন প্রণালীর সবটাই তার নিজস্ব সৃষ্টি একথা দাবী করতে পারে না। তার জীবন-যাত্রার বহু উপাদান তাকে অন্যের কাছে থেকে গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে যদিও জনগোষ্ঠী নিকটবর্তী অন্য জনগোষ্ঠী থেকে কর্তৃক সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ করে, তাহলে তারা এসবকে কিছুটা নিজেদের জীবন-ধারায় খাপ খাইয়ে পরিমার্জিত করে নিতে পারে।

একদল ইংরেজ ব্যাপ্তিবাদী নৃবিজ্ঞানী শব-ব্যবচ্ছেদবিদ জি. ইলিয়ট স্মিথের নেতৃত্বে মিশরীয় সভ্যতার অনেক নিদর্শন অন্যত্র আবিষ্কার করেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নীল-নদের কারণেই সেখানকার সংস্কৃতি অন্যত্র ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। কারণ যাতায়াত ব্যবস্থা যতই উন্নত হয় সংস্কৃতি ততই ব্যাপ্তি লাভ করে। বর্তমানে একদেশের সংস্কৃতি অন্যদেশের সংস্কৃতিতে ব্যাপ্তি লাভের অন্যতম প্রধান কারণ উন্নত যাতায়াত যোগাযোগ ব্যবস্থার উপস্থিতি।

মানব সমাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্লেইসটোনিক যুগের প্রাচীন প্রস্তর সংস্কৃতির আমলে মানুষের ব্যবহৃত বহু হাতিয়ার বহু মাত্রিক বিবর্তনের ধারায় উন্নত হয়ে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, আরব ও ভারতের প্রাচীনতম সংস্কৃতি সমূহকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে "মূল পাথরের সংস্কৃতি" বলে অভিহিত করা যেতে পারে। শিকার যুগে আমরা তীর, ধনুক, বর্শা ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ করে থাকি, এসব ছিল প্রাথমিক ও মৌলিক আবিষ্কার। পরে এগুলোকে আরও ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে পরবর্তীকালে তীর-ধনীকের স্থলে বন্ধুকের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। মূলত, দেখা গেছে যে, প্রযুক্তি পরিবর্তনের ধারায় এগুলো বিভিন্ন সমাজে প্রবর্তিত হয়। এবং তা কোন কোন সমাজে ব্যাপ্তি লাভ করে।

সে যা হোক সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তি সরল-সহজ নয়। তার গতিপথে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি দেখা দিতে পারে। তবে এ বাধা অতিক্রম অসম্ভব নয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বাধার স্থায়িত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও অপসারিত হয়।

www.swapno.in

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, বর্তমান বিশ্বে সংস্কৃতির ব্যাপ্তি প্রক্রিয়া অবাধ গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংস্কৃতি ও ভাবের আদান প্রদান এখন ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। সভা, সমিতি, সংস্থা সম্মেলন যেমন এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে, তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি প্রক্রিয়া সহজতর হচ্ছে।

তবে সংস্কৃতির আলোচনায় একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃতি মনের ব্যাপার তথা মানুষের মনোজগৎ থেকে সৃষ্ট। যে নগণ্য হাতুড়ি, বাটালি আমাদের সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছে সেগুলিকে আমরা নিছক পাথরের টুকরা বা গাছের ডালের মত জড় পদার্থ বলে মনে করি থাকি। কিন্তু এই হাতুড়ি, বাটালি যে প্রকৃতপক্ষে এক নিপুণ হাতের তৈরি উপকরণ এবং হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এগুলি বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌচেছে সে কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

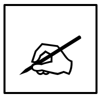

অনুশীলন ১ (Activity 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

মর্গান মানব সমাজের সংস্কৃতিক যে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, সে গুলোর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লিখুন ঃ

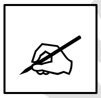

অনুশীলন ২ (Activity 2) **সময় ঃ ৯ মিনিট**

“সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীই অভিন্ন সংস্কৃতির কমবেশী অধিকারী” – অনূর্ধ্ব ৫০টি শব্দ দ্বারা উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন ঃ

www.swapno.in

সারাংশ ঃ
সংস্কৃতির সাথে সমাজের রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। বস্তুত সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের অলংকার স্বরূপ। মানসিক ঐক্য ও অনুভূতি সমাজ গঠনের মৌল উপাদান। আর প্রায় প্রতিটি সমাজ তার সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে মানুষের মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টার সংস্কৃতি গড়ে উঠে। আর সে কারণেই সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল। মানুষের সমাজ জীবনে সংস্কৃতি একটি অপরিহার্য উপাদান। একটি কাগজের উভয় পিঠের মতো সমাজ ও সংস্কৃতি একে অপরের প্রতিরূপ। মূলত, সমাজ বিহীন সংস্কৃতির কথা আমরা চিন্তা করতে পারিনা ; আবার সংস্কৃতি ছাড়া সমাজের কথাও ভাবা যায় না। আসল কথা হচ্ছে মানুষের পরিশ্রমে ফলে গড়ে উঠেছে আমাদের সংস্কৃতি, সমাজ এবং সভ্যতা।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক পরিবেশের অন্য নাম কি কি?
ক) সংস্কৃতি খ) মানবিক পরিবেশ
খ) লোকাচার ঘ) লোকসংস্কৃতি

২। এক অঞ্চলের সংস্কৃতি যখন আরেক অঞ্চলে ব্যাপ্তি লাভ করে তখন তাকে কি বলে?
ক) ব্যাপ্তি খ) সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তি
গ) বিস্তৃতি ঘ) অনুপ্রবেশ

৩। সমাজ ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক কি ধরনের?
ক) একে অপরের প্রতিরূপ খ) পরিপূরক
গ) সমান্তরাল ঘ) বিপরীত

৪। কে সংস্কৃতিকে "সামাজিক ইতিহাসের" সাথে তুলনা করেছেন?
ক) সেন্ট–সাইমন খ) মর্গান
গ) লোঈ ঘ) র‍্যাটজেল

www.swapno.in

www.swapno.in

www.swapno.in

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক

পাঠ
৫

সংস্কৃতি বলতে আমরা মানুষের উন্নততর জীবন যাপনের প্রচেষ্টাসমূহের একটা পরিবর্তনশীল ও সামগ্রিক ফলশ্রুতিকে বুঝি।

এই পাঠটি পড়ে আপনি

১. সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়টি কি তা জানতে পারবেন;
২. এ ছাড়া সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে তুলনামূলক সম্পর্ক সম্বন্ধেও আপনি অবহিত হবেন;
৩. সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে যে পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কেও আপনি জানতে পারবেন।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক

সংস্কৃতির ও সভ্যতার সংজ্ঞা

(Definition of culture and civilization)

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক অর্থে বলা যায় যে, সংস্কৃতি হলো একটি জীবন প্রণালী (A way of life)। এ অর্থে কোন সমাজের সংস্কৃতি বলতে ঐ সমাজের মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা প্রণালীকে বুঝানো হয়ে থাকে। বস্তুত, সামাজিক জীবন যাত্রার বৈশিষ্ট্যসমূহের এক অনন্য সমন্বয় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সমাজের সংস্কৃতি। সংস্কৃতির একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে। ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসার তাঁর Principle of Sociology নামক গ্রন্থে সংস্কৃতিকে অধিজৈবিক প্রপঞ্চ (Superorganic Phenomena) অর্থাৎ জৈবিক ও অজৈবিক তথা জীব জগৎ ও জড় জগতের উর্ধ্বে এমন একটি উন্নততর পরিবেশ বলে ধারণা করেছেন, যে পরিবেশ কেবল মানুষের সমাজেই লক্ষ করা যায়। রুশ সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট সংস্কৃতিকে মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানের সমষ্টি হিসেবে মনে করেছেন। অপরপক্ষে, ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী গ্রাহাম ওয়ালাস বলেছেন যে, মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ ও পার্থিব উপকরণের সমষ্টিগত রূপই মানুষের সংস্কৃতি। তিনি সংস্কৃতিকে সামাজিক ঐতিহ্যের সংগে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে মানুষের দু'প্রকার ঐতিহ্য আছে, যথা সামাজিক ঐতিহ্য, যা পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে নবীনদের ভেতর প্রবেশ করে এবং জৈবিক ঐতিহ্য, যা মানুষ বংশগতির মাধ্যমে লাভ করে।

সংস্কৃতি হলো একটি জীবন প্রণালী (A way of life)।

নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কী সংস্কৃতি বলতে মানুষের সৃজনশীলতার সমষ্টিগত রূপকে বুঝেছেন। সম্ভবত, সংস্কৃতি সম্পর্কে ইংরেজ নৃবিজ্ঞানী টাইলরের সংজ্ঞাটি সবচেয়ে বেশী প্রচলিত। টাইলর সংস্কৃতিকে মানব সমাজের সবকিছুর একটা মিশ্ররূপ হিসেবে গণ্য করেছেন। তার ভাষায় মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, আইন-কানুন, নীতিবোধ, প্রথা এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত সকল দক্ষতা ও অভ্যাসের সামগ্রিক রূপই হল সংস্কৃতি।

নব নব উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে যেমন মানুষের ধ্যান-ধারণা ও অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটেছে। তেমনি মানব সংস্কৃতিও পরিবর্তনশীল। সেজন্য সংস্কৃতি বলতে আমরা মানুষের উন্নততর জীবন যাপনের প্রচেষ্টাসমূহের একটা পরিবর্তনশীল ও সামগ্রিক ফলশ্রুতিকে বুঝি।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহ থেকে সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা হয়েছে যে, নৃবিজ্ঞানীও সমাজবিজ্ঞানীরা যে অর্থে সংস্কৃতিকে বুঝেছেন তা সংস্কৃতির প্রচলিত সাধারণ অর্থ

www.swapno.in

থেকে ভিন্নতর। কারণ সংস্কৃতি বলতে সাধারণত সমাজের সুকুমার শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অবদানকে মনে করা হয়। এছাড়া, এখানে কথায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। তাই শিক্ষিত লোকদেরই সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে 'সংস্কৃতি' হল মানুষের চিন্তা ও কর্মের একটা সার্বিকরূপ। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে কোন মানব গোষ্ঠীই সংস্কৃতিবিহীন নয়। ছোট-বড় ও উন্নত-অনুন্নত সকল সামাজিক গোষ্ঠীরই নিজস্ব সংস্কৃতি বা জীবনধারা রয়েছে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাহলে সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি যে, সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা যা অর্জন করি তাই সংস্কৃতি। মানুষ তার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষে যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাই তার সংস্কৃতি।

সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি মানুষ তার প্রয়োজনে যেসব কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে সেসবের সমগ্র যোগফল।

আসুন এবার আমরা জেনে নেই সভ্যতা বলতে কি বোঝায়। সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি মানুষ তার প্রয়োজনে যেসব কলাকৌশল এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তার সমগ্র যোগফল। মানুষ তার সৃজনশীল প্রয়াস দ্বারা এবং বিজ্ঞানের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে যে-সামগ্রিক সমাজ জীবন গড়ে তোলে তার বাহ্যিক বস্তুগত প্রতিফলনই হলো সভ্যতা। রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, কল-কারখানা, অট্টালিকা, বাসস্থান, অফিস-আদালত নগর-ন্দর, সব মিলে যে জটিল বস্তুগত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠে। তার অনন্য স্বরূপটিই হচ্ছে সভ্যতা। রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্র থেকে শুরু করে, কাপড়ের কল, টেলিফোন, রেলপথ, স্কুল, ব্যাঙ্ক- এসবই সভ্যতার অঙ্গীভূত। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমার্থক নয়। সমাজবিজ্ঞানীগণ সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদানে তাই বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সাধারণত দেখা যায় যে, সংস্কৃতির সংজ্ঞা থেকেও সভ্যতার ধারণা পাওয়া যায়। যদিও অনেক ক্ষেত্রেও মনে হয়ে থাকে যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা অভিন্ন অর্থ জ্ঞাপক, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এদের পার্থক্য লক্ষণীয়।

ম্যাকাইভার বলেছেন, আমরা যা আছি তাই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের যা আছে তা আমাদের সভ্যতা।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে বলেছেন "আমরা যা আছি তাই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের যা আছে তা আমাদের সভ্যতা" (Our culture is what we are, our and civilization is what we use). অর্থাৎ আমরা 'যা আছি' ও আমাদের 'যা আছে' – এ দুটি শব্দের মৌলিক পার্থক্যই হচ্ছে সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে "সামাজিক আমিত্ব", আর সভ্যতা হচ্ছে তার সৃষ্ট সম্পদ। সংস্কৃতি হল জাতির মনোজগতের অন্তর্নিহিত ভাব ও কর্ম। আর সভ্যতার হল জাতীয় সংস্কৃতির বাহ্যিকরূপ।

সভ্যতার হল জাতীয় সংস্কৃতির বাহ্যিক রূপ।

আমরা এর পরে সংস্কৃতি ও সভ্যতার তুলনামূলক পর্যালোচনা করবো। এখানে আমরা মূলত সভ্যতা হলো মানুষের বাহ্যিক আচরণ (Outward behaviour)। সভ্যতার উপাদানসমূহ যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত থাকে এবং এ সঞ্চয়ের ভিত্তিতেই উহার পরবর্তী উন্নয়ন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি, ঘোড়ার গাড়ি প্রবর্তিত হবার ফলে গরুর গাড়ি বাতিল হয়ে যায়নি; আবার মোটর গাড়িও এসবকে বাতিল করেনি। সব কিছুর মধ্যে নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা কাজ করে। এ উদ্ভাবনী চিন্তার ফলশ্রুতিতে আমরা নতুন ধরনের মোটর গাড়ি দেখতে পাই। এভাবে সভ্যতার যে কোন উপাদান বিশ্লেষণ করলে এরূপ অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতিমূলক পরিবর্তন দেখা যায়। আমরা আরও দেখতে পাই যে, সভ্যতার উপাদান যত সহজে আয়ত্ত করা যায়, সংস্কৃতির উপাদান তত সহজে আয়ত্ত করা যায় না; যেমন রেডিও তৈরীর পদ্ধতি বা যান্ত্রিক গঠন প্রণালী জানা থাকলে রেডিও বাজানো যায়। কিন্তু সংস্কৃতির উপাদান প্রতীকমূলক হওয়ায় তা আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়। মূলত, সভ্যতা বাহ্যিক বলেই তা যান্ত্রিক। সভ্যতা সম্পর্কে আমরা আরও বলতে পারি যে, সভ্যতাকে পরিমাপ করা যায়। যেমন একটি ট্রাক, ঘোড়ার গাড়ির তুলনায় দ্রুতগামী। আবার যন্ত্রচালিত তাঁত হস্তচালিত তাঁতের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও উৎপাদনক্ষম। নিম্নে সভ্যতার উন্মেষ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

সভ্যতা হলো মানুষের বাহ্যিক আচরণ (Out ward behaviour)।

সভ্যতা বাহ্যিক বলেই তা যান্ত্রিক।

সভ্যতার উন্মেষ

www.swapno.in

প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী এল এইচ মরগান তাঁর 'Ancient Society' নামক গ্রন্থে সভ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন সমাজের বিকাশকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে বন্য দশা (Savagery), বর্বর দশা (Barbarism) ও সভ্যতা (Civilization)। মর্গানের মতে সভ্যতার সূচনা ঘটে বর্ণমালা ও লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যম। আবার সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেড সভ্যতা বলতে বুঝিয়েছেন যে, যখন মানুষ প্রকৃতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয় তখনই সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

সভ্যতাকে পরিমাপ করা যায়।

পৃথিবীর বিস্তৃত ভূ-খণ্ডের মধ্যে মাত্র কয়েকটি স্থানে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। প্রথম সভ্যতার বিকাশ হয় উত্তর আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় খ্রিষ্টের জন্মের ৩০০০ বছর আগে। পশ্চিম এশিয়ার টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে এবং উত্তর আফ্রিকার নীলনদের অববাহিকায় যে সভ্যতা ও সমাজ গড়ে উঠেছিল পুরাতত্ত্ববিদরা সে সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আজও অনেক সুপ্রাচীন সভ্যতার তথ্য তেমনভাবে জানা যায়নি; যেমন সিন্ধু সভ্যতা, চীন সভ্যতা।

নীলনদের তীরে গড়ে উঠা মিসরীয় সভ্যতার মত টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে (মেসোপটেমিয়ার) ব্যাবিলনীয় সভ্যতা স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে সভ্যাতার উন্মেষের পথ সুগম হয় খ্রিষ্টের জন্মের ৪০০০ বছর আগে।

এক অর্থে সভ্যতা হচ্ছে সংস্কৃতির বাহন।

কৃষির আবিষ্কার মানুষের সমাজ জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বরফ যুগের অবসানে পৃথিবীর জলবায়ুর যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার ফলেই নবোপলীয় অর্থনীতির উদ্ভব হয়। নবোপলীয় যুগ হতে কৃষি কাজের জন্য যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হত, তা ছিল অতি প্রাথমিক স্তরের। নবোপলীয় যুগের শেষ এক হাজার বছরে নানাবিধ আবিষ্কার মানব সভ্যতার যে অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস সম্ভব করে তুলেছিল তাকে আমরা নগর বিপ্লব বলে অভিহিত করে থাকি। এ যুগকেই সাধারণত তাম্র-পলীয় যুগ বলা হয়। এই তাম্রপলীয় যুগের আবিষ্কার হল মৃৎশিল্প, ধাতববিদ্যা, কৃষি যন্ত্রপাতি, লাঙ্গল, ভার বহনে পশু শক্তির ব্যবহার, গাড়ির চাকা, মৃৎশিল্পের চাকা, ইট, কৃত্রিম সেচ ইত্যাদি। তাছাড়া সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকেও কাজে লাগাতে শেখে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের পর পরই মিসরে পালতোলা নৌকার ব্যবহার হতে দেখা যায়; যদিও এসময় প্রাচীন কাঠের মৃৎশিল্প ও পাথরের অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এসব হাতিয়ার ও প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবহার মানুষকে আরও সচেতন করে তোলে। ফলে সমাজকাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের এই গুণগত পরিবর্তনই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সূচনা করে । খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে মিশর, মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু অববাহিকায় নবোপলীয় অর্থনীতির অবসানে নগর সভ্যতার উদ্ভব হয়। তাহলে আমরা সভ্যতা সম্পর্কে বলতে পারি যে, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানব সংস্কৃতির নানারূপ কীর্তি যখন সাধারণ্যে বিস্তৃত হয়ে একটি স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে, তখনই সংস্কৃতির সেই স্থায়ী রূপকে উক্ত জনগোষ্ঠীর, দেশের বা যুগের সভ্যতারূপে চিহ্নিত করা যায়।

মর্গান মানব সমাজকে ৩টি স্তরে ভাগ করেছেন ঃ যথা ১। বন্য দশা, ২। বর্বর দশা৩। সভ্যতা।

বহমান নদীর স্রোতধারা যদি

সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটে। উত্তর আফ্রিকায় ও পশ্চিম এশিয়ায় খ্রিষ্টের জন্মের ৩০০০ বছর আগে।

সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার

(Relation between culture and civilization)

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি উভয়ের মধ্যে মিল আছে। আমরা দেখেছি যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। কেউ কেউ সভ্যতা ও সংস্কৃতি শব্দদুটিকে সমার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। কেউ বলেছেন সভ্যতা ও সংস্কৃতি একই বস্তুর দুটি দিক। বলা যায় যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও

www.swapno.in

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা অনস্বীকার্য। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, সভ্যতা প্রায় ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত নয়; যেমন সভ্যতার উপাদান কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে তা সংস্কৃতি দ্বারা নির্ণীত হয়। সমাজে মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে এবং সভ্যতাও সেভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবার ফলে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয় এবং ক্রমশ কায়িক পরিশ্রম লাঘব করার উদ্দেশ্যে নানা রকম প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়। এছাড়া, জীবন-যাপনের মান সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হবার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন সামগ্রী সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে সংযোজিত হচ্ছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও বিদ্যমান। তাই এবার জেনে নেয়া যাক সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পরস্পরনির্ভরতা কতখানি। প্রথমেই আমরা বলতে পারি যে একদিক থেকে সভ্যতা হচ্ছে সংস্কৃতির বাহন। ছাপাখানা তার মস্ত বড়ো প্রমাণ। বই যখন হাতে লেখা হতো, তখন তার প্রচার ছিল সীমিত। কিন্তু আজ তা পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছতে পারে। আজকের সংস্কৃতি যে এত বিস্তৃত তার মূলে রয়েছে সভ্যতার অবদান। আর এদিক থেকে চিন্তা করলে বলা যায় যে, সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সহজেই সংস্কৃতির সাথে সভ্যতার কোন সম্পর্ক নেই একথা বললে ভুল হবে। কারণ বহান নদীর স্রোতধারা যদি সংস্কৃতি হয় তা হলে নদী তীরবর্তী পলিমাটি ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা পরিবেশ হলো সভ্যতা। বস্তুত, সংস্কৃতি ও সভ্যতা একে অপরের পরিপূরক। আমাদের রাখতে হবে, সভ্যতা আমাদের শ্রমকে অনেক লাঘব করেছে। এই পৃথিবীতে এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষের জীবনে অবসর ছিল না বললেই চলে। দৈনন্দিন খাদ্য সংগ্রহে মানুষের চলে যেত সমস্ত দিনও বছর কিন্তু মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটালো। তখন মানুষের অবসর বেড়ে গেল। অবসর বৃদ্ধি পাবার ফলে মানুষ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সময়ও সুযোগ পেল। অবশ্য শুধু অবসরকে সংস্কৃতি বলা যায় না। অবসরের ফসলকে সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতা বলা যেতে পারে। অন্যের শ্রমকে ভোগ করে যাঁরা অবসর জীবন কাটান তাঁরা বাড়িতে গুটিকয়েক ওস্তাদ পুষলেও আমরা তাঁদের সংস্কৃতিবান আখ্যা দিতে নারাজ। কারণ মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব বিস্তার ন্যায় ও সংস্কৃতি বিরুদ্ধ ব্যাপার। মানুষের অবসরকে নিরন্তর প্রয়াস চলেছে সর্বত্র। কারণ এই অবসর জীবন সংস্কৃতি চর্চায় অত্যাবশ্যক। আর একমাত্র সভ্যতাই তা আমাদের দিয়ে থাকে এবং দিতে পারে। এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি চমৎকার উক্তি উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বলেছেন "অবসরের ক্ষেত্রে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে।" তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতার অবদান। সংস্কৃতির মানদণ্ডে আমরা সভ্যতার বিভিন্ন অবদানকে মূল্যায়ন করি। এ ব্যাপারে সব দেশেরও সব যুগের সংস্কৃতির একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। বাঙালী সংস্কৃতিতে যে সহনশীলতার উপাদান আছে, অন্য সংস্কৃতিতে হয়তো তা সে পরিমাণে নেই। আবার অন্য সংস্কৃতিতে যান্ত্রিক প্রগতির দিকে যেমন সীমাহীন আগ্রহ আছে, আমাদের সনাতন সংস্কৃতিতে ঠিক ততখানি নেই। এক দেশের সংস্কৃতি হয়তো যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে মেনে নিয়েছে, অন্য দেশ তা নেয়নি। নেয়নি বলেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় তার আস্থা কম। অনেক সংস্কৃতিবান মানুষ বোমাকে বিজ্ঞানের কৃতিত্ব বলে না, বলে বর্বরের জয়। এসব আসলে দৃষ্টিভঙ্গির কথা। এই মানদণ্ডে সভ্যতার অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতি নির্ণয় করা হয়। এদিক থেকে চিন্তা করে বলা যায় যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমার্থক না হলেও পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশে বাঙালী জাতিসত্তার বিকাশ ঘটায়, যা পরিণামে একাত্তরে মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণা যোগায় এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কি করে সভ্যতাকে আমরা ব্যবহার করবো তা আমাদের সংস্কৃতি নির্ধারণ করে। যেমন, বাষ্পশক্তি দিয়ে স্নো-পাউডারের কারখানাও হতে পারে, আবার ইস্পাত শিল্পও গড়ে উঠতে পারে। তবে কোনটা আমাদের প্রয়োজনের দিক থেকে অগ্রাধিকার পাবে। সে বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর

www.swapno.in

এক্ষেত্রে আমাদের চাহিদা ও রুচি উভয়ই বিবেচ্য। অর্থাৎ সংস্কৃতিবিহীন সভ্যতার কথা আমরা ভাবতে পারি না, আবার সভ্যতার সংস্পর্শ ছাড়া সংস্কৃতির কথাও অনেক ক্ষেত্রে অচিন্তনীয়। আসল কথা, সভ্যতার উপকরণ বা ফসলগুলো এক একটি জাহাজ সদৃশ। এসবকে নিয়ে অনেক বন্দরেই পাড়ি জমাতে পারি আমরা। কোন্ বন্দরে যাব সেটি সম্পর্কে আমাদের সংস্কৃতি দিক-নির্দেশনা দিবে। আর জাহাজ না থাকলে আমরা আদৌ কোথাও যেতে পারি না। অধিকন্ত জাহাজটা যদি ভালো হয়, তবে আরও দ্রুত বেড়ে চলতে পারি; পুরোনো হলে আমাদের গতি হবে ধীর-মন্থর। আমাদের জাহাজের জীবন হবে তার বিধি-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সভ্যতার ভিত্তি মজবুত হয় তাহলে আমাদের যাত্রা সুগম হবে। যদি দুর্বল হয়, তাহলে এটি প্রচুর কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমরা কোথায় চলেছি এর সঙ্গে সভ্যতার কোন পূর্ব নির্ধারিত সম্পর্ক নেই। সভ্যতার বহিরঙ্গের ওপর সেটা নির্ভরশীল নয়। যদি সভ্যতা শান্তিময় হয় তাহলে ঘাটে ঘাটে আমরা নিঃশঙ্কচিত্তেই থামব। আমরা জীবনকে আর উপভোগ ও পরিপূর্ণ করব। আবার এগিয়ে চলবো। অনন্ত সমুদ্রে জীবনের কলসীকে কানায় কানায় ভরে তোলাই সংস্কৃতি। অতএব বলা যায় যে, সভ্যতার সমগ্র অভিযাত্রাই হচ্ছে সাংস্কৃতিক জীবন। সভ্যতা যে একদিনে গড়ে ওঠেনি তা আমরা জানি, কিন্তু সভ্যতা যে একজনের হাতে গড়া নয়, তা আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। কখনো কখনো জাতীয়তার বড়াই আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। এক সময় মনে করা হত সভ্যতা কোনো একটি বিশেষ জাতির বাগানে বিকশিত ফুল। আসলে সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের আত্ম পরিচয়, আর সভ্যতা হলো আমাদের বস্তুগত সৃষ্টি। কাজেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এ দুটি প্রত্যয়ের মধ্যে অবশ্যই যোগাযোগ রয়েছে। এ সম্পর্কে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংস্কৃতির গতি মন্থর বা দ্রুত যাই হোকনা কেন, সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিকতা আছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সংস্কৃতিকে পরাজিত করা যায় না। কোন পৈশাচিক আক্রমণে সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু সেখানকার সংস্কৃতি সহজে বিনষ্ট হয় না। এ কারণেই ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের শহীদ মিনার ধ্বংস করে দিয়েও বাঙালী সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে দিতে পারেনি। সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর জন্ম নেয় হয় নতুন সংস্কৃতি। তাই সভ্যতা ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। মূলত যে সব উপকরণের সাহায্যে সভ্যতা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেসব উপকরণ দেশ-দেশান্তরের মানুষের অবদান। ইতিহাস আমাদের এ কথাই শেখায়। শুধু কৃষি কিংবা আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি প্রস্তরই নয়, মিশরের পিরামিডের ধ্যান ধারণা থেকেই বিরাটাকার স্থাপত্য ভাস্কর্যও গড়ে শিখেছে ইউরোপ। মিশরীয়রা ছিল সূর্যপূজারী। তাদের মমি, বোনা কাপড়, পিরামিড ও সূর্যপূজা পর্যবেক্ষণ করে পন্ডিতেরা তখনকার সংস্কৃতির নাম দিয়েছেন 'Heliolithic'। হেলিওলিথিক হচ্ছে সূর্য আর পাথরের সম্মিলিত সংস্কৃতি, পেছন রয়েছে সভ্যতার বিরাট অবদান। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমার্থক না হলেও পরস্পর সম্পর্কিত। সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিই সভ্যতার ভিত্তি ও তার গতি নির্ণয় করে। সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হল পরিবার, সম্পত্তি, রাষ্ট্র, ধর্ম শিক্ষা ও বিনোদনমূলক সংঘ আসলে সভ্যতা হচ্ছে সংস্কৃতির বাস্তব রূপায়ন। কাজেই সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার যোগাযোগ অবশ্যই রয়েছে ও থাকবে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক।

ম্যাকাইভার বলেছেন 'আমরা যা তাই সংস্কৃতি এবং আমরা যা ব্যবহার করি তাই সভ্যতা"

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমার্থক নয়।

সভ্যতা একদিনে গড়ে ওঠেনি

সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের আত্ম পরিচয় আর সভ্যতা হলো আমাদের বস্তুগত সৃষ্টি।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এ দুটি প্রত্যয়ের মধ্যে অবশ্যই যোগাযোগ রয়েছে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য ঃ (Difference between culture and civilization)

আমরা অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতি ও সভ্যতার অর্থ অভিন্ন মনে করে থাকি। অনেকে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সভ্যতাকে বুঝিয়েছেন এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমার্থক রূপে ব্যবহার করে প্রত্যয় দু'টিকে দুর্বোধ্য করে তোলেছেন। সংস্কৃতির সাথে সভ্যতার সম্পর্ক থাকলেও এ দু'টি প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি ও সভ্যতা অভিন্ন নয়। তবে সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য নির্ধারণ করা বেশ কষ্টসাপেক্ষ ব্যাপার। এ দুটি প্রত্যয়ের পার্থক্য শুধু সংজ্ঞা দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়; বিশ্লেষণের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে।

www.swapno.in

কারণ, সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি 'সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব' (Corporate Personality), আর সভ্যতা হচ্ছে সমবেত ব্যক্তিত্বের দ্বারা অর্জিত সম্পদ। কথাটাকে অন্যভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, যে, সংস্কৃতির পরিস্ফুট বৈশিষ্ট্য হলো সভ্যতা। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন- ' আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি, আর আমরা যা ব্যবহার করি তা আমাদের সভ্যতা।' (Culture is what we are and civilization is what we use)। অর্থাৎ আমরা যেরূপ আছি, ও আমাদের যা আছে এ দু'টির মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন- সংস্কৃতি হচ্ছে 'সামাজিক আমিত্ব', আর সভ্যতা হচ্ছে 'তার সৃষ্ট সম্পদ'। অথবা অন্যভাবে বলা চলে যে, সংস্কৃতিকে মানুষের সামাজিক আমিত্বের' মাঝে, আর সভ্যতাকে যা নিয়ে ঐ 'সামাজিক আমিত্ব'-এর অস্তিত্ব টিকে থাকে তাকে বোঝানো হয়। কথাটা এভাবেও বলা, যেতে পারে যে, সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের পরিচয় আত্ম পরিচয় আর সভ্যতা হলো আমাদের বস্তুগত সৃষ্টি। বস্তুত, সমাজবিজ্ঞানের এ দুটি মৌলিক ধারনার ধারনা ধারনা দ্বারা মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন সংস্কৃতি হল খাঁটি হওয়া, মার্জিত ও রুচিশীল হওয়া, আর সভ্যতা হল কোন কিছু অর্জন করা বা বর্জন করা। নিম্নে সংস্কৃতি ও সভ্যতার কয়েকটি পার্থক্য উল্লেখ করা হলো ঃ

সংস্কৃতি	সভ্যতা
১। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের মতে "আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি" অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে "সামাজিক আমিত্ব"।	১। ম্যাকাইভার এর মতে "আমরা যা ব্যবহার করি তাই আমাদের সভ্যতা অর্থাৎ সভ্যতা হচ্ছে আমাদের সৃষ্ট সম্পদ।
২। সংস্কৃতি পরিমাপের কোন সুনির্দিষ্ট মানদন্ড নেই।	২। সভ্যতার পরিমাপের একটি সুনির্দিষ্ট মানদন্ড আছে।
৩। সংস্কৃতি সব সময় অগ্রসর মনে হয়।	৩। সভ্যতা সর্বদাই অগ্রসরমান।
৪। সংস্কৃতির বিস্তার সভ্যতার মত এত সহজ নয়।	৪। সভ্যতা অনায়াসেই একস্থান থেকে অন্য স্থানে এবং একজাতি থেকে অন্য জাতিতে বিস্তার লাভ করে।
৫। সংস্কৃতি মানুষের প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টি হয় না।	৫। সভ্যতা সমাজের প্রয়োজনবোধে সৃষ্টি হয়।
৬। সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিক ক্রিয়ার ফল হল সংস্কৃতি।	৬। সমাজবদ্ধ মস্তিস্কপ্রসূত প্রযুক্তিকে সভ্যথও ভলা যেতে পারে।
৭। বাংলাদেশের মত কৃষি ভিত্তিক দেশে সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক হল গ্রাম।	৭। সভ্যতার প্রধান ধারক হল শহর।
৮। সংস্কৃতি একটি জীবন প্রণালী বিশেষ।	৮। সংস্কৃতির প্রতিফলনই হল সভ্যতা।
৯। সংস্কৃতিকে সহজে বিনষ্ট করা যায় না। এর ধ্বংস সাধন বেশ দুরূহ কাজ।	৯। কোন সভ্যতা দ্রুত ধ্বংস হতে পারে।
১০। সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেডের মতে, সংস্কৃতি হচ্ছে, সমাজের শিল্পকলা, নীতিবোধ, দর্শন ও জ্ঞানের সমাহার।	১০। সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেডের মতে, মানুষ যখন তার প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কারিগরি কৌশল দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় তখনই সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

www.swapno.in

উপরে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে বিদ্যমান দশটি পার্থক্য চিহ্নিত করা হলো। এবারে সংস্কৃতি ও সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা আরো কিছু পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করব। প্রথমে উল্লেখ করা যায় যে, দার্শনিক কান্ট বলেন ঃ সভ্যতা হলো মানুষের বাহ্যিক আচরণ (Outward behaviour)। আর সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা (Inward state of man)। সভ্যতার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এটা লুকিয়ে রাখার কোন বিষয় নয়। সংস্কৃতি যদিও অবোধগম্য নয় তবু আমরা বলতে পারি যে, বাহ্যিক চাক্‌চিক্য দেখে কেবল দেশের সভ্যতার যত সহজে বুঝঅ যায় সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ তত সহজ নয়। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের মানুষের নিবিড় সংস্পর্শে আসা প্রয়োজন। তা না হলে ঐ দেশের মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। আর এ কারণেই কোন সমাজ ও সংস্কৃতির গবেষণায় নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও অংশগ্রহণ পদ্ধতি প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। একটি 'শিক্ষা সফর দল'(Study Tour-Group) স্বল্পতম সময়ে কোন দেশের সভ্যতার নিদর্শন দেখে সে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা অর্জন করতে পারলেও সে দেশের সংস্কৃতি (যেমন বিশ্বাস, আচার-আচরণ, প্রথা, মূল্যবোধ, তথা সমগ্র জীবন প্রণালী) সম্পর্কে তেমন সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারে না।

বস্তুত সভ্যতা বাহ্যিক বলেই তা যান্ত্রিক। উপযোগিতা বা উদ্দেশ্য সিদ্ধের উপায় কিংবা কলাকৌশলই হচ্ছে সভ্যতা। আর সংস্কৃতি হল মনোজগতের উপাদান। মানুষের মানবিক চাহিদা পূরণে সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। যদিও হাতিয়ার কিংবা কলাকৌশল মানুষের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়, তবু তা প্রত্যক্ষভাবে নয়। যেমন, যন্ত্রে কাপড় তেরি হওয়া সাপেক্ষে আমরা যন্ত্রের অবদান উপলব্ধি করি। অপরদিকে, সংগীত প্রত্যক্ষভাবেই আমাদের চিত্তের চাহিদা পূরণ করে। তাই সভ্যতা হলো অপ্রত্যক্ষ কলাকৌশল; আর সংস্কৃতি হল প্রত্যক্ষ উপায়।

> সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের অবস্তুগত অবদান আর সভ্যতা হলো বস্তুগত সৃষ্টি।

এখানে আরো একটি পার্থক্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সভ্যতার ক্ষেত্রে একজন আরেক জনের কাজ করে দিতে পারে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। যেমন, একজন ব্যক্তি অন্য আর একজনের জন্য একটি অট্টালিকা তৈরি করে দিতে পারে। তবে এক ব্যক্তি অন্য কারুর জন্য নিজের কণ্ঠস্বর দিয়ে গান গেয়ে দিতে পারে না। কারণ শিল্পী নিজে গান গেয়ে যে আনন্দ পান, অন্য ব্যক্তি গেয়ে দিলে শিল্পীর পক্ষে সে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে আরও পার্থক্য রয়েছে; যেমন, সভ্যতা দ্রুত পরিবর্তনশীল। কিন্তু সংস্কৃতি তত নয়। সংস্কৃতির যাত্রাপথে কোনো মাইলপোস্ট নেই। কিন্তু সভ্যতার ভেতর তা আছে। বলতে গেলে সভ্যতা সব সময় গতিশীল। আজকের আবিষ্কার আগামীকাল বদলে যেতে পারে আবার এর শক্তির উপর নির্ভর করে নতুন কলাকৌশল জন্ম নিতে পারে। এক কালে চলার পথে মানুষের সম্বল ছিল মাত্র দু'খানা পা। আজ সে মহাশূন্য বিচরণেও সক্ষম। সভ্যতা মানুষকে প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতে তুলে দিয়েছে। উপকরণটি নিশ্চয়ই আগেরটির চেয়ে উন্নততর। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি সে কথা। যেমন, শেক্সপীয়র পুরোনো পৃথিবীর মানুষ, আর আমরা একালের লোক এ যুক্তিতে কি আমরা বাতিল করে দিতে পারি তাঁর শ্রেষ্টত্ব? মহাভারত পুরোনো কাব্য- তাই বলে কি আমরা তাকে পুরোনো লাঙলের মতো, কিংবা তাল পাতার কাগজের মতো উপেক্ষা করতে পারি? পারি না। কারণ সংস্কৃতি কালজয়ী। সভ্যতা আপন গতিতে চলে। কিন্তু সংস্কৃতি সে ভাবে চলে না। তাকে ধারণ ও লালন করতে হয়। তার কারণ সংস্কৃতি ও সভ্যতা সভ্যতা দুই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত সত্তা ব্যবহারিক, আর সংস্কৃতি অন্তরের জিনিষ। অশিক্ষিত মানুষও রেলে চড়তে পারে। কিন্তু বিশেষ আকর্ষণ না থাকলে কেউ চিত্র প্রদর্শনীতে পা বাড়ায় না।

> সভ্যতা বাহ্যিক, আর সংস্কৃতি মনোজগতের উপাদান।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে আরেকটি পার্থক্যর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, সভ্যতা সর্বত্রগামী। কিন্তু সংস্কৃতি তা নয়। রাশিয়ায় তেরী এরোপ্লেন বাংলাদেশেও চলতে পারে। কিন্তু

www.swapno.in

বাংলাদেশের একতারা বা নবদ্বীপের খোল-করতাল টেক্সাসে চালাতে গেলে অসুবিধা হতে পারে। তবে আদিকালে সংস্কৃতির উক্ত ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। একমাত্র অনুকূল পরিবেশে ভিন্ন সংস্কৃতি গৃহীত হতে পারে। তবে সেটা অনেক গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে ঘটে এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সভ্যথঅল বৈলঅয় থঅ থত প্রযোজ্য নয়। তাকে নিয়ে ভাবতে হয় কম। অতি সহজেই তাকে গ্রহণ করা যায়।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে আরও পার্থক্য রয়েছে। সভ্যতাকে পরিমাপ করা যায়। যেমন একটি ট্রাক ঘোড়ার গাড়ির তুলনায় দ্রুতগামী। আবার যন্ত্রচালিত তাঁত হস্তচালিত তাঁতের তুলনায় অধিক শক্তিশালী ও উৎপাদনক্ষম। অপরপক্ষে, সংস্কৃতি বিশেষ করে শিল্পকলাকে এভাবে পরিমাপ করা যায় না। এগুলোকে বিমূর্তভাবে উপলব্ধি করতে হয়। শিল্পকলার মূল্য বিচার করতে কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি পাওয়া যায় না। নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সদর দফতর যতই অত্যাধুনিক মনে হোক না কেন, তাজমহলের সাংস্কৃতিক মূল্য জাতিসংঘ ভবনের সাংস্কৃতিক মূল্যের চেয়ে সর্বদাই হয় তো অনেকের কাছে বেশী বলে পরিগণিত হবে। কাজেই বলা চলে যে, সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের অবস্তুগত অবদান, আর সভ্যতা হলো বস্তুগত সৃষ্টি।

মূলত সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে প্রকৃত সীমারেখা নির্ধারণ করা অনেক ক্ষেত্রেই কষ্ট সাপেক্ষ। কারণ দেখা গেছে যে, সংস্কৃতিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলেতা সভ্যতার সীমায় এসে পড়ে। এর কারণ হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি। মর্গান তাঁর (Ancient Society) নামক গ্রন্থে যে পাঁচ প্রকার পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক এক ধরনের বিবাহ পদ্ধতি। অর্থাৎ আদিম যুগের সগোত্র পরিবার অভিন্ন গোষ্ঠীর ভাইবোনদের মধ্যকার বিবাহের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে সংস্কৃতিকে সমাজবদ্ধ মানুষের রুচিবোধ, রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে বলতে পারি, আর এগুলোর ভিত্তি ভূমিকে বলতে পারি সভ্যতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের কবিতা নামক উপন্যাসে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন, যা কোনভাবেই পেশাদারী সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত দৃষ্টান্তের চেয়ে কম অর্থপূর্ণ নয়। যেমন, তাঁর ভাষায় হীরক খন্ড হচ্ছে সভ্যতা, আর তা থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় সেটি হল সংস্কৃতি। আমার বিবেচনায় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সংক্রান্ত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার কিংবা অগবার্ণের ধারণার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা অধিকতর স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। আসলে সংস্কৃতি হচ্ছে হচ্ছে প্রজ্ঞা, আর ঐ প্রজ্ঞা-প্রসূত যেকোন বস্তুগত উপাদান হচ্ছে সভ্যতার নিদর্শন।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রকৃতিগতভাবে দুটি ভিন্ন প্রত্যয়। কারণ সভ্যতা সর্বব্যাপী, স্বচ্ছন্দ গতি সম্পন্ন, যার যাত্রাপথ সহজতর। কিন্তু সংস্কৃতি তার বিকাশ পথে বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অতএব বলা যায়, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে কতক বিষয়ে মিল থাকলেও প্রত্যয় দুটির মধ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান।

অনুশীলনী ১(Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

"সভ্যতাকে পরিমাপ করা যায়" - উক্তিটি অনূর্ধ্ব ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন ঃ

www.swapno.in

অনুশীলনী ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সংস্কৃতি ও সভ্যতা একে অন্যের পরিপূরক” - উক্তিটির সমর্থনে অনূর্ধ্ব ৫০টি শব্দ দ্বারা উক্তিটি লিখুন ঃ

অনুশীলনী ৩ (Activity 3) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য ৫টি বাক্যে প্রকাশ করুন।

সংস্কৃতি	সভ্যতা

সারাংশ ঃ

সংস্কৃতি হলো একটি জীবন প্রণালী। আর সভ্যতা হচ্ছে মানুষ তার প্রয়োজনে যেসব কৌশল এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তার সমগ্র যোগফল। ম্যাকাইভার বলেছেন ‘আমরা যা আছি তাই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের যা আছে তা আমাদের সভ্যতা। মূলত সভ্যতা বাহ্যিক বলেই তা যান্ত্রিক। সংস্কৃতির সাথে সভ্যতার পার্থক্য থাকলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার মিলও রয়েছে। কারণ সভ্যতা প্রায় ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সংস্কৃতি সভ্যতাকে প্রভাবিত করে। সভ্যতা একদিক থেকে সংস্কৃতি নদীর তীরবর্তী পলিমাটি ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা পরিবেশ হলো সভ্যতা। মূলত সভ্যতা সমাজের প্রয়োজন সৃষ্ট অবদান। অপরদিকে, সমাজ মানুষের সৃষ্টি, তাই সংস্কৃতি ও সভ্যতা উভয়েই মানবিক প্রতিভার নিদর্শন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। অভ্যাস ও শক্তির মিশ্ররূপকে কি বলা যায়?

ক) সংস্কৃতি খ) অপসংস্কৃতি

গ) লোকাচার ঘ) মানবিক সংস্কৃতি

২। সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরস্পর সম্পর্ক কি ধরনের?

ক) সমার্থক খ) সম্পর্কিত

www.swapno.in

গ) পরিপূরক ঘ) সম্পূরক

৩। সংস্কৃতির মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি?

ক) লোকাচার খ) অভ্যস

গ) সভ্যতা ঘ) আচার-আচরণ

৪। সামাজিক মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশকে কি বলে?

ক) লোকাচার খ) অভ্যাস

গ) সংস্কৃতি ঘ) সভ্যতা

৫। শিল্প, ধর্ম ও দর্শন এ তিনটি কিসের অন্তর্গত?

ক) সভ্যতা খ) সংস্কৃতি

গ) লোকসংস্কৃতি ঘ) দেশীয় সংস্কৃতি

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সংস্কৃতির উপাদানসমূহ উল্লেখ করুন।

২. বস্তগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি বলতে কি বুঝেন তা আলোচনা করুন।

৩. লোকসংস্কৃতি কাকে বলে? মানব সমাজের ক্রমবিকাশে লোকসংস্কৃতি ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪. বিশ্বাস ও লোকাচার বলতে কি বুঝেন? বিশ্বাস ও লোকাচার কিভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে?

৫. সমাজ বলতে কি বুঝেন? সংস্কৃতি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

৬. সংস্কৃতি কি? সামাজিক জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব আলোচনা করুন।

৭. সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তি বলতে কি বুঝেন? পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত ব্যাপ্তিবাদ আলোচনা করুন।

৮. সংস্কৃতি কাহাকে বলে? সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করুন।

৯. সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিন। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

১০. সংস্কৃতি কি? মানুব সমাজে কিভাবে সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে তা বর্ণনা করুন।

১১. সভ্যতার সংজ্ঞা দিন। "সংস্কৃতি ও সভ্যতা একে অপরের পরিপূরক" - উক্তিটি পর্যালোচনা করুন।

১২. সভ্যতা কাকে বলে? সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

উত্তরমালা ঃ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১ ঃ ১. ক ২. ঘ, ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২ ঃ ১. খ ২. ক ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩ ঃ ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪ ঃ ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫ ঃ ১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. খ

www.swapno.in

www.swapno.in

www.swapno.in

সামাজিক স্তর বিন্যাস ও সমাজ কাঠামো
(Social Stratification and Social Structure)

ইউনিট ১১

ভূমিকা (Introduction)

সামাজিক স্তরবিন্যাস মানব সমাজের একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে সমাজ জীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই মানুষ নিজেই শ্রেণীবিন্যাস প্রবর্তন করেছে। সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্বে সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র, কিন্তু তা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। "স্তর" শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Strata। এ প্রত্যয়টি আমরা ভূতত্ত্ব মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, ভূগোল এবং সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহার করে থাকি। ব্যবহারের দিক থেকে বিভিন্নতা থাকলেও অর্থগত দিকে থেকে অভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। অর্থাৎ স্তর বলতে কোন পদার্থ, সমাজ-জীবন, ব্যক্তি বা বস্তুর গুণগত মানের বিভিন্নতার পর্যায়কে বুঝায়। আর সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে বুঝায় সমাজের ব্যক্তি, গোষ্ঠীর অসম অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। বয়স, লিঙ্গ, বৃত্তিভেদে যেমন শ্রেণী বিভাগ সূচিত হয়, ঠিক তেমনই দক্ষতা, নেতৃত্ব ও পেশার ভিত্তিতে সমাজে বিভিন্ন ধরনের স্তরের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানীগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সমাজের প্রতিটি স্তরকে অবলোকন করে থাকেন। প্রায় সব সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সামাজিক স্তরবিন্যাস সার্বজনীন। অর্থাৎ স্তরবিন্যাস সব সমাজেই ছিল, আছে এবং থাকবে। মানুষের ইতিহাসে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার কারণে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে রদবদল হয়েছে, কিন্তু স্তরবিন্যাস একেবারে অবলুপ্ত হয়নি। এ ইউনিট পাঠ করে আপনি সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা ও ধরন, সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা, ধারণা ও গুরুত্ব জানতে পারবেন।

www.swapno.in

www.swapno.in

সামাজিক স্তরবিন্যাস ঃ সংজ্ঞা, ধারণা ও উপাদান

পাঠ ১

সামাজিক স্তর বিন্যাস বলতে সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠি এবং সামাজিক শ্রেণীর ক্রমোচ্চ অবস্থানকে বুঝায়।

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. সামাজিক স্তরবিন্যাসের মৌলিক উপাদানসমূহ, যেমন- বংশ মর্যাদা, লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, ক্ষমতা, সম্পত্তি, বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

সামাজিক স্তর বিন্যাসের সংজ্ঞা ও ধারণা
(Definition and Concept of Social Stratification)

এ ইউনিটের ভূমিকাতেই সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে। সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে কি বুঝি – এ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীদের সংজ্ঞার আলোকে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া হবে।

এ ইউনিটের শুরুতেই আমরা জেনেছি যে, সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সমাজের ব্যক্তি, গোষ্ঠী ইত্যাদির উঁচু-নীচু অবস্থাকে বুঝায়। অর্থাৎ সামাজিক স্তর দ্বারা সমাজের প্রতিটি মানুষের পদ মর্যাদাকে চিহ্নিত করা হয়। অনুরূপভাবে পদমর্যাদা দ্বারাও সমাজের প্রতিটি মানুষের সামাজিক স্তরবিন্যাস করা যায়। সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সমাজে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং শ্রেণীর অসম অবস্থান কিংবা অসম মর্যাদার বিন্যাসকে বুঝায়।

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্টের ভাষায়, "স্তরবিন্যাস হল প্রাধান্য ও বশ্যতার সূত্রে পরস্পর সম্পর্কিত স্থায়ী গোষ্ঠী বা শ্রেণীতে বিন্যস্ত সামাজিক স্তর বিভাগ"। এখানে তিনি সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে মূলত সমাজে শক্তিধরদের প্রভাব ও দুর্বলদের বশ্যতাকে গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছেন।

সরোকিন ১৯২৮ সালে তার Contemporary Sociological নামক গ্রন্থে বলেন যে, উচ্চ-নীচু শ্রেণীর ক্রমানুসারে সংগঠিত জনসংখ্যার মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্নতাই সামাজিক স্তর বিন্যাস। এখানে তিনি সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে একটি সমাজের জনসংখ্যাকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে সমাজের এক প্রান্তে থাকে উচ্চ শ্রেণীর অবস্থান এবং অপর প্রান্তে থাকে নিম্নশ্রেণীর অবস্থান।

সমাজবিজ্ঞানী জিনবার্টের ভাষায়, "স্তর বিন্যাস হল প্রাধান্য ও বশ্যতার সূত্রে পরস্পর সম্পর্কিত স্থায়ী গোষ্ঠি বা শ্রেণীতে সমাজের মধ্যে স্তর বিভাগ"।

অগবার্ণ ও নিমকফ তাঁদের (Sociology) নামক গ্রন্থে (১৯৫৮) এমন এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে মোটামুটি স্থায়ীভাবে উচ্চ ও নিম্ন মর্যাদার ক্রমানুসারে সাজানো যায়। তাঁরা সামাজিক স্তরবিন্যাসকে "নিয়ন্ত্রিত অসামান্য" (Regulated Inequality) বলে আখ্যায়িত করেছেন- যেখানে সামাজিক ভূমিকা ও কার্যাবলীর ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীর উচ্চ-নীচ অবস্থান নির্ধারিত হয়।

মেরিলের (১৯৬২) মতে, "সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সুযোগের অসম বণ্টন ব্যবস্থাকে বুঝায়, যার অর্থ সমাজের যা কিছু ভাল অর্থাৎ সমাজের সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা ইত্যাদি কতিপয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যদের তুলনায় বেশী মাত্রায় ভোগ করে"। তাঁর মতে জন্মগতভাবেই মানুষ কোন না কোন সামাজিক স্তরে বিন্যস্ত হয় এবং সে অনুযায়ী সে সমাজের সুযোগ-সুবিধা সমূহ ভোগ করতে থাকে।

অপরদিকে মেলভিন টিউমেন এর মতে, "সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে বুঝায় যাতে একটি সামাজিক গোষ্ঠী, শক্তি, সম্পত্তি, সামাজিক মূল্য ও মানসিক

www.swapno.in

সন্তুষ্টির তারতম্যের ভিত্তিতে উল্লম্বী ধারায় শ্রেণীবদ্ধ হয়।" এখানে তিনি সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উভয় দিককেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন।
উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সামাজিক শ্রেণীর ক্রমোচ্চ অবস্থানকে বুঝায়। সমাজে মানুষের আভিজাত্য, যশ ও ক্ষমতার দ্বারা পরস্পরের পার্থক্য নিরূপিত হয়।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের মৌলিক উপাদানসমূহ
(Basic Elements of Social Stratification)

একটি সমাজে বিভিন্ন উপাদান দ্বারা সামাজিক স্তরবিন্যাস হয়ে থাকে। উপাদানসমূহ কি কি? তা জানা প্রয়োজন। তবে এত স্বল্প পরিসরে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সকল উপাদান আলোচনা করা সম্ভব নয়। শুধু মৌলিক উপাদান নিয়েই আলোচনা শুরু করব। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মৌলিক উপাদানসমূহ মূলত দুভাগে বিভক্ত, যথা (১) জৈবিক উপাদান, (২) অজৈবিক উপাদান। সাধারণত: উত্তরাধিকার সূত্রে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত উপাদান সমূহকে জৈবিক উপাদান বলে। আর ব্যক্তিগতমেধা, মনন ও পরিশ্রমকে অজৈবিক উপাদান হিসেবে ধরা হয়। নিম্নে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মৌলিক উপাদানসমূহ আলোচনা করা হল।

> সামাজিক স্তরবিন্যাসের মৌলিক উপাদান সমূহ মূলত দুভাগে বিভক্ত, যথা (১) জৈবিক উপাদান, (২) অজৈবিক (সামাজিক বা অর্জিত) উপাদান।

(ক) বংশ মর্যাদা ঃ সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম মুখ্য উপাদান হল বংশমর্যাদা। বংশ মর্যাদার গুণে ব্যক্তি সমাজে তার অবস্থান করে নেয়। একে আরোপিত বা জৈবিক পদ মর্যাদা বলে। এখানে মানুষের মর্যাদা তার নিজস্ব গুণ, ব্যক্তিত্ব ও কীর্তির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সে কোন্ সামাজিক অবস্থানে জন্ম নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের সমাজে চৌধুরী, ভূঁইয়া, সৈয়দ, শেখ প্রভৃতি উপাধিধারীরা নিজেদেরকে উচ্চ স্তরের মানুষ হিসেবে গণ্য করেন এবং সমাজ তাদেরকে এভাবেই স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। ফলে বিয়ে শাদী ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান বা কর্মকাণ্ড তারা আলাদাভাবে নিজেদের সামাজিক স্তরের মধ্যে করে থাকে।

> সামাজিক স্তর বিন্যাসের অন্যতম মুখ্য উপাদান হল বংশ মর্যাদা। বংশ মর্যাদার গুণে ব্যক্তি সমাজে তার আসন করে নেয়।

(খ) লিঙ্গ ঃ স্ত্রী পুরুষ ভেদে সামাজিক স্তর বিন্যাস লক্ষ করা যায়। আদিম সমাজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও কিছু কিছু ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত অর্থাৎ সমাজে মেয়েদের চেয়ে পুরুষের আধিপত্য ও মর্যাদা বেশী।

(গ) বয়স ঃ সামাজিক স্তর বিন্যাসে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বয়সের উপর নির্ভর করে মানুষ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থকে। সাধারনত কম বয়সী লোকেরা (কিশোর ও তরুণরা) হালকা ধরনের কাজ করে থাকে এবং মধ্যম বয়সী লোকেরা (যুবক ও পরিণত বয়সীরা) কঠিন ও ভারী কাজ করে থাকে এবং বৃদ্ধরা হালকা কাজ করেন, বিশ্রামে থাকেন এবং পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া বয়স দ্বারা সমাজে মানুষের মর্যাদাও সূচিত হয়। যেমন, মানুষ বয়স্ক লোকদের বেশী সম্মান করে, তাদের উপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং সামাজিক বিচার-আচারে তাদের মতামত বা মন্তব্যকে সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

(ঘ) শারীরিক উচ্চতা ঃ যদিও শারীরিক উচ্চতা মানুষ জন্মগতভাবে মা-বাবার ক্রোমোজোম বা জীন থেকে পেয়ে থাকে, তবু শারীরিক উচ্চতার সামঞ্জস্যের মাধ্যমে ব্যক্তির দৈহিক সৌন্দর্য ফুটে উঠে। যেমন, অতিরিক্ত লম্বা বা খুব খাটো লোকদের সাধারণ মানুষ পছন্দ করে না। শুধু তাই নয়, তাদের ব্যক্তিত্বকেও খাটো করে দেখা হয়। কিন্তু পরিমিত উচ্চতা বিশিষ্ট লোকদের

www.swapno.in

ব্যক্তিত্বকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে দেখা হয়। এভাবে পরিমিত উচ্চতা সম্পন্ন লোকজন সাধারণ মানুষের কাছ হতে বেশী মর্যাদা পেয়ে থাকে।

(ঙ) চেহারা ঃ সামাজিক স্তর বিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল চেহারা। চেহারার সামাজিক মূল্য অধিক। বিশেষ করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে এ উপাদানটি অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। যদিও সুন্দর শব্দটি আপেক্ষিক, তবু সাধারণ মানুষ দৈহিক সৌন্দর্যের মূল্য দিয়ে থাকে।মানুষ তার সুন্দর চেহারার বদৌলতে বিয়ে শাদী, নেতৃত্ব প্রদান, অফিসে পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা বা মর্যাদা পেয়ে থাকে।

(চ) বর্ণ/জাতিবর্ণ ঃ বর্ণ কিংবা জাতিবর্ণের দ্বারা বিভিন্ন দেশে সমাজে মানুষের সামাজিক অবস্থা, মর্যাদা, ক্ষমতা ইত্যাদি নির্ণীত হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজে বিভিন্ন জাতি বর্ণের লোক আছে, যেমন- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র ইত্যাদি। আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণের কঠোরতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তথাপি বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে এ সমাজে জাতিবর্ণের ভূমিকা এখনও লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া জাতিবর্ণ অনুযায়ী তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং সর্বোপরি সামাজিক মর্যাদা নির্ণয় হয়। বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানীরা শ্বেতাঙ্গদের অন্যান্য মানব গোষ্ঠীর তুলনায় অধিকতর সৃজনশীল, দক্ষ, সক্ষম, মেধাবী অর্থাৎ সব বিষয়ে উৎকৃষ্ট বলে প্রচার করে থকেন। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা কালোর দীর্ঘ সংগ্রাম বর্ণবাদের চরম রূপ। উল্লেখ্য, হিন্দু সমাজে বিদ্যমান জাতিবর্ণ এবং দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাদা কালো মানুষের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য অভিন্ন নয়।

(ছ) শিক্ষা ও মেধা ঃ শিক্ষা ও মেধা স্তরবিন্যাসের অন্যতম উপাদান। মেধা ও পরিশ্রমের ফলে মানুষ উচ্চ পদমর্যাদা অর্জন করতে পারে। তথাপি মেধাবী লোকেরাই সাধারণত সমাজের উঁচু পেশা, উচ্চ বেতন, অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। তাছাড়া, মেধাবী লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে থকেন। অন্যদিকে, শিক্ষার দিক হতে অনগ্রসর বা কমমেধাবী লোকজন সমাজে মেধাবী লোকদের চেয়ে কম মর্যাদা পায় কিংবা অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে মূল্যায়নই করা হয় না। শুধুমাত্র শিক্ষিত ও মেধাবী লোকদেরকেই বর্তমান সমাজের সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন।

(জ) পদ মর্যাদা ঃ সামাজিক স্তরবিন্যাসে পদ মর্যাদাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পদ মর্যাদা আবার শিক্ষা ও মেধার সাথে সম্পর্কিত। কোন ব্যক্তি কাজ ও ভূমিকা, বেশভূষা এবং চাল-চলন প্রভৃতি তার পদ মর্যাদার উপর নির্ভর করে। সমাজে বিভিন্ন পদমর্যাদা ভিত্তিক সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা যায়। তাছাড়া, একটি প্রতিষ্ঠানেও বিভিন্ন পদ মর্যাদার লোক থাকে।

(ঝ) ক্ষমতা ঃ ক্ষমতা সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি বিশেষ উপাদান। ক্ষমতা মানুষ কর্তৃক অর্জিতও হতে পারে, আবার আরোপিতও হতে পারে। ক্ষমতার ভিত্তিতে সমাজে মর্যাদার রূপ প্রকাশ পায়। ক্ষমতার দ্বারা মর্যাদা অর্জন করার পিছনে দু'টি কারণ বিদ্যমান। যথা (১) আভ্যন্তরীণ প্রভাব ঃ ভূ-স্বামী বা বিত্তশালী ব্যক্তি দ্বারা ও (২) বহিরাগত গোষ্ঠীরা ব্যক্তির প্রভাব। ক্ষমতাধর ব্যক্তি সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থান করে এবং সাধারণ মানুষ মনে মনে তাদের ঘৃণা করলেও সমাজ তাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকে।

www.swapno.in

(ঞ) সম্পত্তি ও আয় ঃ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে সমাজে মানুষের স্তরবিন্যাস নির্ধারিত হয়। তাছাড়া কায়িক বা মানসিক পরিশ্রম দ্বারাও মানুষ আয় করে থকে। একজন মানুষের সর্বমোট ব্যক্তিগত আয়ের দ্বারা সমাজে তার অবস্থান চিহ্নিত হয়। যেমন, বেশী আয়ের লোকজন ভাল এলাকায় বসবাস করে, অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, সর্বোপরি অধিক মর্যাদা পেয়ে থাকে। সমাজে যে ব্যক্তির সম্পত্তি বেশি তার মর্যাদা, সম্মান, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাও বেশী। অনেক সময় শিক্ষিত লোকও অশিক্ষিত কিন্তু অধিক সম্পত্তির অধিকারী লোকদের কাছে হীনমন্য হয়ে থাকতে হয়।

(ট) বাসস্থান ঃ বাসস্থানের ধরন ও অবস্থান দ্বারাও সামাজিক স্তরবিন্যাস নির্ধারিত হয়। এটি সামাজিক স্তর বিন্যাসের অন্যতম বিশেষ উপাদান। যেসব অভিজাত এলাকার বাসিন্দা ও বস্তির বাসিন্দাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল সদৃশ সামাজিক স্তরভেদ লক্ষণীয়। এছাড়া আবার গ্রামীণ ও শহুরে মানুষের মধ্যে মন-মানসিকতা, চাওয়া পাওয়ার পার্থক্য অনেক বেশি। আবার গ্রামে যাদের বাড়ীঘর উন্নতমানের এবং নির্মাণ উপাদান ও সুন্দর ডিজাইনে তৈরী তাদের সামাজিক মর্যাদা অন্যদের চেয়ে কিছুটা হলেও বেশী হয়ে থাকে।

ক্ষমতার দ্বারা মর্যাদা অর্জন করার পিছনে দুটি কারণ উল্লেখযোগ্য। যথা (১) আভ্যন্তরীণ প্রভাব ঃ ভূ-স্বামী বা বিত্তশালী ব্যক্তি দ্বারা ও (২) বহিরাগতের প্রভাব।

শুধুমাত্র একটি উপাদান দ্বারা কি সামাজিক স্তর বিন্যাস করা সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব, কারণ একটি উপাদানের মাত্রার তারতম্যের কারণে একটি মানুষের বা গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান অন্য একটিমানুষের সামাজিক অবস্থান থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করা যায়, অর্থাৎ তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। আবার একাধিক উপাদান দ্বারাও যেকোন সমাজকে স্তরায়িত করা যায়। সামাজিক স্তর বিন্যাসের উপাদানগুলো পৃথিবীর সকল সমাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কমবেশী বিদ্যমান। সমাজে উপরোক্ত উপাদান সমূহের উপস্থিতির কারণে মানুষ যেদিন থেকে সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস শুরু করেছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সকল সমাজেই সামাজিক স্তর বিন্যাস বহাল আছে।

অনুশীলনী ১ (Activity1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও মেধার ভূমিকা অনূর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

অনুশীলনী ২ (Activity2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামজিক স্তরবিন্যাসের ১০ মৌলিক উপাদানের নাম লিখুন ঃ

www.swapno.in

সারাংশ

সামাজিক স্তরবিন্যাস মানব সমাজে একটি সাধারণ ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। মর্যাদা ও ক্ষমতার ক্রমোচ্চ বিন্যাসকেই সাধারণত সামাজিক স্তরবিন্যাস বলা হয়। সামাজিক স্তরবিন্যাসের বেশ কয়েকটি মৌলিক উপাদান রয়েছে, তন্মধ্যে বংশ মর্যাদা, বয়স, শারীরিক উচ্চতা, চেহারা, বর্ণ, লিঙ্গ, শিক্ষা, মেধা, ক্ষমতা, বাসস্থান, পদমর্যাদা, সম্পত্তি ইত্যাদিই মুখ্য। এ উপাদানগুলোর যেকোন একটি বা একাধিক উপাদান দ্বারা যেকোন সমাজকে স্তরায়িত করা যায়। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন সমাজই স্তরবিন্যাসবিহীন এবং উল্লিখিত সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপাদানগুলো মানব সভ্যতার সর্বস্তরে প্রকাশ্য কিংবা সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান ছিল।

www.swapno.in

www.swapno.in

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্ সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপাদান নয়?

ক) ক্ষমতা খ) বাসস্থান

গ) পদমর্যাদা ঘ) পরিবার

২। “সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সুযোগের অসম বন্টন ব্যবস্থাকে বুঝায়” এ কথাটি কে বলেছেন?

ক) মেরিল খ) মেলভিন টিউমেন

গ) সরোকিন ঘ) জিসবার্ট

৩। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মৌলিক উপাদান সমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) দুই খ) তিন

গ) চার ঘ) পাঁচ

www.swapno.in

www.swapno.in

ক) দাসপ্রথা

পাঠ ২

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান ধরন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
২. দাসপ্রথার সংজ্ঞা ও ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৩. দাসপ্রথা সম্পর্কে এরিষ্টটলের বক্তব্য জানতে পারবেন।
৪. দাসপ্রথার ভিত্তি ও দাসদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৫. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে দাস প্রথার সীমাবদ্ধতা যেমন- শিল্প অবস্থা হিসাবে অসম সামাজিক বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকারভেদ (Major forms of Social Stratification)

বেশীরভাগ সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি প্রধান সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা পোষণ করে। যথা ঃ
ক) দাসপ্রথা ;
খ) এস্টেট;
গ) জাতিবর্ণ প্রথা; এবং
ঘ) সামাজিক শ্রেণী ও

আমরা প্রথমেই জেনে নেই সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান ধরন কি কি? বেশীরভাগ সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক স্তর বিন্যাসের চারটি প্রধান ধরন সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করে। যথা- পোষণ করে। যথা ঃ

ক) দাসপ্রথা (Slavery);
খ) এস্টেট (Estate);
গ) জাতিবর্ণ প্রথা (Caste System) এবং
ঘ) সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদা (Social class and status)

ক) দাসপ্রথা (Slavery)

আমরা ইউনিট ছয় এ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহ অধ্যয়ন করেছি এবং সেখানে দেখেছি যে, পাশ্চাত্যের সমুদ্রতীরবর্তী প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা মূলত দুটি দাসপ্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। আর এ দাসপ্রথাই হচ্ছে সামাজিক স্তর বিন্যাসের অন্যতম প্রধান ধারনা। দাসপ্রথার আলোচনার থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

দাস প্রথার সংজ্ঞা ও ধারণা

বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী এল.টি হব হাউজের মতে, "দাস হচ্ছে এমন এক একটি লোক সমাজের আইন ও প্রথা অন্যের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করে।" দাস প্রথার চরম রূপ প্রাচীন গ্রীস ও রোমে দেখা দেয়, যেখানে দাসরা ছিল সম্পূর্ণভাবে অধিকারবিহীন ও মালিকের অস্থাবর সম্পত্তি(Culture)। এর মতে চরম অবস্থায় দাস হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আকারবিহীন ব্যক্তি বা মালিকের অস্থাবর সম্পত্তি।"

দাসদের দ্বারা যেকোন ধরনের কাজকর্ম করানো হত। দাসদেরকে প্রভুদের সম্পত্তি মনে করা হত। সামাজিক দিক দিয়ে দাসদের কোন মর্যাদা ছিল না। মালিকরা তাদের দাসকে গরু বা গাধার মতই মনে করত এবং গরু-গাধার মতই রক্ষণাবেক্ষণ করত। প্রভুদের আদেশ ও নির্দেশক্রমে তাদের জীবন পরিচালিত হত। প্রাচীন দাস সমাজে দাসরা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে অধিকারবিহীন অবস্থায় জীবন যাপন করত।

www.swapno.in

পৃথিবীর কয়েকটি সমাজে বিভিন্ন সময়ে দাসপ্রথা বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রচলিত ছিল। তবে নিম্নোক্ত অঞ্চলসমূহে দাসপ্রথা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল ; যেমন -

১) প্রাচীন কালে বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল;
২) অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা কষ্টকর ছিল; এবং
৩) প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশে এক ধরনের দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীন দাস সমাজ দাসরা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে অধিকারবিহীন অবস্থায় জীবন যাপন করত। পৃথিবীর কয়েকটি সমাজে বিভিন্ন সময়ে দাসপ্রথা বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রচলিত ছিল। তবে নিম্নোক্ত অঞ্চল সমূহে দাসপ্রথা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছি। যেমন - ১) প্রাচীন কালে, বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সমাজ দাস প্রথা প্রচলিত ছিল; ২) অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা কার্যকর ছিল; এবং ৩) প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশে এক ধরনের

দাসপ্রথা সম্পর্কে এরিস্টটলের বক্তব্য

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল দাসদেরকে উৎপাদনের জীবন্ত হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে মালিক বা মনিব শ্রেণীর সেবার জন্য দাসের প্রয়োজন। এতে মনিব শ্রেণী দাস সমাজের কল্যাণের জন্য চিন্তা করার অবকাশ পায়। যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে দাসে পরিণত করার ক্ষেত্রেও তিনি যুক্তি দেখান। সে ক্ষেত্রে তিনি বলেন যুদ্ধে পরাজিতরা বিজয়ীদের সেবা করবে। কারণ তারা জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন যে যেদেশে দাস প্রথা নেই সে দেশটি কোন না কোন দেশের দাস। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় দাস প্রথার প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজন ছিল কিনা সে সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট বক্তব্য দেন নি। কিন্তু দাসের প্রয়োজন ছিল বলে স্পষ্ট মন্তব্য করেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র প্লেটো এবং প্লেটোর ছাত্র এরিষ্টটলের কেওই দাস প্রথার অবলুপ্তির কথা বলেন নি। বরং তাঁরা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিকাশ ও নগর রাষ্ট্রসমূহের অস্তিত্বের জন্য দাস প্রথাকে অপরিহার্য উপাদান বলে আখ্যায়িত করেন। দাস প্রথা সম্পর্কে এরিস্টটল বক্তব্য রাখতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, 'সমাজে কতক লোক জন্মগ্রহণ করে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য, আর কতকলোক জন্ম গ্রহণ করে অপরের বশ্যতা স্বীকারের জন্য' প্লেটো এরিস্টটল উভয়েরই প্রধান চিন্তনীয় বিষয় ছিল কি করে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, বিশেষ করে নগর রাষ্ট্র এথেন্সের সমৃদ্ধি বজায় রাখা ও তার অস্তিত্ব রক্ষা করা যায়। অপরদিকে, মার্কসের বন্ধু এঙ্গেলস (Engels) বলেছেন 'দাসপ্রথা উদ্ভাবিত হয়েছে' (Slavery was invented)। আর এ উদ্ভাবনের মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক উৎপাদন। এজন্য প্রাচীন গ্রীসের দাসপ্রথাকে উৎপাদনমূলক দাস ব্যবস্থা বলা হয় (Production Slavery), আর প্রাচীন ভারত ও অন্যান্য নদীতীরবর্তী সভ্যতায় দাস প্রথার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাকে সাধারণত গৃহদাস প্রথা বলে চিহ্নিত করা হয়(Domestic Slavery)। তবে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, ভারতীয় সমাজে গৃহ দাসপ্রথা (Domestic) প্রাধান্য পেলেও উৎপাদনমূলক দাস প্রথার (Production Slavery) একেবারে অস্তিত্ব ছিল না একথা সম্পূর্ণ ভারতীয় সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় সম্পর্কের অস্তিত্ব থাকায় এবং পলিমাটী সমৃদ্ধ এলাকা বিধায় প্রাচীন গ্রীসের মতো দাস প্রথার তত কঠোরতা প্রাচীন ভারতে কদাচিৎ লক্ষ করা যায়।

দাস প্রথার ভিত্তি

প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক কালে দাস প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। দাসদেরকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হতো অর্থাৎ কেনাবেচা যেত; ঠিক তেমনই দাসদের দ্বারা উৎপাদিত ফসল ও পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হতো। সামাজিক ইতিহাসবিদ নিবুর দাসপ্রথাকে একটা শিল্প ব্যবস্থার সাথে তুলনা করেন। অর্থনৈতিক কারণে দাসপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। অভিজাত শ্রেণীর লোকজন কোন প্রকার পরিশ্রম করত না। সমাজে তারা প্রভু হয়ে মর্যাদা ভোগ করত এবং দাসদের দ্বারা তাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করাত। এভাবে সমাজে দুটো প্রধান শ্রেণী গড়ে উঠে। যথা প্রভু এবং ভৃত্য। প্রভুরা ছিল দাসদের মালিক এবং তারা উচ্চ শ্রেণীর মর্যাদা ভোগ করত। ভৃত্য তথা দাসরা নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তারা প্রভুদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক

www.swapno.in

সেবা প্রদান করত তাহলে উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক ও সেবামূলক ভিত্তিতে প্রাচীন গ্রীসে দাসপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দাসদের সামাজিক অবস্থা

যদিও পূর্বে দাসপ্রথার ভিত্তি ও ধারণা আলোচনা করতে গিয়ে দাসদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু তুলে ধরা হয়েছে, তবু এদের সামাজিক অবস্থা আলাদাভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাচীন সভ্যতাসমূহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল দাস প্রথা। সমাজে কেউ ইচ্ছে করে দাস হত না। ঘটনাচক্রে পড়ে দাস হতে বাধ্য হত। সমাজের সর্বনিম্নস্তরে দাসদের অবস্থান ছিল। ইতিহাসিবিদ নিবুর(Neibur) তার Slavery as an Industrial System নামক গ্রন্থে দাসদের সামাজিক অবস্থার বিশদ বর্ণনা দেন। এখানে তাঁর বর্ণনার সার সংক্ষেপ তুলে ধরা হল ঃ

প্রাচীন সভ্যতা সমূহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল দাস প্রথা। সমাজে কেউ ইচ্ছে করে দাস হত না। ঘটনাচক্রে পড়ে কেউ দাস হতে বাধ্য হত। সমাজের সর্বনিম্নস্তরে দাসদের অবস্থান ছিল।

"প্রতিটা দাস তার মনিবের অধীনস্থ থাকত। দাসদের ওপর মালিকের সীমাহীন প্রভাব বা ক্ষমতা ছিল। সামন্ত যুগের 'ফ্রীম্যানদের তুলনায় দাসদের অবস্থা ছিল অনেক নীচে। দাসদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। যদিও রোমান সাম্রাজ্যের শেষ দিকে দাসদের ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। সামাজিকভাবে দাসদেরকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র বলে মনে করা হত। কাজ করার ক্ষেত্রে দাসদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। মনিব বা মালিকের ইচ্ছা অনুসারে তাদের কাজ করতে হত। গৃহস্থালী, ক্ষেতেখামারে, বাণিজ্যে এবং ক্ষুদ্র বা মাঝারি ধরনের শিল্প-কল কারখানায় যেকোন কাজ করতে তাদের বাধ্য করা হত। তাদেরকে লেখাপড়া করতে দেওয়া হত না, অর্থাৎ তাদের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না।"

সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে দাসপ্রথার সীমাবদ্ধতা

আমরা এইপাঠে এ পর্যন্ত দাস প্রথাকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি অন্যতম ধরন হিসেবে দেখেছি। বেশীরভাগ সমাজবিজ্ঞানীই দাসপ্রথাকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি ধরন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে কিছু সংখ্যক সমাজবিজ্ঞানী দাসপ্রথাকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন হিসেবে স্বীকার করে নেন নি, কারণ কোন কোন সমাজে দাসপ্রথার মধ্যে সামাজিক স্তর বিন্যাসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠে নি। এতে বুঝা যাচ্ছে যে সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে দাসপ্রথার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। নিম্নে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে দাসপ্রথার সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করা হল।

ক) শিল্প ব্যবস্থা হিসাবে দাসপ্রথা ঃ বর্তমানে অনেক সমাজ বিজ্ঞানী দাসপ্রথাকে একটি শিল্প ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। কারণ প্রাচীন সভ্যতা সমূহে যেমন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি দাস প্রথার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। তখন দাসরা ছিল উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার। উৎপাদনের পাশাপাশি তাদেরকে সেবামূলক কাজে ব্যবহার করা তবে সেই সেবামূলক কাজকেও উৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হত। অর্থনৈতিক দিকে থেকে দাসদের কাজ ও উৎপাদন যতক্ষণ পর্যন্ত লাভজনক হত, ততক্ষণ পর্যন্ত দাসপ্রথা টিকে থাকত। অর্থনৈতিক উৎপাদনের দিক থেকে দাসপ্রথাকে একটি শিল্প ব্যবস্থা হিসেবে চিবেচনা করা যায়।

দাসপ্রথা মূলত প্রাচীন কয়েকটি সভ্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রীক, রোমান, ও দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলোর সভ্যতা সমূহে দাসপ্রথা

খ) অসম সামাজিক বৈশিষ্ট্য ঃ আমরা পূর্বে দাসপ্রথার ভিত্তিতে গঠিত সমাজে দুটি শ্রেণীর কথা জেনেছি, যেমন, মালিক বা মনিব শ্রেণী ও দাস শ্রেণী। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ চিত্রটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ সকল মনিবের সমান সংখ্যক দাস ছিল না বা দাস রাখার সামর্থ্য ছিল না। ফলে মনিবদের মধ্যেও ছিল উচ্চ-নীচ ভেদ আবার সকল দাসের আর্থিক মূল্য থাকলেও কায়িক পরিশ্রম ও দৈহিক চেহারার দিক হতে দাসদের মধ্যে উচু নিচু অবস্থান ছিল। শুধু তাই নয়

www.swapno.in

বয়স, স্ত্রী পুরুষ, কর্ম দক্ষতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দাসদের মধ্যে ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্য। এছাড়া, সমাজে আবার কিছু সাধারণ নাগরিক ছিল যারা দাসও ছিল না, মনিবও ছিল না। সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, দাসপ্রথার ছিল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। এজন্য দাসপ্রথাকে একটি পরিপূর্ণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয়।

গ) দাসপ্রথার ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ঃ দাস প্রথা মূলত পাশ্চাত্যের প্রাচীন দু'টি সভ্যতার (গ্রীক ও রোমান) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে দাসপ্রথা প্রায় উঠে গিয়েছিল বা দাসপ্রথার অনেক নিয়ম-নীতি শিথিল হয়েছিল। মধ্যযুগে বা রেঁনেসাঁ পূর্বকালে দাসপ্রথা মূলত মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের কতক সমাজে কমবেশী প্রচলিত ছিল তবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী দাসপ্রথার প্রচলন কখনওই ছিল না। তাই অনেক সমাজবিজ্ঞানী দাসপ্রথাকে একটি সাবলীল সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধরন হিসেবে গণ্য করতে চান না।

ঘ) দাসপ্রথা ও সভ্যতা ঃ মূলত শিল্প বিপ্লবের (১৭৬০-১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ) পর পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকে দাসপ্রথা উঠে যায়। এর আগে হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক ইসলাম প্রচারের ফলে শুরু হতে দাসপ্রথার উচ্ছেদ শুরু হয়। আধুনিক সমাজে দাসপ্রথা নীতিগতভাবে বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দাস প্রথার অস্তিত্ব নেই। অতএব আপনারা বুঝতে পারছেন যে, সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি ধরন হিসাবে আধুনিক সভ্যতায় এর তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে মানব সভ্যতার বিকাশে উক্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এর দাসপ্রথার ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। মার্কস প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার বিকাশে দাসপ্রথার গুরুত্ব স্বীকার করে বলেছেন যে, দাসপ্রথা, ভূমি দাসপ্রথা ও মজুরী দাসত্ব পর্যায়ক্রমে মানব সমাজের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের তিনটি ভিন্নধর্মী সমাজ কাঠামোকে (দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদ) সুচিহ্নিত করেছে।

অনুশীলনী ১ (Activity1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

দাসপ্রথা সম্পর্কে এরিষ্টটলের বক্তব্য অনূর্ধ্ব ৫০টি শব্দ দ্বারা লিখুন।

অনুশীলনী ২ (Activity2) ঃ **সময় ঃ ৩ মিনিট**

দাসপ্রথার সীমাবদ্ধতাগুলোর উল্লেখ করুন ঃ

www.swapno.in

সারাংশ ঃ
প্রাচীনকালে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে প্রাচীন দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটেছে। প্রাচীনকালে দাসরা সমাজে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অধিকারবিহীন অবস্থায় বসবাস করত। এরিস্টটলের মতে মালিক বা মনিব শ্রেণীর সেবার জন্য দাসের প্রয়োজন হয়, যদিও এ ধরনের মন্তব্যকে বর্তমানে অনেকেই সমর্থন করেন না। অর্থনৈতিক কারণেই ভিত্তিতেই দাসপ্রথার উদ্ভব হয়েছিল। দাসদের পণ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। সামাজিক স্তরবিন্যাসে এদের স্থান ছিল সবার নীচে। তবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে দাসপ্রথার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে কারণ এটি সার্বজনীন সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধরণ ছিল না। তাই আধুনিক সমাজে দাসপ্রথার তেমন কোন ভূমিকা নেই।

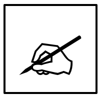

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। “দাসপ্রথার চরম রূপ হচ্ছে এই যে, দাস সম্পূর্ণভাবে অধিকারবিহীন ও তার মালিকের অস্থাবর সম্পত্তি” - দাসের এ সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?
ক) হব হাইজ খ) প্লেটো
গ) এরিস্টটল ঘ) নিবুর

২। কে দাসপ্রথাকে শিল্প ব্যবস্থার হিসাবে বিবেচনা করেছেন?
ক) এঙ্গেলস খ) নিবুর
গ) মর্গান ঘ) এরিস্টটল

৩। নিচের কোন প্রাচীন সভ্যতায় দাস প্রথা ‘আদর্শ নমুনা’ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
ক) ভারতীয় খ) গ্রীক
গ) রোমান ঘ) চৈনিক

www.swapno.in

www.swapno.in

খ) এস্টেট

উদ্দেশ্য (Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. এস্টেটের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. এস্টেট সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. সামন্ত সমাজে এস্টেটের বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন।
৪. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে এস্টেট ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা জানতে পারবেন।

এস্টেট ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা

মধ্য যুগের ইউরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সের সামন্তবাদী রাষ্ট্রের অন্তর্গত লোকজনকে বিভিন্নগণ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হত, যাদেরকে এস্টেট বলা হত। তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন আসে যে, 'এস্টেট কি সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি ধরন? এর উত্তর স্বত:সিদ্ধভাবে পাওয়া সহজ নয়। তবে এ এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এস্টেটকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি ধরন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাহলে আসুন একটি আমরা এ ধরণা থেকে এস্টেটের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করি। "এস্টেট হল মুখ্যত সামন্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত গণ শ্রেণী বিশেষ এটি কখনও ভূ-সম্পত্তি বা খামার, আবার কখনো অধিকার বা কর্তব্যকেও বুঝায়" মধ্যযুগে ইউরোপে ব্যক্তির পদমর্যাদা জন্মগতভাবেই নিরূপিত হত। ইউরোপীয় সামন্ত সমাজের স্তরবিন্যাসে এস্টেট ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছিল। বৃটিশ ভারতে এক ধরনের সামন্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। যা তখনকার সামাজিক স্তরবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন হিসেবে এস্টেট ব্যবস্থা পশ্চিম ইউরোপ ফরাসী সামন্ত সমাজে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। এজন্য এ পাঠে এস্টেট ব্যবস্থাকে বুঝার সুবিধার্থে পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্তবাদী এস্টেট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূহ বিশেষভাবে তুলে ধরা হল।

> "এস্টেট হল মুখ্যত সামন্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত গণশ্রেণী বিশেষ, কখনও ভূ-সম্পত্তি বা খামার, আবার কখনো অধিকার বা কর্তব্যকেও বুঝায়"।

পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্ত সমাজে এস্টেটের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমাজের সকল মানুষকে তিনটি প্রধান এস্টেটে বিভক্ত করা হয়। অক্সফোর্ড অভিধানে এস্টেটকে প্রথমে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : আধ্যাতিক প্রভু শ্রেণী, পার্থিব প্রভু শ্রেণী। এবং জনসাধারণ যাজক শ্রেণীকে প্রথম এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদের ছিল সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা দ্বিতীয় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণী। তারাও যাজক শ্রেণীর মত সম-মর্যাদা ভোগ করত। তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল সর্বসাধারণ। এরা প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেটের চেয়ে কম মর্যাদার অধিকারী এবং মূলত উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত ছিল। উল্লেখ্য, ১৭৮৯ মনে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী বুর্জোয়ারা তৃতীয় এস্টেটভুক্ত ছিল। উক্ত বিপ্লবে যখন ফরাসী বুর্জোয়ারা জয়যুক্ত হয় তখন সেদেশের জনসাধারণ তথা কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর তাদের সর্বাত্মক সাহায্য করে। আর বুর্জোয়ারা ক্ষমতাসীন হয়ে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সর্বোচ্চ স্থান দখল করে। ফলে এস্টেট ব্যবস্থা ও ভেঙ্গে পড়ে। অক্সফোর্ড অভিধান চতুর্থ এস্টেট হিসাবে মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যবসায় এর সাথে যুক্ত লোকদের চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদেরকে সাংবাদিক বলা যেতে পারে। সে যা হোক, ফরাসী সামন্ত সমাজে উক্ত চার রকম এস্টেটভুক্ত মানুষের জীবন প্রণালীর মধ্যেও পার্থক্য ছিল।

> প্রতিটি এস্টেটের স্বতন্ত্র মর্যাদা ও ক্ষমতা ছিল, যা সামন্ত সমাজে লিখিত বা অলিখিত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

www.swapno.in

> সামাজিক বিবর্তনের একটি বিশেষ যুগে এস্টেট ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং তখন এস্টেট সামাজিক স্তর বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, কিন্তু এটি সার্বজননীয়ও ছিল না, স্থায়িত্বও লাভ করেনি।

নিম্নে পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্তবাদী সমাজে বিদ্যমান এস্টেট ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

ক) আইন সিদ্ধ মর্যাদা ও ক্ষমতা ঃ প্রতিটি এস্টেটের স্বতন্ত্র মর্যাদা ও ক্ষমতা ছিল, যা ঐ দেশে বা সমাজে লিখিত বা অলিখিত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। দ্বিতীয় এস্টেটের পর্যায়ভুক্ত লোক তথা অভিজাত শ্রেণীর হাতেই বেশীরভাগ ভূমির মালিকানা ছিল। তারা ভূমিদাস নিয়োগ করত। ভূমি দাসরা রাজা বা রাণীর কাছে বিচার প্রার্থনা করতে পারত না, তাদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না। তবে এস্টেটের ভিন্নতা অনুযায়ী ভূমিদাসদের আইনগত অধিকার ও কর্তব্য ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির।

খ) এস্টেটের বিভাজন ঃ শ্রম ও মর্যাদা অনুযায়ী এস্টেটসমূহ প্রধানত তিনটিভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন (১) যাজক শ্রেণী (২) সামন্ত অভিজাত শ্রেণী (৩) সাধারণ জনগণ।

গ) এস্টেটসমূহের কার্যবিভাগ ঃ যাজক শ্রেণীর লোকেরা প্রার্থনা করত ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে (বিয়ে শাদী) পৌরহিত্য করত: অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ভূসম্পত্তির মালিক ছিল, তারা কায়িক পরিশ্রম করত না এবং সাধারণ জনগণ কায়িক পরিশ্রম করত। তারা শ্রম দিয়ে জমিতে ফসল ফলাত ও কুটির শিল্পে কাজ করে ছোটখাটো জিনিষপত্র উৎপাদন করত।

ঘ) এস্টেটের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ঃ রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য কিংবা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য এস্টেট ব্যবস্থা কার্যকরী ভূমিকা পালন করত। মূলত সেস্টেট ছিল সামন্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত এক একটি রাজনৈতিক শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠী। ভূমিদাসদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হত না এবং তারা জমি জমারও মালিক ছিল না। এছাড়া, ভূমিদাস ব্যতীত অন্য সকল মানুষ যারা কোন না কোন এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা সকলেই রাজনীতিতে কমবেশী অংশগ্রহণ করত। ভূমিদাস প্রথা প্রকৃত পক্ষে পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্তবাদের এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এরা দ্বিতীয় এস্টেটভুক্ত ভূমধ্যকারী অভিজাত শ্রেণীর মালিকাধীন জমির সাথে ছিল বাঁধা। তারা মুক্ত ছিল না। তবে প্রাচীন সভ্যতার সময়ের দাসদের চেয়ে এরা সামান্য সম্মান বেশি ভোগ করত।

> তখন ভারত উপমহাদেশে এক ভিন্নধর্মী সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল যাতে চারটি প্রধান শ্রেণী অস্তিত্ব ছিল : যথা- রাজা, মধ্যস্বত্বভোগী, খাজনা আদায়কারী ও কৃষক শ্রেণী।

ঙ) এস্টেট ও বুর্জোয়া শ্রেণী ঃ দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ত প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। ফলে যারা অভিজাত শ্রেণীর এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের এবং নগরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে থেকে একটি বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তারা মূলত ব্যবসা ও প্রশাসনিক কাজের সাথে জড়িত ছিল।

ভারত উপমহাদেশের সমাজে এক বিশেষ ধরনের সামন্ত প্রথা প্রচলিত ছিল, যাতে চারটি প্রধান শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল: যথা- রাজা, মধ্যস্বত্বভোগী, খাজনা আদায়কারী ও কৃষক শ্রেণী।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে এস্টেট ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

সামন্ত সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে এস্টেট ছিল একটি কার্যকর ব্যবস্থা। কিন্তু স্থান ও কাল ভেদে পৃথিবীর সর্বত্র এস্টেট ব্যবস্থা কখনও চালু ছিল না, আর যেসব এলাকায় এটি চালু ছিল, সেসব এলাকা এস্টেটের প্রকৃতি অভিন্ন ছিল না। তাই আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন যে, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে এস্টেটের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নিম্নে এর সীমাবদ্ধতা সমূহ আলোচনা করা হল।

ক) সামাজিক স্তর বিন্যাসের একটি ধরন হিসাবে এস্টেট ব্যবস্থা ছিল একটি সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী কাঠামো, যা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন সামাজিক কাঠামোর সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ নয়।

www.swapno.in

খ) এস্টেট দ্বারা সাধারণ সামাজিক মর্যাদা নির্ধরণ করা হত। কিন্তু সামন্ত সমাজে বংশ, পদমর্যাদা, পেশা, জাতিবর্ণ ও শ্রেণীগত অবস্থান ইত্যাদিও সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গ) সামাজিক বিবর্তনের একটি বিশেষ যুগে এস্টেট ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং তখন এস্টেট সামাজিক স্তর বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু এটি সার্ব জননীয়ও ছিল না, সায়িত্বও লাভ করেনি। এছাড়া, এস্টেট ব্যবস্থা মূলত ছিল ফরাসী সামন্ত সমাজের শ্রেণী বিন্যাস ব্যবস্থা।

ঘ) আধুনিক পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে এস্টেটের কোন ভূমিকা নেই; সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের ফলে থাকারও কথা নয়।

উপরের আলোচনা থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে, সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে এস্টেট প্রথা মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্ত সমাজের কাঠামো বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে এস্টেট প্রথা বিলুপ্ত হতে থাকে। অর্থাৎ সামন্ত শ্রেণীবিন্যাস হিসাবে এস্টেট ব্যবস্থার স্থলে তখন আধুনিক পুঁজিবাদী শ্রেণী কাঠামোর বিকাশ ঘটে।

অনুশীলন ১ (Activity1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

মধ্যযুগের সামন্ত সমাজের এস্টেট ব্যবস্থার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

১.

২.

৩.

৪.

৫.

অনুশীলন ২ (Activity2) ঃ **সময় ঃ ৩ মিনিট**

সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে এস্টেট ব্যবস্থার ৩টি সীমাবদ্ধতা লিখুন ঃ

১.

২.

৩.

সারাংশ

সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম প্রধান ধরন হলো এস্টেট। এস্টেট বলতে কখনো ভূ সম্পত্তি বা খামার, কখনও সামাজিক শ্রেণী, কখনও বা অধিকার-কর্তব্য বুঝায়। মূলত মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত সমাজের স্তরবিন্যাস- এস্টেট ব্যবস্থার দ্বারা নির্ণয় করা হত। তখন সকল মানুষকে প্রধানত তিনটি এস্টেটে বিভক্ত করা হয়েছিল, যথা ঃ যাজক শ্রেণীকে প্রথম এস্টেটে,

www.swapno.in

অভিজাত শ্রেণীকে দ্বিতীয় এস্টেটে এবং সাধারণ জনগণকে তৃতীয় এস্টেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি এস্টেটের ছিল স্বতন্ত্র মর্যাদা ও ক্ষমতা, যা ঐ সামন্ত সমাজের লিখিত বা অলিখিত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। যদিও সামন্ত সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে এস্টেট একটি কার্যকরী ব্যবস্থা হিসাবে বিদ্যমান ছিল, তবু স্থান ও কাল ভেদে পৃথিবীর সর্বত্র এটি কখনও চালু ছিল না; আর যেসব এলাকায় চালু ছিল সেসব এলাকার এস্টেটের প্রকৃতিও অভিন্ন নয়।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন-(খ)

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। এস্টেট ব্যবস্থা কখন ইউরোপে খুব বেশী প্রচলিত ছিল?

ক) আদিম যুগে খ) দাস যুগে
গ) মধ্য যুগে ঘ) আধুনিক যুগে

২। সামন্ত যুগে কারা প্রথম এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

ক) যাজক শ্রেণী খ) অভিজাত শ্রেণী
গ) সাধারণ জনগণ ঘ) ভূমিদাস

৩। নিচের কোন্‌টি সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে এস্টেট ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা নয়?

ক) শিক্ষা খ) প্রযুক্তি
গ) শিল্প ঘ) ধর্ম

www.swapno.in

www.swapno.in

গ) জাতি-বর্ণ

জাতিবর্ণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আন্তজাতি বর্ণ বিবাহ, বংশমর্যাদা, সামাজিক পদমর্যাদা, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. জাতিবর্ণের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. জাতিবর্ণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. জাতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য, যেমন স্বর্ণ বিবাহ, মর্যাদা, সামাজিক, পদমর্যাদা, জন্ম সূত্রেপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক পেশা, অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৪. সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে জাতিবর্ণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

জাতিবর্ণঃ সংজ্ঞা ও ধারণা

জাতিবর্ণ বলতে আমরা বংশগত জনগোষ্ঠীকেই বুঝি। সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম প্রধান রূপ হলো জাতিবর্ণ ব্যবস্থা। জাতি-বর্ণ এর ইংরেজী হল Caste। ইংরেজি Caste শব্দটি স্পানিশ শব্দ ক্যাস্টা (Casta) থেকে এসেছে। এই অর্থ হল বংশ। অর্থাৎ শব্দটির মধ্যে জৈবিক উপাদান আছে। এবং এরই সূত্র ধরে Caste) শব্দটির বাংলা করা হয়েছে জাতিবর্ণ। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় সামাজিক স্তরবিন্যাস জাতি-বর্ণ প্রথার মাধ্যমে গড়ে উঠে। তবে কখন ও কিভাবে এর উৎপত্তি ঘটে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। কিন্তু, ধারণা করা হয় যে, বিদেশী বণিকগোষ্ঠী পর্তুগীজরা এ উপমহাদেশের সামাজিক অসমতাভিত্তিক জাতিভেদ প্রথাকে বুঝানোর জন্য Caste শব্দটি ব্যবহার করে। স্থিতিশীলতা, ব্যাপকতা ও প্রাচীনতার হিন্দু জাতি-বর্ণের যৌক্তিক ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভারতীয় সমাজেই লক্ষ করা যায়। তবে পৃথিবীর আরো কতক সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিশর, রোম ও জাপানে জাতি-বর্ণ প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপমহাদেশের হিন্দু সমাজে অন্যান্য সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে াাতিবর্ণ প্রথার প্রভাব এখনও বিদ্যমান।

জাতি-বর্ণ হল একটা বদ্ধ ব্যবস্থা যেখানে কোন বিশেষ জাতি-বর্ণের সদস্য পদ মর্যাদা অর্জন করতে পারে না, জন্ম হতেই তার উপর সংশ্লিষ্ট জাতিবর্ণের সামাজিক পদমর্যাদা আরোপিত হয়।

জাতি-বর্ণের সংজ্ঞা ঃ জাতি-বর্ণ হল একটা বদ্ধ ব্যবস্থা যেখানে কোন বিশেষ জাতি-বর্ণের সদস্য পদ মর্যাদা অর্জন করতে পারে না, জন্ম হতেই তার উপর সংশ্লিষ্ট জাতিবর্ণের সামাজিক মর্যাদা আরোপিত হয়।

জাতি বর্ণের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

সমাজবিজ্ঞানীরা জাতি বর্ণের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করেন নি। তবুও জাতিবর্ণের এমন কতক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে প্রায় সকল সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী ঐকমত্য পোষণ করেন। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে জাতিবর্ণের যেসব বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে নিম্নে সেগুলো দেওয়া হল। আসুন, তাহলে আমরা জাতিবর্ণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ জেনে নেই।

ক) স্বর্ণ বিবাহ(Endogamy) ঃ জাতি-বর্ণ প্রথা অনুসারে অভিন্ন জাতিবর্ণভুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয়ে থাকে, যাকে ইংরেজীতে Endogamy বলে। একই জাতিবর্ণের লোক সাধারনত অন্যজাতিবর্ণে বিবাহ করতে পারে না; যদি কোন কারণে বিবাহ

www.swapno.in

করে ফেলে তাহলে তা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হয়। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে অনেক সময় অভিভাবকরা তার সন্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। উল্লেখ্য, বিবাহের দিক থেকে হিন্দু বিবাহ (Lxgamres) অর্থাৎ সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। দুই ভিন্ন গোত্রে (Clan) ও অভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে হিন্দু বিবাহ স্বীকৃত।

শিল্প বিপ্লব, আধুনিক প্রযুক্তি বা ব্যবসা বাণিজ্যের ও শিক্ষার প্রসারের ফলে মেধাবী ও পরিশ্রমী মানুষেরা পৃথিবীতে বেশী মূল্যায়িত হয়েছে।

খ) বংশমর্যাদা ঃ জাতিবর্ণের পরিবারে সন্তান আজীবন উক্ত জাতিবর্ণের বংশমর্যাদা ভোগ করে। যেমন, হিন্দু সমাজে কেউ যদি ব্রাহ্মণ জাতিবর্ণের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে তাহলে সে আজীবন ব্রাহ্মণ জাতিভুক্তই থেকে যাবে; এমনকি, তার উত্তরসুরিরাও ব্রাহ্মণ জাতিবর্ণের অধিকারী হবে। হিন্দু সমাজের প্রতিটি জাতি বর্ণ আবার একাধিক উপ-জাতি-বর্ণে (Sub Castes) বিভক্ত এবং প্রতিটি উপজাতিবর্ণই আন্ত-জাতিবর্ণ ভিত্তিক বৈবাহিক গোষ্ঠী। তাহলে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, হিন্দু জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা কতটুকু একটি বদ্ধ ব্যবস্থা।

গ) সামাজিক পদ মর্যাদা ঃ জাতি-বর্ণমূলত বিভিন্ন জাতি-বর্ণ ভুক্ত পরিবারের সদস্যদের উপর পৃথক সামাজিক পদ মর্যাদা আরোপ করে থাকে, যা তারা জন্মগতভাবেই লাভ করে। সামাজিক পদ মর্যাদা জাতিবর্ণ অনুযায়ী উচ্চ-নীচ হয়ে থাকে এবং উক্ত মর্যাদার কাঠামো ঐ ধারায়ই বিন্যস্ত হয়। যেমন, প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় যে চারটি প্রধান জাতিবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলো হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সামাজিক পদ মর্যাদার দিক থেকে ব্রাহ্মণদের অবস্থান সবার উপরে এবং শূদ্রদের অবস্থান সর্ব নিম্নে।

কোন ব্যক্তির পদমর্যাদা জাতি-বর্ন অনুযায়ী উচ্চ নীচ হয়ে থাকে এবং উক্ত মর্যাদার কাঠামো ঐ ধারাই বিন্যস্ত হয়।

ঘ) অর্থনৈতিক পেশা ঃ জাতি-বর্ণ অনুযায়ী প্রত্যেকটি জাতিবর্ণের অর্থনৈতিক পেশা সুনির্দিষ্ট থাকে। ঐতিহ্যগতভাবে ব্রাহ্মণদের কাজ হল, পূজা-পার্বন, প্রার্থনা ও শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ ও দান; ক্ষত্রিয়দের কাজ হল যুদ্ধবিদ্যা ও প্রশাসনিক কাজ কর্ম; বৈশ্যের কাজ হল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত থাকা। শূদ্রের কাজ হল উপরে বর্ণিত তিন জাতিবর্ণের সেবা করা। আগে জাতি-বর্ণের ঐতিহ্যগত পেশা পরিবর্তন করা যেত না। ফলে তখন জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশা গোষ্ঠির উদ্ভব ঘটে।

আগে জাতি-বর্ণের ঐতিহ্যগত পেশা পরিবর্তন করা যেত না। ফলে তখন জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশা গোষ্ঠির উদ্ভব ঘটেছিল।

ঙ) আচার-অনুষ্ঠানগত অবস্থান ঃ জাতি-বর্ণ প্রথা দ্বারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত হত। পূর্বে করা হত যে, স্রষ্টার মুখমন্ডল থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়েছে। তাই তারা শিক্ষক বা গুরু ক্ষত্রিয়দের জন্ম স্রষ্টার বাহু থেকে তাই তাদেরকে যুদ্ধ বা দেশরক্ষার কাজে ব্যবহার করা হত। বৈশ্যদের জন্ম স্রষ্টার উরু থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য তাই তাদেরকে নিয়োজিত থাকতে হত। আর শুদ্রদের জন্ম স্রষ্টার পা থেকে বিধায় তাদের আচার-অনুষ্ঠানগত পদমর্যাদা সবার নীচে। সেজন্য তারা উপরস্থ সকলের সেবা কার্যে নিয়োজিত।

চ) জাতি-বর্ণ প্রথার স্থিতিশীলতা ঃ জাতি-বর্ণ প্রথা একটি স্থিতিশীল, কারণ জাতি-বর্ণের ছিল কতকগুলো অপরিবর্তনীয় সামাজিক বিধি-নিষেধ, যেসব জাতি-বর্ণের সদস্যদের নিয়ন্ত্রিত করত। ভারতের বিখ্যাত সামাজিক নৃবিজ্ঞানী এম.এন শ্রী নিবাসের মতে কর্মের ধারণা (Concept of Karma) একজন হিন্দুকে এই শিক্ষাই দেয়া হয় যে, সে একটি বিশেষ জাতি-বর্ণে জন্মগ্রহণ করেছে, কারণ ওটাতে জন্মগ্রহণ করার মতই তার যোগ্যতা ছিল এবং তার কৃতকর্মের ফলস্বরূপই সেখানে জন্মগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সুতরাং আমরা বলতে পরি য়ে, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক সংস্কার উভয়ের সংমিশ্রণে জাতি-বর্ণ প্রথা সমাজে একটি স্থিতিশীলতা ব্যবস্থায় পরিণত হতে পেরেছিল।

ছ) কঠোর সামাজিক বিধি নিষেধ ঃ জাতি বর্ণ প্রথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি মানুষ তার দৈনন্দিন কাজ কর্ম ও জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলা। যেমন,

www.swapno.in

কোন বিশেষ জাতি-বর্ণের লোকদের সাথে অন্য জাতিবর্ণের লোকদের মেলা মেশার উপর বিধি-নিষেধ লক্ষ করা যায়। দেখা গেছে যে, উচু জাতি বর্ণের লোকেরা নীচু জাত-বর্ণের লোকদের বাড়ীতে খাদ্য গ্রহণ করত না, জল পান করত না, বসত না, শুধু তাই নয়, নীচু জাতি-বর্ণের লোকেরা যেসব জিনিস ব্যবহার করত উৎকৃষ্ট জাতি-বর্ণের লোকেরা সেসব জিনিস ব্যবহার করত না।

জ) অসম সামাজিক মনোভাব ঃ কঠোর জাতি-বর্ণ প্রথার প্রভাবে ব্যক্তি যেন সমাজ ব্যসস্থার দাস। ফলে এ ব্যবস্থার অধীনে উদার গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে গড়ে উঠা অধিন। এমনকি, আধুনিক ভারতে জাতি-বর্ণভেদে ব্যাংক, হোটেল, সমবায় সমিতি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, বিবাহ উৎসবের জন্য সংক্রান্ত পাঠ থেকে কমিউনিটি সেন্টার গড়ে উঠেছে, পত্র-পত্রিকাও সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে।
আমরা জাতি-বর্ণ প্রথা সংক্রান্ত পাঠ থেকে শিখতে পারলাম যে, ভারতীয় সামাজিক স্তরবিন্যাসে এখনও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে আধুনিক শিক্ষার প্রথার ও দ্রুত নগরায়নের ফলে জাতি-বর্ণ প্রথা আগের চেয়ে ক্রমশ: শিথিল হয়ে আসছে।

সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ প্রথার সীমাবদ্ধতা

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে জেনেছি যে জাতি-বর্ণ প্রথা সামমজিক স্তর-বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে; যদিও বর্তমানে শিক্ষা ও শিল্পের অসার ও নগরায়ণের ফলে এ প্রথা আগের চেয়ে এখন অনেকটা শিথিল হয়ে আসছে। তাই সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে আধুনিককালে জাতি-বর্ণ প্রথার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নিম্নে এর সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ করা হল ঃ

ক) পৃথিবীর সব সমাজে জাতি-বর্ণ প্রথার উপস্থিতি নেই, আর থাকলেও আজকাল সামাজিক স্তর বিন্যাসে তা গুরুত্ব পায় না।

খ) আধুনিক কালের মানুষের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "জন্ম হোক যথা-তথা কর্ম হোক ভাল" বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে জাতি-বর্ণ প্রথা আগের মতো তেমন প্রাধান্য পাচ্ছে না। তাছাড়া, আধুনিক মানুষের মধ্যে বংশ পরিচয় দেয়াটা অনেকটা অরুচিকর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ জাতি-বর্ণের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যাচ্ছে।

উচ্চ জাতি বর্ণের লোকেরা নিম্নতম জাতি-বর্ণের লোকদের বাড়ীতে খাদ্য গ্রহণ করত না, জল গ্রহণ করত না, বসত না, শুধু তাই নয়, নিম্নতম জাতি-বর্ণের লোকেরা যেসব জিনিস ব্যবহার করত উচ্চ জাতি-বর্ণের লোকেরা সেসব জিনিস ব্যবহার করত না।

গ) শিল্প, আধুনিক প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষার প্রসারের ফলে মেধাবী ও পরিশ্রমী মানুষেরা সমাজে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হচ্ছেন। ফলে জাতি-বর্ণ প্রথার গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া, অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর বা বিত্তবান ব্যক্তিরা যে জাতি-বর্ণেরই হোক না কেন মর্যাদার দিক থেকে সমাজে উচ্চ স্থান দখল করছে। এ কারণে আজকাল শুধু জাতি-বর্ণ দ্বারা হিনদউ সমাজে স্তরবিন্যাস করা অনেকটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। শিল্প, প্রযুক্তি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নগরায়ন ইত্যাদি প্রসারের ফলে জাতি-বর্ণ প্রথা সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে আজকাল আগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে না পারলেও এটি যে ভারতীয় হিন্দু সমাজে একেবারে উঠে গেছে তা কিন্তু বলা যায় না। এখনও একথা বরা যায় যে, হিন্দু সমাজের স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হলো জাতি-বর্ণ প্রথা।

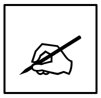

অনুশীলনী ১ (Activity1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

জাতি-বর্ণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্ববর্ণ বিবাহের গুরুত্ব অনূর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

www.swapno.in

অনুশীলনী ২ (Activity2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

শিক্ষার প্রসার জাতিবর্ণ প্রথাকে ক্রমশ শিথিল করে তুলছে-এ বিষয়ে লিখুন :

সারাংশ

সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হল জাতি-বর্ণ। জাতি-বর্ণ বলতে আমরা জনগোষ্ঠীকে বুঝি। জাতি-বর্ণ একটি নির্দিষ্ট বৃত্তি ভিত্তিক গোষ্ঠী। এটি পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখে, সামাজিক আচার-আচরণে অভিন্ন নীতি অবলম্বন করে এবং একই ধরনের বিধি-নিষেধের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। জাতি-বর্ণ প্রথার নিয়ম অনুসারে অভিন্ন বর্ণের অন্তর্গত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয়ে থাকে এবং জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততি আজীবন উক্ত জাতি বর্ণের পরিচয় বহন করে। জাতিবর্ণের নিয়ম শৃঙ্খলা এতই কঠোর যে, এ ব্যবস্থায় অধীনে সমাজে মানুষের মনে গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে উঠা খুবই কঠিন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার প্রসার শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি এবং নগরায়ণের ফলে জাতি-বর্ণ প্রথা আগের চেয়ে অনেকটা শিথিল হয়ে আসছে।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২(ঘ)

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। Casta শব্দটি কোন ভাষা থেকে উদ্ভুত?

ক) স্প্যানিশ খ) ইংরেজি
গ) ল্যাটিন ঘ) গ্রীক

২। নিচের কোন্‌টি জাতি-বর্ণের বৈশিষ্ট্য নয়?

ক) স্ববর্ণ বিবাহ খ) বংশ মর্যাদা
গ) শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ঘ) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান

৩। নীচের কোন্‌টি বদ্ধ ব্যবস্থা?

ক) দাসপ্রথা খ) শ্রেণী
গ) জাতি-বর্ণ ঘ) এস্টেট

৪। জাতি-বর্ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?

ক) বংশ মর্যাদা খ) স্ববর্ণ বিবাহ
গ) সামাজিকপদ মর্যাদা ঘ) বর্ণভিত্তিক পেশা

www.swapno.in

www.swapno.in

ঘ) সামাজিক শ্রেণী ও পদপর্মাদা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. সামাজিক শ্রেণীর সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. সামাজিক শ্রেণীর প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. পদমর্যাদার সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
৪. সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টির কারণ সমূহ জানতে পারবেন।
৫. সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদার পারস্পরিক সম্পর্ক জানতে পারবেন।
৬. সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদার মধ্যে পার্থক্য জানতে পারবেন।

সামাজিক শ্রেণী ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা

বিখ্যাত বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী টি.বি. বটোমোর তাঁর Sociology নামক গ্রন্থে সামাজিক শ্রেণীকে বাস্তব গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

'শ্রেণী' বলতে আমরা বুঝি, একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি সামাজিক গোষ্ঠী, যা অন্যাণ্য সামাজিক জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা। শ্রেণী হল এমন একটি উন্মুক্ত ব্যবস্থা যেখানে কোন বিশেষ শ্রেণীর সদস্য আপন চেষ্টায় নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারে অথবা আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটলে উচ্চ শ্রেণী থেকে নিচের নেমে যেতে পারে। সাধারণত শ্রেণী বলতে আমরা বুঝি অভিন্ন আয় এবং একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী একটি সামাজিক গোষ্ঠীকে।

যদিশ্রেণীর ভিত্তি অর্থনৈতিক আয়ের বৈষম্য হয়, তবু ব্যক্তির পদমর্যাদা তার শ্রেণীগত অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বটোমোর তাঁর Sociology নামক গ্রন্থে সামাজিক শ্রেণীকে বাস্তব সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শ্রেণী একটি আপেক্ষিক সামাজিক গোষ্ঠী। এটা জাতিবর্ণের মত কোন বদ্ধ ব্যবস্থা নয়। যদি শ্রেণীর ভিত্তি অর্থনৈতিক বিত্ত বা আয়ের বৈষম্য হয়, তবু ব্যক্তির পদমর্যাদা তার শ্রেণীগত অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন উলম্যানের (H.levy Ullman) মতে, শুধুমাত্র ধন ও দ্যারিদ্রের শ্রেণী নির্ণয় করা ঠিক নয়, বরং প্রভাব খাটাবার বা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষমতা হলো সমাজের শ্রেণী বিভাগের মূল ভিত্তি। তাঁর কথায় সমাজে মূল শ্রেণী হলো দুটো, যেমন - শাসক ও শাসিত। শাসক সর্বদাই তার শারীরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শক্তি, ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শাসিতদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তিনি ব্যক্তিগত শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার তারতম্য হেতু যে শ্রেণীর উদ্ভব হয় তাকেই তিনি সামাজিক শ্রেণী বলেছেন।

আমেরিকান সমাজে শ্রেণী হলো একটি সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যেখানে অর্থনৈতিক প্রভাব পরোক্ষ।

কার্ল মার্কসের ভাষায় শ্রেণী হচ্ছে সমাজের ঐতিহাসিক বির্বতনের ফল, যেখানে উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কে দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান বিশ্লেষণ করা যায়।

আমেরিকান সমাজে শ্রেণী হলো একটি সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, যেখানে অর্থনৈতিক প্রভাব পরোক্ষ। উক্ত আমেরিকা সমাজবিজ্ঞানী সেখানকার সমাজকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যেমন, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। বর্তমানে আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীরা উক্ত তিনটি শ্রেণীকে আবার ছয়টিভাগে ভাগ করেছেন, যেমন - উচ্চ উচ্চবিত্ত, নিম্নউচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, উচ্চ-নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-নিম্ন বিত্ত। অন্যদিকে কার্ল মার্কসের ভাষায় শ্রেণী হচ্ছে সমাজের ঐতিহাসিক বির্বতনের ফল, যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বারা সমাজের মানুষের অবস্থান করা যায়।

সামাজিক শ্রেণী সংক্রান্ত উপরের আলোচনা থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম যে, আধুনিক সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান, যার ভিত্তিতে আমরা বিশাল জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সামাজিক পদমর্যাদায় বিন্যস্ত করতে পারি। সামাজিক শ্রেণী কোন বদ্ধ গোষ্ঠী () নয় এটি সর্বদা পরিবর্তনশীল। একজন মানুষ ইচ্ছে করলে তার কর্ম, প্রজ্ঞা ও মেধা দ্বারা নিম্নতর শ্রেণী থেকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারে।

www.swapno.in

সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার কারণ সমূহ

আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি যে দাস প্রথা, এস্টেট এবং জাতি-বর্ণের রয়েছে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ এসব সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন আধুনিক শিক্ষা, শিল্প ও প্রযুক্তি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও নগরায়নের প্রভাবে হয় একেবারে বিলীন হয়ে গেছে কিংবা থাকলেও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সামাজিক শ্রেণী সামাজিক স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে আধুনিককালে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। তবে উক্ত সামাজিক শ্রেণী ইউরোপীয় সমাজে প্রাক্-রেঁনেসা যুগে (পঞ্চদশ শতক) ছিল না বললেই চলে। মূলত রেঁনেসা পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে এবং সমাজে ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করছে। আধুনিক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর আবির্ভাবের প্রধান কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

ক) মানব সমাজে যখন প্রথমে কৃষি উৎপাদন শুরু হল তখন মানুষের শ্রমের মূল্য স্বীকৃতি পেল। আর এর ফলে মানব সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব হল।

খ) উৎপাদন যন্ত্রের আবিষ্কারের সাথে সাথে উৎপাদনের সাথে উৎপাদনের উপায়ের ও উৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান বাড়ল।

> কৃষি বিপ্লবের ফলে সমাজে মেহনতি মানুষের মূল্যবৃদ্ধি বাড়ল এবং এই মেহনতি মানুষের মধ্য হতে সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব হল।

গ) অষ্টাদশ শতকে শিল্প বিপ্লবের(১৭৬০-১৮৪০) ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে তথা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এবং এ কারণে পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বিকাশ ঘটে।

ঘ) আধুনিককালে নগরায়ণের ফলে সমাজে এলিট, গরীব, বস্তিবাসী ইত্যাদি শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে।

> আধুনিক নগরায়নের ফলে সমাজে এলিট, গরীব, বস্তিবাসী ইত্যাদি শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে।

ঙ) ব্যাপক শ্রম বিভাগ ও বিশেষায়িত ক্রিয়া-ক্রর্মের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে।

চ) আধুনিক কালে প্রতিটি দেশে রয়েছে উন্নয়ন বাজেট। তাছাড়া, বৈদেশিক অর্থ সাহায্যেও বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে সমাজে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পেশা, আয় ও জীবনযাত্রার প্রণালীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য আসে। সৃষ্টি হয় নানা শ্রেণী।

ছ) আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মেধার বহুমুখী বিকাশ হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন, প্রকৌশলী, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি শ্রেণী।

> আধুনিক যুক্তি ভিত্তিক পন্থায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে মানব মেধার বিকাশ বিভিন্নমুখী হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন প্রকৌশলী, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি শ্রেণী।

জ) বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী দল ও জনগণের আন্দোলনের ফলে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে রাজনীতিতে রাজতন্ত্র ও এক নায়কতন্ত্র উচ্ছেদ হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে গণতন্ত্র আর এর ফলে গণতান্ত্রিক সমাজে চাপ সৃষ্টিকারী দল ও এলিট শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটছে।

ঝ) দেশী, বহুজাতিক, আন্ত-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো বিকাশশীল দেশের সমাজেও বিভিন্ন নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে।

ঞ) সমাজতান্ত্রিক সমাজেও ক্ষমতা ও আয়ের তারতম্য থাকার কারণে সামাজিক পদমর্যাদা ও শ্রেণী সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমগ্র পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বর্তমান পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ কথার সত্যতা খোঁজে পাওয়া যাবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা এবং বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যও শিল্পের বিস্তার ইত্যাদি কারণে আধুনিক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ এসব উপাদান সামাজিক স্তর বিন্যাসে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদার মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য ঃ

www.swapno.in

এ পাঠের প্রথম দু'টি অনুচ্ছেদে সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কে ধারণা লাভের পাশাপাশি আমরা পদমর্যাদা সম্পর্কেও কিছুটা জেনেছি। এখানে আমরা সামাজিক শ্রেণীর সাথে পদমর্যাদার কি কি সম্পর্ক ও পার্থক্য রয়েছে তা জানব।

অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে সামাজিক শ্রেণীর সাথে পদমর্যাদার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সাধারণভাবে পার্থক্য না থাকলেও গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বেশ কিছু পার্থক্য খুঁজে বের করতে পারব। যেমন, একজন উচ্চ শিক্ষিত লোক বিত্তবান নাও হতে পারেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিভিন্ন আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে বিত্তবান লোক অধিক মর্যাদা পান, আবার সভা সেমিনারে বিত্তবান লোকদের তেমন কোন ঠাঁই নেই। কিন্তু শিক্ষক বা গবেষক সেখানে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে বসেন। এখানে বিত্তবান ও শিক্ষিত লোক পদমর্যাদার দিক থেকে সম্মান না হলেও শ্রেণীগত দিক হতে এক হতে পারেন। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদার মধ্যে যেমনই সম্পর্ক রয়েছে তেমনই পার্থক্যও রয়েছে।

পদমর্যাদা বলতে মূলত আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদাকেই বুঝায়।

সমাজের সদস্যের আয়, বংশ মর্যাদা, শিক্ষা, প্রতিপত্তি বা ক্ষমতার ভিত্তিতে কতকগুলো ক্রমোচ্চ স্তরে ভাগ করা যায়। আর এসবের প্রত্যেকটির ভিত্তিতে গঠিত অবস্থানকে আর্থ-সামাজিক পদ মর্যাদা বলা যায়। পদমর্যাদা বলতে মূলত আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদাকেই বুঝায়। আবার সামাজিক শ্রেণী বলতে সম-পদমর্যাদার অধিকারী একদল লোককে বা গোষ্ঠিকে বুঝায়। এক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদা ও সামাজিক শ্রেণী সমার্থক রূপে ব্যবহৃত কিন্তু ব্যক্তির গুণাবলী ও সংখ্যা অনুযায়ী এ দুটিকে অভিন্ন অর্থে সব সময় ব্যবহার করা যায় না।

আমরা যদি আমাদের জাতীয় উৎপাদনের (শিল্প ও কৃষি) দিকে তাকাই তাহলে আমরা উৎপাদনের পরিমাণ ও অর্থ-আয় অনুযায়ী সমাজের অধিবাসীকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী "ভোগ" ও জীবনযাত্রার ধরনের" প্রেক্ষিতে মর্যাদা গোষ্ঠীগুলোও স্তরবিন্যস্ত। আসুন তাহলে এবার আমরা একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই। "যারা উৎপাদন করেন এবং উৎপাদিত বস্তুর মালিক তারা কি সেসব ভোগ করে জীবন যাত্রার ধরনে পরিবর্তন আনেন?" উত্তরটি হ্যাঁও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। হ্যাঁ হলে বুঝে নিতে হবে যে শ্রেণী ও অর্থ-সামাজিক পদমর্যাদার মধ্যে গোষ্ঠিতে কোন পার্থক্য নেই, আর "না" হলে এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে এ দুটোর মূল পার্থক্য হল এই যে - শ্রেণী বলতে অভিন্ন আয় সম্পন্ন গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে আর পদমর্যাদা বলতে ভোগ ও জীবন যাত্রার ধরনকে নির্দেশ করে।

আবার বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ওয়েবারের মতে, শ্রেণীর ভিত্তি হল সম্পত্তি আর পদমর্যাদার ভিত্তি হল খ্যাতি। এখন প্রশ্ন হল খ্যাতির ভিত্তি কি? কোন না কোন ভাবে এর ভিত্তি নিশ্চয়ই সম্পত্তি। তাহলে আমরা বলতে পারি যে সম্পত্তি যেমন শ্রেণীর ভিত্তি তা পরোক্ষভাবে পদমর্যাদারও ভিত্তি। অতএব উপসংহারে বলা যায়, শ্রেণী ও পদমর্যাদার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তবে তা এক নয়। সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুসারী বিকশিত পুঁজিবাদী ও অধিবাসিত পুঁজিবাদী দেশসমূহের সমাজে ক্ষমতা, আয়, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষা অনুযায়ী বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও বিভিন্ন মর্যাদাগোষ্ঠীকে সনাক্ত করা যায়। আধুনিক সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সামাজিক শ্রেণী ও পদ মর্যাদার বিন্যাসকেই বুঝায়।

শ্রেণী বলতে একই আয় সম্পন্ন গোষ্ঠিকে নির্দেশ করে আর পদমর্যাদ... বলতে ভোগ ও জী... যাত্রার ধরনকে নির্দে... করে।

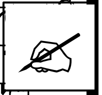

অনুশীলনী ১ (Activity1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদার মধ্যে বিদ্যমান চারটি পার্থক্য লিখুন।

www.swapno.in

অনুশীলনী ২ (Activity2) ঃ **সময় ঃ ৬ মিনিট**

"পেশা, বহুজাতিক, আন্তঃ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রসারের ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হচ্ছে' - এ বাক্যটি ব্যাখ্যা করুন (অনূর্ধ ৬০টি শব্দ দ্বারা)

সারাংশ

সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হল শ্রেণী। শ্রেণী হল এমন একটি উন্মুক্ত ব্যবস্থা যেখানে কোন বিশেষ শ্রেণীর সদস্য আপন চেষ্টায় বা অন্য কোন উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারে অথবা আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটলে উচ্চ শ্রেণী থেকে নিচের শ্রেণীতে নেমে যেতে পারে। সামাজিক শ্রেণী হল এক একটি বাস্তব গোষ্ঠী আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্য ও নগরায়নের চিরাচরিত সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সামাজিক শ্রেণী সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে আধুনিককালেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। মানব সমাজে যখন প্রথম কৃষি বিপ্লব ঘটে তখন তেকে সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে ব্যাপক শ্রম বিভাগ এবং বিশেষয়িত কর্মক্রিয়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সামাজিক শ্রেণীও পদমর্যাদার মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ডেহেতু পদমর্যাদা বলতে আর্থ-সামাজিক পদমর্যাদাকেই বুঝায় সেহেতু সামাজিক শ্রেণী বলতে সমপদমর্যাদার অধিকারী একদল লোককেই বুঝায়। আবার কারো কারো মতে শ্রেণীর ভিত্তি হল সম্পত্তি, আর পদমর্যাদার ভিত্তি হল খ্যাতি। আধুনিক সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদার যুগপৎ অবস্থাকেই বুঝায়।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২(ঘ)

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। বটোমোর সামাজিক শ্রেণীকে কি আখ্যা দিয়েছেন?

ক) বাস্তব গোষ্ঠী খ) তাত্ত্বিক গোষ্ঠি
গ) ধর্মীয় গোষ্ঠী ঘ) নরগোষ্ঠী

২। "নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার অভিপ্রায়ই হলো সমাজের শ্রেণী বিভাগের মূল ভিত্তি" - উক্তিটি কে করেছেন?

ক) বটোমোর খ) মর্গান
গ) উলম্যান ঘ) সেন্ট সাইমন

www.swapno.in

৩। কখন সমাজে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল?

ক) শিল্প বিপ্লবের পর

খ) কৃষি বিপ্লবের পর

গ) আদিম যুগে

ঘ) সামন্ত যুগে

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজ কাঠামো

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. 'সমাজ কাঠামো' শব্দটির উৎপত্তি ও সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. সমাজ কাঠামোর জৈবিক ও মার্কসীয় ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. সমাজ কাঠামোর উপাদান সমূহ জানতে পারবেন।
৪. সমাজের মৌলিক কাঠামো ও উপরি কাঠামোর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
৫. সমাজ কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য খুজে বের করতে পারবেন।

সমাজ কাঠামো ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার সর্বপ্রথম সমাজ কাঠামো শব্দটি ব্যবহার করেন। জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম এ শব্দটি ব্যাখ্যা করেন।

বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সমাজবিজ্ঞানে সমাজ কাঠামোর প্রধানত দুটি ধারণা লক্ষ করা যায়। একটি সমাজ কাঠামো সংক্রান্ত জৈবিক ধারণা আর অন্যটি অজৈবিক ধারণা। দ্বিতীয় দৃষ্টি কোণকে

সমাজবিজ্ঞানী র‌্যাডক্লিফ ব্রাউন সমাজ কাঠামোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "ব্যক্তির পারস্পারিক সামাজিক সম্পর্ক সমাজ কাঠামোর একটি অংশ বস্তুতপক্ষে যাকে আমরা সমাজ কাঠামো বলে থাকি তা হচ্ছে একটি বিশেষ সময়ে বিদ্যমান ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির সকল সামাজিক সম্পর্ক।

সমাজবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকেই 'সামাজিক কাঠামো' (Social Stracture) উক্ত বিষয়ের একটি অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীর মতে সমাজবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় হলো সামাজিক কাঠামো। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কতকগুলো আইন-কানুন ও রীতি-নীতির মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এ রীতি-নীতিগুলো যথাযথ পালনের মাধ্যমে সমাজ টিকে রয়েছে এবং যেসবের মাধ্যমে সমাজ টিকে থাকে সেসবের সম্মিলিত রূপকে আমরা সমাজ কাঠামো বলতে পারি। সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার সর্বপ্রথম সমাজ কাঠামো শব্দটি ব্যবহার করেন। জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম এ শব্দটি ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং সমাজ কাঠামো বলতে শুধুমাত্র সমাজের গঠন প্রণালীকেই বুঝানো হত। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সমাজবিজ্ঞানে সমাজ কাঠামোর প্রধানত দুটি ধারণা লক্ষ করা যায়। একটি সমাজ কাঠামো সংক্রান্ত জৈবিক ধারণা আর অন্যটি অজৈবিক ধারণা। দ্বিতীয় দৃষ্টি কোণকে মার্কসীয় মতবাদ বলা যায়। জৈবিক ধারণা অনুসারে 'সমাজ কাঠামো' হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে বিশেষ যেসববের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পর নির্ভরশীলতা বর্ণনা করা যায়। অপর পক্ষে, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সমাজের প্রত্যেকটি কাঠামো এক একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। মার্কস ও এংগেলসের মতে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড দ্বারা সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে।

সমাজ কাঠামোর ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্যের শেষ নেই। তবে সমাজ বিজ্ঞানীগণ সমাজকাঠামোর একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কার্ল ম্যানহাইম (Karl Mannhiem) সমাজ কাঠামোকে কর্ম কাঠামো (Structure of Action) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, কর্ম সম্পাদন উপলক্ষে সামাজিক গোষ্ঠীগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত।

সমাজবিজ্ঞানী র‌্যাডক্লিফ ব্রাউন সমাজ কাঠামোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁর Structure and Function in নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, "ব্যক্তির পারস্পারিক সামাজিক সম্পর্ক সমাজ কাঠামোর একটি অংশ। বস্তুতপক্ষে যাকে আমরা সমাজ কাঠামো বলে থাকি তা হচ্ছে একটি বিশেষ সময়ে বিদ্যমান ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির সকল সামাজিক সম্পর্ক। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে সমাজের মাঝে বিদ্যমান কিছু স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ সম্পর্ক সমাজ কাঠামোর একটি প্রকাশ মাত্র। সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিন্সবার্গের মতে" সামাজিক কাঠামো হচ্ছে সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের জটিল রূপ যার দ্বারা সমাজ গঠিত হয়, অর্থাৎ সমাজ বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের

www.swapno.in

পারস্পারিক সম্পর্কের মাধ্যমে টিকে থাকে। টি.বি বটোমোরের মতে “সমাজ কাঠামো হচ্ছে সমাজবিস্তারের একটি কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।”
উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে সমাজ কাঠামো বলতে আমরা সমাজের প্রতিষ্ঠান, সামাজিক দল এবং সমাজস্থ মানুষের আচার-অনুষ্ঠানকেই বুঝে থাকি; যেসবের মাধ্যমে সমাজের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রতিভাত হয়।

সমাজ কাঠামোর উপাদান (Factors of Social Structure)

সমাজ কাঠামোর উপাদানগুলো হচ্ছে- মানুষের মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও ফলাফল যেমন- পরিবার, শিক্ষা, ও বিবাহ, ভাষা, ধর্ম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা রাষ্ট্র ও সরকারী ব্যবস্থাপনা। নিম্নে এ সকল উপাদানের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

> সমাজ কাঠামোর উপাদানগুলো হচ্ছে- মানুষের মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও ফলাফল, যেমন- পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থা, ভাষা, ধর্ম, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা রাষ্ট্র ও

১. **ভাষা ঃ** সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে ভাষা মৌলিক ভূমিকা পালন করে। সেজন্য সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা ও সমাজের সদস্যদের সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা সমাজ কাঠামোর অন্যতম উপাদান হিসাবে গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে।

২. **অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঃ** মানুষের বাস্তব প্রয়োজন মিটানোর জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের ভোগ ও বন্টন ব্যবস্থা সম্পত্তি ও তার মালিকানা ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অন্তর্ভূক্ত। কোন সমাজই এ সব ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। সেজন্য অনেকে মনে করেন যে, সমাজের মৌলিক ও অন্যতম প্রধান ভিত্তি হচ্ছে অর্থনীতি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কার্ল মার্কস অর্থনীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সমাজের কাঠামো বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন।

৩ **পরিবার ও শিক্ষা ঃ** পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্তা, অর্থনৈতিক যোগান, জৈবিক চাহিদা পূরণ, মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে। পরিবারের ভিত সুদৃঢ় থাকলে সমাজ জীবনে সৃশৃঙ্খল ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে পরিবার সমাজ কাঠামোর উপাদান হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় পরিবার শুধু মুখ্য গোষ্ঠীই () নয়, উহার মাধ্যমে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা তথা সামাজিকরণ (Socialization) শুরু হয়।

৪. **রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঃ** মানুষের সমাজ জীবনের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই দলপতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তা থেকেই বুঝা যায় যে, আইন ও রাজনৈতিক সংগঠন সমাজ কাঠামোর অন্যতম প্রতিষ্ঠান। সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে আইন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিবর্তন ঘটেছে। ফলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি সমাজ কাঠামোর অন্যতম উপাদান হিসাবে স্বীকৃত।

৫. **ধর্ম ঃ** সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খীমের মতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সমাজের সংগতি টিকে থাকে। মানুসের জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, বেদনা, হতাশা ও সুখের পরিতৃপ্তি ইত্যাদি থেকেই মানুষের চরম চাওয়া ও পাওয়ার উপলব্ধি জাগে। সেজন্য মানবজীবনের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই মানুষের বিশ্বাস ও জাগতিক কার্যকলাপে ধর্মীয় চেতনার সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়া কোন সমাজেই সকল মানুষ সমান ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভোগ করে না। এসব ক্ষেত্রে কম-বেশী লক্ষ্য করা যায়। তাই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বণ্টন ব্যবস্থা সমাজ কাঠামোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

www.swapno.in

সমাজের উপরি কাঠামো ও মৌলিক কাঠামো
(Superstructure and Foundation of Society)

প্রত্যেক সমাজেরই রয়েছে তার নিজস্ব কাঠামো। আর কাঠামোর মধ্য দিয়েই সমাজের বাহ্যিক রূপ ধরা পড়ে। মানুষ তার সমাজকে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের ভূমিকার বাস্তবরূপ থেকেই সমাজ কাঠামো নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের মনে যে কল্পিত সমাজ থাকে, তাকে বাস্তবারূপ দিতে সে নানারকম উপায় বের করে। সে সব উপায়ের মাধ্যমে মানুষ তাদের সম্পর্ক সমাজে স্থায়ীভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। যে সব মাধ্যমে মানুষ সমাজে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস পায় সে সবই সমাজের মৌলিক কাঠামো ও উপরি কাঠামোর সমন্বিত রূপ পরিগ্রহ করে।

কার্ল মার্কসের মতে, মানুষের সংস্কৃতি হল উপরি কাঠামো। উৎপাদন পদ্ধতি (Method of Production) ও উৎপাদন সম্পর্ক (Relation of Production of Social Clsses) সমাজের মৌল কাঠামোকে নির্ধারণ করে। এ মৌল কাঠামোই উপরি কাঠামোকে (Super sturcture) নির্ধারণ করেছে। আমরা দেখতে পাই যে, সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে এবং এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতেই সমাজে সংস্কৃতি রূপ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক কাঠামোর আকৃতি-প্রকৃতির উপর সামাজিক কার্যাবলী নির্ভরশীল। কৃষি প্রধান এবং শিল্পপ্রধান সমাজের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য বিবেচনা করলে এ বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। কৃষিপ্রধান সমাজে উৎপাদন ব্যবস্তার মাধ্যমে ভূমি-মালিক ও কৃষকের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা হচ্ছে, সে সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক এবং এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে কৃষিপ্রধান সমাজের সংস্কৃতি। আবার শিল্পপ্রধান সমাজেও তদ্রূপ শ্রমিক ও কারখানার মালিকদের সম্পর্ককে নির্ধারণ করছে উক্ত উৎপাদন সম্পর্ক। এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই শিল্প প্রধান সমাজের সংস্কৃতি গড়ে উঠে। উপরি কাঠামো হল সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতি হল রাষ্ট্র, আইন, ধর্ম, শিল্পকলা এবং দর্শন সংক্রান্ত মতাদর্শ এবং রাষ্ট্রীয় আইন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংরক্ষিত হয়।

সমাজ-ব্যবস্থা কতকগুলো আইন দ্বারা পরিচালিত এবং সে সব আইন ও নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সমাজ-ব্যবস্থা সে সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টিকে থাকে। আরও একটু স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, সমাজে পারস্পারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে- এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যবিধি দ্বারাই সমাজ কাঠামো গঠিত। তবে সমাজের মৌলিক কাঠামোর একমাত্র ভিত্তি হল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, আর অন্যসব প্রতিষ্ঠান সমাজের উপরি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

মৌলিক কাঠামো দ্বারাই উপরি কাঠামো নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে কখনও কখনও উপরির কাঠামো দ্বারাও মৌলিক কাঠামো নির্ধারিত হতে পারে। উপরি কাঠামোর মধ্য দিয়ে মৌলিক কাঠামোর প্রতিফলন ঘটে। সমাজের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন হলেই উপরি কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। আর মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে সম্পর্কও দেখানো হল ঃ

সামাজিক কাঠামো	সামাজিক স্তরবিন্যাস
১. সামাজিক কাঠামো বলতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝায়। যেমন- রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ও পরিবার ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান মিলে সমাজ কাঠামো গঠিত হয়।	১. সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান, যা বিশেষভাবে অর্থ-সম্পদ, শিক্ষা, পেশা, আভিজাত্য ও ক্ষমতার দ্বারা নিরূপণ করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হল

www.swapno.in

	সমাজ কাঠামোর মধ্যে এসবের ভিত্তিতে রচিত একটি সুবিন্যস্ত সিঁড়ি।
২. জিন্সবার্গের মতে, "সামাজিক কাঠামো হল সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের জটিল রূপ"। ব্রাউনের মতে, "একটি সমাজের সদস্যদের সব ধরনের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের ফলই হল সমাজ কাঠামো।"	২. সমাজবিজ্ঞানী সরোকিনের মতে "সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে জনসংখ্যাকে ক্রমোচ্চ ধারায় বিভক্তিকরণ বুঝায়।" আবার সমাজবিজ্ঞানী মেয়রের মতে, সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সদস্যদের পারস্পরিক পৃথকীকরণের একটি পদ্ধতি।
৩. সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা এবং পারস্পরিক বজায় সম্পর্ক থাকে।	৩. সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে তেমন কোন সম্পর্ক থাকে না। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ধরনই স্বয়ংসম্পূর্ণ।
৪. সামাজিক কাঠামো হল সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।	৪. সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সমাজকাঠামোর সার কথা।
৫. মানুষ জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একই সমাজ কাঠামো কিংবা বিররীত কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।	৫. সামাজিক স্তরবিন্যাসে সমাজ কাঠামোভুক্ত সকল সদস্যই কোন না কোন স্তরের অধীন।
৬. পরিবার থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি সবকিছুই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান থাকে।	৬. সামাজিক স্তরবিন্যাস একটি বিশেষ শ্রেণীর বলে এতে থাকে শুধু আভিজাত্য, অর্থ-সম্পদ, শিক্ষা, যশ, পেশা ও ক্ষমতা।
৭. সমাজের মৌলিক কাঠামোকে জানতে হলে যে উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনমূলক সমাজ গড়ে উঠেছে তাকে জানা একান্ত প্রয়োজন।	৭. সামাজিক স্তরবিন্যাসকে জানতে হলে সমাজের ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং শ্রেণীর অসম অবস্থান সম্পর্কে জানতে হয়।

সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে উল্লিখিত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বেশ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। কেননা সমাজে কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক স্তরবিন্যাসেও পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া, সমাজের মধ্যে যেসব শ্রেণী বা স্তর বিদ্যমান সেসবের মূল ভিত্তি সংশ্লিষ্ট সমাজের মৌলিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ বলা যায়, সমাজকাঠামো হচ্ছে অনেকটা বিমূর্ত, আর সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে তার বাস্তব রূপ।

অনুশীলনী ১ (Activity1) ঃ **সময় ঃ ৩ মিনিট**

সামাজিক কাঠামোর ৫টি উপাদানের নাম লিখুন

১.
২.
৩.

www.swapno.in

৪.

৫.

৬.

অনুশীলনী ২ (Activity2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

"সংস্কৃতি হল উপরি কাঠামো" - উক্তিটি অনূর্ধ ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

সামাজিক গড়েনর অপর নাম সমাজ কাঠামো। সমাজ কাঠামো সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের যৌগিক রূপ। এটি সামাজিক কার্যবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যার মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন অটুট থাকে। কতকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে বা প্রভাবে সমাজকাঠামো গড়ে উঠে। সেগুলো হল ঃ পরিবার, শিক্ষা, ভাষা, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। সমাজ কাঠামো মূলতঃ সমাজের মৌলিক কাঠামো ও উপরি কাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত। উপরি কাঠামো বলতে সাধারণত সংস্কৃতিতেই বুঝায়, যেমন ঃ রাষ্ট্র, আইন, ধর্ম, শিল্পকলা, দর্শন ইত্যাদি। মৌলিক কাঠামো বলতে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায়। সমাজের উপরি কাঠামো হচ্ছে সংস্কৃতি যার দ্বারা মানুষের চিন্তাধারাকে বুঝা যায় আর মৌলিক কাঠামো হচ্ছে উপরি কাঠামোর বাস্তবভিত্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সমাজবিজ্ঞান "সমাজ কাঠামো" শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?
- ক) হার্বার্ট স্পেনসার — খ) মার্কস
- গ) ম্যানহাইম — ঘ) জিন্সবার্গ

২। "সমাজ কাঠামো একটি ক্রমবিকশিত সত্ত্বা"- এ উক্তিটি সমাজ কাঠামোর কোন্ ধারণার অন্তর্ভুক্ত
- ক)জৈবিক — খ) অজৈবিক
- গ) মনস্তাত্ত্বিক — ঘ) ভৌগোলিক

৩। বটোমোর সমাজ কাঠামোর কয়টি পূর্বশর্ত কিংবা উপাদানের কথা বলেছেন?
- ক) ২টি — খ) ৩টি
- গ) ৪টি — ঘ) ৫টি

৪। কার্লমার্ক্সের মতে মানুষের সংস্কৃতিকে কি বলা হয়?
- ক) বস্তুগত উপাদান — খ) মৌলিক কাঠামো
- গ) অবস্তুগত উপাদান — ঘ) উপরি কাঠামো

www.swapno.in

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা দিন। আপনার নিজ গ্রামের বা মহল্লার সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধরন আলোচনা করুন।
২. সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা দিন। বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
৩. জাতি-বর্ণের সংজ্ঞা দিন। শ্রেণী ও জাতি-বর্ণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৪. এস্টেট প্রথার সংজ্ঞা দিন। মধ্যযুগে ইউরোপের এস্টেট প্রথার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৫. সামাজিক স্তর বিন্যাসের ধরন হিসাবে দাসপ্রথা ও এস্টেট প্রথার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।
৬. দাস প্রথা কি? দাস প্রথা কিভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে- আলোচনা করুন।
৭. সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদার মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনা করুন।
৮. শ্রেণী কাকে বলে? শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
৯. সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা দিন। সমাজ কাঠামোর উপাদান সমূহ আলোচনা করুন।
১০. সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা দিন। মৌলিক কাঠামো ও উপরি কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আলোচনা করুন।
১১. সমাজ কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনা করুন।
১২. সামাজিক কাঠামোকে সমাজবিজ্ঞানে কেন্দ্রীয় প্রত্যয় কিংবা সামগ্রিক ধারণা কেন বলা হয়?

উত্তরমালা ঃ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১ ঃ	১। ঘ	২। ক	৩। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২ ঃ	১। ক	২। খ	৩। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩ ঃ	১। গ	২। ক	৩। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪ ঃ	১। ক	২। গ	৩। গ	৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫ ঃ	১। ক	২। গ	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬ ঃ	১। ক	২। গ	৩। গ	৪। ঘ

www.swapno.in

www.swapno.in

সামাজিক বিবর্তন (Social Evaluation)

ইউনিট
১২

ভূমিকা

মানব সমাজ পরিবর্তনশীল। সময়ের পরিবর্তন ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ফলে মানব সমাজের প্রকৃতি ও রূপ পরিবর্তিত হয়। একশ, এক হাজার, বা এক লক্ষ বছর পূর্বে পৃথিবীর মানুষের সমাজ ব্যবস্থার রীতি নীতি ও চিন্তাধারা যেরূপ ছিল আজ তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নতির সাথে সাথে সমাজে পরিবর্তন ঘটছে। যদিও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আমাদের চোখে সহজে সাথে সাধে ধরা পড়ে না তবু কয়েক বছর পর তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তাই সমাজ যে বিবর্তিত হচ্ছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সমাজ বিকাশের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যদিও বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদদের মধ্যে সমাজ বিকাশের পর্যায় নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে তবু সমাজ ব্যবস্থার যে ক্রমবিকাশ ঘটছে এ ব্যাপারে কারো দ্বিম নেই। এ ইউনিটে আমরা সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মতামত অনুযায়ী সমাজের ক্রমবিকাশ আলোচনা করব। সাধারণভাবে বলা যায় মানব সমাজ কতকগুলো স্তর অতিক্রম করে আধুনিক গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এ স্তর গুলো হল যথাক্রমে আদিম সমাজ, পশুচারণ সমাজ, আদি কৃষি সমাজ, দাস প্রথাভিত্তিক সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজ। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠসূচি অনুসারে ও স্বল্প পরিসরের কারণে আমরা এ ইউনিটে সমাজের বিকাশের তাত্ত্বিক ধারণা প্রথমে আলোচনা করে পর্যায়ক্রমে আদিম সাম্যবাদ থেকে আধুনিক সমাজতন্ত্র পর্যন্ত সমাজ ব্যবস্থাগুলোর বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাব। এ ইউনিট পাঠ শেষে আমরা সমাজের ক্রমবিকাশের এসব পর্যায়ের সংরক্ষন, উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ জানতে পারব।

www.swapno.in

সমাজের ক্রমবিকাশ ঃ মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ধারণা

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

১. সমাজের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাটি জানতে পারবেন।
২. সমাজের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অমার্কসীয় ধারণাও জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

আজকের পৃথিবীর পুঁজিবাদী কিংবা সমাজতান্ত্রিক সমাজ হঠাৎ গড়ে উঠে নি, বরং তা বহু বছরের ক্রমবিকাশের ফল। প্রথম দিকে মানুষ ছিল বন্য পশুর ন্যায় অসহায়। ক্রমে মানুষ শিকার করতে শিখল। পাশুপালন করতে শিখল ও কৃষি উৎপাদন করতে শিখল। এভাবে তারা দলবদ্ধ জীবন যাপন শুরু করল। সূচনাপর্বে তারা কোন কিছুকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করত না। ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়। তজ্জন্য সমাজেরও রূপ বদলায় সমাজের বিবর্তন এখনও চলছে। যেমন সমাজের ক্রমবিকাশের স্তর ও কারণ সম্পর্কিত কিছু স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন ঠিক তেমনি কিছু বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানীও এ সম্পর্কিত ধারণা দিয়েছেন।

সমাজের ক্রমবিকাশ ঃ মার্কসীয় ধারণা

মার্কসের মতে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফলেই একটি সমাজব্যবস্থা থেকে আরেকটি সমাজব্যবস্থার উত্তরণ

মার্কসের মতে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফলেই একটি সমাজব্যবস্থা থেকে আরেকটি সমাজব্যবস্থার উত্তরণ ঘটে। তার মতে মানুষ সর্বপ্রথম অসহায় প্রাণী ছিল। প্রকৃতিকে মোকাবিলা করতে গিয়ে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে শিখে। তারা জীবন ধারণের জন্য পশু শিকার, ফলমূল আহরণ, আদিম কৃষি কাজে নিয়োজিত হয়। এ পর্যায় কোন কিছু কেই নিজের সম্পত্তি মনে করত না। ফলে আদিম সমাজে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। ছিল গোষ্ঠীগত বা যৌথ মালিকানা। ফলে তখন গড়ে উঠে ছিল একটি আদিম শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা। মার্কসের মতে তখনকার শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থাকে আদিম সাম্যবাদ বলা হয়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর নির্মম শোষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সর্বহারা শ্রেণী এক দিন হয়ত সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে এবং পরিণামে আধুনিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

ধীরে ধীরে সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে শুরু হয় দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, ভোগ, বিলাসীতা ইত্যাদি। ফলে সবল ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষগুলো হয়ে উঠে ক্ষমতাধর ও সম্পদশালী। তখন একটি উচ্চ শ্রেণীর মানুষকে প্রায় সবাই সেবা প্রদান করত। এভাবে শুরু হয় মানুষ ক্রয় করে কিংবা যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করা। বহু বছর এ দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে দাস প্রথা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণীভেদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। জমি ও ফসলের নিরাপত্তার কারণে সমাজের দুর্বল লোকেরা শক্তিশালী জমিদারদের শরণাপন্ন হয়। আর এভাবে এক শ্রেণীর সামন্তপ্রভুর জন্ম হয়। শুরু হয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। এঁটা মূলত ইউরোপের মধ্যযুগ হিসাবে চিহ্নিত।

ধীরে ধীরে মানুষ লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জন করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। ফলে উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে সামন্ত্রতন্ত্রে অসংগতি দেখা দেয় এবং সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে। পুজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় এক শ্রেণীর বুর্জোয়া। তারা শোষণের নবতর পন্থা উদ্ভাবন করে এবং শ্রেণী সংগ্রামের এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। পুঁজিবাদী সমাজে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন দুটি বিবদমান শ্রেণী সৃষ্টি

www.swapno.in

হয় - একটি বুর্জোয়া, অন্যটি সর্বহারা। ধীরে ধীরে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ আন্দোলন মূখী হয়ে উঠে। তারা সাম্যের জন্য, শান্তির জন্য আন্দোলন করতে থাকে। এর ফলে বিশ্বের কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শোষিত বঞ্চিত মানুষ সমাজতন্ত্রকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। তখন অর্থনৈতিক সাম্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। যদিও পৃথিবীতে এখন পুঁজিবাদের জয় জয়কার, তবু বুর্জোয়া শ্রেণীর নির্মম শোষণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সর্বহারা শ্রেণী এক দিন হয়ত সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে এবং পরিণামে আধুনিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

সমাজের ক্রমবিকাশ ঃ অমার্কসীয় ধারণা

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীগণ সকলেই মনে করেন যে, সমাজের পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে সামাজিক মানুষের কর্মতৎপরতা। মানুষের প্রবৃত্তি, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন যন্ত্রের পরিবর্তনের ফলে সমাজের বিবর্তন হচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মানব সমাজকে প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নব্যপ্রস্তরযুগ তাম্র-বোঞ্জ যুগে বিভক্ত করেন।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীগণ সকলেই মনে করেন যে, সমাজের পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে সামাজিক মানুষের কর্মতৎপরতা।

সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাষ্ট কোঁতের মতে, মানব সমাজ মানব পর্যায়ক্রমে ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তার স্তর অতিক্রম করে অধিবিদ্যা সংক্রান্ত চিন্তার স্তরে প্রবেশ করে চূড়ান্ত পর্যায়ে দৃষ্টিবাদী চিন্তার স্তরে উন্নীত হয়। নৃবিজ্ঞানী মর্গান সমাজবিকাশের পর্যায়গুলোকে প্রধানত তিনটিভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা বন্যদশা, বর্বরদশা ও সভ্যতা। সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের নৃবিজ্ঞানীদের মতে সমাজ বিকাশের পর্যায়গুলো হচ্ছে আদিম যুগ, পশুপালন যুগ, কৃষি যুগ এবং শিল্প যুগ। অন্যদিকে, ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন ও আধুনিক যুগে মানব ইতিহাসকে বিভক্ত করেন। সে যা হোক, পাশ্চাত্যের অনেক সমাজবিজ্ঞানী সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কারণ খুঁজতে গিয়ে ডারউইনের বিবর্তন মূরক মতবাদকে গ্রহণ করলেও তারা মার্কসের সামাজিক বিবর্তনের ধারনাকে সমর্থন করেন না। আদিম সমাজে সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মালিকানা ছিল না। এটি তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তারা মনে করেন যৌথ মালিকানা সম্পন্ন সম্পত্তি থাকতে পারে। যার অংশীদারত্ব একাধিক পরিবারের থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে একে সাম্যবাদ বলা যায় না। পৃথিবীতে শুরু তেকেই সবল ও দুর্বল মানুষের জন্ম হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে ভোগ ও পদমর্যাদার দিক থেকে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় সামাজিক অসামর্থ্য। শ্রেণী পার্থক্য পূর্বেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অর্থাৎ তাঁদের মতে প্রকৃত সাম্যবাদ কখনও প্রতিষ্ঠিত হবে না। আসলে প্রশ্নটির উত্তর আপেক্ষিক।

নৃবিজ্ঞানী মর্গান সমাজবিকাশের পর্যায়গুলোকে প্রধানত তিনটিভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা বন্যদশা, বর্বরদশা ও সভ্যতা।

পাশ্চাত্যের অনেক সমাজবিজ্ঞানীই সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কারণ খুজতে গিয়ে ডারইউনের বিবর্তনমূলক সমবাদকে সমর্থন করেন।

অনুশীলনী - ১ (Activity - 1) **সময় ঃ ৩ মিনিট**

সমাজ ক্রমবিকাশের মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ধারণার মধ্যকার তিনটি পার্থক্য লিখুন ঃ

ক্রম	মার্কসীয় ধারণা	অমার্কসীয় ধারণা
১.		
২.		
৩.		

সারাংশ

সমাজ ক্রম বিবর্তিত হচ্ছে একথা কোন সমাজবিজ্ঞানী বা নৃবিজ্ঞানী অস্বীকার করেন না। মার্কসের মতে সমাজের ক্রমবিকাশের ছয়টি পর্যায় রয়েছে। যথা- আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা,

www.swapno.in

সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র আধুনিক সাম্যবাদ। তাঁর মতে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজব্যবস্থায় বিবর্তন ঘটে। নৃবিজ্ঞানী মর্গানের মতে সমাজের ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো হচ্ছে যথাক্রমে বন্যদশা ও বর্বরদশা, সভ্যতা। মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা যে ভাবেই নির্ণয় করা হোক না কেন সমাজ যে পরিবর্তনশীল এ সম্পর্কে কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই। তবে একই ধারায় পৃথিবীর সব দেশের সমাজ বিবর্তিত হয়নি এবং হবেও না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। মর্গান সমাজবিকাশের পর্যায়কে কয়টি ভাগে ভাগ করেন।
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

২। মার্কস সমাজবিকাশের পর্যায়কে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন।
ক) ৬টি খ) ৭টি
গ) ৫টি ঘ) ৪টি

৩। ডারউইনের বিবর্তনবাদকে সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে কে সমর্থন করেছেন?
ক) এরিষ্টটল খ) প্লেটো
গ) মর্গান ঘ) সেন্ট-সাইমন

৪। মার্কসীয় ধারণা অনুসারে সমাজ বিবর্তনের মূল কারণ কি?
ক) শিক্ষার উন্নয়ন খ) উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক
গ) প্রযুক্তি বিপ্লব খ) শিল্প বিপ্লব

www.swapno.in

www.swapno.in

আদিম সাম্যবাদ ও দাস সমাজ

পাঠ ২

বয়স ও স্ত্রীপুরুষ ভেদে শ্রমবিভাগ ছিল; কিন্তু সামাজিক শ্রেণী ছিল না।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১. আদিম সমাজের প্রাথমিক ধারণা পাবেন।
২. আদিম সাম্যবাদী সমাজের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৩. দাস সমাজের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

আদিম সমাজ ঃ ধারণা

পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের সমাজব্যবস্থা কিরূপ ছিল তা সঠিকভাবে বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে ধারণা করা হয় যে, অসহায় অবস্থা থেকে মানুষের জীবনযাত্রা শুরু হয়। তখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নির্ভর ছিল। তাদের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ ও অনুন্নত। মানুষ কঠোর জীবন সংগ্রামে ছিল নিয়োজিত। আদিম সমাজে মানুষের জীবন যাত্রা ছিল অত্যন্ত করুণ ও কষ্টকর। আদিম সমাজের সকল মানুষ ছিল পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। সে সমাজের সংস্কৃতি আধুনিক সমাজের মত ছিল না। আদিম মানুষের সামাজিক নীতি, আচরণ বিধি ও চিন্তাধারা আধুনিক সমাজের মত জটিল রীতি ছিল না।

আদিম সাম্যবাদী সমাজ

আদিম সাম্যবাদী সমাজে মানুষ ছিল একান্তই খাদ্য সংগ্রহকারী। তারা পশু শিকার এবং বন-জঙ্গলের মূল ও শাক-সব্জি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে মানুষ ছিল একান্তই খাদ্য সংগ্রহকারী। তারা পশু শিকার এবং বন-জঙ্গলের মূল ও শাক-সব্জি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। উৎপাদনের হাতিয়ার ছিল পাথর, জীবজন্তুর হাড়, গাছের ডালপালা ইত্যাদি। তখন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বা লোভ জন্মায় নি; সারাদিন যা সংগ্রহ করত, দিনের শেষে সবাই মিলে তা ভাগ করে নিত। ফলে তখন একটি শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। তাই মার্কস একে আদিম সাম্যবাদী সমাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। নিম্নে আদিম সাম্যবাদী সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল ঃ

ক) সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ আদিম সমাজ ছিল যাযাবর বৃত্তি নির্ভর। তারা বড় বড় গাছের ডাল ও গুহা থেকে ঘর তৈরী করতে শিখল। স্ত্রী-পুরুষ মিলে পরিবার গড়ে তুলে তারা সমাজের জন্ম দেয়। তাদের মাঝে কোন শ্রেণী বৈষম্য ছিল না, তবে বয়স ও লিঙ্গ ভেদ ছিল।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে পরিবার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেনি।

খ) পরিবার ও বিবাহ ঃ আদিম সাম্যবাদী সমাজে পরিবার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার গড়ে উঠার পূর্বে অবাধ যৌনাচার ছিল। এ স্তর অতিক্রম করে মানুষ মর্গানের মতে সর্বপ্রথম সগোত্র পরিবার গড়ে তুলল। আর এর সাথে সাথে আদিম সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশত অব্দে প্রাচীন গ্রীসের অর্থনীতি দাস শ্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গ) পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ আদিম সাম্যবাদী সমাজের মানুষের পেশা ছিল পশু শিকার, মাছ ধরা, পশু পালন করা। তারা যৌথভাবে জীবিকা নির্বাহ করত। বয়স ও স্ত্রীপুরুষ ভেদে

www.swapno.in

শ্রমবিভাগ ছিল; কিন্তু সামাজিক শ্রেণী ছিল না। তখন ভৌগোলিক পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের জীবিকা, পেশা ও অর্থনীতি গড়ে উঠে।

ঘ) সম্পত্তি ঃ আদিম সাম্যবাদী সমাজে সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। কেউ মনে করেন কিছুটা ব্যক্তি মালিকানা বিদ্যমান ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন যৌথ মালিকানা। বস্তুত, উৎপাদনমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে আদিম সমাজে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ ঘটেনি।

> আদিম সাম্যবাদী সমাজের লোকেরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিল। এরূপ ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাদের জীবনযাত্রা ও সামাজিক রীতিনীতি গড়ে উঠেছিল।

ঙ) ধর্ম ঃ আদিম সাম্যবাদী সমাজের লোকেরা সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী ছিল। এরূপ ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাদের জীবনযাত্রা ও সামাজিক রীতিনীতি গড়ে উঠেছিল।

দাস সমাজ

> যখন মানুষ খাদ্য সংগ্রহের স্তর থেকে উৎপাদনমূলক স্তরে পৌছল তখন সে বেশী উৎপাদন করতে শিখল। আর এভাবে আদিম সাম্যবাদী সমাজ শ্রেণী সমাজের প্রথম দাসপ্রথায় রূপান্তরিত হল।

উৎপাদন কৌশলের উন্নতির ফলে মানুষ খাদ্য উৎপাদনকারীতে পরিণত হয়। যখন মানুষ খাদ্য সংগ্রহের স্তর থেকে উৎপাদনমূলক স্তরে পৌছল তখন সে বেশী উৎপাদন করতে শিখল। আর এভাবে আদিম সাম্যবাদী সমাজ শ্রেণী সমাজের প্রথম দাসপ্রথায় রূপান্তরিত হল। ধারনা করা হয় যে, খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ অব্দে দাসপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন গ্রীসে সর্বপ্রথম দাস প্রথার বিকাশ ঘটেছিল। সমাজে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ব্রোঞ্জ ও লৌহের সাথে যুক্ত হয় দাস। রোমান আইনে দাস প্রথাকে একটি বৈধ ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রোমান আইনে যে ব্যক্তি হয় সে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বভাবের বিরুদ্ধে অন্যের আজ্ঞাবহরূপে তার বিচার শক্তি ও ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে তার সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

দাসপ্রথা হল প্রাচীনতম শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি। খাদ্য সংগ্রহ, পশু মৎস্য শিকার ও পশুপালন পর্যায়ে এর অস্তিত্ব ছিল না। যখন উৎপাদনের কৃৎকৌশল উন্নত হল ও শ্রমের ব্যবহার বেড়ে গেল তখন একজন দাসকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে যে খরচ হয় তার চেয়ে সে বেশী উৎপাদন করতে পারে। সেজন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হওয়ায় বর্বর অবস্থার মধ্য পর্যায় থেকে যুদ্ধে বিজিত মানুষকে দাস বানানো হল। প্রথম অবস্থায় দাসদের ব্যক্তিগত বা ঘরে কাজে নিয়োগ করা হত। কিন্তু পরবর্তিতে লোহার ব্যবহারের সাথে সাথে দাসদের কৃষি কাজে লাগানো হল এবং এভাবে দাস প্রথার প্রকৃত রূপ প্রতিষ্ঠিত হল।

খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশত অব্দে গ্রীসের অর্থনীতি দাস শ্রমের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। দাসদের কৃষি কাজ ছাড়াও খনি ও শিল্প-কারখানায় কাজ করানো হত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের প্রতিদিন ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা খাটতে হত। মন্দির, অট্টালিকা, জলপথ, প্রাচীর নির্মাণ ইত্যাদি কাজেও দাসরাই প্রধান অবলম্বন। এইছাড়া, দাসদের অনেক ব্যবসা বাণিজ্যেও ব্যবহার করা হতো এবং অনেকে মালিকের সম্পত্তি দেখাশুনার কাজে নিয়োজিত থাকতো।

আগেই বলা হয়েছে মানব সমাজে দাসপ্রথাই শ্রেণী শোষণের সূচনা করে। দাসদের শ্রমের ফসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত রচিত হয়। দাসদের বিবাহ ও পরিবার ইত্যাদি সব কিছুই তাদের মনিবের ইচ্ছানুযায়ী সংগঠিত হত।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

দাস প্রথার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

www.swapno.in

১.
২.
৩.
৪.
৫.

সারাংশ

আদিম সাম্যবাদী সমাজে মানুষ ছিল প্রধানত খাদ্য সংগ্রহকারী। পশু শিকার, বনের ফল-মূল, শাক-সব্জি সংগ্রহই ছিল জীবিকা নির্বাহের উপায়। তখন সমাজে পরিবারের কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গড়ে উঠেনি। মানুষ যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে শিখল, তখনই আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙ্গে দাস সমাজের উদ্ভব হয়। দাসরা তাদের মনিবের ব্যক্তিগত ও ঘরের কাজ থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং খনি ও কল-কারখানায় নিয়োজিত হয়।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কেন একটি সমাজ ব্যবস্থা থেকে আরেকটি সমাজ ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটে?

ক) ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ খ) সামাজিক উন্নয়ন
গ) রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ

২। আদিম সাম্যবাদী সমাজের মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি?

ক) পশুপালন খ) খাদ্য সংগ্রহ
গ) কৃষিকাজ ঘ) শিল্প উৎপাদন

৩। কোন সমাজে পরিবার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে বর্ণ?

ক) আদি সমাজে খ) দাস সমাজে
গ) পুঁজিবাদী সমাজে ঘ) সামন্ত সমাজ

৪। খ্রীষ্টপূর্ব কত অব্দে সাদপ্রথা সমাজের উদ্ভব হয়?

ক) ২০০০ খ) ২৫০০
গ) ৩০০০ ঘ) ৩৫০০

৫। শ্রেণী শোষণ কোন সমাজব্যবস্থা থেকে শুরু হয়?

ক) দাস সমাজ খ) সাম্যবাদী সমাজ
গ) আদিম সমাজ ঘ) সামন্ত সমাজ

www.swapno.in

www.swapno.in

সামন্তবাদ

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

১. সামন্তবাদ তথা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।
২. সামন্তবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন, সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

সামন্ততন্ত্র ঃ সংজ্ঞা

ইংরেজি 'Feudal' শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে সামন্ততন্ত্র বা সামন্তবাদ বা সামন্তপ্রথা। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরই ইউরোপে ভূমি মালিকানার উপর ভিত্তি করে এক বিশেষ ধরনের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে যার নাম সামন্তবাদ। রোমান সাম্রাজ্যের দাস প্রথা, জার্মানীর অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণীভেদের প্রতিক্রিয়ার ফলেই সামন্তবাদের আবির্ভাব ঘটে। নবম শতকে পশ্চিম ইউরোপে কৃষি অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে যে সমাজ সংস্কৃতি, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে উঠেছিল তাকেই সামন্ত সমাজ নামে আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং ভূমিসত্ব ও কৃষি অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে যে সমাজে সংস্কৃতি প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে উঠে এবং সামাজিক স্তরবিন্যাস বিকল্পিত হয় তাকেই সামন্ততন্ত্র বলে।

> ইংরেজি 'Feudal' শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে সামন্ততন্ত্র বা সামন্তবাদ বা সামন্তপ্রথা। রোমান সাম্রাজেল পতনের পরই ইউরোপে ভূমি মালিকানার উপর ভিত্তি করে এক বিশেষ ধরনের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে যার নাম সমান্তবাদ।

সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি (Origin of Feudalism)

পূর্বেই বলেছি যে, রোমান সাম্রাজ্যের দাস প্রথা ও জার্মানীর অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণীভেদের প্রতিক্রিয়ার ফলেই সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সম্রাট অঙ্গরাজ্য গুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হন এবং রাজ্যগুলো দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে দুর্বল ও ক্ষুদ্র চাষীরা বা ভূমির মালিকগণ ভূমিহারা বা ভূমিহীন হওয়ার ভয়ে প্রতিবেশী শক্তিশালী ভূ-স্বামীর সাহায্য প্রার্থনা করে। শক্তিশালী ভূ-স্বামী চুক্তি অনুযায়ী দুর্বল ভূমি মালিককে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করত এবং আর শক্তিশালী ভূস্বামী ইচ্ছানুযায়ী ভূমি দখল করতে পারত। এ প্রথার নাম প্রিকোরিয়াম (Precarium)। কিন্তু ক্ষুদে ভূমি মালিকগণ ভূমি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে আবার নতুন করে চুক্তি করল দুর্বল ও সবলের মধ্যে। এ চুক্তি অনুযায়ী জমি মূল মালিকের নিয়ন্ত্রনেই দেওয়া হল এই শর্তে যে, দুর্বল সবলকে সামরিক শক্তি দিয়ে সাহায্য করবে। এ ব্যবস্থার নাম ছিল বেনিফিসিয়াম (Beneficium)। যখন বেনিফিসিয়াম প্রথা বহু দিন ধরে চলতে থাকল তখন এর নাম হল ফিফ (Fief)। আবার অন্য একটি রোমান প্রথার ভূমিহীনেরা প্রতিবেশী শক্তিশালী ভূ স্বামীদের তাবেদারে রূপান্তরিত হয়। শক্তিশালী ভূ-স্বামীদের অধীনে থাকায় তারা তাদের জান মালের নিরাপত্তা লাভ করে, আর বিনিময়ে তারা তাদের সেবা ভূ-স্বামীদেরকে প্রদান করত। এই চুক্তি প্রথার নাম প্যাট্রোসিয়াম (Patrocium)। জার্মান সমাজে রাজা ও জমিদার (অভিজাত) শ্রেণী যোদ্ধাদের হাতে রাখত এবং তারা তাদের যোদ্ধাদের ভরণ-পোষণ করত। আর যোদ্ধারা তাদের (রাজা জমিদার) রাজত্ব ও জমিদারী রক্ষার জন্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করতো। জার্মানীর এ জাতীয় প্রথার নাম ছিল কমিটেটাস (Comitatus)। রোমানদের পেট্রোসিয়াম ও জার্মানদের কমিটেটাস প্রথার সমন্বয়ে গড়ে উঠে

www.swapno.in

বিপন্ন মানুষেরা যেমন পৃষ্ঠপোষক শরণাপন্ন হত, তেমনি ছোট জোতদাররা আবার বড় ভূ-স্বামীদের আশ্রয় প্রার্থী হত। এভাবে বড় ভূস্বামীদের আশ্রয়দানের ক্ষমতা তথা অধীনস্থ ও প্রতিবেশীদের দমন করার কর্তৃত্ব ও দাপট ক্রমেই বেড়ে যায় এবং এরাই কালক্রমে সামন্তরাজ্যের পরিণত হয়।

সামন্ততন্ত্র। রোম ও জার্মানী ছাড়া ফ্রান্সেও ভূ-স্বামী ও প্রজার মধ্যে অনেকটা সেবা ও রক্ষার এক চুক্তি প্রথা চালু ছিল। বর্ণিত দুটি চুক্তিরই প্রধান শর্ত ছিল যে, ভূস্বামীর হাতে জমির মালিকানা ন্যস্ত হবে। কৃষক অবশ্য জমি ভোগ দখলের অধিকার পাবে। কৃষকের এ ধরনের আশ্রয়দাতাদের বলা হত পৃষ্ঠপোষক। বিপন্ন মানুষেরা যেমন পৃষ্ঠপোষক শরণাপন্ন হত, তেমনি ছোট জোতদাররা আবার বড় ভূ-স্বামীদের আশ্রয় প্রার্থী হত। এভাবে বড় ভূস্বামীদের আশ্রয়দানের ক্ষমতা তথা অধীনস্থ ও প্রতিবেশীদের দমন করার কর্তৃত্ব ও দাপট ক্রমেই বেড়ে যায় এবং এরাই কালক্রমে সামন্তরাজায় পরিণত হয়। বৃহৎ জমির মালিক ক্ষুদ্র জমির মালিককে জমি দান করতেন। তাকে “লর্ড” বা “প্রভু” বলা হত। যিনি গ্রহণ করতেন তাকে বলা হত ‘ভেসাল’ (Vassal)। যে জমি লর্ড কর্তৃক ভেসালকে দেওয়া হত তাকে 'Fief তথা 'Feud' বলা হত আর এ ফিউড (Feud) থেকেই ফিউডাল (Feudal) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এভাবে পশ্চিম ইউরোপে (রোম, ইংল্যান্ড, জার্মান ও ফ্রান্স)বিবর্তনের সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটে, যা নবম শতক হতে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ঐ সময়কালে ইউরোপ ছোট ছোট সামন্ত এস্টেটে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

<u>সামান্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ</u> ঃ আপনারা পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ পড়ে সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা ও ও ইহার বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। তাহলে নিশ্চয় আপনারা আঁচ করতে পেরেছেন যে, সামন্ততন্ত্রে কি কি বৈশিষ্ট্য থকতে পারে। আসুন, তাহলে আমরা সামন্ততন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করি।

সামন্ততন্ত্রের মাধ্যমে যে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে জমির পরিমাণ ও মালিকানার উপর রাজনৈতিক শক্তি ও সামাজিক স্তর নির্ণীত হত।

(ক) <u>সামাজিক অবস্থা</u> ঃ সামন্ততন্ত্রের মাধ্যমে যে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে জমির পরিমাণ ও মালিকানার উপর রাজনৈতিক শক্তি ও সামাজিক স্তর নির্ণীত হত। যে জমির মালিক আছে যে শাসক, যার জমি নেই সে শাসিত। জমির মালিকরা উচ্চ মর্যাদা ভোগ করত, আর ভূমিহীনদেরকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য করা হত। কৃষক তার সামন্ত প্রভুর জমিতে বাস করত এবং সামন্ত প্রভু যদি তার জমি বা রাজ্য অন্যকোন সামন্ত প্রভুর কাছে হস্তান্তর করত তাহলে সাথে সাথে উক্ত জমির কৃষকও হস্তান্তরিত হয়ে যেত। কৃষকদের দ্বারা জমিতে ফসল ফলানো হত, কিন্তু জমিতে তাদের পূর্ণ স্বত্ব ছিল না। জমি চাষের সুযোগের বিনিময়ে সামন্ত প্রভু কর্তৃক অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য কৃষককে পালন করতে হত। ঐ সময়ের কৃষক ক্রীতদাসও ছিল না আবার স্বাধীনও ছিল না। সে মূলত ছিল ভূমিদাস। এজন্য ভূমিদাস প্রথা সামন্তবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সামন্ত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে ছিল রাজার অবস্থান। রাজা ছিল সকল জমির মালিক। রাজা তার রাজ্যের একাংশ নিজের খাসমহলের জন্য রেখে অবশিষ্ট জমি তার অধীনস্থ পাত্র মিত্র, অমাত্য রাজন্যবর্গ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে বন্দোবস্ত দিতেন।

(খ) <u>রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা</u> ঃ সামন্ত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে ছিল রাজার অবস্থান। রাজা ছিল সকল জমির মালিক। রাজা তার রাজ্যের একাংশ নিজের খাসমহলের জন্য রেখে অবশিষ্ট জমি তার অধীনস্থ পাত্র মিত্র, অমাত্য রাজন্যবর্গ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে বন্দোবস্ত দিতেন। যারা জমির বন্দোবস্ত পেতেন তারা সামন্তরাজা (Feudal Kings) হিসেবে পরিচিতি লাভ করতেন। রাজার বশ্যতা স্বীকার ও রাজাকে সামরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জমিদারী ভোগ দখলের এবং জামিদারিতে শান্তিরক্ষা, শাসনকার্য এবং বিচারকার্য পরিচালনার পূর্ণ অধিকার লাভ করেছিল। সামন্তপ্রভু আবার পুরো জমিদারী সরাসরি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেননি। তিনি কিছু জমি তার বংশধর ও তাঁবেদারদের মধ্যে ভোগ দখলের জন্য ভাগ করে দিতেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে একাধিক মধ্যস্বত্ত্ব ভোগী সামন্তশ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল। রাজা সামন্ত সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন, কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তবে সামন্ত শাসনতন্ত্রে তার নাম প্রথমে ছিল। রাজার সার্বভৌম শক্তি তার খাসমহল ও খাস জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর রাজকীয় খাসমহলগুলোর বাইরে সামন্ত রাজারা নিজ নিজ জমিদারিতে সর্বেসর্বা ছিল। ফলে সার্বভৌম

www.swapno.in

কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে উঠেনি বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সামন্ত প্রভুদের মধ্যে জমির মালিকানার ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল।

(গ) **বিচার ব্যবস্থা ও জাতীয় নিরাপত্তা** ঃ রাজা সাধারণত একই রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন সামান্তপ্রভুদের মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব নিস্পত্তির জন্য নিজেই বিচার কার্য নিস্পত্তি করতেন। তবে রাজা কখনই জনসাধারণের বিচার করতেন না। সামন্তরাজা নিজ জমিদারী এলাকায় সকল বিরোধ নিস্পত্তি করতেন এবং বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন। এটি ছিল প্রচলিত প্রথা, যা তখনকার আইন হিসেবে গণ্য হয়। বিভিন্ন জমিদারীতে অভিন্ন বিচার ব্যবস্থা ছিল না। রাজ্যের কোন জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী বা সেনাবাহিনী ছিল না। প্রতিটি সামন্তপ্রভু নিজেই নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তুলেছিল। রাজা সামরিক প্রয়োজনে সামন্তরাজাদের সহযোগিতা চাইতেন। রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কতিপয় সামন্তপ্রভু নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলেছিল এবং এরা রাজাকে তোয়াক্কা না করে নিজেদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হত। ফলে সামন্ততন্ত্রে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় আইন ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি।

সামন্তপ্রভুদের বাস ছিল কৃষকের গ্রামের বা

রাজা সাধারণত একই রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন সামান্তপ্রভুদের মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব নিস্পত্তির জন্য নিজেই বিচার কার্য নিস্পত্তি করতেন। তবে রাজা কখনই জনসাধারণের বিচার করতেন না।

(ঘ) **অর্থনৈতিক অবস্থা** ঃ সামন্তবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে, সামন্ত উৎপাদনের একক ছিল ম্যানর (Manor)। ম্যানর বলতে সামন্ত প্রভুর বা তার তাঁবেদারদের অধীনস্থ ভূমিদাসের (কৃষক) সংখ্যাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কারো কারো মতে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের ঘরে বা তাঁবুতে যে কয়জন কৃষক বা ভূমিদাস বাস করতে পারত সেই তাঁবু বা ঘরটিকে ম্যানর বলা হত। আসলে ম্যানর হচ্ছে সামন্তযুগের একটি আঞ্চলিক একক। ঐ এককের অধীনস্থ জমির মালিকানা ও স্বত্বাধিকার সামন্তপ্রভুর উপর বর্তায়। ম্যানর হাউজ (Manor house) গুলো ছিল সামন্ত প্রভুর বাসস্থান। সর্বোপরি, ম্যানর বলতে বুঝায় সামন্ত প্রভুর মালিকানাধীন খামার বিশেষ। এজন্য, ম্যানবাদ (manorialism) হচ্ছে বিশেষ করে ইংল্যোন্ডের সামন্তবাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যা ভারতীয় সামন্তবাদ (যদি বলা হয়) সামরিক (Military) ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাই (Fiscalism) প্রাধান্য লাভ করে। এর মূল কারণ হল বৃটিশ পূর্ব ভারতের ভূমি ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ সুস্পষ্টভাবে ঘটেনি কিংবা ঘটলেও এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অর্জন করেনি বলে সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ম্যানরদের দ্বারা উৎপাদিত শস্য সামন্ত প্রভুর বাসস্থান সংলগ্ন গোলাঘরে রাখা হত। সামন্তপ্রভুর কৃষিজমি প্রত্যেক বছর চাষ হতো না। জমি চাষের ক্ষেত্রে শস্য পর্যায় অনুসরণ করা হতো। সামন্তপ্রভুর অধীনস্থ জমিতে পশুপালন, মৎস্যচাষ পাখি শিকার ইত্যাদি করতে হলে তার অনুমতি আবশ্যক ছিল এবং এসব হতে উৎপাদিত সম্পদের একটি অংশ সামন্তপ্রভুদের দিতে হত। একটি ম্যানরের অন্তর্গত সকল কৃষক-কৃষাণীর পেটের ভাত, জ্বালানী, গবাদি পশুর খড় বিচালী সামন্তপ্রভুর নির্দেশে সরবরাহ করা হত। মহিলা সাধারণত ঘরে বসে রান্নাবান্না করতেন ও গৃহপালিত পশুর সেবা করতেন, আর কৃষকরা তাদের বাড়ীর ভিটায় বা ম্যানরের এলাকায় ও জমিতে শস্য ও শাকসজী ফলাত। কৃষকদের পাশাপাশি গ্রামে কামার, চর্মকার, ছুতার, মিস্ত্রি, ধোপা, রংমিস্ত্রি ইত্যাদি পেশার লোকজন বসবাস করত। কৃষকরা যে কোন প্রয়োজনে তাদের কাছে যেত এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগান তাদের কাছ থেকে পেত। কাজেই কৃষক অধ্যুষিত ম্যানর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক একক। ম্যানরের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির ফলে সামন্ত ইউরোপে ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয় এবং মুদ্রার ব্যবহার প্রায় লোপ পায়। সামন্ত ইউরোপের ব্যবসায়ী ছিল ফেরিওয়ালা। মূলত সামন্ত উৎপাদন প্রণালীতে উৎপাদনের মৌলিক উপাদান ছিল ভূমিদাস, কিন্তু উৎপাদিত সম্পদের প্রধান ভোক্তা ছিল সামন্ত প্রভু।

বিশেষ করে ইংল্যান্ডে, সামন্ত উৎপাদনের একক ছিল ম্যানর (Manor)। ম্যানর বলতে সামন্ত প্রভুর বা তার তাবেদারদের অধীনস্থ ভূমি দাসের (কৃষক) সংখ্যাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কারো কারো মতে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের ঘরে বা তাঁবুতে যে কয়জন কৃষক বা ভূমিদাস বাস করতে পারত সেই তাঁবু বা ঘরটিকে ম্যানর বলা হত।

(ঙ) **বাসস্থান ও পরিবেশ** ঃ সামন্তপ্রভুদের বাস ছিল কৃষকের গ্রামের বা ম্যানরসমূহের কেন্দ্রস্থলে। তাদের বাসস্থানকে একটি দুর্গের সাথেই তুলনা করা যায়। আর এ দুর্গের

www.swapno.in

অনতিদূরে ছিল কৃষকদের গ্রাম। নিরাপত্তার খাতিরে ম্যানরের সকল কৃষক ঠাসাঠাসি করে একত্রে বাস করত। তাদের কুটিরের সাথেই ছিল পাকের ঘর ও ঘোড়ার আস্তাবল। কুটিরের অভ্যন্তরে শূকর ও মোরগ মুরগির যাতায়াত ছিল অবাধ, পাশে ছিল ময়লা ফেলার জায়গা। শস্য রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞান ছিল না। নোংরা পরিবেশে বাস করে সে অপরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাস্তাঘাট ছিল না বললেই চলে। আর ঘরবাড়িগুলো ছিল আজকের আমাদের দেশের বস্তিগুলোর মতো এক একটি জীর্ণ কুটির।

(চ) নগর জীবন ঃ সামন্ততন্ত্রে একমাত্র কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিই প্রাধান্য পেয়েছিল। সিল্ড ভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য থাকলেও নগরের গুরুত্ব হ্রাস পায়। সামন্ত প্রভুর ম্যানরে বসবাস করার কারণে সমাজ ও অর্থনীতি মূলত গ্রামভিত্তিক হয়ে উঠে তাছাড়া, মুদ্রার লেনদেন হ্রাস পায় এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিবাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সামন্তযুগে নগর জীবনের গুরুত্ব তুলনা কিভাবে কম ছিল।

(ছ) **কৃষি জমি ও চাষ পদ্ধতি ঃ** ম্যানরের অধীন কৃষি যোগ্য জমি সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ক্ষেত্রের জমি আবার নীচু বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট দাগে বিভক্ত ছিল। এক একটি দাগ আয়তনে প্রায় এক একর ছিল। কৃষি কাজ তথা চাষ পদ্ধতি ছিল অনুন্নত। সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ হতো। কৃত্রিম সার দূরের কথা, জমিতে গোবর সারও দেওয়া হতো না। জমির উর্বরতা নষ্ট হওয়ার ভয়ে এক তৃতীয়াংশ জমি বছরের পর বছর ফেলে রাখা হতো।

(জ) **পারিবারিক বন্ধন ও বিবাহ ঃ** সামন্ত সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামের সকল অধিবাসী পরস্পরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। পুরুষানুক্রমে একে অন্যের সাথে গ্রামে তাদের এ বন্ধন গড়ে উঠেছে। সামন্ত সমাজে পরস্পরের সকল আত্মীয় গ্রামবাসী মিলে যেন এক একটি বৃহৎ পরিবার বা গোত্র গড়ে উঠে। কৃষক তথা ভূমিদাসেরা স্বাধীনভাবে বিয়ে করতে পারত না। বিবাহের পূর্বে তাদেরকে সামন্ত প্রভুর অনুমতি নিতে হত এবং বিয়ের জন্য সামন্ত প্রভুকে নজরানা দিতে হত। কখনও কখনও সামন্তপ্রভু বরকে তার নিজস্ব ম্যানারের কাউকে বিয়ে করতে বাধ্য করত, এমনকি বিবাহের পর নববধূর সতীত্ব নষ্ট করারও প্রয়াস পেত।

(ঝ) **ধর্ম ঃ** সামন্ত ইউরোপ খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিল এবং গীর্জা ছিল সামন্ত ব্যবস্থার অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন সামন্ত প্রভুদের বিরাট একটি অংশ ছিল খ্রীষ্টান ধর্মযাজক এবং ধর্মগুরুদের মনোরঞ্জন ও আনুকূল্য লাভের জন্য ভূমি দান করতো। এক পর্যায়ে দান স্বরূপ প্রাপ্ত জমি আয়তনে এমন বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে গীর্জা এককভাবে ইউরোপের বৃহত্তম সামন্ত প্রভুতে পরিণত হয়। কিন্তু গীর্জার ঐ পার্থিব ঐশ্বর্য লৌকিক ক্ষমতা ও আচরণ মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্মের বিশুদ্ধতা ও সারল্য ক্ষুণ্ন করেছিল এবং নানা অপবাদ ও অনাচারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারত উপমহাদেশেও পুরোহিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাজকীয় মর্যাদা দেওয়া হত এবং অনেক সময় রাজা বাদশাহ তাদের জায়গীর প্রদান করতেন।

সামন্ত ইউরোপ খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিল এবং গীর্জা ছিল সামন্ত ব্যবস্থার অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন সামন্ত প্রভুদের বিরাট একটি অংশ ছিল খ্রীষ্টান ধর্মযাজক এবং ধর্মগুরুদের মনোরঞ্জন ও আনুকূল্য লাভের জন্য ভূমি দান করতো।

অনুশীলন ১ ঃ (Activity - 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.

www.swapno.in

সারাংশ

পশ্চিম ইউরোপে গ্রীস ও রোমান সাম্রাজ্যের এবং জার্মানীর অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণীভেদের প্রতিক্রিয়ার ফলে সামন্তবাদের আবির্ভাব ঘটে। সামন্ত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে ছিল রাজার অবস্থান। রাজা ছিল সকল জমির মালিক। রাজা তার রাজ্যের একাংশ নিজের খাসমহলের জন্য রেখে অবশিষ্ট জমি তার অধীনস্থ পাত্রমিত্র অমাত্য, রাজন্যবর্গ এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের বন্দোবস্ত দিতেন। সামন্তবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি। সামন্তপ্রভুদের বাসস্থান ছিল কৃষকের গ্রামের বা ম্যনরসমূহের কেন্দ্রস্থলে মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্তপ্রভুদের একটি বিরাট অংশ খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ও ধর্মগুরুদের মনোরঞ্জন ও আনুকূল্য লাভের জন্য ভূমি দান করতো। বৃটিশপূর্ব ভারতেও সামরিক বাহিনীর পদস্থ ব্যক্তি ও সমাজের গণমান্য লোকদেরকে বাদ্দী-বাদশাহ জমি দখল করতেন থাকে জায়গীর জমি বরা হত। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাস্থ ওয়েবের এরূপ জমিদখল প্রথাকে প্রিবন্ডে লাইবেশন বলেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। শক্তিশালী ভূস্বামী ও ভূমিহীনদের মধ্যকার জান-মালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তিতে কি বরা হত?

ক) প্যাট্রেসিনয়া — খ) প্রিকেরিয়াম
গ) কমিটটাস — ঘ) বেনিভিসিয়াম

২। যিনি ভূ-স্বামী কাছ হতে জমি গ্রহণ করতেন তাকে কি বলা হত?

ক) লর্ড — খ) ভেসাল
গ) ক্ষুদ্র চাষী — ঘ) জমিদার

৩। সামন্ত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে কে ছিলেন?

ক) রাণী — খ) সামন্ত প্রভু
গ) রাজা — ঘ) জমিদার

৪। সামন্তবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি কি ছিল?

ক) শিল্প — খ) ব্যবসা-বাণিজ্য
গ) মহাজনী প্রথা — ঘ) কৃষি

www.swapno.in

পুঁজিবাদ

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

১. পুঁজিবাদের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. পুঁজিবাদের প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. পুঁজিবাদের বিকাশের কারণসমূহ জানতে পারবেন।
৪. পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে পারবেন।

www.swapno.in

পুঁজিবাদ ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা

কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিল্প সমাজে উত্তরণের ফলে পুঁজিবাদের উৎপত্তি হয়। মূলতঃ সামন্ততন্ত্রের অবসানের পর ধনতন্ত্রের বা পুঁজিবাদের জন্ম উদ্ভব হয়েছে। পুঁজিবাদ মূলতঃ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা। এই পাঠে আপনারা প্রধান পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর চেয়ে উহার সমাজ কাঠামো সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত এবং অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ থাকে তাকে পুজিবাদ বলে।

পুঁজিবাদের সংজ্ঞা ঃ যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত এবং অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ থাকে তাকে পুজিবাদ বলে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সিডনী ওয়েবের মতে পুঁজিবাদের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি-মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কলকারখানায় শ্রমিকদের শ্রমে প্রচুর পণ্য উৎপাদন। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানাই পুঁজিবাদের ভিত্তি। পুঁজিবাদে ভূমি, শিল্প, কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সবই ব্যক্তি মালিকানায় থাকে। উৎপাদনের উপকরণের উপর শ্রমিকদের কোন মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না। শ্রমিকরা উৎপাদিত দ্রব্যের অবাধ মুনাফা থেকে বঞ্চিত থাকে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে মেহনতি মানুষের শ্রমের ফলে পুঁজিপতির বিকাশ ঘটে এবং পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের পরিচালিত করে।

পুঁজিবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ সামন্তবাদের শেষদিকে যান্ত্রিক উন্নতির ফলে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে নতুন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয় তাকেই পুঁজিবাদ বলা হয়। শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে যে ব্যবস্থার উদ্ভব হয় সেটাই পুঁজিবাদ নামে পরিচিত লাভ করে। পুঁজিবাদের বিকাশের প্রথম স্তর ছিল বণিকের ধনতন্ত্র। সামন্ত প্রভুদের ভোগবিলাস যতই বেড়ে চলল বণিক শ্রেণী ততই তাদের যোগান দিতে লাগল। সমাজবাদের শেষ পর্যায়ে বণিক শ্রেণী আইন করে সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করে এবঙ জমিদাররা কৃষকদেরকে নিজেদের কারখানায় নিয়োগ করে। এভাবে একদল লোক ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠে এবং অন্যদল নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এ পর্যায়টাকে অনেকে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্র বলে থাকেন। পরবর্তী পর্যায়ে আসে শ্রম শিল্প-ধনতন্ত্র। এটি মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পউন্নয়নের এক বিশেষ পর্যায়, যখন উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের ফলে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের পরিবর্তে বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে লগ্নি-পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যায়ে বণিক বা ধনী শ্রেণীর লোকেরা শ্রম শিল্প ও কারখানায় পুঁজি বিনিয়োগ করত এবং তারা শুধু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপালন করত। একথায় তারা

www.swapno.in

কায়িক পরিশ্রম না করে মুনাফার সিংহভাগ নিয়ে নিত। ফলে সমাজে একদল লোক সৃষ্টি হল যাদের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল আর আরেক দল দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হল। এদের দৈহিক শ্রমই তাদের পুঁজি। পুঁজিবাদের উৎপত্তি কখন হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদ সামন্ততান্ত্রিক কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং তার চরম বিকাশ ঘটে শিল্প বিপ্লবের পর। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংল্যান্ডে এর পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তারপর ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভারতবর্ষে এর বিস্তৃতি ঘটে। তবে ভারতে এর বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে।

<u>**পুঁজিবাদ বিকাশের কারণসমূহ**</u> ঃ পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি ও গতি যেমন পরিবর্তনশীল ঠিক তেমনি পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল। তবে সমাজের এ পরিবর্তন প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক কারণে হয়ে থাকে। পুঁজিবাদ বিকাশের জন্য মূলত দুটি কারণ দায়ী, প্রথমটি হল অর্থনৈতিক এবং দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। ব্যক্তি মালিকানায় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে মানুষের ভোগের প্রবণতা বেড়ে যায়। ফলে পুঁজিবাদের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপনিবেশ সৃষ্টি। নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ঋণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি পুঁজিবাদ বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ইউরোপ ও এশিয়ার দেশসমূহে পুঁজিবাদ বিকাশের প্রকৃতি ও পদ্ধতি ভিন্ন হলেও এ দুটি মহাদেশের বেশ কিছু দেশে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার পিছনে মুখ্য ও সাধারণ কারণসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ -

> পুঁজিবাদ বিকাশের জন্য মূলত দুটি কারণ দায়ী, প্রথমটি হল অর্থনৈতিক এবং দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক।

(ক) <u>**কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক পরিবর্তন**</u> ঃ সামন্ততন্ত্রের শেষ দিকে সামন্তপ্রভুগণ এতটা বিলাসপ্রিয় হয়ে পড়েন যে, তাদের বিলাস সামগ্রী ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য বণিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ফলে কৃষি নির্ভর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। বণিক শ্রেণী অধিকতর শক্তিশালী হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে সামন্তপ্রভুদের আধিপত্য লোপ পায় ও বণিক শ্রেণী একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে।

(খ) <u>**বণিকদের গিল্ড ব্যবস্থা**</u> ঃ সামন্তবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে বণিক ও কুটির শিল্পীদের যেসব সংঘ গড়ে উঠে এগুলোকেই সিল্ড বলা হয়। ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম গিল্ডের আবির্ভাব ঘটে। গিল্ডভূক্ত বণিকদের শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। এক একটি কুটির শিল্পকে কেন্দ্র করে এক একটা গিল্ড গড়ে উঠত, যেমন তাঁতী, কর্মকার, সুত্রধরের সংঘ ইত্যাদি। এ গিল্ড ব্যবস্থার ফলে বণিকশ্রেণীর কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে বণিকশ্রেণী সমাজে পুঁজিবাদকে সুদৃঢ় স্থায়ী রূপ দেয়।

> এ গিল্ড ব্যবস্থার ফলে বণিকশ্রেণীর কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে বণিকশ্রেণী সমাজে পুঁজিবাদকে সুদৃঢ় স্থায়ী রূপ

(গ) <u>**বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব**</u> ঃ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রায় সকল ধন-সম্পদ একশ্রেণীর লোকের হাতে চলে যায়। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা সহ সমাজের সকল স্থানে তাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। ক্রমান্বয়ে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে। এভাবে সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে এবং এদের দ্বারা পুঁজিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঘ) <u>**আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উপনিবেশনীতি**</u> ঃ ইউরোপীয় দেশসমূহে ঐসব দেশের বণিকরা প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে কমখরচে কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন দেশে

www.swapno.in

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ সামাজিক প্রয়োজনের দিকে তেমন একটা লক্ষ্য না রেখে বাজারের জন্য উৎপাদন কর হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তি মালিকানায় থাকে এবং ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

যেত এবং এ কাঁচামাল থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও বিদেশে রপ্তানী করত। এভাবে তারা এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। কালক্রমে ইউরোপের একদল পুঁজিপতির হাতে বিশ্বের সকল পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয়।

(ঙ) **শিল্প বিপ্লব ও যোগাযোগ ব্যবস্থা** ঃ শিল্প বিপ্লবের ফলে কলকারখানায় যেমন ব্যাপক প্রসার ঘটে ঠিক তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বিদেশের কাঁচামাল আমদানী করে শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করে অধিক মুনাফার জন্য রপ্তানী শুরু হয়। এভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আমদানী ও রপ্তানীর মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিস্তার ঘটে।

(চ) **আদর্শগত কারণঃ** মার্টিন লুথার প্রবর্তিত প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে পুঁজিবাদ অনেকটা ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃতিলাভ করে। মার্টিন লুথারের মতে পোপকে ছাড়াও গীর্জা চলতে পারে এবং পোপের নিকট টাকা পাঠানোর কোন প্রয়োজন নেই। লুথারের মত জনগণের সমর্থন পায়। অন্যদিকে, জনগণ এ আর্দশের অনুসারী হয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ চার্চকে না দিয়ে সঞ্চয় করা শুরু করল এবং ধীরে ধীরে সে পুঁজিপতি হয়ে উঠল। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এ ধারণার একজন প্রধান প্রবক্তা।

(ছ) **কাগজের টাকা প্রচলন** ঃ মধ্যযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কাগজের নোট আবিষ্কার ও প্রচলনের ফলে ব্যবসা-বণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয় এবং এর সাথে সাথে ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠার ফলে পুঁজিবাদ বিকাশে কাগজের নোট অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং এখনও করছে।

পুঁজিবাদ বিকাশের উপরোক্ত কারণগুলো মূলত ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশে অনন্য ভূমিকা রেখেছিল, তবে এর কোন কোনটি ভারতবর্ষেও পুঁজিবাদ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে মূলত ভারত উপমহাদেশের বিদেশী বণিক গোষ্ঠীর আগমনের ফলে পুঁজিবাদ বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অনেক আগেই মোগল শাসনামলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ভারতে বৃটিশ পূর্ব কালে প্রচুর পুঁজি সঞ্চিত হলেও পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেনি। এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ঐ সময়কার দেশীয় বণিকগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য বঞ্চিত চিল। বরং তারা নানা অনুবিধার সম্মুখীন হত। আর তার সুযোগ পুরোপুরি ব্যবহার করে বিদেশী বণিক গোষ্ঠী।

মধ্যযুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কাগজের নোট আবিষ্কার ও প্রচলনের ফলে ব্যবসা-বণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয় এবং এর সাথে সাথে ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠার ফলে পুঁজিবাদ বিকাশে কাগজের নোট অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং এখনও করছে।

পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পুঁজিবাদের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিকাশের কারণসমূহ জেনে গেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ পুঁজিবাদের ধারণা ও ক্রমবিকাশের কারণ সমূহের মধ্যেই খুঁজে পাবেন। তবু জানার সুবিধার্থে পুঁজিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করছি।

(ক) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ সামাজিক প্রয়োজনের দিকে তেমন একটা লক্ষ্য না রেখে বাজারের জন্য উৎপাদন কর হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তি মালিকানায় থাকে এবং ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গোষ্ঠী হলেও তারা কিন্তু শোষিত শ্রেণী। পুঁজিপতিরা দর কষাকষির মাধ্যমে তাদের শ্রম ক্রয় করে বা

www.swapno.in

ভাড়া করে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখে। এ ব্যবস্থায় শ্রমিকরা সামন্তবাদের ভূমিদাসদের মত পরাধীন নয় সত্য কিন্তু অত্যন্ত অবহেলিত এবং উৎপাদনের মুনাফা থেকে বঞ্চিত।

(গ) সমাজ বিকাশের ধারায় পুঁজিবাদ একটি সমাজ দর্শনের জন্ম দেয়। গণতন্ত্র, মুক্তচিন্তা, প্রতিযোগিতা,আইনের শাসন, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, অবাধ বণিজ্য ইত্যাদি ধারণা এ দর্শনের মূল ভিত্তি।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং বড় বড় পুঁজিপতিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গোষ্ঠী হলেও তারা কিন্তু শোষিত শ্রেণী।

(ঘ) পুঁজির ক্রমবিকাশের ফলে উৎপাদন যন্ত্রে বিপ্লব ঘটে। উৎপাদন যন্ত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করা হয়। আর গুটি কতক লোক সেই উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হয়। তারা কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহার করে এবং যন্ত্র চালনার জন্য দক্ষ শ্রমিক প্রকৃত ফলে সঠিক উৎপাদনের কিয়দংশের মূল্য শ্রমিককে মজুরী হিসেবে দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ মুনাফা (উদ্বৃত্ত মূল্য) হিসাবে নিজেরা আত্মসাৎ করে।

সমাজ বিকাশের ধারায় পুঁজিবাদ একটি সমাজ দর্শনের জন্ম দেয়। গণতন্ত্র, মুক্তচিন্তা, প্রতিযোগিতা,আইনের শাসন, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, অবাধ বণিজ্য ইত্যাদি ধারণা এ

(ঙ) পুঁজিবাদীর দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি পবিত্র আমানত এবং সমাজ সর্বদাই শ্রেণী বিভক্ত। প্রাকৃতিক জগতে যেমন বৈচিত্র্য বিদ্যমান ঠিক তেমনি মানব সমাজেও শ্রেণী বৈষম্য থাকবে। সম্পদ ও ঐশ্বর্যে কতিপয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। আর এটিই পুঁজিবাদের প্রধান আদর্শ।

পুঁজিবাদীর দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি পবিত্র আমানত এবং সমাজ সর্বদাই শ্রেণী বিভক্ত। প্রাকৃতিক জগতে যেমন বৈচিত্র্য বিদ্যমান ঠিক তেমনি মানব সমাজেও শ্রেণী বৈষম্য থাকবে। সম্পদ ও ঐশ্বর্যে কতিপয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। আর এটিই পুঁজিবাদের প্রধান আদর্শ।

(চ) পুঁজিবাদী সমাজ প্রধানত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত; যেমন- পুঁজিপতি, উঠতি পুঁজিপতি, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী ইত্যাদি। শ্রমিকরাও দু'টো ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যেমন- দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক। এভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে শ্রেণীস্বার্থ তীব্র হয়ে উঠে এবং সামাজিক স্তর বিন্যাসে শ্রেণী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(ছ) পুঁজিপতিদের শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এক্ষেত্রে গড়ে উঠে। সম্পদের বা পণ্যের উৎপাদন, বন্টন, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পুঁজিপরিত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে পুঁজিপতিরা দয়াদাক্ষিণ্য হিসেবে কিছু অর্থ সমাজের কল্যাণে মাঝে মাঝে ব্যয় করে। রাষ্ট্র পুঁজিপতিদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রশাসনিক সাহায্য প্রদান করে। আবার রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে তা সমাজের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে।

জ) পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং বড় বড় পুঁজিপতিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

(ঝ) পুঁজিবাদে রয়েছে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ। ফলে সামাজিক শ্রেণী সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকবে। পুঁজিবাদী দার্শনিকদের মতে এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত একটি সমাজকে গতিশীল রাখে এবং এর ফলে সমাজে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

(ঞ) পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে উৎপাদনের পরিমান যেভাবে বাড়ে ঠিক অন্যদিকে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যও বাড়তে থাকে। ফলে কোন এক সময় বিপ্লব সংঘটিত হলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যেতে পারে।

www.swapno.in

পুঁজিবাদের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি যে পুঁজিবাদ সমাজের নিম্ন বা শ্রমিক শ্রেণীকে স্বাধীনতা দিয়েছে, কোনমতে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, কিন্তু সাধারণ জনগণের তথা শ্রমিক শ্রেণী অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি দিতে পারেনি।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় : ৫ মিনিট**

পুঁজিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের পাঁচটি কারণ লিখুন ঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলনী ২(Activity 2) ঃ **সময় : ৫ মিনিট**

পুঁজিবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন ঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.

সারাংশ

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা মূলত ব্যক্তিগত সম্পত্তি গড়ে তোলার অধিকার ও অবাধ মুনাফা লাভের প্রত্যাশা থেকে উৎপত্তি হয়েছে। মধ্যযুগের শেষার্ধে যান্ত্রিক উন্নতির ফলে কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা পায়। সামন্ত কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন, বাণিজ্য ও শিল্প গিল্ড ব্যবস্থার বিপর্যয়, বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উপনিবেশবাদ, শিল্প বিপ্লব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতিসাধন ইত্যাদির কারণে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ সামাজিক প্রয়োজনের দিকে তেমন একটা লক্ষ্য রাখা হয় না, শুধু বাজারের জন্য উৎপাদন করা হয়। এ ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণী ককটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গোষ্ঠী তবে তারা শোষিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী এর ফলে সামাজিক শ্রেণী, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বেড়ে যায় এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। পুঁজিবাদের উৎপত্তির মূল কারণ কি?

ক) ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অবাধ মুনাফা লাভের নিরংকুশ অধিকার
খ) শিল্পের প্রসার
গ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি
ঘ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

২। গিল্ড ব্যবআর ধ্বংসের ফলে বণিক শ্রেণীর দ্বারা কি প্রতিষ্ঠিত হয়?

www.swapno.in

ক) ব্যবসা-বাণিজ্য খ) কোম্পানী
গ) বাজার ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠান

৩। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক সামাজিক গোষ্ঠী কিন্তু শোষিত শ্রেণী?
ক) শাসক খ) পুঁজিপতি শ্রেণী
গ) শ্রমিক ঘ) ক্রীতদাস

৪। পশ্চিম ইউরোপ পুঁজিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশের ফলে কোন্ ধর্মীয় মতবাদ রয়েছে।
ক) প্রোটেস্ট্যান্ট খ) ক্যাথলিক
গ) ইসলাম ঘ) বৌদ্ধ

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজতন্ত্র

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

১. সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
৩. সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ জানতে পারবেন।
৪. সমাজতন্ত্রের প্রকারভেদ যেমন, কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, খ্রিষ্টীয় সমাজতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, আধুনিক সাম্যবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৫. সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেমন- রাজনৈতিক সাম্য, শ্রেণী সংগ্রাম, সামাজিক মালিকানা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

সমাজতন্ত্র : সংজ্ঞা ও ধারণা

কয়েক হাজার আগে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করার শুরু থেকে কয়েকটি সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশ্বের বেশীরভাগ দেশে পুঁজিবাদ ও গুটি কয়েক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগোষ্ঠীর ভেতর বিচিত্র ধরনের সমাজব্যবস্থা চালু রয়েছে। আপনারা জানেন যে, প্রায় সকল সমাজব্যবস্থাই এক একটি অর্থনৈতিক কাঠামো অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিকভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে চরম প্রতিক্রিয়া হিসেবে উদ্ভব হয়। সমাজতন্ত্র একটি জনপ্রিয় আধুনিক মতবাদ। এটি যেমন রাজনৈতিক তত্ত্ব ও বিপ্লব হিসেবে পরিচিত তেমনি অন্যদিকে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রাষ্ট্রের ব্যাপক কার্য পরিধির সমর্থনে এ মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফরাসী সমাজ দার্শনিক ফোর্ট সাইমন বৃটেনের ওয়েব দম্পতি ও জার্মানীর মার্কস ও এঙ্গেলস।

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা ঃ

> সমাজতন্ত্র বলতে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে উৎপাদানের উপাদানগুলোর উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত

সমাজতন্ত্র বলতে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে উৎপাদানের উপাদানগুলোর উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে " সমাজতন্ত্র হল ভূমি ও পুঁজির সমমালিকানার একটি ব্যবস্থা। নাট্যকার বার্নাড'স এর মতে "সমাজতন্ত্রের অর্থ আয়ের সাম্য ছাড়া কিছুই নয়। হানফ্রের মতে " সমাজতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে জীবন যাত্রার প্রধান মাধ্যম গুলোর মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র"। কার্ল মার্কসের মতে উৎপাদিত বস্তুর সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নির্ভর সমাজ সংগঠনের এক বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনই হচ্ছে সমাজতন্ত্র। তাহলে আমরা বলতে পারি যে সমাজতন্ত্র উৎপাদনের যৌথ পরিচালনা ও প্রয়োজন ভিত্তিক বন্টনের নীতিতে বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সামাজিক মালিকানার অধীনে এনে সম্পদের সুষম বন্টনের দ্বারা শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা।

সমাজতন্ত্র ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঃ

www.swapno.in

এ পাঠের শুরুতেই আপনারা জেনেছেন যে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করার পর থেকে আজ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সমাজ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। আর প্রত্যেকটি সমাজ ব্যবস্থাই এক একটি অর্থনৈতিক কাঠামোকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। মানুষ আদিকালে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। তখন মানুষ দলবদ্ধভাবে থাকত এবং শিকার বা খাদ্যের সন্ধানে সবাই একসাথে যেত এবং প্রাপ্ত খাদ্য একসঙ্গে ভাগ করে খেত। মানুষের এ অবস্থাকে আদিম সাম্যবাদ বলে। মানুষের এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। নানা রকম হাতিয়ার ও উৎপাদন যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রচলন হল। ফলে মানুষের মনে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ জন্ম নিল। ব্যক্তিগত অধিকারে এসে গেল উৎপাদন যন্ত্র। সম্পত্তিতে প্রতিষ্ঠা হল ব্যক্তি মালিকানা। এমন করে আদিম সাম্যবাদের যুগ শেষ হয়ে গেল। পরবর্তী সমাজের মানুষে মধ্যে স্তর বিন্যাস দেখা দিল এবং মূলত দুটি প্রধান শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। সম্পত্তি, অর্থ ও ঐশ্বর্য নিয়ে একটি শ্রেণী গড়ে উঠল। আর আরেক দল লোকের সম্পত্তি থাকল না, কিন্তু বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হিসাবে রইল তাদের শারীরিক শ্রমশক্তি। প্রথমোক্ত শ্রেণীটি তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ নিয়ন্ত্রণ করত এবং ভূমিহীন বা বিত্তহীনদেরকে নিজেদের ইচ্ছামত খাটাত। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রমজীবী মানুষের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না। এমনকি শ্রমজীবী মানুষকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার জন্য হাটে বাজারে কেনাবেচা চলত। এটি "দাস সমাজ" হিসেবে পরিচিত ছিল। এ অবস্থার অবসান ঘটে সৃষ্টি হল 'সামন্ত সমাজ'। সামন্ত সমাজে জমির মালিক বা জমিদারগণ কৃষকের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর ভাগ বসাত এবং নিজেদের ইচ্ছামত এদের খাটাত। তবে তখন স্বাধীন কৃষকদের কিছুটা ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু এ অবস্থাও বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এরপর পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব হল। পুঁজিবাদী সমাজেও শ্রমিকরা যে সব পণ্য উৎপাদন করত তা থেকে তাদের ন্যায্য পাওনা লাভ করা কঠিন হয়ে পড়ল। এভাবে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ দাসযুগ তেকে পুঁজিবাদী পর্যায় পর্যন্ত একদল মুষ্টিমেয় লোক অবশিষ্ট ব্যাপক সংখ্যক জনগণকে শোষণ করে অব্যাহত থাকল। একের পর এক শ্রেণী সমাজের সৃষ্টি হল। শ্রেণী সমাজের দাস মালিক জমিদার পুঁজিপতিরা বিলাস বহুল জীবন কাটায় আর সত্যিকার সম্পদ সৃষ্টিকারীরা হয় শোষিত ও অবহেলিত। ফলে শ্রমিক শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মনে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তা সৃষ্টি হয় এবং তারা ক্রমে আদি সমাজতন্ত্র থেকে আধুনিক সাম্যবাদে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালান। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ধ্বংস করে শ্রেণী হীন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেলিন অগ্রগণ্য।

কার্ল মার্কসের মতে উৎপাদিত

> সমাজতন্ত্রের ধারণা মূলত প্রাচীন সাম্যবাদ হতেই এসেছে। কিন্তু এ শব্দটির তাৎপর্য স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন কার্ল মার্কস। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল শ্রেণী শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

১৮৪৪ সালে কার্ল মার্কস তার সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস্ কমিউনিস্ট ইশাহারে সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা ও আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরেন। রাশিয়ার শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণীর নেতা লেলিন ১৮৮৯ সালে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি এবং ১৯০২ সালে লেলিন ও তার অনুসারীরা বিপ্লব করার জন্য ঐক্যমতে পৌছেন। ১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবর রাতে লেলিনের নেতৃত্বে শ্রমিক, সৈনিক, নাবিকরাও বিপ্লব ঘটিয়ে জার সম্রাটের প্রাসাদ দখল করেন। তার ঠিক তিন ঘন্টা পরে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধির সমগ্র রাশিয়ায় সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে পৃথিবীতে প্রথম শোষিত সাধারণ মানুষের হাতে আসে রাষ্ট্র ক্ষমতা। তারপর পূর্ব ইউরোপ, চীন, ভিয়েতনাম ও ল্যাটিন আমেরিকার কিউবায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়।

> ১৮৪৪ সালে কার্ল মার্কস তার সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস্ কমিউনিস্ট ইশাহারে সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা ও আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা তুলে

সমাজ তন্ত্রের প্রকারভেদ

সমাজতন্ত্রের ধারণা মূলত প্রাচীন সাম্যবাদ হতেই এসেছে। কিন্তু এ শব্দটির তাৎপর্য স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন কার্ল মার্কস। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল শ্রেণী

www.swapno.in

শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের রচিত সাম্যবাদী ইস্তাহারে বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যেসব বিভিন্ন সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠা করার কথা সমাজ দার্শনিকরা ভেবেছেন। তাঁরা এসবের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে আধুনিক সাম্যবাদী ব্যবস্থায় পৌঁছার রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের রচিত সাম্যবাদী ইস্তাহারে (১৮৪৮) সমাজতন্ত্রের মতবাদকে প্রথমে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র, রক্ষণশীল অথবা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র এবং সমালোচনামূলক -- সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ। এরপর তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রকে সামন্তবাদী সমাজতন্ত্র খৃস্টীয় বা পাত্রীদের সমাজতন্ত্র জার্মান অথবা 'প্রকৃত' সমাজতন্ত্র () এই চারভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁরা সমাজতন্ত্রের দ্বিতয়ি ধারণা আর বিভক্ত করেননি। তবে তৃতীয় মতবাদ ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের ধারণাকে তারা দুটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁদের মতে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের স্তর অবিকলিত তথা অনুন্নত, যার প্রধান প্রবক্ত হচ্ছেন সেন্ট সাইমন, ফুরিয়ের, ওয়েন প্রমুখ। আর সাম্যবাদী স্তরটিই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের সর্বশেষ তথা চূড়ান্ত পর্যায়, যেখানে সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করে। সে যা হোক আট রকম সমাজতন্ত্রকে সনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হল ঃ

(ক) কাল্পনিক সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism)

(খ) ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র (Fabian Socialism)

(গ) খ্রিষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (ChristianSocialism)

(ঘ) সংঘমূলক সমাজতন্ত্র (Syndi Socialism)

(ঙ) গিল্ড ভিত্তিক সমাজতন্ত্র (Guild Socialism)

(চ) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (State Socialism)

(ছ) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scentific Socialism)

(জ) আধুনিক সাম্যবাদ (Modern Commuinism)

ক) **কাল্পনিক সমাজতন্ত্র** ঃ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা হলেন টমাস মুর। তার সমসাময়িক কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের অন্যান্য প্রবক্তাগণ হচ্ছে সেন্ট সাইমন ফুরিয়ার এবং ওয়েন তাঁরা পুঁজিবাদকে ইতিহাসের সবচেয়ে বৈষম্যমূলক সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিকল্প শোষণ ও সামাজিক বিরোধ মুক্ত এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ তুলে ধরেন।

> কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন টমাস মুর। ফরাসী দার্শনিক ফেল্ড সাইমনকেও কার্স মার্কস একজন আদি সমাজতন্ত্রী বলে গণ্য করেছেন।

খ) **ফেরিয়ান সমাজতন্ত্র** ঃ ইংল্যান্ডের ফেরিয়ান সোসাইটি বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা একটি আদর্শ সমাজ গঠনের কথা বলেন। ফেরিয়ান সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ওয়েব দম্পত্তি নাট্যকার জর্জ বার্ণাডশও সমাজবিজ্ঞানী গ্রাহাম ওয়ালস। তাঁদের মতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নাই, বরং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অসারতা জনগণকে বুঝিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফেরিয়ান সমাজতন্ত্রের অপর নাম নাগরিক সমাজতন্ত্র।

গ) **খ্রিষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র** ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে যখন পুঁজিবাদ চরমভাবে সমাজের অধিকাংশ মানুষকে শোষণ করতে শুরু করল, তখন কতিপয় খ্রিষ্ট্রীয় ধর্মযাজক যীশু খ্রিষ্ট্রের সাম্য ও ন্যায়

www.swapno.in

বিচার প্রতিষ্ঠার অমরবাণী অনুসরণে যে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাকেই "খ্রিষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এটি মূলত ইংলন্ডে দেখা দেয়।

ঘ) **সংঘমূলক সমাজতন্ত্র** ঃ শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে শ্রমিকদের হাতে ন্যস্ত করা এবং উৎপাদন পদ্ধতিকে শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল সংঘমূলক সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। এটি মূলত ফ্রান্সে দেখা যায়।

ঙ) **গিল্ড ভিত্তিক সমাজতন্ত্র** ঃ প্রতিটি পেশা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে গিল্ড গঠন করা এবং গিল্ড কর্তৃক সমাজের সকল উৎপাদন ও ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই ছিল সমিতি ভিত্তিক সমাজতন্ত্রের মূলনীতি। এটি মূলত ইংলন্ডের সমাজতন্ত্রের এক বিশেষ রূপ। ফ্রান্সে যাকে Syndicalism বলে তাকেই ইংল্যান্ডে Guild Socialism বলে।

চ) **রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র** ঃ জনগণের কল্যাণার্থে দেশের বৃহৎ শিল্প ব্যাংক, বীমা, পরিবহন ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্ত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ঔপনিবেশমুক্ত নব্য স্বাধীন দেশসমূহের দেখা যায়।

ছ) **বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র** ঃ বাস্তব ঐতিহাসিক অবস্থা আনুযায়ী বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের শাসন উচ্ছেদ করে সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে তার স্থলে একপ্রকার সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্যাপক ভিত্তিকে মেহনতি জনতার সমর্থনে ক্রমান্বয়ে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলাই মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মূল বক্তব্য।

জ) **আধুনিক সাম্যবাদ** ঃ সমাজতান্ত্রিক পর্যায় পার হয়ে মানব সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে নীতি হবে প্রত্যেকে দক্ষতা অনুযায়ী শ্রম দিবে, আর চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্য পাবে।" মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে সমাজতন্ত্র হচ্ছে আধুনিক সাম্যবাদে পৌছার প্রথম পর্যায় যেখানে "প্রত্যেকে দক্ষতা অনুযায়ী শ্রম দিবে, আর কাজের পরিমাণ অনুযায়ী প্রাপ্য পাবে।" উল্লেখ, পৃথিবীতে কয়েকটি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ও এসব দেশে আধুনিক সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটেনি। নব্বই এর দশকে সমাজতন্ত্র বিপর্যস্ত হওয়ায় সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে এখন প্রকৃতপক্ষে পাশ্চত্যের উপর নির্ভরশীল এক ধরনের পুঁজিবাদ কায়েম হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) **অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা** ঃ সমাজতান্ত্রিকরা মনে করেন সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক সাম্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা পায় এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগের বেলায় সবাই সমান সুযোগ লাভ করে।

খ) **দ্বান্দ্বিক বৈষ্যের অবসান** ঃ আদিম সাম্যবাদের পরবর্তী সকল সমাজেই মানুষ আর্থসামাজিক কারণে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সুতরাং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন তার শ্রেণীসংগ্রাম যার ফলে শ্রেণী হীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অর্থাৎ বুর্জোয়ারা শক্তিহীন হয়ে পড়বে, আর শক্তিবৃদ্ধি পাবে। আর সর্বহারা এভাবে কালক্রমে দ্বান্দ্বিক শ্রেণী সংগ্রামের অবসান ঘটবে।

www.swapno.in

গ) **সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা** ঃ সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সর্বহারা শ্রেণী দ্বারাই আধুনিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঘ) **সামাজিক মালিকানার উদ্ভব** ঃ সমাজতন্ত্র ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের লাগামহীন প্রতিযোগিতার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এরফলে সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ঙ) **সমান সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থা** ঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক মানুষকে বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সম অধিকার দেওয়া হয়। ফলে সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ই উপকৃত হয়।

চ) **সামজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা** ঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটে, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিকরা মনে করেন ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ছ) **আমূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন** ঃ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ববর্তী পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার আমূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব। কারণ উৎপাদনের উপায়গুলোর ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণীশোষণের পথ চিরতরে বন্ধ হয়।

জ) **সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সশস্ত্র বিপ্লব না সংস্কার** ঃ সাধারণভাবে মনে করা হয় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে কোন কোন সমাজতন্ত্রী মনে করেন যে বিশেষ পরিস্থিতিতে সংস্কারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব।

ঝ) **পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রণয়ন** ঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বুর্জোয়া অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব।

ঞ) **সমাজতন্ত্রের মূলনীতি** ঃ এখানে সমাজের প্রত্যেক সদস্য স্বস্ব দক্ষতা অনুযায়ী শ্রম প্রদান করবে, আর কাজের পরিমাণ অনুযায়ী প্রাপ্য পাবে। সমাজতন্ত্র হচ্ছে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে আধুনিক সাম্যবাদে পৌঁছার প্রথম পর্যায়।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে সব ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকল নাগরিকের সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতি নির্ভর করে শুধুমাত্র সামাজিক উৎপাদনের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ এবং উৎপাদিত পন্যের পরিমাণ ও তার গুণগত মান বৃদ্ধির উপর।

> সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে সব ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকল নাগরিকের সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্র[তিষ্ঠা] করা।

অনুশীলনী ঃ ১ (Activity - 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সমাজতন্ত্রের দশটি বৈশিষ্ট্য লিখুন

১.

www.swapno.in

২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

সারাংশ

সমাজতন্ত্র বলতে এমন একটি পরিপূর্ণ সমাজব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে উৎপাদনের উপাদানগুলোর উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্র মূলত শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। এ পর্যন্ত আট প্রকারের সমাজতান্ত্রি সমাজের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলো হল ঃ কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, ফেরিয়ান সমাজতন্ত্র, খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্র, সংঘমূলক সমাজতন্ত্র, গিল্ড ভিত্তিক সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও আধুনিক সাম্যবাদ। সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্য, দ্বান্দ্বিক শ্রেণী বৈষম্যের অবসান সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা, এবং সম্পত্তিতে সমসামাজিক মালিকানার উদ্ভব ইত্যাদি। তবে সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সকল নাগরিকের সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কত সালে কার্ল মার্কস তাঁর সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন।
- ক) ১৮৪৪ — খ) ১৮৪৫
- গ) ১৮৪৬ — ঘ) ১৮৪৭

২। এ যাবৎ পর্যন্ত কত প্রকারের সমাজতান্ত্রিক সমাজের সন্ধান পাওয়া গিয়েে?
- ক) সাত — খ) আট
- গ) নয় — ঘ) দশ

৩। কোন সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকে দক্ষতা অনুযায়ী শ্রম দিবে ও চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্য পাবে।
- ক) বৈজ্ঞানিক — খ) পুঁজিবাদ
- গ) আধুনিক সাম্যবাদ — ঘ) সামন্তবাদ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজের ক্রমবিকাশের মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ধারণা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. সাম্যবাদ কি? আদিম সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
৩. দাস প্রথার সংজ্ঞা দিন। দাস প্রথার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
৪. সামন্তবাদ কি? সামন্তবাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন।
৫. সামন্তবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
৬. পুঁজিবাদের সংজ্ঞা দিন। পুঁজিবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করুন।
৭. পুঁজিবাদ কি? পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
৮. পুঁজিবাদ কি? পুঁজিবাদ বিকাশের কারণ সমূহ লিখুন?
৯. সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন? সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করুন।
১০. বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
১১. সমাজতন্ত্রে বৈশিষ্ট্য সমূহ লিখুন।

উত্তরমালা ঃ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১ ঃ	১. খ	২. ক	৩. গ	৪. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২ ঃ	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. গ	৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩ ঃ	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৪ ঃ	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫ ঃ	১. ক	২. খ	৩. গ		

www.swapno.in

www.swapno.in

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ(Social Control)

ইউনিট ১৩

ভূমিকা ঃ

সমাজের প্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে ক্রিয়াশীল রাখার থাকার নিমিত্তে মানুষ বিভিন্ন ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করে; কারণ মানুষ উন্নতির জন্যই যতই পরিশ্রম করুক না কেন সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি ব্যতীত সার্বিক কল্যাণ আসতে পারে না। তাই ব্যক্তির অস্বাভাবিক, অসংযত আচরণ ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রথা, নিয়ম-কানুন, শিক্ষা, আইন, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে পরিচালিত করে। সমাজ কর্তৃক মানুষের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধই হচ্ছে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। সমাজে যদি এরূপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকত তাহলে মানুষ নিজের ইচ্ছামত আচরণ করত এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এই ইউনিটটি পাঠ করলে আপনি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা, ধারণা, উদ্দেশ্য গুরুত্ব, কৌশল, প্রকারভেদ এবং গুরুত্বপূর্ণ বাহন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

www.swapno.in

সংজ্ঞা ও ধারণা

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
২. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে পারবেন।
৩. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও এর উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৪. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কৌশল ও তার প্রকারভেদ জানতে পারবেন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা

(The Concept of Social Control)

সমাজের অগ্রগতির পথকে যদি নিশ্চিত করতে হয় তা হলে উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি সামাজিক সংহিত এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা অপরিহার্য। সমাজবদ্ধ মানুষ অগ্রগতির জন্য যত পরিশ্রমই করুক না কেন সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলাবোধ ছাড়া সার্বিক কল্যাণ আসতে পারে না। সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করতে হলে সবাইকে কতিপয় সাধারণ নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়। ব্যক্তি স্বার্থ যেন গোষ্ঠীস্বার্থকে ক্ষুণ্ন না করে। এ কারণে ব্যক্তির অসংযত আচরণ এবং কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

একজন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে গোষ্ঠীর স্বার্থ-পরিপন্থী অসংযত আচরণ এবং কুপ্রবৃত্তি দমন করা তেমন সহজ নয়। সমাজকে তাই একটি নির্দিষ্ট উপায় উদ্ভাবন করতে হয় যা ব্যক্তির অসংযত আচরণ ও কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে কাঙ্ক্ষিত পথে সমাজবদ্ধ মানুষকে পরিচালিত করতে পারে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা

যে পন্থা-পদ্ধতি সমাজের সদস্যদের অসংযত ও সমাজবিরোধী আচরণ এবং কুপ্রবৃত্তি দমন করতে এবং সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলে সমাজকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে তার নাম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

অতএব, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায় সমাজবদ্ধ মানুষের আচর-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সে আচরণকে সমাজের আকাঙ্ক্ষিত ধারায় পরিচালিত করা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষকে সুশৃঙ্খল ও সংহত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

MacIver এবং Page তাঁদের **Society** নামক গ্রন্থে বলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন একটি পন্থা যার মাধ্যমে গোটা সামাজিক ব্যবস্থা সুসংহত থকে ও নিজেই পরিচালিত হয় ("The way in which the entire social order coheres and maintains itself")। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায় এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজ বিপথগামীদের শাস্তি প্রদান করে এবং সামাজিক মূল্যবোধ অনুযায়ী আচরণকে সংশোধিত করে।

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞানী মেটা স্পেনসার (Metta Spencer) তার **Foundations of Modern Sociology** গ্রন্থে বলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের মানুষ তার সদস্যদের কাঙ্ক্ষিত আচরণকে সমর্থন করে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণকে নিরুৎসাহিত করে ("Social control is the process by which members of a group support desired forms of behaviour and discourage undesired forms"). সহজ কথায় বলা যায়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায় বিপথগামীদের (deviant) প্রতি সমাজের প্রতিক্রিয়া, যার উদ্দেশ্য বিপথগামীদের শাস্তি দেওয়া কিংবা তার চরিত্রকে সমাজ স্বীকৃত পন্থায় সংশোধন করে নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করা।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কতিপয় নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা ঃ

১. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সামাজিক সংহতিকে জোরদার করা।

২. মানুষের অসংযত আচরণ ও কুপ্রবৃত্তি দমন এবং মানব আচরণকে সমাজ স্বীকৃত ধারায় প্রবাহিত করা। এর অন্যতম লক্ষ্য সমাজের প্রথা, অনুশাসন এবং মূল্যবোধ অনুযায়ী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

৩. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আরেকটি লক্ষ্য হচ্ছে সার্বিকভাবে সামাজিক স্বার্থ বা গোষ্ঠী স্বার্থকে বড় করে দেখা এবং সে কারণে ব্যক্তির হীন স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অবক্ষয় থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

৪. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একটি কর্তৃত্ব বা শাসনব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। অতএব, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য সমাজকে শাসন করা। এক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, প্রথা তথা সমাজ স্বীকৃত উপায় অনুসরণ করা হয় এবং এমন কতিপয় ব্যবস্থা গৃহীত হয় যেসব সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে।

৫. যেহেতু সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলা উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত, সেহেতু সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন তথা কল্যাণ।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও ইহার উৎপত্তি

(Importance of social control and its origin)

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সর্বপ্রথম যিনি বিস্তারিতভাবে গবেষণা করেন তিনি হচ্ছেন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী রস্ (E. A. Ross)। তিনি ১৯০১ সালে **Social Control** নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর থেকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। Ross বলেন যে, যদিও মানুষ একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারই তার ধর্ম তথাপি এসব গুণাবলী তার স্বীয় স্বার্থ অর্জনের প্রবৃত্তিকে বিধিবদ্ধ পন্থায় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। সে কারণেই স্বীয় স্বার্থ অর্জনে ঐ সব প্রবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সমাজকে কতক স্বীকৃত পন্থা-পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।

সমাজবিজ্ঞানী রস এমন কতিপয় পন্থা-পদ্ধতির নাম উল্লেখ করেন যেগুলো যুগ যুগ ধরে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি এ

www.swapno.in

প্রসঙ্গে জনমত, আইন, ধর্ম, পরিবার ব্যক্তিত্ব, উৎসব-অনুষ্ঠান, শিল্পকলা, শিক্ষা ও সচেতনতা এবং সামাজিক মূল্যায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আমরা এ সম্পর্কে পরবর্তী পাঠে আলোচনা করব।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কলা কৌশল ও তার প্রকারভেদ (Techniques and types of Social control)

আমরা এখানে এমন কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করব যারা প্রত্যেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কলা-কৌশল ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী হেইজ (F. C. Hayes) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ

১. **শাস্তি বা পুরস্কার** প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ; এবং
২. **পরামর্শ ও অনুকরণের** মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

অসংযত আচরণের জন্য শাস্তি প্রদান এবং ভাল আচরণের জন্য পুরস্কার প্রদান সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি স্বীকৃত ও কার্যকর পদ্ধতি। এছাড়া, তিনি মনে করেন যে, মানুষকে উপদেশ ও পরামর্শ দান করে অথবা সৎ ও নীতিবান লোককে অনুসরণ করার শিক্ষা দিয়েও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তবে তিনি বলেন যে, অপরাধের প্রতিকার বা শাস্তি বিধানের চেয়ে অপরাধের প্রতিরোধ ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি শিক্ষাকে সবচেয়ে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে উল্লেখ করেন এবং এ পর্যায়ে পরিবারের শিক্ষামূলক ভূমিকার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন।

লুমলী (F. E. Lumley) তাঁর **Means of Social Control** নামক গ্রন্থে প্রচলিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে দুটি প্রধান বর্গে বিভক্ত করেন। যথা ঃ

১. **দৈহিক বল** প্রয়োগের (Physical Force) ওপর নির্ভরশীল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
২. **সমাজের প্রতীকী কলাকৌশলের** (Symbolic devices) ওপর নির্ভরশীল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

তিনি বলেন যে যদিও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ অতীব জরুরী বিষয় বলে বিবেচিত তবু কেবল বলপ্রয়োগের দ্বারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। তাঁর মতে সমাজকে যদি কেবল শক্তিবলে নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত তাহলে সামাজিক শৃঙ্খলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। এ কারণেই মানব সমাজে সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রতীকী কলাকৌশল (Symbolic devices) উদ্ভাবনের প্রয়োজন। প্রতীকী করাকৌশলগুলো শক্তি প্রয়োগের তুলনায় বেশি মাত্রায় দ্রুত কার্যকর, সহজতর এবং খুবই কম ব্যয় সাপেক্ষ। লুমলীর মতত প্রতীকী করাকৌশলগুলো অনুসরণ না করলে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে।

প্রতীকী কলাকৌশলগুলোকে তিনি আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। **প্রথম** শ্রেণীর উদ্দেশ্য মানব আচরণকে একটি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পরিচালনা করা। যেমন, পুরস্কারে আশায়, প্রশংসা অর্জনের উদ্দেশ্যে, উপদেশবাণী শ্রবণে আত্মতৃপ্তি অর্জন করে এবং শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে ব্যক্তি বা দল তার চরিত্র সংশোধন করে নিতে পারে। **দ্বিতীয়** শ্রেণীর সামাজিক প্রতীকের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। যেমন - খোশ-গল্পের মাধ্যমে কারো চরিত্রের মন্দ

www.swapno.in

দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা, বিদ্রূপ করা, সমালোচনা করা, গালি দেওয়া, ব্যঙ্গমূলক হাসি-তামাসা, সাবধান বাণী উচ্চারণ করা, তিরস্কার করা, নিন্দামূলক প্রচার চালানো এবং শাস্তি। এসব কলাকৌশল প্রয়োগ করলে লোক-সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হবার ভয়ে ব্যক্তি বা কোন দল তাদের আচরণকে সংশোধন করে নিতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী রস Bernard তাঁর **Social Control** নামক গ্রন্থে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে পদ্ধতিগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ

১. **অবচেতন** (Unconscious) সমাজ নিয়ন্ত্রণ এবং
২. **সচেতন** (Conscious) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ।

সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য এবং রীতি-নীতি হচ্ছে অবচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল। কেননা, মানুষ সমাজে বসবাস করতে গিয়ে অচেতনভাবেই অভ্যসবশত সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য মেনে চলে এবং এভাবেই সে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। অপরপক্ষে, সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝায় সমাজপতিরা সামাজিক সংহতি এবং শৃংখলা বজায় রাখার জন্য পরিকল্পিত উপায় গ্রহণ করেন। আইন, শাসন প্রণালী ও শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে মানব চরিত্রকে সংশোধন করা কিংবা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

সমাজবিজ্ঞানী বার্নার্ড সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে অন্যভাবে দুটি প্রধান বর্গে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ

১. **নেতিবাচক** (Negative) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং
২. **ইতিবাচক** (Positive) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

পুলিশ বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, যেমন আদালত, শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস পায়। এ ধরণের প্রয়াসকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নেতিবাচক কলাকৌশল বলা যায়। কেননা, এখানে ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের ওপর নিয়ন্ত্রণ তথা দমনমূলক নীতি গৃহীত হয়। অপরপক্ষে, পুরস্কার প্রদান বা প্রশংসাসূচক উক্তিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ইতিবাচক কলাকৌশলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বার্নার্ডের মতে, নেতিবাচক কলাকৌশল চেয়ে ইতিবাচক কলাকৌশল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কেননা, ইতিবাচক পদ্ধতি গ্রহণ করলে ব্যক্তি সমাজে সৃজনশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং তার চারিত্রিক উন্নতি ঘটিয়ে সামাজিক সংহতি এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় তৎপর হয়। অধিকন্তু, শাস্তির হুমকি বা তিরস্কারের চেয়ে পুরস্কারের আশ্বাসের প্রতি মানুষ স্বাভাবিক উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দেয়। দমনমূলক নীতিকে মানুষ ঘৃণা করে অথচ ইতিবাচক কলাকৌশলকে মানুষ কষ্টকর হলেও সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশলকে আবার সমাজের অগ্রগতির পর্যায়ের প্রেক্ষিতে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১. **অনানুষ্ঠানিক** (Infromal) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ; এবং
২. **আনুষ্ঠানিক** (Formal) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

সামাজিক ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি-নীতি ইত্যাদিকে অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল বলে গণ্য করা হয়। পদ্ধতি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, আদিম এবং ঐতিহ্যবাহী সমাজগুলো সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে

www.swapno.in

অনানুষ্ঠানিক কলাকৌশলই বেশী প্রয়োগ করে। অপরপক্ষে, আধুনিক অগ্রসরমান যান্ত্রিক সভ্যতা ভিত্তিকে সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ আইন, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মাবলী, পুলিশ,আদালত ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক কলাকৌশল অধিকতর প্রচলিত ও কার্যকর।

যে সব ঠাট্টা, বিদ্রুপ বা সমালোচনা ব্যক্তিকে বিপথগামী হবার পথে বাধা প্রদান করে সেগুলোকেও অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কৌশল বলে আখ্যা দেওয়া যায়। সমাজবিজ্ঞানী ক্রসবি (Crosbie) তাঁর Interaction in Small Groups (1975) গ্রন্থে কয়েকটি অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নাম উল্লেখ করেন। যথা ঃ **পুরস্কার** (কারো কাজের জন্য বাহবা বা প্রশংসা করা); **শাস্তি** (সমালোচনা, বয়কট) এবং **অনুরোধ** (কারো অবহেলায় যদি কোন খেলার দলের মান হ্রাস পায় তাহলে তাকে তার মান বজায় রাখতে অনুরোধ করা)।

আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিধিবদ্ধ আইনও প্রতিষ্ঠানের কার্যকর হয়। এখানে পুলিশ, আদালত এবং এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ ব্যক্তির চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রেফতার, আদালতে বিচার, শাস্তি, সংশোধন বা মুক্তি এগুলো হলো আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া।

অনুশীলন ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনূর্ধ্ব ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন ঃ

অনুশীলন ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

"সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি হচ্ছে- অবচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি" - উক্তিটি অনূর্ধ্ব ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

অনুশীলন ৩ (Activity 3) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পাঁচটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করুন।

১.

২.

www.swapno.in

৩.

৪.

৫.

অনুশীলন ৪ (Activity 4) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পাঁচটি কলাকৌশলের নাম উল্লেখ করুন।

১.

২.

৩.

৪.

৫.

সারংশ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন একটি পন্থা যার মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষকে সুশৃঙ্খল ও সুসংহত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সামাজিক সংহতিকে শক্তিশালী করা। তাছাড়া এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল সমাজের প্রথা, অনুশাসন এবং মূল্যবোধ অনুযায়ী ব্যক্তি গোষ্ঠির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা। যেহেতু মানুষ স্বীয় স্বার্থ অর্জনের প্রবৃত্তিকে বিধিবদ্ধ পন্থায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সেহেতু সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের রয়েছে বিভিন্ন পদ্ধতি। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক উপায়ের মধ্যে পুরস্কার ও শাস্তি এবং পরামর্শ ও অনুকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেতিবাচক ও ইতিবাচক হতে পারে।

www.swapno.in

www.swapno.in

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য কি?
   ক) সামাজিক শৃঙ্খলা   খ) সামাজিক সংহতি
   গ) কুপ্রবৃত্তি দমন   ঘ) গোষ্ঠী আচরণ নিয়ন্ত্রণ

২। কোন্ সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে নেতিবাচক ও ইতিবাচক এই দুইভাবে বিভক্ত করেছেন?
   ক) হেইজ   খ) বার্ণার্ড
   গ) লুমলী   ঘ) মর্গান

৩। নিচের কোনটি দ্বারা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
   ক) আইন   খ) অভ্যাস
   গ) পুলিশ   ঘ) আইন ও বল প্রয়োগ

৪। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সর্ব প্রথম যে সমাজবিজ্ঞানী বিস্তারিতভাবে গবেষণা করেন তার নাম
   ক) প্লেটো (Plato)   খ) মার্কস (Marx)
   গ) রস (Ross)   ঘ) রাসেল (Russell)

৫। সামাজিক ঐতিহ্য, প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদিকে বলে
   ক) আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
   খ) অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
   গ) ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
   ঘ) সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

৬। সামাজিক প্রতীকের সাহায্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কথা কে বলেছেন ?
   ক) লুমলী (Lumley)
   খ) ম্যাকাইভার (MacIver)
   গ) রাসেল (Russell)
   ঘ) রস(Ross)

৭। বার্নার্ড (Bernard) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে কিভাবে বিভক্ত করেন ?
   ক) পুরস্কার ও শাস্তির মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
   খ) অবচেতন এবং সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
   গ) আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
   ঘ) নেতিবাচক ও ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

www.swapno.in

www.swapno.in

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বাহনসমূহ যেমন জনমত, প্রথা, লোকাচার, লোকরীতি, ধর্ম ও নৈতিকতা, আইন, শিক্ষা, গণমাধ্যমের ভূমিকা, রাষ্ট্র, পরিবার, উৎসব, শিল্পকলা, পৌরানিক কাহিনী ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
২. বাংলাদেশের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা জানতে পারবেন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অনেক বাহন রয়েছে। এ সব বাহনের মধ্যে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. **জনমত (Public opinion)** ঃ জনমত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম কার্যকর বাহন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রথম যিনি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন তিনি হচ্ছেন সমাজবিজ্ঞানী E. A. Ross। রস জনমতকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম শক্তিশালী বাহন হিসেবে উল্লেখ করেন। জনমতের ভয় কে না করে? ব্যক্তির ভাব-ভঙ্গি, চালফেরা, কাজকর্ম, তথা তার আচার-আচরণ সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের জানা থাকে। জনমত হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের একটি সাধারণ বিচারবোধ (Judgement)। ব্যক্তির কোন্ কাজটি ন্যায় সঙ্গত কোন্টি অন্যায়, কোন্টি মন্দ, কোন্টি ব্যক্তির স্বার্থে, কোন্টি হীনম্নতার, কোন্টি উদারতার, কোন্টি উত্তম, কোন্টি নিম্ন প্রকৃতির ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের মতামত যথাসময়ে ব্যক্ত হয়। ফলে, ব্যক্তি জনমতের ভয়ে ও লজ্জায় তার আচরণকে সংশোধন করে নেয় এবং তাকে সমাজ নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করে।

সমাজে সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় জনমতের ভূমিকা বেশ ব্যাপক।
প্রথমত, জনমত দ্বারা ব্যক্তি চরিত্র সংশোধিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
দ্বিতীয়ত, জনমত কোন সংঘ, গোষ্ঠী, এমন কি, রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে।
তৃতীয়ত, জনমত কোন প্রচার মাধ্যমকে যেমন রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কেননা, জনমত কর্তৃক সমালোচিত বা উপেক্ষিত হবে এমন অনুষ্ঠান বা সংঘবদ্ধ প্রচার থেকে ঐসব গণমাধ্যম বিরত থাকে।
চতুর্থত, জনমত সরকারকেও নিয়ন্ত্রিত করে। গণতান্ত্রিক দেশের সরকার জনমত বা গণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকে। অধিকন্তু, সরকার কখনও কোন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রাক্কালে জনতম যাচাই করে নেয়।
পঞ্চমত, জনমত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকেও নিয়ন্ত্রণ করে।
গ্রামীণ সমাজ নিয়ন্ত্রণে জনমতের ভূমিকা খুবই কার্যকর। কেননা, সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। সমাজে অতি নিন্দনীয় কাজ করলে সেখানে জনগণ তাকে বয়কট করতে পারে। বস্তুত, সামাজিক বয়কট এক বেদনাদায়ক শাস্তি। শহুরে সমাজে জনমতের গুরুত্ব অবশ্য কম নয়। তবে তা নির্ভর করে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং পরিস্থিতির ওপর।

www.swapno.in

২. **গণমাধ্যমের ভূমিকা (Role of mass media)** ঃ সমাজ নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা বেশ ফলপ্রসূ হতে পারে। গণমাধ্যম সমাজের গলদ, অন্ধবিশ্বাস, অনিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেতার, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, ছায়াছবি ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

৩. **রাষ্ট্র (State) :** Hobbes-এর তত্ত্বানুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তিই হয়েছে একটি বিশৃঙ্খল ও দ্বন্দ্ব সংঘাতময় সমাজে শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। রাষ্ট্রের ওপরই সমাজের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার চূড়ান্ত দায়িত্ব বর্তায়। সে কারণে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারই দেশ পরিচালনা করে। দেশের সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কাজ-কর্ম চালিয়ে যায়। এ পর্যায়ে সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগ, পুলিশ, আইন-আদালত ইত্যাদি রয়েছে। রাষ্ট্র তার প্রশাসন যন্ত্রকে রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত এমনভাবে বিন্যস্ত করে যাতে প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিট সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে যেতে পারে। এভাবে বাংলাদেশকে, বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটের ওপর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব রয়েছে। বিচার বিভাগও এভাবে সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা আদালত পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। বস্তুত, আইনের শাসন সুনিশ্চিত করলে এবং জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করলে সমাজ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। রাষ্ট্রের কর্তব্যই হলো **জীবন, সম্পত্তি** ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে তার নিয়ন্ত্রণমূলক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

রাষ্ট্র তিনটি উপায়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। যথা ঃ **পুলিশ, আদালত** এবং **কারাগার**। পুলিশের কাজ হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। একাজ করতে গিয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তি বা বিপথগামীদের পুলিশ গ্রেফতার করে এবং প্রাথমিক রির্পোট প্রদান করে। আদালতের কাজ হলো গ্রেফতারকৃত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিটি মূলত বিপথগামী বা অপরাধী কিনা তা পুংখানুপুংখরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করা। আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ মনে করলে মুক্তি দেবে। নতুবা আইনানুযায়ী শাস্তি প্রদান করবে। এর পরই আসে কারাগারের কথা। কারাগার অপরাধীর জন্য মূলত একটি শাস্তিনিবাস। তবে কোন কোন সমাজ অপরাধীর চারিত্রিক সংশোনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এভাবে রাষ্ট্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি বলিষ্ঠ বাহন হিসেবে কাজ করে থাকে।

৪. **আইন (Law)** ঃ আইন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন। আইনের দুটি আবেদন রয়েছে। যথা ঃ

১) আইন জনসাধারণকে অসামাজিক কিছু করা থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানায়।

২) আইন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে জনসাধারণকে কিছু করতে আবেদন জানায়।

এভাবে আইন-বিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকা এবং আইনানুযায়ী কর্তব্য পালন করে যাওয়াই আইনের শিক্ষা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আইন তাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সরকারের আইন বিভাগ সাধারণ আইন প্রণয়ন করে। আইন হল মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম চাবিকাঠি। আইন যুগপৎ ভয়ের এবং শ্রদ্ধার বিধান স্বরূপ। আইন ভঙ্গ করার শাস্তি যেমন মানুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি সমাজবিরোধী লোক সাজা পেলে আইনের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

www.swapno.in

আইনকে যদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহন হিসেবে কাজ করতে হয় তাহলে কতিপয় শর্ত পালন করতে হবে। যেমন ঃ

১. আইনের বিধান সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। কেননা অনেকেই আইন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন। ফলে জনসাধারণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন এলাকায় আইন সম্পর্কে আলোচনার আয়োজন করা।

২. জনসাধারণের একটি অংশ বা কোন ব্যক্তি যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় সে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। কেননা, আইন যদি ব্যক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হয় তবে জনসাধারণ আইনের প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা হারাবে।

৩. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। মূলত, এই তিনটি শর্ত পালন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অপরিহার্য অংশ।

৫. **ধর্ম (Religion) ও নৈতিকতা** ঃ জনমত, রাষ্ট্র ও আইনকে হয়তো ফাঁকি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে অতিপ্রাকৃত শক্তি সব কিছু জানে, সব কিছু দেখে এবং যে সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে চূড়ান্ত রায়ের মাধ্যমে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করবে তাঁকে ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ ফাঁকি দেবে কেমন করে? ধর্ম তাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম শক্তিশালী বাহন।

প্রথমত, ধর্ম পার্থিব জীবনে ব্যক্তিকে সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, সত্যবাদী ও বিনয়ী হবার শিক্ষা দেয়। ফলে, ধর্মের সামাজিক ভূমিকাকে কেউ, এমন কি অভয়বাদী ব্যক্তিও উপেক্ষা করতে পারে না। অতএব, ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

দ্বিতীয়ত, ধর্ম কেবল সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ হবার শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না। অসৎ পথে জীবনযাপন করলে যে মহা শাস্তি ভোগ করতে হবে সে সম্পর্কেও ধর্ম মানুষকে সাবধান করে দেয়। ফলে, মানুষ তার লোভ-লালসা ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে চলে, যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য অপরিহার্য।

তৃতীয়ত, ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ জানে যে তার কাজ-কর্ম বা আচার-আচরণ সমাজের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লক্ষ না করলেও সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে, সে নিজেই নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্তুত ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তিকে সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ হতে জনমত, রাষ্ট্র, আইন বা অন্য কোন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনের উপর এতটা নির্ভরশীল হতে হয় না।

চতুর্থত, ধর্ম হচ্ছে একটি জীবন দর্শন। ধর্ম মানুষকে একটি আদর্শ জীবনের শিক্ষা দেয়। অতএব মানুষের গোটা জীবন এভাবে পরিচালিত হয়। তার পক্ষে অন্যায়ও অসত্যের আশ্রয় নেওয়ার অবকাশ আপেক্ষিকভাবে কম থাকে।

পঞ্চমত, ধর্মের অখণ্ড আবেদন রয়েছে। কেননা, ধর্ম পার্থিব জগতের পরেও পারলৌকিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা দেয়। ধর্মগ্রন্থে মানুষের পার্থিব জীবনের পর পারলোকিক জীবন প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা রয়েছে। ধর্মের বিধান মানুষের সব কাজ-কর্মের বিচারের ভিত্তিতে তার পরলোকে শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব, ধর্মের পারলৌকিক আবেদন মানুষকে সৎপথে থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। মৃত্যুই শেষ নয়। এর পরেও জীবন আছে। সে জীবন অতি দুঃখের অথবা অনাবিল সুখ ও আনন্দের হতে পারে এবং সে জীবন অখণ্ড ও অনন্ত। এ বিশ্বাস মানুষকে সমাজে এমনভাবে বসবাস করতে শেখায় যে, তার অন্য কোন সামাজিক প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণের পড়ে না। ধর্ম বিস্তার মাধ্যমে নিজেই নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে এবং উদ্বুদ্ধ হয় সমাজে সৎ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে।

www.swapno.in

বাংলাদেশের সমাজ নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকা ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ধর্ম অদ্যাবধি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এখনও বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে যৌন অপরাধের বিচার হয় ইসলামী ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য নিরূপিত হয় ধর্মীয় বিধান দ্বারা। মা-বাবার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নীতিও ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত। ধর্ম উত্তরাধিকার নীতি রাষ্ট্রের দ্বারাও স্বীকৃত। এভাবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নির্ণীত হয় ধর্মীয় শিক্ষানুযায়ী। এখনও ধর্ম বিরোধী আচরণ করলে সমাজচ্যুত বা বয়কট করা হয়। কয়েকজন মিলে গরু, মহিষ কোরবানী দিতে গিয়ে বক-ধার্মিক বা অসৎ পথে উপার্জনকারীকে সাথে নেয় না। একটি অবস্থায় ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য ধর্মীয় গোঁড়ামী অনেক সময় ব্যক্তি-চরিত্র সংশোধনের নামে অহেতুক ঝামেলা ও যন্ত্রণা বাড়ায় এবং অনেক সময় অতিরিক্ত ধর্মীয় আবেগে পরিচালিত হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হতে পারে। যদিও ধর্মেই অহেতুক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে পরিহার করার বিধান রয়েছে- তথাপি-মানুষ ধর্মীয় আবেগের আতিশয্যে এসবে কখনোবা অংশ নেয়। ফলে, সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

এসব অন্ধ গোঁড়ামী বাদ দিলে সমাজ নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকাকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা যায় না। বর্তমানে অবশ্য উদারনৈতিক শিক্ষা গ্রহণের ফলে ধর্মীয় গোঁড়ামী অনেকাংশে কমে এসেছে। ধর্ম তাই অতি আবেগ অনুভূতিকে অতিক্রম করে যুক্তির আশ্রয় সাহায্য নিচ্ছে। এভাবে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা আজও সমুন্নত রয়েছে।

ধর্মের ভূমিকা এতই ব্যাপক যে, তা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম সামাজিক সম্পর্ক বা মানব সম্পর্ককে (যা সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক পাঠ্য বিষয়) নিয়ন্ত্রণ করে। কেননা, ধর্মেই নির্দেশ রয়েছে কিভাবে কার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। কেমনভাবে, কার সঙ্গে কি সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ সমাজ কাঠামোকেও নিয়ন্ত্রণ করা। তাই ধর্ম সমাজ কাঠামোর অন্যতম উপাদান। অর্থাৎ ধর্ম শুধু অপকর্ম বা সমাজ বিরোধী কাজ-কর্মকেই নিরুৎসাহিত বা বাধা প্রদান করে ক্ষান্ত হয় না। ধর্ম অপকর্মের চিন্তা ও বাসনাকেও অবদমিত করে। তাই ধর্মের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেশ ব্যাপক ও প্রবল।

ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা সমাজ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। যেমন - মসজিদ, মন্দির, গির্জা এবং তথাকার ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয় গ্রন্থাবলী, শিক্ষাদান কেন্দ্র ইত্যাদি।

৬. **পরিবার (Family)** ঃ পরিবার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহন। পরিবারের অন্যতম কাজ হলো সন্তান-সন্ততিকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ আকাঙ্ক্ষিতভাবে সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা। পরিবারে ব্যক্তি শৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা পায়। বস্তুত, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিবার নামক অনানুষ্ঠানিক বিদ্যা-গৃহেই শিক্ষা দেওয়া হয়। সে কারণে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকাকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা চলে না। বস্তুত, সামাজিক নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকা বেশ প্রবল।

www.swapno.in

প্রথমত, পরিবারই ব্যক্তিকে সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শানুযায়ী সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তুলে। পরিবার থেকেই সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো অর্জিত হয় এবং তা ব্যক্তি চরিত্র গঠনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে।

দ্বিতীয়ত, পরিবারের গণ্ডিতে বসবাস করতে গিয়ে শৃঙ্খলা ও সংহতিবোধের প্রয়োজন হয়। এ শিক্ষাটি অবশ্যই পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফল।

তৃতীয়ত, পরিবার এমনই একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান, সাময়িকভাবে বিপথগামী ও সমাজবিরোধী পারিবারিক সদস্যকে সংশোধন করতে পারে। পিতা-মাতা যেমন সন্তানের আপত্তিকর আচরণকে সংশোধন করতে পারেন, তেমনি স্ত্রী তার স্বামীর এবং স্বামী তার স্ত্রীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

চতুর্থত, প্রতিটা পরিবারের রয়েছে একটা নিজস্ব আত্মসম্মানবোধ। কেউ ব্যক্তিগত বদনামের ভাগী হলেও নিজের পরিবার সম্পর্কে ঢালাও বদনাম গ্রহণে বাধ্য নয়। তাই, পরিবার তার নিজস্ব মান-মর্যাদার কথা চিন্তা করে পরিবারের সবার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এভাবে সব পরিবারই যদি তার সদস্যদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে তা হলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্যান্য বাহনের তেমন ভূমিকা পালন করতে হয় না।

পঞ্চমত, পারিবারিক পরিবেশেই ব্যক্তির মনোভাব ও ব্যক্তিত্বের মৌল কাঠামো গড়ে ওঠে। এই মনোভাব ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ীই সমাজে মানুষ আচরণ করে। তাই, কে কেমন আচরণ করবে সেটা পরিবারের পরিবেশ ও তার শিক্ষার উপর নির্ভর করে।

আমাদের সমাজে অদ্যাবধি পরিবারের বাঁধন তখনও বেশ শক্ত। বিশেষ করে, গ্রামীণ পরিবারগুলোতে মা-বাবা ও ভাই-বোনদের প্রভাব বেশ কার্যকর। গ্রামীণ কোন সালিস বা বিচারের ক্ষেত্রে অনেক সময় পরিবারের কর্তা ব্যক্তিকেই তার ছেলে বা ছোট ভাইকে শাসন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তদুপরি, গ্রামীণ সমাজের একক হিসেবে পরিবারগুলোর কর্তা-ব্যক্তিরা একত্রে বসে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করে থাকে। নগর সমাজে অবশ্য পারিবারিক জীবন অনেকটা গণতান্ত্রিক। তথাপি সন্তান-সন্ততির আচরণ নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। পরিবারের ছেলে মেয়েরা বাবা-মার মান-সম্মানের কথা চিন্তা করে নিজেই সংশোধিত হওয়ার প্রয়াস পায়। পরিবারের কোন সদস্যের সংশোধনের জন্য পরিবারের কর্তা ব্যক্তি কখনওবা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না।

৭. **উৎসব (Ceremonies)** ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণে উৎসব অনুষ্ঠানের ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের জীবন কাটে নানাবিধ উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই। উৎসব ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যখন কেউ কোন কিছু গ্রহণ করে বা কাজ করে তখন সে সব কাজকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেননা, আচার-অনুষ্ঠানে থাকে কিছু নিয়ম-রীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি। কোন কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পূর্ণ হবার সময় ঐ সব নিয়ম-রীতি, মূল্যবোধের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি বেড়ে যায় যা তার আচরণের ওপর প্রভাব রাখে এবং এভাবে সে সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়।

এমন অনেক আচার-অনুষ্ঠানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেসব আচার-অনুষ্ঠান মূল্যবোধ মানুষকে সুশৃঙ্খল হবার প্রেরণা যোগায় এবং তাদের মধ্যে সংহতিবোধ সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠানের উদাহরণ দেওয়া যায়। আমাদের সমাজে, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এসব আচার-অনুষ্ঠান বিবাহের প্রস্তাব থেকে শুরু করে বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান

www.swapno.in

পর্যন্ত পালিত হয়। এই ব্যাপক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ ও নিয়ম-রীতি থাকে, যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে, বিশেষ করে পাত্র-পাত্রীকে মেনে চলতে হয়। এই মেনে চলার মাধ্যমে তারা বিবাহ এবং বিবাহোত্তর পারিবারিক জীবনকে দায়িত্ব-কর্তব্যবোধের সঙ্গে এবং ভক্তিভরে সবার আশীর্বাদ নিয়ে গ্রহণ করে। ফলে, বিবাহ বন্ধন হয় দৃঢ়। এতে বিবাহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে খুবই কম। আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে অনেক সময় এসব অনুষ্ঠান না করে কোর্টে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কখনবা দূরালাপনীর মাধ্যমেও বিবাহ সম্পন্ন হয়। অথবা সহসা তড়ি-ঘড়ি করে কোন অনুষ্ঠান ছাড়াই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এসব ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর পক্ষে বিবাহের গুরুত্ব পুরাপুরিভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ববং এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও তারা সচেতন হয়। এই আগ্রহ ও দায়িত্ববোধ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাদের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। তেমনি শিক্ষা শেষে বিদায় অনুষ্ঠান এবং সমাবর্তন **(Convocation)** অনুষ্ঠানে ডিগ্রীধারী ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা, সততা ও শৃঙ্খলার পরিচয় দেবে বলে মনে মনে অঙ্গীকার করে। বিশেষ করে, সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডিগ্রীধারী ছাত্র-ছাত্রী আনুষ্ঠানিক পোশাকে সজ্জিত হয় এবং যথারীতি অনুষ্ঠান পর্বের মাধ্যমে ডিগ্রীপত্র বা সার্টিফিকেট গ্রহণ করে। এরূপ গুরু-গম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে - শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনত হয় এবং কর্মজীবনে সততা, ন্যায়, দেশপ্রেম এবং শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বস্তুত, সমাবর্তন অনুষ্ঠান তাদের মনে এমন এক দাগ কাটে, যা তাদের আচরণকে সমাজ ঈপ্সিত পথে পরিচালিত করে।

৮. **শিল্পকলা (Art)** ঃ শিল্পকলা নানাভাবে জাতির পরিচয় তুলে ধরে। ছবি, চিত্র, মূর্তি নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্পী বিদ্যামান সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এসব শিল্প-কলা সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি সাধারণ আবেগ ও চেতনা জাগ্রত করে। কোন দুর্ভিক্ষের চিত্র, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র, গণহত্যা, বা যুদ্ধের চিত্র যেমন মানুষকে ব্যথিত করে, উদার ও আত্মত্যাগী হবার অনুপ্রেরণা যোগায়, তেমনি জাতীয় জীবনের কোন বিজয় বা আনন্দের দৃশ্যনির্ভর অংকিত চিত্র মানুষকে গর্ব করতে শেখায়। এতে জাতীয় জীবনে সংহতি বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম লক্ষ্য।

৯. **পৌরণিক কাহিনী (Myth)** ঃ সাধারণত পৌরাণিক কাহিনী হচ্ছে কল্পনাশ্রয়ী গল্প। পৌরাণিক কাহিনী বানোয়াট হলেও তাতে উপদেশ, নীতিবাক্য, পাপীর দুর্গতি, পুণ্যবানের সৌভাগ্য, মিথ্যার পরাজয়, সত্যের জয় ইত্যাদি বিষয়ে অনেক শিক্ষণীয় উপাদান রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক ও ছায়াছবি প্রণীত হয়। সুয়োরাণী-দুয়োরানী, বেহুলা, লাইলী-মজনু, সাত-ভাই-চম্পা ইত্যাদি কাহিনীতে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সত্যমিথ্যা ইত্যাদির ধারণা রয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকেরা ন্যায়, সত্য ও পুণ্যের জয় দেখে আনন্দে হাততালি দেয়। আবার এসব অন্যায়, অসত্য ও পাপের প্রতি তাদের মনে ঘৃণা জাগিয়ে তুলে।

www.swapno.in

বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে অনেক পুঁথি ও কেচ্ছা-কাহিনীর আসরের আয়োজন করা হয়। এসবের মধ্যেও রয়েছে অনেক পৌরাণিক কাহিনী, যা মানুষকে সত্য, ন্যায় ও শৃঙ্খলার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং অন্যায় ও বিশৃঙ্খলার প্রতি ঘৃণাবোধ জাগ্রত করে। তাই দেখা যায় যে, পৌরাণিক কাহিনী সামাজিক নিয়ন্ত্রণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০. **প্রথা, লোকাচার ও লোকরীতি (Customs, Folkways and Mores)** ঃ সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতি সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, সামাজিক প্রথা, লোকাচার ও অবশ্য পালনীয় লোকরীতি মেনে চলতে হয় এবং এ শিক্ষা সে বাল্যকাল থেকেই পেয়ে থাকে। বস্তুত, প্রথা, লোকাচার ও অবশ্যপালনীয় লোকরীতির বিরুদ্ধাচরণ করে সমাজে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রথা, লোকাচার, লোকরীতি, আদব-কায়দা ইত্যাদি সামাজিক ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করে। বস্তুত, এসব সামাজিক মূল্যবোধের পরিপূরক বিধায় এসব পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি সামাজিক মূল্যবোধকে সম্মান করতে শেখে এবং তা সামাজিক ঐক্য-সংহতি ও শৃঙ্খলার জন্য বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়।

১১. **নিষেধাজ্ঞা (Tabu)** ঃ ট্যাবু বলতে বুঝায় কোন কিছু করার ওপর নিষেধ আরোপ। ট্যাবুর পেছনে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের প্রশ্ন জড়িত। আদিম সমাজে ট্যাবুর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিচিত্র ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারী আদিম জনগোষ্ঠী যখন বিশ্বাস করত যে, এসব কাজ করলে রোগ মহামারীতে জীবন নাশ হবে, ফসলের ক্ষতি হবে কিংবা গোষ্ঠী হিসেবে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে তখন তারা ঐসব কাজের ওপর ট্যাবু আরোপ করতো। এভাবে ট্যাবু ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ তথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতো।

১২. **ব্যক্তিত্ব (Personality)** ঃ বিশিষ্ট ব্যক্তি জীবনাদর্শ সমাজ নিয়ন্ত্রণে খুবই কার্যকর এবং সাধারণ মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। আদর্শ ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, ধর্মীয় নেতা সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। ন্যায়-নীতি ও আদর্শের প্রতীক ঐ সব ব্যক্তির জীবন-দর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ তার আচার-আচরণকে একটি সুনির্দিষ্ট মডেলে পরিচালিত করে, যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে খুবই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) এক ধরনের নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন (Charismatic leader) বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা সমাজের কাছে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিসেবে আবির্ভূত হন এবং আবেগ, ভয়, ভালবাসা ও আদর্শের দ্বারা পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যুগান্তকারী ধর্মীয় নেতাদের এ ধরনের নেতার শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এমনকি সমাজের আমূল ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম নেতাদেরও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন - নেপোলিয়ান, হিটলার, লেনিন, গান্ধী মাওসেতুং প্রমুখ।

অতএব, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা মহামানবের জীবন ও দর্শন দ্বারা যে মানুষ আপন চরিত্র গঠন করে এবং সেটা যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে - তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

www.swapno.in

১৩. **গ্রামীণ সম্প্রদায় ও শহুরে মহল্লা (Village community and urban neighborhood)** ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সম্প্রদায়ের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। কোন নির্দিষ্ট এলাকায় (area) সম্প্রদায়গত মন-মানসিকতা (community sentiment) নিয়ে গড়ে উঠে একটা জনপদ বা জনগোষ্ঠী। আদিম বৃটিশ যুগে উপমহাদেশের গ্রামীণ সম্প্রদায় ছিল অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামই মূলত এক একটি সম্প্রদায়। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ গণ্যমাণ্য ব্যক্তি সম্প্রদায়ের শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ রাখেন। এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে একটি ওয়ার্ডও গড়ে উঠে। বৃহৎ গ্রামে আবার একাধিক ওয়ার্ড থাকে। ওয়ার্ডগুলো ইউনিয়নের একক। প্রতিটা ওয়ার্ডে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বা মেম্বার থাকেন। তারাও গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

আগেকার দিনে গ্রামে **পঞ্চায়েত** প্রথা ছিল, যা গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হতো। পঞ্চায়েত প্রথা না থাকলেও গ্রামীণ সালিস ব্যবস্থা লোপ পেয়ে যায়নি। কোন ব্যক্তির আচার-আচরণ আপত্তিকর বলে মনে হলে গ্রামের বয়স্ক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সাবধান করে দেন বা উপযুক্ত পরামর্শ দানের মাধ্যমে ব্যক্তিটির চরিত্র সংশোধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রামের অনেক গোলযোগ যেমন - কোন পারিবারিক বিষয়, সম্পত্তি বন্টন ও উত্তরাধিকার, ঝগড়া-বিবাদ, ছোট-খাটো চুরির ঘটনাবলীর শুনানী ও বিচার গ্রামীণ সম্প্রদায়ই করে থাকে।

কোন কোন গ্রামে আবার গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, সংঘ-সমিতি ইত্যাদি থাকে। এসব দল এবং সংঘ গ্রাম ও সমাজের শান্তি ও সংহতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত, স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভূমিকা সর্বাধিক। পরিবারের কর্তা যেখানে ব্যর্থ, গ্রামীণ সম্প্রদায় সেখানে শক্ত হাতে কোন বিপথগামী ব্যক্তিকে সুপথে আনতে বা প্রয়োজনে সমাজচ্যুত করতে পারে। গ্রামীণ সম্প্রদায়ে আজও সামাজিকভাবে বয়কট হবার ভয় বেশ প্রকট। অতএব, বলা চলে যে, গ্রামীণ সম্প্রদায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

নগর সমাজে থাকে **পাড়া** বা **মহল্লা**। মহল্লাভিত্তিক সংঘ-সমিতির অস্তিত্ব বিদ্যমান। কোন কোন মহল্লায় থাকে **কমিউনিটি সেন্টার** বা **ক্লাব**। তদুপরি, রয়েছে মহল্লার বয়োজ্যেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তি। এসব প্রতিষ্ঠান ও গণ্যমান্য ব্যক্তি মহল্লার শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তবে নগরের মহল্লার সংহতি গ্রামের সংহতির তুলনায় দুর্বল। কেননা, মহল্লায় নানা অঞ্চল, নানা শ্রেণী ও পেশার মানুষ বসবাস করে। ফলে, তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে গ্রামবাসীদের তুলনায় সাদৃশ্য ও ঐক্য কমই থাকে। তদুপরি, শহুরে মহল্লার মানুষ তুলনামূলকভাবে স্বাধীনচেতা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী। এ ধরনের মহল্লায় পারস্পরিক সম্পর্কটি তাই অনেকটা আনুষ্ঠানিক, চুক্তিভিত্তিক ও কৃত্রিম। গ্রামে অবশ্য সম্পর্কটি তুলনামূলকভাবে অনানুষ্ঠানিক, মর্যাদাভিত্তিক এবং অকৃত্রিম। এতদ্‌সত্ত্বেও শহুরে মহল্লা তার সীমিত পরিসরে মহল্লার বাসিন্দাদের ছেলেমেয়েদের আচরণের ওপর যথাযসম্ভব দৃষ্টি রাখে। উদাহরণস্বরূপ পুরানো ঢাকার পাড়া মহল্লার ভূমিকা এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

১৪. **সামাজিক নিয়ন্ত্রণে শাস্তি ও শিক্ষার আপেক্ষিক গুরুত্ব (Relative importance of punishment and education in social control)**

www.swapno.in

ঃ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার অর্থ সমাজবদ্ধ মানুষের এমন সব আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যে সব আচরণ সমাজ ও আইন বিরোধী এবং যা সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য দেয় এবং সর্বোপরি সামাজিক সংহতি বিনষ্ট করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যতসব পদ্ধতি ও পন্থা রয়েছে তার মধ্যে শাস্তি ও শিক্ষা অন্যতম। অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষা, উপদেশ বা পুরস্কার প্রদান করে অপরাধপ্রবণতা বা সমাজ বিরোধী আচরণ সংশোধন করা যাবে না। তারা শিক্ষার চেয়ে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করেন।

শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য মূলত অপরাধ ও বিশৃঙ্খলমুক্ত সমাজের নিশ্চয়তা বিধান। এ উদ্দেশ্যে শাস্তির আপাত লক্ষ্য হলো ঃ

১. কোন ব্যক্তি যাতে অপরাধ না করে তার নিশ্চয়তা বিধান। কারো শাস্তি অবলোকনে অন্যরা ভয়ে ও লজ্জায় সংশোধিত হয়ে যাবে এমন একটি বিশ্বাস পোষণ করা অযৌক্তিক নয়।
২. শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় যাতে অপরাধে লিপ্ত না হয় বা সামাজিক বিশৃঙ্খলামূলক কাজ না করে সেটাও শাস্তির অন্যতম লক্ষ্য।
৩. শাস্তির আর একটি লক্ষ্য হলো ক্ষতিপূরণ। কেননা, অপরাধী ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন করে তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ দাবি করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। তাই শাস্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ক্ষতিপূরণ। অর্থ বা সম্পদ দ্বারা এ ক্ষতিপূরণ সম্ভব হতে পারে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বহু রকম শাস্তি দেওয়া হয়। আদিম সমাজে শাস্তি ছিল বড়ই কঠিন। এসব শাস্তির অনেকগুলোই আজ আর প্রয়োগ করা হয় না। বেত্রাঘাত, অংগচ্ছেদ, শিরচ্ছেদ, মৃত্যুদণ্ড, কাষ্ঠদণ্ডে গলা চেপে রাখা ইত্যাদি শাস্তি আজকাল প্রায় অচল। আধুনিক সমাজে **অর্থদণ্ড, কারাবাস** এবং **মৃত্যুদণ্ড** শাস্তিই প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ অনেক দেশে মৃত্যুদন্ড রহিত করা হয়েছে।

আধুনিককালে অবশ্য অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে নীতি পাল্টাচ্ছে। বলা হচ্ছে 'Hate the crime, not the criminal` - অর্থাৎ **অপরাধকে ঘৃণা কর, অপরাধীকে নয়**। কেননা, অপরাধী হয়তো কোন পরিবেশগত কারণে বা মানসিক বিকারগ্রস্ততার কারণে অপরাধ করেছে। তাই, অপরাধীদের সংশোধনমূলক পন্থায় চারিত্রিক উন্নতির শিক্ষা প্রদান করা উচিত। এ কারণে বিভিন্ন দেশে **প্রবেশন** (Probation) এবং **প্যারোল** (Parole) ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। এ সব ব্যবস্থায় সাজা স্থগিত রেখে বা কিছুটা সাজা দেওয়ার পর প্রবেশন বা প্যারোল কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে শর্তসাপেক্ষে অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সে যাতে কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হবার, সংশোধিত হবার এবং চারিত্রিক উন্নতি ঘটাবার সুযোগ লাভ করে এবং সর্বোপরি সমাজে পুনরায় খাপ-খাইয়ে নিয়ে সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে এমন কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

অনেকে মনে করেন শাস্তি প্রদানের চেয়ে এভাবে সংশোধনমূলক পন্থা অবলম্বন করলে অপরাধী সংশোধিত হবার বেশী সুযোগ পায়। তাঁরা বলেন যে, কারাগারে গেলে নতুন অপরাধী দাগী অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে আরো পাকা অপরাধীতে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে এবং যে এভাবে কারাগার ত্যাগ করেই আবার বড় ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয়। সাধারণত অপরাধীরা **জেলের পাখি** (Jail Bird) হিসেবে গড়ে উঠে। অতএব, কারাগারে রেখে শাস্তি প্রদানের চেয়ে অপরাধীকে চারিত্রিক সংশোধনের শিক্ষা প্রদান করা উচিত।

www.swapno.in

কেবল অপরাধীর সংশোধনমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ শেষ হবে না। যারা শাস্তির চেয়ে শিক্ষার গুরুত্ব দেন - তারা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথাও বলেন।

প্রথমত, তাঁদের মতে, শিক্ষাব্যবস্থা হবে সুস্থ সামাজিক নীতিবোধ কেন্দ্রিক। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নীতি শাস্ত্রের শিক্ষা থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, বৈষম্যমূলক শিক্ষার পরিবর্তে অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত। শিক্ষা যদি শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করে তাহলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব তথা অপরাধ বেড়েই যাবে। কিন্তু একথা সভ্য যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে মেধার তারতম্যের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। সমাজে বিভিন্ন পেশার মধ্যেও দক্ষতার তারতম্য বিদ্যমান।

তৃতীয়ত, শিক্ষার লক্ষ্য হবে আদর্শ ও কর্মঠ নাগরিক গঠন। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার লক্ষ্য হবে একটি পূর্ণাঙ্গ, সৎ ও আদর্শ জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা। বস্তুত, মানুষের আচার-আচরণ যাতে সমাজ-ঈপ্সিত ধারায় গড়ে উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। অতএব, **কেবল শাস্তি নয় - শিক্ষাও সামাজিক নিয়ন্ত্রণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।**

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন **যে শাস্তি তুলে দিয়ে নয় বরং শাস্তির পাশাপাশি পরিকল্পিত শিক্ষাও যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিরসনে তথা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে** আমরা সেটাই বলার প্রয়াস পেয়েছি।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

বাংলাদেশের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইনের ভূমিকা অনূর্ধ ৭৫টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন ঃ

অনুশীলনী ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিবারের পাঁচটি ভূমিকা উল্লেখ করুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলনী ৩ (Activity 3) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধর্মের পাঁচটি ভূমিকা উল্লেখ করুন।

১.
২.
৩.
৪.
৫.

www.swapno.in

সারাংশ

বিভিন্ন পদ্ধতিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু সকল সামাজিক নিয়ন্ত্রণই কতকগুলো বাহন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল : জনমত প্রথা, লোকাচার, লোকরীতি, ধর্ম, নৈতিকতা, আইন, শিক্ষা, রাষ্ট্র, পরিবার, উৎসব, শিল্পকলা, পৌরাণিক কাহিনী নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তিত্ব ও গ্রামীণ সম্প্রদায় বা মহল্লা। বাংলাদেশে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্ম এখনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে (Ö) টিক দিন

১। কোন সমাজ দার্শনিক জনমতকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছেন।

ক) মার্কস খ) প্লেটো গ) রস ঘ) ম্যাকাইভার

২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কোন্ বাহনটি বাংলাদেশের সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে?

ক) ধর্ম খ) আইন গ) শিক্ষা ঘ) প্রথা

৩। শিল্পকলা কিভাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা রাখছে?

ক) চিত্রকলায় আকৃষ্ট করে খ) জাতির পরিচয় তুলে ধরে
গ) আবেদনকে জাগিয়ে তুলে ঘ) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে

৪। নিচের কোন্টি সামাজিক মূল্যবোধের পরিপূরক?

ক) পৌরাণিক কাহিনী খ) শিক্ষা
গ) প্রথা ঘ) বিশ্বাস

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। গ ৫। খ ৬। ক ৮। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

১। গ ২। ক ৩। খ ৪। গ

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা দিন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

২। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায় ? সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনগুলির আলোচনা করুন।

৩। গ্রামীণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্ম ও পরিবারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায় ? আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কি ? সামাজিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা ও শাস্তির আপেক্ষিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

www.swapno.in

সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ
(Social Processes)

ইউনিট ১৪

ভূমিকা

মানুষের সামাজিক কার্যকলাপ খুবই জটিল। এর কারণ হলো সমাজবদ্ধ জীবন হিসাবে মানুষকে অন্যান্য মানুষের সাথে নানাবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে হয়। একে অপরের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমেই সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত। নানাবিধ সম্পর্কের মাধ্যমেই ব্যক্তি সমষ্টিবদ্ধ জীবনের অংশীদার। এভাবে পরস্পরের চাওয়া পাওয়ার সম্পর্কের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। যখন মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কিছুটা স্থায়িত্ব লাভ করে সুদৃঢ় হয়, তখনই সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়; যেমন– পরিবার, সমিতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি। আর কার্যকারণ সম্বন্ধের মাধ্যমে এসব সংগঠন মানুষের উদ্দেশ্য সাধন করে, কারণ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষকে অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কে আসতে হয়। মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। এ প্রবাহ কখনো স্তব্ধ হয়ে থাকে না বরং গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল মানবিক সম্পর্ককে সামাজিক প্রক্রিয়া বলা হয়। মানব সমাজের দুটি দিক। একটি এর কাঠামো বা সাংগঠনিক রূপ (Structural) এবং অপরটি কার্যকারণ সম্বন্ধ (Functional)। সামাজিক গড়ন বা কাঠামোর মধ্যে রয়েছে প্রধান প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী। আর এর কার্যকারণ সম্বন্ধের ভেতর আছে মানুষের দলবদ্ধ জীবনযাত্রা সংক্রান্ত সকল প্রকার মানবিক সম্পর্ক। মানব সমাজের গড়ন (Structure) থেকে এর কার্যকারণ সম্পর্ককে (Functional) আলাদা করা যায় না। সমাজের এ দুটো একে অন্যের সঙ্গে এমনি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, একটিকে জানতে হলে অন্যটিকে জানতে হয়। তবে সমাজের সাংগঠনিক দিকটা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কটা অধিকতর পরিবর্তনশীল।

www.swapno.in

সামাজিক প্রক্রিয়া ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. ব্যক্তি ও সমষ্টির ভেতর কিভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তা জানতে পারবেন।

২. সমাজের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৩. সামাজিক কার্যাবলীর ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৪. সামাজিক অবস্থার রূপান্তর সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৫. সমগ্র সমাজ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সাধারণভাবে, ব্যক্তি ও সমষ্টির ভেতর যেভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই সামাজিক প্রক্রিয়া বলে।

সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক প্রক্রিয়া প্রত্যয়ের বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এর কোন সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা নেই। যেমন একদিকে পদটি দ্বারা সাধারণভাবে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার যে কোন প্রকাশকে বোঝানো হয়ে থাকে, আবার অন্যদিকে এর দ্বারা সামাজিক কার্যাবলীর অব্যাহত অনুক্রমকে (Continuous Sequence) বোঝানো হয়ে থাকে। তাছাড়া, একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থা থেকে অপর সামাজিক অবস্থায় রূপান্তর বোঝাতেও পদটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (MacIver) তাঁর 'Society' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, "মানব গোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের ভেতর যে প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সম্পর্ক একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে তাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলা যায়।"

সাধারণভাবে, ব্যক্তি ও সমষ্টির ভেতর যেভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই সামাজিক প্রক্রিয়া বলে। অনেক সমাজবিজ্ঞানীই সামাজিক প্রক্রিয়ার (Social Process) সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (MacIver) তাঁর Society' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে "মানব গোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যের ভেতর যে প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সম্পর্ক একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে তাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলা যায়।" তিনি মানব সম্পর্ককে পরিবর্তনশীল বলে মনে করেছেন। এর সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, সামাজিক প্রক্রিয়া সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এরই মাধ্যমেই আন্ত মানবিক সম্পর্কের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। যা পরে সংগঠনের রূপ ধারণ করে। সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হবার পরও সামাজিক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে না। কারণ সংগঠনের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং এক সংগঠনের সাথে অন্য সংগঠনের সম্পর্ক সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। সেজন্য সামাজিক ঘটনা দু'প্রকারে পরিলক্ষিত হয়; যেমন প্রথমত, যেসব ঘটনা সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত, এর সাংগঠনিক প্রকাশ। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী আবার এরূপ সামাজিক প্রক্রিয়াকেই 'সমাজ' বলেছেন। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেইজ (MacIver & Page) অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজবিজ্ঞানী যিমেলের (Simmel) এর মতে একাধিক ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে ওঠে। তাই সমাজ পাঠে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ককে জানতে হবে। তিনি মানুষের এ ধরনের সম্পর্ককে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। এটাই ছিল তাঁর অধিকাংশ গবেষণার মূল বিষয়। র‌্যাটজেন হপার, ভীরকাণ্ড, টনিস্ এবং ভনভীজ প্রমুখ আরও অনেক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী সমাজ পাঠে যীমেলের (Simmel) পদাংক অনুসরণ করেছেন। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানে মানুষের পারস্পরিক সংযোগকে (Contact) বিশেষভাবে পাঠ করা হয়। মার্কিন

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞানী হেইল পার্ক, বারজেস্ও প্রধানত সামাজিক প্রক্রিয়ার দিক থেকে সমাজ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন।

সামাজিক প্রক্রিয়া প্রত্যয়টির উৎপত্তি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে জৈব-শারীর তাত্ত্বিক (Bioorganismic) সমাজবিজ্ঞানীদের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। কারণ প্রথম যুগের সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও জীবদেহের অনুরূপ প্রক্রিয়া আবিষ্কারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এ বিষয়ে পথিকৃৎ হলেন পোলান্ডের সমাজবিজ্ঞানী লুডভিগ গামপ্লোভিচ (Ludwig Gumplowicz 1838-1909) বলেন যে, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার (natural process) মধ্যে যেমন বিপরীতধর্মী (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) উপাদান ক্রিয়াশীল, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিপরীতধর্মী উপাদান (যেমন সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা)সর্বদা ক্রিয়াশীল। অবশ্য পরবর্তীকালে রুশ সমাজবিজ্ঞানী পিটার ক্রোপোতকিন (Peter Kropotkin) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা সহযোগিতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সামাজিক প্রক্রিয়াকে নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানী র‌্যাটজেনপার অন্যতম। তিনি সামাজিক স্বার্থের (Interest) দিক থেকে সামাজিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক প্রতিভাত হয়। সামাজিক সম্পর্ক মানুষের কতক মৌলিক চাহিদার উপর নির্ভরশীল। র‌্যাটজেনহপার মৌলিক চাহিদাকে স্বার্থ বলেছেন। তিনি মানুসের মৌলিক চাহিদাকে পাঁচ প্রকার স্বার্থে ভাগ করেছেন। যথা– (১) প্রজনন সংক্রান্ত (Procreative), (২) শারীরবৃত্তীয় (Physiological), (৩) ব্যক্তিগত (Individual), (৪) সামাজিক (Social) এবং (৫) অতীন্দ্রিয় (Transcendental)। মানুষের পারস্পরিক (Reciprocal) সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ টিকে আছে। একে সামাজিক প্রক্রিয়া বা সামাজিক আচরণ বলা যায়। তাঁর মতে মানুষের সামাজিক আচরন, সম্পর্ক ও প্রক্রিয়া পরিবর্তনশীল। র‌্যাটজেনহপারকে সমর্থন করে সমাজবিজ্ঞানী স্মল বলেছেন যে, সমাজ মূলত সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের একটি মিশ্র রূপ। সেজন্য সমাজবিজ্ঞানীকে সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হবে। স্মলের মতে সমাজ একটি পরিবর্তনশীল সত্তা। সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহের গতিশীলতাকে পাঠ করলে সমাজের অভ্যন্তরীণ গতিশীলতাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। গতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়ার পাঠের মাধ্যমেই মানুষের গোষ্ঠী জীবনকে জানা যায়।

> র‌্যাটজেনহপার মৌলিক চাহিদাকে স্বার্থ বলেছেন। তিনি মানুষের মৌলিক চাহিদাকে পাঁচ প্রকার স্বার্থে ভাগ করেছেন। যথা– (১) প্রজনন সংক্রান্ত (Proceative), (২) শারীরবৃত্তীয় (Physiological), (৩) ব্যক্তিগত (Individual), (৪) সামাজিক (Social), এবং (৫) অতীন্দ্রিয় (Transcendental)।

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী হেইজ (Gayse) উপরোক্ত ধারণাকে সমর্থন করে বলেছেন যে, সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হল মানুষের সামাজিক কার্যকলাপ ও প্রক্রিয়াসমূহের পাঠ করা। তিনিই প্রথম মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী যিনি সমাজকে সামাজিক প্রক্রিয়ার দিক থেকে বিবেচনা করতে মনোযোগী হয়েছিলন। সমাজ পাঠে এ দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি সকল সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিগত শতকের শেষার্ধে এবং বর্তমান শতকের প্রারম্ভে মানুষের সামাজিক ক্রিয়া পদ্ধতি সম্পর্কে বহু সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা হয়েছে। গবেষকদের মধ্যে যিমেল লিওপোল্ড ডন্ভীজে, ব্যাটজেনহপার প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানের প্রধান প্রতিপাদ্য হিসাবে সামাজিক কার্য প্রক্রিয়া ও তার সাংগঠনিক পরিণতির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন (P.A. Sorokin) তাঁর "contemporary Sociological Theories" নামক গ্রন্থে এর বিরোধিতা করে উল্লেখ করেন যে, "সামাজিক প্রক্রিয়া সমাজবিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়, অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সঙ্গে একে একটি বিশেষ সমস্যা হিসাবে পাঠ করা যেতে পারে।" কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজের সকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সব সময় যে মধুর বা সহানুভূতিমূলক হয়, তা নয়। সদস্যদের মধ্যে এমন সম্পর্কও গড়ে উঠে যা ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব একদিকে

www.swapno.in

> একদিকে যেমন সহযোগিতা ও সমঝোতার মত সংযোগকারী (Associative) সম্পর্কও দেখা যায়, অপরদিকে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও শত্রুতার মত বিযুক্তকারী (Dissociative) সম্পর্কও সমাজে পাশাপাশি দেখা যায়।

যেমন সহযোগিতা ও সমঝোতার মত সংযোগকারী (Associative) সম্পর্কও দেখা যায়, অপরদিকে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও শত্রুতার মত বিযুক্তকারী (Dissociative) সম্পর্কও সমাজে পাশাপাশি দেখা যায়। কাজেই সাধারণ অর্থে আমরা যাকে সামাজিকতা বলে থাকি বা একজন মানুষকে যখন Social বা 'সামাজিক' আর অন্য একজনকে 'অ-সামাজিক' Unsocial বলে আখ্যায়িত করে থাকি– তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ, সমাজে সকল প্রকার মানুষেরই বাস, তাদের সর্বপ্রকার সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক। এভাবে বিপরীতমুখী উভয় সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই মানুষ সমাজে বসবাস করে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ে একদিকে যেমন সংযোগকারী সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন, অপরদিকে বিযুক্তকারী সম্পর্কের সামাজিক মূল্য ও নিরূপণ করেন।

সামাজিক প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান হল এক ধরনের পরিবর্তনশীলতা, গতিময়তা এবং চলিষ্ণুতা। সামাজিক তত্ত্ব বিকাশে কালের প্রেক্ষিত উপলব্ধি করবার যে সচেতনতা তাকে এক কথায় তা সামাজিক প্রক্রিয়ারই গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলা যায়। সেদিক থেকে দেখলে সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণে সামাজিক প্রক্রিয়ার তত্ত্বকে স্থিতি তত্ত্বের (Static theory) বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে।

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৬ মিনিট**

"সমাজ একটি অসমাপিকা প্রক্রিয়া" –উক্তিটি অনূর্ধ্ব ৫০টি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

মানুষ সামাজিক জীব। আর তাই সমাজবদ্ধ জীবন হিসাবে মানুষকে অন্যান্য মানুষের সাথে নানাবিধ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে হয়। মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। যা কখনো স্তব্ধ হয়ে থাকে না। এ পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। এই পরিবর্তনশীল মানবিক সম্পর্ককে সামাজিক প্রক্রিয়া বলা হয়। সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যেভাবে গড়ে ওঠে তাকেই সামাজিক প্রক্রিয়া বলা হয়। পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আমরা ব্যক্তি ও সমষ্টির ভেতরকার সম্পর্ক, সমাজের আভ্যন্তরীণ গতিশীলতা, সামাজিক অবস্থার রূপান্তর, সামাজিক কার্যাবলীর অব্যাহত ধারা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

www.swapno.in

১। সাধারণভাবে সামাজিক প্রক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি-

ক) ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক

খ) ব্যক্তি ও সমষ্টির ভেতর যেভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ) ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্কহীনতা

ঘ) ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক

২। সামাজিক প্রক্রিয়াকে যারা বিশেষভাবে পাঠ করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন–

ক) র‌্যাটজেনহপার খ) ভন্‌ভীজ

গ) টনিস্‌ ঘ) যিমেন

৩। "সামাজিক প্রক্রিয়া সমাজবিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়, অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সঙ্গে একে একটি বিশেষ সমস্যা হিসাবে পাঠ করা যেতে পারে"– উক্তিটি কার?

ক) ম্যাকাইভার খ) যিমেল

গ) সরোকিন ঘ) ব্যাটজেনহপার

৪। সামাজিক প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদান হল –

ক) এক ধরনের পরিবর্তনশীলতা, গতিময়তা এবং চলিষ্ণুতা

খ) পরিবর্তনহীনতা এবং গতিহীনতা

গ) পারস্পরিক সমঝোতা

ঘ) ব্যক্তি ও সমষ্টি

www.swapno.in

www.swapno.in

সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ
Types of Social Process

পাঠ
২

উদ্দেশ্য(Objectives)

এ পাঠটি পড়ে আপনি

১. উপযোজন, আত্মীকরণ ও সহযোগিতার স্বরূপ এবং এসবের সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

২. প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের স্বরূপ এবং এসবের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সমাজবিজ্ঞানী পার্ক এবং বার্জেস যেসব সামাজিক প্রক্রিয়াকে মুখ্য বলে বিবেচনা করেছেন সেগুলো হল – ১. প্রতিযোগিতা, ২. দ্বন্দ্ব, ৩. উপযোজন, ৪.

সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process) কত প্রকার তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী লিওপোণ্ড ফন্‌ভীজ মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে ছয়শত পঞ্চাশ রকমের উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি সম্পর্ক (Relation) এবং গঠনের (Structure) ভেতর পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। প্রথমটির মধ্যে রয়েছে মানুষের সর্বপ্রকার গতিশীল কার্যকলাপ, আর দ্বিতীয়টির মধ্যে আছে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ। সমাজবিজ্ঞানী রস্ (Ross) সামাজিক প্রক্রিয়ার আটত্রিশ রকমের নমুনা নির্ধারণ করেছেন। আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক প্রক্রিয়াকে সংযোগকারী (conjunctive) এবং বিযুক্তকারী (Disjunctive) এই দু'ভাগে ভাগ করাকেই সমীচীন বলে মনে করেছেন। আবার সমাজবিজ্ঞানী পার্ক এবং বার্জেস (Park & Burgess) নিম্নলিখিত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোকে মুখ্য বলে বিবেচনা করেছেন; যথা–

১. প্রতিযোগিতা (Competition)
২. দ্বন্দ্ব (Conflict)
৩. উপযোজন (Accommodation)
৪. আত্মীকরণ (Assimilation)

অভিন্ন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে যে আদর্শ বা একাত্মতা গড়ে উঠে তাই সহযোগিতামূলক কাজকর্মে প্রয়োজনীয় উৎসাহ জোগায়।

সমাজবিজ্ঞানী মার্টন ও ম্যাকাইভার (Marton & MacIver) উপরোক্ত চার প্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়া ছাড়াও সহযোগিতাকে (Co-operation)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উপরোক্ত সবগুলো সামাজিক প্রক্রিয়াকে সংযোগকারী (Conjunctive) ও বিযুক্তকারীর (disjunctive) অন্তভুর্ক্ত করা যেতে পারে; যেমন – প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বকে বিযুক্তকারী এবং উপযোজন, আত্মীকরণ ও সহযোগিতাকে সংযোগকারী সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। সামাজিক প্রক্রিয়ার উপরোক্ত দ্বিবিধ বিন্যাসের মধ্যে একটি ভারসাম্যের ধারণা অন্তর্নিহিত রয়েছে। এ জন্যই বলা হয় যে, উল্লিখিত দ্বিতীয় পর্যায়ের সামাজিক প্রক্রিয়া এই ভারসাম্যকে রক্ষা করে এবং প্রথম পর্যায়ের প্রক্রিয়া তাকে বিনষ্ট করে।

এখন আমরা উপরোক্ত পাঁচ প্রকারের সামাজিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ এবং তাদের সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।

www.swapno.in

সহযোগিতা (Co-operation)

সহযোগিতা হলো এমন একটি সামাজিক সম্পর্ক যার দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমবেত ভাবে কাজ করে। সাধারণত যেখানে একক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয় সেখানে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি দেশের সরকার তখনই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয় যখন শাসক এবং শাসিতের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতার সুযোগ থাকে। যখন জনগণ কোন সরকারের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে সেই সরকারের পরিবর্তন চায়, তখন স্বভাবতই তারা সেই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় না এবং তার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, সহযোগিতা তখনই দৃঢ় হয় যখন একটি যৌথ উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত প্রচেষ্টা থাকে। সেজন্য সমাজবিজ্ঞানী ফেয়ারচাইল্ড (Fairchild) মন্তব্য করেছেন যে, "সহযোগিতা হলো এমন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী যৌথভাবে কাজ করে যৌথ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাতে সংগঠন কম বা বেশি শক্তিশালী হোক না কেন।"

> সহযোগিতা কেবলমাত্র সমাজের সর্বাধিক প্রচলিত রীতিই নয়, বরং তা গোষ্ঠী ও সমাজের ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সম্পূরক সম্পর্কও বটে।

সমাজস্থ মানুষের সাধারণ স্বার্থ অথবা অভিন্ন স্বার্থকে কেন্দ্র করে সহযোগিতামূলক কাজকর্ম বা আচার-আচরণের সূচনা হতে পারে। সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হলে জনসাধারণ নানা কারণে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র অভিন্ন লক্ষ্য থাকলেই সহযোগিতা সৃষ্টি হয় না; যখন অভিন্ন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে একাত্মতা গড়ে উঠে কেবলতখনই সহযোগিতা সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বন্যাপীড়িত মানুষের দ্বারা গঠিত সেবাকার্য সংঘের সভ্যদের সাধারণ স্বার্থ হওয়ার সহযোগিতামূলক মনোভাব সকলের মধ্যে দেখা যায়। সাধারণ স্বার্থ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ (Maclver & page) বলেন যে, সাধারণ স্বার্থের কথা আমরা তখনই বলব যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়, যা তাদের সকলের পক্ষে এক ও অভিভাজ্য, কিন্তু তা, তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক লক্ষ্যের সমষ্টি নয়, বরং এমন এক লক্ষ্য, যা তাদের সকলকে একত্রিত করে।

আবার অভিন্ন স্বার্থকে কেন্দ্র করেও সহযোগিতা দেখা দিতে পারে। অভিন্ন স্বার্থ বলতে সেই স্বার্থকে বুঝায়, যা প্রত্যেক মানুষের কাছেই ব্যক্তিগত বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একই সামগ্রীর উৎপাদক বা বিক্রেতাগণের স্বার্থ ব্যক্তিগতভাবে পৃথক, কিন্তু, সরকারের কাছ থেকে বিশেষ কোন সুবিধা আদায় করার জন্য যখন তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তখন এরূপ সহযোগিতাকেই অভিন্ন সহযোগিতা বলে আখ্যায়িত করা যায়। আবার কোন বড় রকমের প্রতিযোগিতাকে পরাস্ত করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল যখন সহযোগিতা করে তখনও উহাকে অভিন্ন সহযোগিতা বলে মনে করা যায়।

সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, উপরোক্ত এই দুই ধরনের সহযোগিতার সামাজিক তাৎপর্য খুবই ব্যাপক।

সাধারনত স্বার্থ হতে যে সহযোগিতার উদ্ভব হয় তার স্থায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে না। অভিন্ন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে যে আদর্শ বা একাত্মতা গড়ে উঠে তাই সহযোগিতামূলক কাজকর্মে প্রয়োজনীয় উৎসাহ জোগায়। সেজন্য ব্যর্থতাও অনেক সময় সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। যখন কোন সামাজিক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠী কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়, তখন গোষ্ঠীভুক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতার ভাব ফুটে উঠে এবং এই সহযোগিতার দ্বারা নানা রকম সৃষ্টিশীল কাজের পথ উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে, স্বার্থের ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাবটি ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার ফল। এর স্থায়িত্বও অপেক্ষাকৃত কম। কেননা এ ধরনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য পায়।

www.swapno.in

সহযোগিতার সামাজিক গুরুত্ব (Social Importance of Co-operation)

সহযোগিতা হলো এমন একটি সামাজিক সম্পর্ক যার দ্বারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্পনের জন্য সমবেত ভাবে কাজ করে।

সহযোগিতার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ মন্তব্য করেছেন যে, সমাজের স্থায়িত্ব পুরোপুরি নির্ভর করে যখন পুরুষ এবং নারী পারস্পরিক সহযোগিতায় আগ্রহী হয়। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত শিশুর লালন-পালন সম্ভব নয়। এমন কি, পরিবারের সদস্যদের জৈবিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সেজন্য কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সহযোগিতাকে একটি মৌলিক সামাজিক প্রক্রিয়া বলে মনে করেন। সহযোগিতা কেবলমাত্র সমাজের সর্বাধিক প্রচলিত রীতিই নয় বরং তা গোষ্ঠী ও সমাজের অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সম্পূরক সম্পর্কও বটে। মানুষের সংঘবদ্ধতার মূলে সহযোগিতাই ক্রিয়াশীল। পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন মানুষ সমাজবদ্ধ থাকতে পারে না।

সহযোগিতার শ্রেণী বিভাগ (Classification of Co-operation)

সমাজবিজ্ঞানীগণ সহযোগিতাকে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন; যথা– প্রত্যক্ষ সহযোগিতা (Direct Co-operation) এবং পরোক্ষ সহযোগিতা (Indirect Co-operation)।

প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রমাণ মিলে এসব কার্যের মধ্যে যেসব মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সম্পন্ন করে কিংবা করতে আগ্রহী হয়।

১. প্রত্যক্ষ সহযোগিতা (Direct Co-operation) ঃ প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রমাণ মিলে এসব কার্যের মধ্যে যেসব মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে সম্পন্ন করে, কিংবা করতে আগ্রহী হয়। যেমন– একত্রে খেলা করা, একত্রে প্রার্থনা করা অথবা একত্রে জমিচাষ করা ইত্যাদি। মানুষ এ সকল কাজ একত্রে করতে পছন্দ করার দুটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে (১) হয়তো মুখোমুখি অবস্থান ঐ কাজে প্রেরণা যোগায়; অথবা (২) এর দ্বারা হয়ত তারা অন্য কোন ধরনের সামাজিক সন্তুষ্টি অর্জন করতে থাকে। অন্য একটি কারণ হতে পারে যে অনেক ক্ষেত্রে কোন কাজ একা সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব।

২। পরোক্ষ সহযোগিতা (Indirect Co-peration) ঃ সমাজে যখন বিভিন্ন ব্যক্তি একই উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য ভিন্ন ধরনের কার্য ভিন্ন ভিন্নভাবে কিংবা একই সাথে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করে তখন এ ধরনের সহযোগিতাকে পরোক্ষ সহযোগিতা বলে মনে করা হয়; যেমন– কলকারখানাও সরকারী দপ্তরে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সকলেই কাজ করছে এবং এসব কাজ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব। তাছাড়া, বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। সেজন্য প্রত্যক্ষ সহযোগিতার স্থান দখল করছে পরোক্ষ সহযোগিতা।

যদি কোন কাজ সকলে মিলে প্রকাশ্যে প্রকাশভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধা করে তখনই পারস্পরিক সহযোগিতা সকলের দৃষ্টি গোচর হয়।

যখন ব্যাহত দ্বন্দ্বের ভাবটি সুপরিস্ফুট, কিন্তু তার অন্তরালে থাকে সহযোগিতা তখন তাকে প্রচ্ছন্ন

সহযোগিতাকে আবার অন্যভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যেমন– প্রকাশ্য সহযোগিতা ও প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা।

ক) প্রকাশ্য সহযোগিতা ঃ যদি কোন কাজ সকলে মিলে প্রকাশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধা করে তখনই পারস্পরিক সহযোগিতা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। সেজন্য এরূপ সহযোগিতাকে প্রকাশ্য সহযোগিতা বলে মনে করা হয়; যেমন– সমাজের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা।

খ) প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা ঃ যখন ব্যার্হত দ্বন্দ্বের ভাবটি সুপরিস্ফুট, কিন্তু তার অন্তরালে থাকে সহযোগিতা তখন তাকে প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা বলা হয়। সংসদে যখন বিরোধী পক্ষের

www.swapno.in

সদস্যরা সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করে থাকেন তখন তাকে প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা বলে মনে করা যেতে পারে।

প্রতিযোগিতার কোন শেষ নেই।

প্রতিযোগিতা (Coppetition)

প্রতিযোগিতা হল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রক্রিয়া। কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দুই বা ততোধিক-ব্যক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হতে পারে। কেননা, মানুষের চাহিদার তুলনায় তার প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত হলেই সমাজে জাগতিক দ্রব্য, ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা, খ্যাতি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়।

অনেক সমাজবিজ্ঞানীই প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রতিযোগিতার সাধারণ সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা হল ঃ যখন একাধিক ব্যক্তি একটি বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কিংবা অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে একই সময়ে তৎপর হয়।

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, যখন একাধিক ব্যক্তি বা দল কাম্য লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৎপর হয়ে উঠে, তখনই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। সমাজবিজ্ঞানী পার্ক ও বার্জেস (Park & Burjess) সামাজিক সংযোগ নিরপেক্ষা পারস্পরিক ক্রিয়াকে প্রতিযোগিতা বলে উল্লেখ করেন। সমাজবিজ্ঞানী মাদারল্যান্ড (Sutherland) প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে, "ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে এবং গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর মধ্যে কোন একটি জিনিসের সীমিত সরবরাহের দরুন যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং যা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তাই হল প্রতিযোগিতা। আবার সমাজবিজ্ঞানী ফেয়ারচাইল্ড (Fairchild) এবং বোগারডাস (Bogardas) বলেন "কোন একটি জিনিসের যদি প্রাচুর্যের অভাববোধ পরিলক্ষিত হয় তখন যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সে বস্তুটিকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠে।"

প্রতিযোগিতার সাধারণ সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা হল ঃ যখন একাধিক ব্যক্তি একটি বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কিংবা অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে একই সময়ে তৎপর হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা প্রতিযোগিতার স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি; যেমন– প্রতিযোগিতা হল এক ধরনের বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতিযোগিতার একটি প্রকাশ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, আর একটি প্রকাশ অধিক পরিশ্রমে। আবার কয়েক রকম প্রতিযোগিতা আছে যে সবের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোন ভাব নেই; যেমন বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে শক্তির লড়াই এ অবতীর্ণ হওয়া(কুস্তি, পাঞ্জা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি)। প্রতিযোগিতাকে নৈর্ব্যক্তিক বলা চলে, কেননা প্রতিযোগিতার দৃষ্টি থাকে লক্ষ্যের দিকে, ব্যক্তির দিকে নয়। যখন প্রতিযোগিতা নৈর্ব্যক্তিক থাকে না তখনই দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়।

প্রতিযোগিতার প্রকৃতি (Nature of Corpetition)

প্রতিযোগিতার প্রকৃতি কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতিযোগিতার প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।

প্রথমত ঃ প্রতিযোগিতা সার্বজনীন ও নিরবচ্ছিন্ন। প্রত্যেক সমাজে এবং সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রতিযোগিতা বিদ্যমান, যেমন– ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, শ্রমিক মালিক প্রত্যেকের মধ্যেই প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ করা যায়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

প্রতিযোগিতা সার্বজনীন ও নিরবচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রতিযোগিতার কোন শেষ নেই। মানুষের যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই তেমনি প্রতিযোগিতারও শেষ নেই। কোন ব্যক্তি আজ এক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলে কাল সে

www.swapno.in

অধিকার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে সাহস পায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে তার মনে প্রতিযোগিতার ভাব প্রবল হয়ে উঠে।

তৃতীয়ত ঃ প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য থাকে লক্ষ্যের দিকে কাম্যের দিকে নয়। সেজন্য বলা যায় প্রতিযোগিতা ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়। একটি নির্দিষ্ট কাম্যকে লক্ষ্য করে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠে। অতএব বলা যায় যে, বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্রতিযোগিতা দেখা দেয়।

প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য থাকে লক্ষ্যের দিকে, কাম্যের দিকে নয়। সেজন্য বলা যায় প্রতিযোগিতা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়।

চতুর্থত ঃ প্রতিযোগিতা ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর প্রত্যাশাকে বর্ধিত করে, ব্যর্থতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপাদান সৃষ্টি করে প্রতিযোগিতা ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে প্রণোদিত করে। সেজন্যই পরিবর্তনশীল সমাজে প্রতিযোগিতা এত প্রবল।

প্রতিযোগিতা ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য সাধনে প্রণোদিত করে।

পঞ্চমত ঃ প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নয়। নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিযোগিতা বলতে কিছু নেই। প্রত্যেক প্রতিযোগিতাই নিয়মনির্ভর।

প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণমুক্ত

প্রতিযোগিতার প্রকারভেগ (Types of Competition)

সমাজবিজ্ঞানী গিলিন ও গিলিনের মতে, মানুষ সজ্ঞানে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় না। আবার সকল প্রকার প্রতিযোগিতাই মানুষের অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হয় না। সেজন্য তিনি প্রতিযোগিতার দুটি দিকের উল্লেখ করেন। প্রথমত, প্রতিযোগিতা ব্যক্তিগত (Personal); দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগিতা নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal)। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় প্রভুত্ব বিস্তারের আশায়, কোন ব্যবসাকে উপলক্ষ করে ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক প্রতিযোগিতা গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। প্রতিযোগিতার প্রকারভেদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

১। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা (Economica Competition)

অনেকের মতে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমেই সমাজে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। আধুনিক সমাজে মানুষ ভোগ্য বস্তুকে ভিত্তি করে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। সেজন্য মানুষ নানাবিধ পার্থিব কর্মে নিয়োজিত।

২। সামাজিক প্রতিযোগিতা (Social Competition)

সামাজিক জীবনে ব্যক্তির মর্যাদা লাভের জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা চলছে। এর কারণ হল মানুষ সমাজে নিজের প্রাধান্য বজায় রেখে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং এভাবেই সে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার আসন লাভ করে।

৩। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (Cultural Competition)

পৃথিবীর সর্বত্র সাংস্কৃতিক ধরন অভিন্ন নয়। সাংস্কৃতিক ধরনের ভিন্নতার কারণে মানব সমাজে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার কথা বলা যায়।

www.swapno.in

৪। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা (Political Competition) **ঃ**

রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রত্যেক রাষ্ট্রেই লক্ষণীয় উপাদান। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অনুরূপ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে দুই বা ততোধিক সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক যে বিরোধ অথবা আক্রমণাত্মক আচরণের প্রকাশ ঘটে তখনই তাকে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বলা হয়ে থাকে।

৫। জাতিগত প্রতিযোগিতা (Racial Competition) **ঃ**

বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায় তাকে বর্ণগত (Racial) প্রতিযোগিতা বলা যেতে পারে। কৃষ্ণকায় এবং শ্বেতকায়দের মধ্যে এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সমাজে প্রতিযোগিতার ভূমিকা
(Role of Competition in Society)

সমাজ জীবনে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম প্রতিযোগিতার সামাজিক ভূমিকা হল এই যে, এর মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য যোগ্যতা যাচাই হয়। এর জন্য অবশ্য ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সমাজকে গতিশীল করে তোলে। সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে প্রতিযোগিতা নিষ্পন্ন হয়। এরই সূত্র ধরে প্রতিযোগিরা পরষ্পর পরস্পরকে অতিক্রম করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সচেষ্ট হয়। ফলে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা নানাভাবে বিশেষিথ হয় এবং বিভিন্ন দিকে প্রসার লাভ করে।

প্রতিযোগিতা সমাজকে গতিশীল করে তোলে।

সমাজস্থ মানুষ ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত কতকগুলো অনুমোদিত নিয়ম মেনে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রায় প্রত্যেক সমাজেই প্রতিযোগিতা একটি সমাজ অনুমোদিত আচরণ। আমেরিকার সামাজিক জীবনে প্রতিযোগিতামূলক আচরণ শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, এটি আদর্শ বলে গণ্য। আবার কোন কোন সমাজে প্রতিযোগিতামূলক আচরণ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়; যেমন- জুনি(Zuni) এবং ডেকোটা (Dakota) সমাজে প্রতিযোগিতামূলক আচরণকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। কারণ, তাদের কাছে প্রতিযোগিতার ইতিবাচক দিকগুলোর চেয়ে নেতিবাচক দিকগুলোই বিশেষভাবে বিবেচ্য।

প্রতিযোগিতার যেমন ইতিবাচক দিক রয়েছে, তেমনি উহার কতকগুলো নেতিবাচক দিকও আছে, যেমন- সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকলে প্রাচুর্যের পাশাপাশি দারিদ্র্য থাকতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী কিংস্লে ডেভিস (Kingley Davis) বলেন, "প্রতিযোগিতা প্রাচুর্যের মধ্যে অভাব, ভীতি, অস্থিরতা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে।" সে জন্য অনেকে মনে করেন, প্রতিযোগিতা পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে অবিমিশ্র কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে না। অনেকে প্রতিযোগিতার অনেক অশুভ প্রভাব লক্ষ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ক্যারেন হর্নী (Karen Horney) এর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রতিটি সদস্যের জন্য প্রতিযোগিতা একটি সমস্যা।"

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রতিযোগিতা সকল সমাজে সমান নয়। বিভিন্ন সমাজে তা বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল। প্রতিযোগিতার ইতিবাচক দিক তখনই নেতিবাচক দিক থেকে অধিক ক্রিয়াশীল হবে যখন অসুস্থ প্রতিযোগিতার প্রভাবকে পরিহার করে সুস্থ প্রতিযোগিতার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে।

দ্বন্দ্ব বা সংঘাত (Conflict)

দ্বন্দ্ব হল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে দুই বা ততোধিক সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক যে বিরোধ অথবা আক্রমণাত্মক আচরণের প্রকাশ ঘটে তখন তাকে

www.swapno.in

দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বলা হয়ে থাকে। সমাজস্থ মানুষের মৌল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের রূপ নেয়। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ (Maclver & Page) সামাজিক দ্বন্দ্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, সেসব ধরনের ক্রিয়াই সামাজিক দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত, যেসব ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্য লাভের জন্য মানুষ পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে। আবার অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, প্রতিযোগিতা থেকেই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। কিন্তু দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতার মত নিরবচ্ছিন্ন ও অবিরাম নয়।

সমাজ জীবনে দ্বন্দ্ব মানুষের নিত্য সহচর। দ্বন্দ্ব নানাভাবে বিভিন্ন মাত্রায় এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রতিটি স্তরে প্রকাশ পায়। সামাজিক জীবনে মানুষের চিন্তায়, মননে এবং মূল্যায়নে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, আবার এই পার্থক্য কখনো ব্যক্তি স্বার্থকে কেন্দ্র করে, কখনো শ্রেণী স্বার্থকে কেন্দ্র করে, আবার কখনো ধর্মকে কেন্দ্র করে প্রতিফলিত হয়। এজন্য আমরা একে কখনো বলে থাকি শ্রেণী দ্বন্দ্ব, কখনো ব্যক্তি দ্বন্দ্ব আবার কখনো গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলী ডেভিস দ্বন্দ্বকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, একটি আংশিক দ্বন্দ্ব (Partical Contlit) এবং অপরটি সামগ্রিক দ্বন্দ্ব (Total Contlict)। আংশিক দ্বন্দ্ব হল, যখন এক বিষয়ে মতের মিল থাকলেও উহার লক্ষ্য অর্জনে বা উপায়ে যদি মিল না থাকে তাহলে তাকে আংশিক দ্বান্দ্ব বলে। যদি সর্বত্র ক্ষেত্রে মতের গরমিল থাকে তাহলে তাকে সামগ্রিক দ্বন্দ্ব বলে। সামগ্রিক দ্বন্দ্বের নিরসনে বল প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায়।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ (Maclver and Page) দ্বন্দ্বকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, যথা- প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব (Direct Contfict) ও পরোক্ষ দ্বন্দ্ব (Indirect Conflict)। যখন দুই বা ততোধিক পক্ষ প্রত্যেকের অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরস্পরকে প্রকাশ্যভাবে বাধা দান করে, প্রতিঘাত করে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিহিংসামূলক কাজ করে, তখন প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সাধারণত প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব পরস্পর বিরোধী দু'ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভেতর সংঘটিত হয়; যেমন মামলা, সশস্ত্র যুদ্ধ, বিপ্লব, দাঙ্গা ইত্যাদি। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে পরোক্ষ সংঘাত বা দ্বন্দ্ব হলো নৈর্ব্যক্তিক। সমাজের ন্যায়নীতি ও নৈতিক আদর্শ রক্ষার জন্য এ ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানী গিডিংসও দ্বন্দ্বকে দুভাগে ভাগ করেছেন। যথা- মুখ্য দ্বন্দ্ব (Primary Contfict) ও গৌণ দ্বন্দ্ব(Secondary Conflict)। মুখ্য দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল সংঘাতে সরাসরি বিজয় অর্জন। এছাড়া দুর্বল পক্ষকে সবল পক্ষ পরাজিত করে প্রভাব বিস্তার করা কিংবা নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করাকেও মুখ্য দ্বন্দ্বের প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এর ফলে দুর্বল পক্ষের স্বাধীন সত্তার অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু গৌণ দ্বন্দ্ব সমাজে পারস্পরিক শক্তির সমতা থেকে জন্ম নেয়। যদি কোন সময়ে সমপর্যায়ের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে সে শক্তিকে পরাভূত করে তার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার প্রয়াসকে গৌণ দ্বন্দ্ব করা যায়।

সমাজে বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সেজন্য দ্বন্দ্বের বিভিন্ন ধরন দেখা যায়। আমরা এখানে সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করছি ঃ

ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব (Personal Contfict) ঃ যখন দুজন ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্ট হয় তখন তা থেকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অথবা যখন দুজন ব্যক্তি একই স্বার্থের বশবর্তী হয় তখন পরস্পরের মাঝে দ্বন্দ্বের জন্ম হতে পারে।

২। **শ্রেণীদ্বন্দ্ব** (Class Contfict) ঃ সমাজে যখন একশ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণী শাসিত ও শোষিত হয় এবং সমাজে শোষক শ্রেণী শোষিত শ্রেণীর চেয়ে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তখন শ্রেণীদ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে।

www.swapno.in

৩। **বর্ণগত দ্বন্দ্ব** (Raeial Contfict) ঃ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের আপন বর্ণগত গৌরব অনুভব করে। বিশেষ করে স্বেতকায় জাতি কৃষ্ণকায় জাতিকে তাদের চেয়ে নীচ মনে করে। মানুষের এ ধরনের মনোভাব থেকে বর্ণগত গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

৪। **গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব** (Group Contfict) ঃ সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতরও দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এসব গোষ্ঠীর মাঝে দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকার অন্যতম কারণ হল রাজনৈতিক প্রভাব বলয় বৃদ্ধি।

৫। **ধর্মীয় দ্বন্দ্ব** (Religious Contfict) ঃ সমাজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে দেখা যায় যে, তারা স্বীয় ধর্মের ভাবাদর্শের গৌরব কীর্তনে অধিকতর আগ্রহী। সমাজে যখন এরূপ ধর্মীয় চেতনা জাগে তখন এক ধর্মাবলম্বীদের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

৬। **রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব** (Political contfict) ঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে অথবা একই রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সাথে দ্বন্দ্ব হতে পারে। আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথেও দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি তখন তাকে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব বলে।

দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার সম্পর্ক (Relationship of Contfict and Competition)

সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব বর্তমান। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ম্যাকাইভার মূলত প্রতিযোগিতাকে পরোক্ষ দ্বন্দ্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিংসলী ডেভিস প্রতিযোগিতাকে পরিশীলিত বিরোধ বলে বর্ণনা করেছেন। প্রতিযোগিতার ন্যায় দ্বন্দ্বও একটি মৌলিক মানবিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য। এ দু'য়ের মাঝে ভেদরেখা টানা সহজ নয়। কারণ প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব উভয়েরই প্রকৃতি হলো বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করা। যখন কোন ব্যক্তি নিয়ম মেনে কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করে তখন ব্যক্তির এরূপ প্রয়াসকে প্রতিযোগিতা বলা হয়। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগত ক্রোধ যখন চরম আকার ধারণ করে তখনই তা দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। সেজন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যক্তিগণ কি প্রকার আচরণ করবে এ সম্পর্কে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে কতকগুলো মৌলিক পার্থক্য লক্ষণীয়; যেমন-

১. সমাজ জীবনে প্রতিযোগিতার যথার্থ ভূমিকা রয়েছে। একজন ব্যক্তিকে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। এ দিকে থেকে বলা যায় যে, প্রতিযোগিতা বিদ্য মান। কিন্তু সমাজ জীবনে দ্বন্দ্ব ক্ষণস্থায়ী। কারণ ব্যক্তিগত ক্রোধ যখন চরম আকার ধারণ করে তখন তা দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। কিন্তু যদি সময় অতিবাহিত হলে আক্রোশ মিটে যায় তাহলে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।
২. প্রতিযোগিতার মাঝে সহযোগিতা নীরবে নিভৃতে কাজ করে, কিন্তু দ্বন্দ্বের মাঝে এর কোন স্থান নেই। দ্বন্দ্ব হলো নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দ্বন্দ্বের সঙ্গে সর্বদা হিংসার উপাদান জড়িত থাকে।
৩. প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সৃজনী শক্তি বিকশিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কারণ প্রতিযোগিগণ উভয়েই পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু দ্বন্দ্বের মাঝে উত্তেজনা, ক্রোধ ও মন মেজাজের অসামঞ্জস্য ক্রিয়াশীল থাকে। সেজন্য সব সমাজেই দ্বন্দ্ব সাধারণত বর্জনীয় বলে বিবেচিত। আবার অনেকে মনে করেন যে, দ্বন্দ্ব সব সময় ধ্বংসাত্মক নয়, তা গঠনমূলকও বটে। কারণ, মানব সমাজের অখণ্ডতার ভিত্তি মানসিক বা সাংস্কৃতিক, জৈবিক নয়। সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তায়, বিচারে এবং মূল্যায়নে অসামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে আপন জাতির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত প্রীতিই মুখ্য ভূমিকা পালন

www.swapno.in

করে। অনেক সময় সমাজে অবাধ প্রতিযোগিতা সুফলের চেয়ে কুফলও আনয়ন করে। সেজন্য সমাজে সব সময় প্রতিযোগিতা সকলের কল্যাণ সাধন করতে পারে না।

সামাজিক জীবনে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের সম্পর্ক

(Relationship of Co-operation and Conifict in Social life)

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন এবং নিমকফ (Ogburn and Nimkof) বলেন, যে কার্য প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিসদৃশ অবস্থা থেকে সদৃশ অবস্থায় উপনীত হয় অথবা স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিল দেখা দেয় তাকেই আত্তীকরণ বলে।

সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একদিকে মানুষ সমাজে যেমন অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত চলতে পারে না, অপরদিকে পারস্পরিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বও বিদ্যমান রয়েছে। সামাজিক জীবনে দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজ বিজ্ঞানী চার্লস কুলীর উক্তি এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, একই কার্য প্রক্রিয়ার একটি দিক, যার মধ্যে উভয়েরই কিছু কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত।" কাজেই সহযোগিতা ও দ্বন্দ্ব সমাজে সহাবস্থান করছে। মানুষ সমাজের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা করতে দেখা যায় এবং দ্বন্দ্বকে পরিহার করতেও উদ্যোগী হয়। তবুও সহযোগিতামূলক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের সাথে মানুষের সহযোগিতার সম্পর্ক ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে যতদিন পর্যন্ত তাদের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। সেজন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সমাজে দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা এমনভাবে বিরাজ করছে যে, সামাজিক ভারসাম্য কোনভাবে বিঘ্নিত হয় না। সে কারণেই ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন "Society is Co-operation crossed by conflict"। এ উক্তি থেকে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের সামাজিক তাৎপর্য বুঝা যায়। কখনো কখনো দেখা যায় যে, সহযোগিতা ও দ্বন্দে পাশাপাশি বিদ্যমান সেজন্য এ দুই সামাজিক প্রক্রিয়াকে মানব জীবনের দুটি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কিংসলী ডেভিসের মতে, দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে দুটি দলের মধ্যে মিল হতে পারে এমন কিছু এখানে নেই। যেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সেখানে উচ্চতর কোন লক্ষ্য নেই এবং একজন আর একজনকে পরাজিত করে হটিয়ে দেওয়া ছাড়া সমস্যা সমাধানের অন্য কোন পথ নেই।

সমাজবিজ্ঞানী চার্লস কুলীর উক্তি এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, একই কার্য প্রক্রিয়ার একটি দিক, যার মধ্যে উভয়েরই কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত।"

কিংস্‌লী ডেভিসের উক্ত ধারণা থেকে এটা স্পষ্ট যে, দ্বন্দ্ব হচ্ছে সহযোগিতার বিরোধী সামাজিক প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে দ্বন্দ্বকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সামাজিক দ্বন্দ্বের এমন কোন রূপ দেখা যায় না, যার মধ্যে সহযোগিতামূলক ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বন্দ্বের প্রকারভেদ রয়েছে, যেমন- দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে বিতর্ক প্রতিযোগিতায়, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব হতে পারে এবং যুদ্ধের মুলেও দ্বন্দ্ব বিরাজমান এমন কি, কোন কোন দ্বন্দ্বের মাঝেও সহযোগিতা লক্ষণীয়, যেমন দু রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক নিয়মের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে সহযোগিতা করতে হয়। দ্বন্দ্বকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলে পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়া সহযোগিতাকে একেবারে বর্জন করতে পারে না বলেই মানুষের সামাজিক জীবনে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের সংযোগ লক্ষ করা যায়।

দ্বন্দ্বমূলক ক্রিয়া সহযোগিতাকে একেবারে বর্জন করতে পারে না বলেই মানুষের সামাজিক জীবনে সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের সংযোগ লক্ষ করা যায়।

আত্তীকরণ (Assimilation)

আত্মীকরণ একটি সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়া। বিপরীত ধর্মী দুই বা ততোধিক সংস্কৃতি বা ব্যক্তির সামঞ্জস্য বিধানকে আত্তীকরণ বলে। সামাজিক জীবনে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে চায়। যখন বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন সামাজিক জীবনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সেজন্য প্রয়োজন প্রত্যেক ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর আদর্শ বা নীতির সঙ্গে অপরাপর ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর আদর্শ বা নীতির সামঞ্জস্য রক্ষা করা। সমাজে যখন

www.swapno.in

বিপরীতধর্মী দুই বা ততোধিক সংস্কৃতি বা ব্যক্তির সামঞ্জস্য ঘটে তখন সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি কোণ থেকে এরূপ সামঞ্জস্য বিধানকে আত্তীকরণ বলা হয়।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী আত্মীকরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন এবং নিমকফ্ (Ogburn and Nimkof) বলেন, যে কার্য প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিসদৃশ থেকে সদৃশ অবস্থায় উপনীত হয় অথবা স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিল দেখা দেয় তাকেই আত্তীকরণ বলে।

সমাজবিজ্ঞানী পার্ক ও বার্জেস এর মতে, যে কার্য প্রণালীর মাধ্যমে যখন একজন ব্যক্তিরা একটি গোষ্ঠী অন্যের মনোভাব ও অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে সক্ষম হয় তখন তাকেই আত্তীকরণ বলা হয়।

সমাজবিজ্ঞানী বোগারডাস্ (Bogardus) বলেন যে, আত্তীকরণের ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মনোভাব একীভূত হয়ে ক্রমে অভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের সংহতি ও ঐক্যের একটি প্রক্রিয়াই হল আত্তীকরণ। এই প্রক্রিয়ার মূলে বিভিন্ন সামাজিক কারণ রয়েছে। এসবের মধ্যে এমন কারণও রয়েছে, যা সাংস্কৃতিক সংহতি বজায় রাখার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আমরা নিম্নে সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করছি ঃ

১। **বিচ্ছিন্নতা** (Isolation) ঃ সমাজ জীবনে পারস্পরিক ক্রিয়ার অভাব ঘটলেই মানুষ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেজন্য সমাজবিচ্যুত কোন ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আত্মীকরণের প্রশ্নও অবান্তর। সামাজিক জীবনে তখনই টিকে থাকা সম্ভব যখন পারস্পরিক ক্রিয়ার সংমিশ্রণ ঘটে।

২। **সাংস্কৃতিক পার্থক্য** (Cultural Differences) ঃ আত্মীকরণ তখনই সম্ভব হয় যখন দুটি সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মৌলিক বৈষম্য বিদ্যমান থাকে না। আবার যখন দুটি সংস্কৃতির মাঝে মৌলিক পার্থক্য থাকে তখন আত্মীকরণ সম্ভব হয়ে উঠে না।

৩। **বর্ণগত এবং দেহগত বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা** (Difference of Colour and Physiological Characteristics) ঃ মানুষে মানুষে সাংস্কৃতিক জীবনে মিল থাকা সত্ত্বেও বর্ণগত কিংবা দৈহিক বিভিন্নতার জন্যও আত্মীকরণ সহজ হয় না। এক্ষেত্রে মানুষের পারস্পরিক ঐক্যে বা সামাজিক সংহতি ফাটল ধরে, যেমন আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের সাথে থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে আত্মীকরণ ঘটেনি। কারণ শ্বেতাঙ্গরা নিজেদেরকে উন্নত জাতি বলে মনে করে।

৪। **সামাজিক নির্যাতন** (Social Persecution) ঃ সমাজে যখন উচ্চ শ্রেণী কর্তৃক নিম্ন শ্রেণী বা শাসক কর্তৃক শাসিত গোষ্ঠী শোষিত হয় তখন সমাজে পারস্পরিক বিদ্বেষ ভাব বাড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মীকরণে বিঘ্ন ঘটে।

তবে কতকগুলো উপাদানের উপস্থিতির কারণে পরস্পরের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আত্মীকরণ সহজতর হয়ে উঠে, যেমন- সহনশীলতা, সাংস্কৃতিক ঐক্য, অর্থনৈতিক প্রগতি। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-

www.swapno.in

১। **সহনশীলতা** (Toleration) ঃ বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তির মধ্যে যদি সহনশীলতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আত্তীকরণ সম্ভব হয়ে উঠে। কারণ, প্রত্যেকেই যদি কেবল আপন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে তাহলে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষিত হয় না, তাতে সুস্থ সামাজিক জীবন বিঘ্নিত হয় সেজন্য পারস্পরিক সংমিশ্রণের মনোভাব নিয়ে যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একাত্ম হয় তখনই আত্মীকরণ সম্ভব হয়।

২। **সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য** (Cultural Similarity) ঃ যখন দুই বা ততোধিক সংস্কৃতির মতে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয় তখন উভয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আত্তীকরণ সহজ হয়ে উঠে। বিভিন্ন সংস্কৃতির ভেতর ঐক্যবোধ গড়ে উঠা তখনই সম্ভবপর হয় যখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে।

অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য সমান সুযোগ সুবিধার (Equality of Opportunity for Economic Progress) ঃ সামাজিক জীবনে যদি অর্থনৈতিক বৈষম্য অধিক মাত্রায় বিরাজ করে তাহলে সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠে। ফলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যদি উপভোগের ক্ষেত্রে সমাজে সমতা থাকে তাহলে আত্তীকরণের পথ সুগম হয়।

উপযোজন (Accommodation)

যে সমস্ত আচরণ বা কার্যাবলী দ্বারা মানুষ তার পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ায় ঐ সকল আচরণ বা কার্যাবলীকে বোঝাবার জন্য মনস্তত্ত্ববিদ জেমস্ মার্ক বালড্উইন (James Mark Baldwin) সর্বপ্রথম উপযোজন বা Accommodation প্রত্যয়টি প্রয়োগ করেন। উপযোজন হল সামঞ্জস্য বিধান বা খাপ খাওয়ানো, যা মানুষের সামাজিক সূত্রে অর্জিত আচরণ কিংবা নুতন কোন আচরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে সে সম্পন্ন করে থাকে।

বলতে গেলে জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে মানুষের সাথে তার পরিবেশের মিথ্যাক্রিয়া শুরু হয়। কেননা তার শারীরিক প্রকৃতি, তার আবেগ ও তাড়নায় (impulses and drives) উপরে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হতে থাকে এবং এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো ব্যতীত মানুষের পক্ষে সমাজের সক্রিয় সদস্য হওয়া সম্ভব হয় না।

সমাজবিজ্ঞানী পার্ক এবং বার্জেস (Park and Burgess) এর মতে উপযোজনের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী উপাদান সমূহের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয় যার ফলে এই দ্বন্দ্ব সংঘাত আপাত দৃষ্টিতে নিরসন হতে পারে, অথবা তা সুপ্ত থাকতে পারে যা ভবিষ্যতে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। উপযোজন আবার স্থায়ী হতে পারে, যেমন জাতি, বর্ণভিত্তিক সমাজে বিভিন্ন জাতি-বর্ণের সহা অবস্থান। এটি অস্থায়ী হতে পারে কেবল মুক্ত সমাজে (Open Society) যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর সহা অবস্থান ঘটে।

> উপযোজন হল সামঞ্জস্য বিধান বা খাপ খাওয়ানো, যা মানুষের সামাজিক সূত্রে অর্জিত আচরণ কিংবা নুতন কোন আচরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে সে সম্পন্ন করে থাকে।

উপযোজনের প্রকারভেদ (Types Accommodation)

পার্ক এবং বার্জেস দুটি প্রধান ধরনের উপযোজনের উল্লেখ করেছেন। যথা- (১) নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং (২) নতুন সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধান। প্রথমোক্ত ধরনের উপযোজন দ্বারা প্রধানত নতুন জলবায়ু, আবহাওয়া ও মাটির সাথে খাপ-খাওয়ানোকে বোঝানো হয়ে থাকে, যাকে এক কথায় যাকে অভ্যস্তকরণ (acclimatization) বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের উপযোজনের দ্বারা নূতন সামাজিক

www.swapno.in

রীতিনীতি, লোকাচার, সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোকে বুঝায় যাকে এক কথায় প্রাকৃতকরণ (Naturalization) বলা যেতে পারে।

সিমেল (Simmel) এর মতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এই উপযোজন দুটি প্রধান রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, যথা- (ক) কর্তৃত্বপ্রবণ (Superordinate) ও (খ) অধীনতাপ্রবণ (Subordinate)। অবশ্য ব্যক্তি বা দলের মধ্যে এই প্রাধান্য বা হীনম্নতা কোনটিই একমুখী নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে কর্তৃত্বপ্রবণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যে, নির্দেশ দেয় অধঃস্তনরা তা নির্বিবাদে মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম পক্ষও দ্বিতীয় পক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

উপযোজনের উপায়সমূহ (Mea of Accommodation)

উপযোজন বহুবিধ উপায়ে বা পদ্ধতিতে হতে পারে। বিলিন ও গিলিন (Billin and Gillin) নিম্নোক্ত উপায়সমূহের উল্লেখ করেছেন।

১. জোর জবরদস্তির কাছে নতি স্বীকার (Yielding to coercion)।
২. আপোষরফা (Compromise)।
৩. মধ্যস্থতা ও অনুরঞ্জন বা মীমাংসা (Arbitration and conciliation)
৪. সহিষ্ণুতা (Toleration)।
৫. ধর্মান্তকরণ (conversion)
৬. মহত্ত্বরোপ (Sublimation)
৭. জোর যৌক্তিকতা (Rationalization)।

- জবরদস্তির ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ বা শক্তি প্রয়োগের ভীতি বিদ্যমান।
- আপোষরফার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষগণ মোটামুটি সমানভাবে ক্ষমতাবান এবং একে অন্যের কিছু কিছু দাবী মনে নেয়।
- মধ্যস্থতা ও অনুরঞ্জনের ক্ষেত্রে তৃতীয় কোন পক্ষ সালিশী বা শান্তি স্থাপনকারীর ভূমিকা পালন করে।
- সহিষ্ণুতার অর্থ প্রকাশ্য সংঘাত এড়িয়ে চলা।
- ধর্মান্তকরণের অর্থ ব্যক্তি কর্তৃক আপন বিশ্বাস, মতাদর্শ, আনুগত্য ইত্যাদি অকস্মাৎ প্রত্যাখান করা এবং অন্যের বিশ্বাস ও মতাদর্শ গ্রহণ করা।
- উদগতিকরণের সম্ভ্রম উৎপাদক মনোভাব গ্রহণ।
- যৌক্তিকতার অর্থ হল মানুষের আপন আচরণের সপক্ষে সম্ভাব্য অজুহাত ও ব্যাখ্যা দাঁড় করানো।

অতএব উপযোজন যে কেবল সংঘাতকে হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করে তাই নয়, বরং তা সামাজিক রীতিনীতির নিরাপত্তা বিধান করে, যাতে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের অধিকারী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গ একত্রে আপন আপন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে।

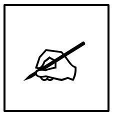

অনুশীলনী ১ (Activity 1) ঃ **সময় ঃ ৬ মিনিট**

www.swapno.in

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত "সহযোগিতার" তিনটি সংজ্ঞা লিখুন।

১.

২.

৩.

www.swapno.in

অনুশীলনী ২ (Activity 2) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

দ্বন্দ্বের সাথে প্রতিযোগিতার ৫টি পার্থক্য লিখুন

দ্বন্দ্ব	প্রতিযোগিতা

অনুশীলনী ৩ (Activity 3) ঃ **সময় ঃ ৫ মিনিট**

উপযোজনের ৭টি উপায়ের নাম উল্লেখ করুন।

www.swapno.in

সারাংশ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বিধায় প্রত্যেক মানুষ অপর একটি মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর এই পারস্পরিক সম্পর্কের একটা বিশেষ দিকই হল সামাজিক প্রক্রিয়া। সাধারণ কথায় ব্যক্তি ও সমষ্টির ভেতর যেভাবে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে মোট কত ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া আছে আছে এনিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত বিরোধ আছে। তথাপি বিশ্লেষণ সাপেক্ষে দুই ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার কথা জানা যায়। প্রথমত, সংযোগকারী (Conjunctive) এবং দ্বিতীয়ত বিযুক্তকারী(Disjunctive)। আবার সংযোগকারী সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে উপযোজন, আত্তীকরণ ও সহযোগিতা এবং বিযুক্তকারী সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব। সামাজিক প্রক্রিয়ার এই দ্বিবিধ বিন্যাসের মধ্যে একটি ভারসাম্যের উপাদান অন্তর্নিহিত রয়েছে। এজন্যই বলা হয় যে, প্রথম শ্রেণীর সামাজিক প্রক্রিয়া এই ভারসাম্যকে রক্ষা করে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রক্রিয়া তাকে বিনষ্ট করার প্রয়াস পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। সমাজবিজ্ঞানী পার্ক ও বার্জেস সামাজিক প্রক্রিয়াকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন?

ক) ৫ ভাগে খ) ৩ ভাগে

গ) ৪ ভাগে ঘ) ৬ ভাগে

২। সহযোগিতাকে প্রধানতঃ কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

ক) ২ ভাগে খ) ৩ ভাগে

গ) ৫ ভাগে ঘ) ৬ ভাগে

৩। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে প্রতিযোগিতার প্রকারভেদ কয়টি?

ক) ৫টি খ) ২টি

গ) ৭টি ঘ) ৭টি

৪। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের ধরন কয়টি?

ক) ৭টি খ) ৩টি

গ) ৬টি ঘ) ৮টি

৫। "উপযোজন হল সামঞ্জস্য বিধান" কথাটি কার?

ক) পার্ক খ) বার্জেস

গ) জেমস্ মার্ক বলড্উইন গ) যিমেল

৬। নিচের কোন্টি সামাজিক পারস্পরিক ক্রিয়া

ক) আত্মীকরণ খ) বিচ্ছিন্নকরণ

গ) অবিচ্ছিন্নকরণ ঘ) একত্রীকরণ

www.swapno.in

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝায়? এর উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. সামাজিক প্রক্রিয়া কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া কি কি?
৩. সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয় করুন।
৪. দ্বন্দ্বের সাথে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার সম্পর্ক নির্ণয় করুন।
৫. সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে প্রতিযোগিতার প্রকৃতি বর্ণনা করুন। প্রতিযোগিতার প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১ ঃ ১। খ ২।ক ৩। গ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ক ৪। গ ৫। গ ৬। ক

www.swapno.in

www.swapno.in

সামাজিক পরিবর্তন (Social Change)

ইউনিট ১৫

ভূমিকা ঃ

মানব সমাজের ইতিহাস পরিবর্তনের ইতিহাস। কোন সমাজই স্থির নয়, বরং গতিশীল। তবে সামাজিক পরিবর্তনের গতি সকল সমাজে একরূপ নয়। যেমন, আদিম ও বর্তমান উন্নত সমাজে পরিবর্তনের গতিতে রয়েছে ব্যাপক ব্যবধান, যদিও পরিবর্তশীলতাই হচ্ছে সকল সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর মানুষের সমাজ ব্যবস্থা, রীতি-নীতি ও চিন্তাধারা যেরূপ ছিল সেক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে। মানব সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক রীতিনীতি, আচার-বিধি এবং চিন্তাধারা অভিন্ন ছিল না। অধিকন্তু, মানুষ যখন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এসেছে, তখন তার সামাজিক আচার-বিধি, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয়েছে। সমাজের এই পরিবর্তন আদি যুগ থেকেই চলে এসেছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজবিজ্ঞানও পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। সামাজিক বিশ্লেষণ শুধু স্থিতিশীলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের তথা সংস্কৃতির রূপান্তর, নতুন চেতনা, নতুন সম্পর্ক ও নতুন প্রতিষ্ঠানের কথাও চিন্তা করা হয়। বস্তুত পক্ষে, সামাজিক পরিবর্তনকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে।

‘পরিবর্তন’ শব্দটি প্রথমত সংশোধন অর্থে ব্যবহৃত হত। নৃতত্ত্ববিদগণ আদিম সমাজের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে সমাজের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের সংশোধনমূলক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তারা সংশোধনের মাধ্যমে আদিম সমাজের নতুন রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। অনেক সমাজবিজ্ঞানীই পরিবর্তনকে সংশোধন বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সংশোধনের ফলে যে পরিবর্তন, বিবর্তন ও উন্নয়নের মতবাদ গড়ে উঠল তখন সামাজিক রূপান্তরকে পরিবর্তন বলে মনে করা শুরু হল।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যখন পশ্চিম ইউরোপের সমাজে পরিবর্তনের গতি বৃদ্ধি পেল। তখন ইতিহাসের দর্শন পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ লাভ ঘটে। দৃশ্যমান সামাজিক পরিবর্তনকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেকালে স্কটিশ ঐতিহাসিক ও দার্শনিকগণ, বিশেষ করে এডাম ফারগুসন (Adam Ferguson), মিলার (Miller) এবং রবার্টসন (Robertson), ফ্রান্সের দার্শনিক ভল্টেয়ার (Voltaire), টারগট (Turgt) ও কনডোরসেট, জার্মান ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হারডার ও হেগেল (Hegel) তাঁদের স্ব স্ব দেশের বৈপ্লবিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ পরিবর্তনের গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। পরবর্তীকালে তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ফরাসী সমাজকে দার্শনিক সেন্ট সাইমন (Saint Simon), বাক্ল (Buckle) ও আগস্ট কোঁতে (Auguste Comte), ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসার (Spencer) এবং জার্মান সমাজবিজ্ঞানী মার্কস (Marx) সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যা বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের বিশ্লেষণে মাঝে সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন ও প্রগতির প্রকৃত অর্থ নিয়ে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ, উক্ত সমাজতাত্ত্বিক প্রত্যয় তিনটি প্রায় অভিন্ন অর্থ বহন করে। অনেকেই এ তিনটি শব্দকে সমার্থক বলে মনে করতেন। এভাবে পরবর্তীকালে এ তিনটি প্রত্যয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলে গন্য করা হয়। তবুও এ নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। এ সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব।

www.swapno.in

সামাজিক পরিবর্তন ঃ সংজ্ঞা, ধারণা ও কারণ

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

১. সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা জানতে পারবেন
২. বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত "পরিবর্তন" প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা জানতে পারবেন
৩. সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন
৪. সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ (যেমন, ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
৫. বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের কারণসমূহ জানতে পারবেন।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা ও ধারণা

একটি বিশেষ সামাজিক রূপ থেকে অন্য রূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে।

সামাজিক পরিবর্তন বলতে সাধারণত সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন বা রূপান্তরকে বুঝে থাকি। একটি বিশেষ সামাজিক রূপ থেকে অন্য রূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে। এ রূপান্তর কখনো স্থায়ী আবার কখনো অস্থায়ী হয়ে থাকে। কখনো বাহ্যিক বা বস্তুগত আবার কখনো অভ্যন্তরীন বা অবস্তুগত হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যে রূপান্তর দ্বারা সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ ক্রিয়ার ব্যবধান ঘটে না সে রূপান্তরকে পরিবর্তন বলা যায়

স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা বলতে পারি যে, সমাজের বিশেষ রূপান্তরকে পরিবর্তন বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে কোন রূপান্তরকেই আমরা পরিবর্তন বলতে পারি কি? বস্তুতপক্ষে, তা পারা যায় না। কারণ , যে রূপান্তর দ্বারা সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ ক্রিয়ার ব্যবধান ঘটে না সে রূপান্তরকে পরিবর্তন বলা যায় না। কারণ আমরা জানি যে, পরিবর্তন হচ্ছে পুনর্গঠনমূলক একটি প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ আমরা সমাজবিজ্ঞানী জিন্সবার্গের কথা মনে করতে পারি। তিনি বলেছেন, যে রূপান্তর বা প্রকারান্তর সামাজিক কাঠামোর ক্রিয়াকে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে তাকে পরিবর্তন বলা চলে।

পরিবর্তন প্রত্যয়টি সমাজতত্ত্ববিদরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। অনেকে সামাজিক পরিবর্তনকে দেখেছেন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দৃষ্টিতে, আবার অনেকেই এটিকে কাঠামোগত পরিবর্তন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি যে, সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। তবে সমাজের কাঠামোর সামগ্রিক পরিবর্তন না হয়েও কাঠামোর বিশেষ অংশের পরিবর্তন ঘটে তাকেও পরিবর্তন বলা যায়। তাকে আমরা আংশিক পরিবর্তন বলতে পারি। আবার সমাজের আমূল পরিবর্তনও ঘটতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, আংশিক পরিবর্তনের ফলে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে না।

পরিবর্তন প্রত্যয়টি সমাজতত্ত্ববিদরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। অনেকে সামাজিক পরিবর্তনকে দেখেছেন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দৃষ্টিতে আবার অনেকেই এটিকে কাঠামোগত পরিবর্তন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, মূল্যবোধের পরিবর্তনকে ও সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়। অন্য কথায়, মানুষের আরচরণ বিধির পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। উইলবার্ট ও মুর (Wilbert and Moore) সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন বুঝিয়েছেন। সমাজতত্ত্ববিদ রস (Ross) পরিবর্তনকে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনকে না বলে এটিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমেরিকার সামাজিক পরিবর্তনকে তিনি নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণীতে

www.swapno.in

বিভক্ত করেছেন ঃ (১) গণতন্ত্রের উন্নতি; (২) নারী মুক্তি; (৩) বিবাহ বিচ্ছেদের ক্রমিক বৃদ্ধি, এবং (৪) জনগণের ক্রমবর্ধমান বহিরাগমন।

সমাজতত্ত্ববিদ রস আমেরিকার সামাজিক পরিবর্তনকে নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ (১) গণতন্ত্রের উন্নতি; (২) নারী মুক্তি; (৩) বিবাহ বিচ্ছেদের তালাক সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি, এবং (৪) জনগণের বহিরাগমন ক্রমবর্ধমান।

সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসারের মতে সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে একটি ও সহজ-সরল সংগঠন থেকে একটি জটিল কাঠামোয় ক্রমশ রূপান্তরকে বুঝায়। সমাজবিজ্ঞানী ওয়ার্ড (Lester Frank Ward) মনে করেন যে, উদ্দেশ্যমূলক এবং যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের গতি বাড়িয়ে দেয়া যায় এবং পরিবর্তনের গতিকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা যায়। সমাজবিজ্ঞানী এলউডের (EA.Ellwood) মতে সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের অজ্ঞাতসারেই সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হতো; কিন্তু পরবর্তী স্তরগুলোতে সামাজিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে যুক্তিশীল ও উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা। সমাজবিজ্ঞানী (L.T. Hobhouse) অনেকটা এ ধরনেরই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, মানুষ বুদ্ধি দ্বারা পার্থিব শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক উন্নতি সাধন করতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) সামাজিক পরিবর্তনকে একটি ধারাবাহিক প্রগতি হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। পক্ষান্তরে, কিছু কিছু সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক পরিবর্তনকে মানুষের আচরণ প্রণালীর পরিবর্তন হিসাবে দেখেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) সামাজিক পরিবর্তনকে একটি ধারাবাহিক প্রগতি হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। পক্ষান্তরে, কিছু কিছু সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক পরিবর্তনকে মানুষের আচরণ প্রণালীর পরিবর্তন হিসাবে দেখেছেন। সমাজতত্ত্ববিদরা সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা আচার অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু মার্কসবাদীরা সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সামাজিক পরিবর্তন হলো উৎপাদান ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন। আদিম সমাজ ছাড়া প্রতিটি সমাজের একটি নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থা আছে। তাঁদের মতে উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলেই সামাজিক পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বস্তু জগতের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতিই সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকদিকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

ইতিমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছি যে, সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। মতানৈক্য থাকাই স্বাভাবিক। বিশ্লেষণের স্বার্থে তারা এটিকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভাষায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। রজার্স (Rosers) সামাজিক পরিবর্তন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করেছেন যার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। তাঁর ভাষায় "Social Change is the process by which alteration occurs in the structure and function of social system" উল্লেখ্য, সামাজিক ক্রিয়া ও সমাজ কাঠামো পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। সংগতভাবেই রজার্স সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর মতে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া তিনটি ভাগে বিভক্ত : উদ্ভাবন (Innovation), পরিব্যাপ্তি (Diffusion) এবং পরিণতি (Consequence)। প্রথমটি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সেটি বিকশিত হয়। পরিব্যাপ্তি হলো পরবর্তী প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থার নতুন ধারনা সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ঘটায়। আর নতুন ধারণাকে গ্রহণ বা বর্জন করার ফলে সমাজে যে পরিবর্তন ঘটে সেটাই হল তার পরিণতি। সামাজিক পরিবর্তনকে রজার্স (Rosers) দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি চিরন্তন অথবা অভ্যন্তরীণ('Immanent' or 'Endogeneous') অপরটি, সংযোগ অথবা বহিরাগত ('Contact' or 'Exogeneous')। প্রথম ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাইরের কোন প্রভাব ছাড়াই একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার ভেতর থেকেই সামাজিক পরিবর্তন হয়। অপরদিকে, একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার ভেতর থেকে বা নিজস্বভাবে পরিবর্তন না হয়ে বাইরের সূত্র (Source) থেকে সৃষ্ট পরিবর্তনকে দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন বলা হয়। দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি

www.swapno.in

নৈর্বাচনিক (Selective), অপরটি প্রত্যক্ষ (Direct)। প্রথমটির ক্ষেত্রে বহিরাগত কোনো ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন ধারণা বা ব্যবস্থার সংযোগ ঘটায় এবং পরবর্তীকালে জনগণ সেটি নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাখ্যা, গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। অপরদিকে, বহিরাগতদের দ্বারা যখন পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয় এবং তখন যে পরিবর্তন ঘটে তাকে প্রত্যক্ষ পরিবর্তন বলে।

সামাজিক পরির্তনের কারণ

আদিম যুগ হতে শুরু করে বিশ শতকের সমাজতন্ত্র পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানব সমাজ বিকাশ লাভ করেছে। সাধারণত আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, সমাজের এ রূপান্তর কিভাবে ঘটেছে? অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক কারণ, মনোবিজ্ঞানীগণ মনস্তাত্ত্বিক কারণ আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক কারণের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সামাজিক পরিবর্তন কোন এক বিশেষ পথ ধরে সংঘটিত হচ্ছে না। সেজন্য একই সমাজে একই সময়ে বিভিন্ন উপাদান পরিবর্তনের পিছনে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। কোন সময় একটি বিশেষ কারণ প্রত্যক্ষ হয় বলে তাকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে সকল পরিবর্তনের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়; যেমন কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক উপাদানকে সামাজিক পরিবর্তনের মুখ্য কারণ বলে ধরে নিয়েছেন। তেমনি ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) সাংস্কৃতিক উপাদানকে সামাজিক পরিবর্তনের কারণ বলে বিবেচনা করছেন। অবশ্য, সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে ঘটিষ্ঠ সম্পর্ক। ফলে কোনটি মুখ্য বা কোনটি গৌণ তা নির্ধারণ করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। সমাজতত্ত্ববিদ সরোকিন (Sorokin) তাঁর Contemprary Sociological Theories” নামক গ্রন্থে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। সে যা হোক সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রাকৃতিক (Natural), মানুষ সৃষ্ট পরিবর্তন (Man made change), এবং জনসংখ্যার স্থানান্তর (Migration) । প্রাকৃতিক কারণ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে মানব সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেভাবে ক্রিয়াশীল ছিল বর্তমান সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে এর প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবু আধুনিক কালে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। মানুষের সৃষ্ট উপাদান সামাজিক পরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আদিম অর্থনৈতিক (খাদ্য আহরণ ও সংগ্রহ এবং শিকার) ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে এবং এর সাথে সাথে আদিম প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, পরিবার, বিবাহ, ধর্ম, রাজনীতি, আদর্শ ও নৈতিকতা, অবসর বিনোদন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। জনসংখ্যার ব্যাপক স্থানান্তর এবং জনসংখ্যার কাঠামোও (population Structure) সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

> সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রাকৃতিক (Natural), মানুষ সৃষ্ট পরিবর্তন (Man made change), এবং জনসংখ্যার স্থানান্তর (Migration)।

এছাড়া, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপাদান। দ্বন্দ্ব ও (অর্থনৈতিক ও জাতিগত) সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের জাতিগত দ্বন্দ্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রকে উল্লেখ্যযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রবীণের সঙ্গে নবীনের নীতি আদর্শের দ্বন্দ্বও সমাজ পরিবর্তনের জন্য কম দায়ী নয়। কেননা দেখা যায়, প্রবীনেরা বেশী মাত্রায় ঐতিহ্যপ্রিয়, পক্ষান্তরে নবীনেরা প্রগতিবাদী। অনেকসময় বিশেষ ধরনের মতবাদ (রাজনৈতিক ও ধর্মীয়)

www.swapno.in

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন, "মার্কসবাদ" সামাজিক পরিবর্তনে অত্যন্ত বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। ওয়েবারের মতে 'প্রোটেস্টান্ট ধর্ম' ইউরোপে সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদী সমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। যুগে যুগে সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে বিভিন্ন মহাপুরুষ (ধর্মীয় ও রাজনৈতিক) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এর ফলেও সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছে।

রবার্ট বিয়ারস্টেড সামাজিক পরিবর্তনের কতকগুলো বিশেষ কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা - ১) ভৌগোলিক কারণ, ২) জৈবিক কারণ, ৩) জনসংখ্যা, ৪) রাজনৈতিক ও সামাজিক, ৫) প্রযুক্তিগত, ৬) অর্থনৈতিক এবং ৭) মহৎ ব্যক্তির

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান প্রধান কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট বিয়ারস্টেড তার 'Social order : An Introduction to Sociology' নামক গ্রন্থে সামাজিক পরিবর্তনের কতকগুলো বিশেষ কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা - ১) ভৌগোলিক কারণ, ২) জৈবিক কারণ, ৩) জনসংখ্যা, ৪) রাজনৈতিক ও সামাজিক, ৫) প্রযুক্তিগত, ৬) অর্থনৈতিক এবং ৭) মহৎ ব্যক্তির ভূমিকা।

পরিবর্তনের উপরোক্ত কারণসমূহের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে, সামাজিক পরিবর্তন অনন্য হলেও পরিবর্ধনের কারণ সমূহকে সম্পূণ বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যায় না।

১। **ভৌগোলিক কারণ ঃ** মানব জীবনের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের ফলে মানুষের জীবন যাপন প্রণালীতে তারতম্য ঘটে।

২। **জৈবিক কারণ ঃ** সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্নতার মূলে (অনেকের মতে) জৈবিক কারণ বিদ্যমান।

৩। **জনসংখ্যা ঃ** জনসংখ্যার আকৃতি ও এর অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের পারিবারিক জীবন, সামাজিক দলগত জীবন, সামগ্রিক সমাজ জীবন, জাতীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক জীবনে বহুবিধ রূপান্তর ঘটায়।

৪। **রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ ঃ** সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণের ফলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট সমাজের দলগত জীবনেও রূপান্তর আসে।

৫। **প্রযুক্তিগত কারণ ঃ** সমাজের সামগ্রিক ও দ্রুত পরিবর্তন সাধনে শিল্পায়ন ও নগরাগণের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। আর এর পিছনে থাকে মূলত প্রযুক্তিগত কারণ। পাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থায় এটি বিশেষভাবে প্রতীয়মান।

৬। **অর্থনৈতিক কারণ ঃ** উৎপাদন পদ্ধতি সমাজের মৌল কাঠামো গড়ে তুলে, যাকে কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক কাঠামো বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর উক্ত মৌল কাঠামোর উপর নির্ভর করে সৃষ্টি হয় সমাজের রাজনৈতিক আইনানুগ উপরিকাঠামো এবং সামাজিক সচেতনতা। যখন মৌল তথা অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন সূচিত হয় তখন শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক উক্ত উপরিকাঠামোতেও আমূল রূপান্তর ঘটে। এভাবেই সমাজ কিংবা এর কাঠামোর বিবর্তন ঘটে আসছে।

www.swapno.in

৭। **মহৎ ব্যক্তির ভূমিকা** - সমাজে মহৎ ও গুণী ব্যক্তির প্রভাব বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। যার কারণে দরুন সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারের পরিবর্তন ঘটে।

মরিস জিন্সবার্গ (M. Ginsberg) সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নিম্নোক্ত উপাদানের নাম উল্লেখ করেছেন, যথা-

১। ব্যক্তির সচেতন উদ্দেশ্য ও তার সিদ্ধান্ত
২। ব্যক্তির কার্যাবলী (যা পারিপার্শ্বিক অন্যান্য উপাদান দ্বারা প্রভাবিত)।
৩। মৌল কাঠামোগত পরিবর্তন, যা উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে রূপান্তর ঘটায়।
৪। বাহ্যিক প্রভাব, যেমন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও যুদ্ধে জয়-পরাজয়।
৫। প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব নেপেলিয়ান, হিটলার, লেলিন, মাওসেতুং মহাত্মাগান্ধী বা গোষ্ঠীর প্রভাব।
৬। বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক উপাদানের অভিমতে কোন বিশেষ সামাজিক শক্তির সূচনা যেমন- সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব।
৭। ঔপনিবেশিক শাসন ও এর প্রভাব (ইতিবাচক)।
৮। জনগোষ্ঠীর কোন সাধারণ বিশেষ ইচ্ছার উন্মেষ, যেমন - জাতীয়াবোধে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠী বা উন্নয়নের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজনৈতিক দল ও সম্পৃক্ত জনতা।

ক্রিয়াবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের আমূল পরিবর্তনের বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে চান। তাঁদের মতে সমাজের আমূল পরিবর্তন একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়। তাঁরা সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে ঐকমত্যের উপর এবং মতামতের দ্বন্দ্বের চেয়ে সমন্বয়ের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন।

একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হয় যে, প্রতিটি সমাজ যেমন একদিকে পরিবর্তিত হচ্ছে অন্যদিকে সমাজগুলো তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বেশ খানিকটা বজায়ও রেখেছে। তাই বলা হয় সব সমাজেরই রয়েছে দুটি বৈশিষ্ট্যর :পরিবর্তন (Change) এবং ধারাবাহিকতা (continuity) দু'টি প্রক্রিয়াই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষা পদ্ধতি তথা সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। সমাজের বা খুবই পরিবর্তন তো স্বাভাবিক ব্যাপার, যা অনেক বিভিন্ন কারণে সংঘটিত হতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রভূত প্রযুক্তিগত প্রগতির ফলে গণ-মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সারা বিশ্বে যে সকল আবিষ্কার সংঘটিত হচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাধ্যমে সেগুলোর সরাসরি সম্প্রচার সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। এগুলো ছাড়াও যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জাতিগত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পরিবর্তন ত্বরান্বিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে স্ব স্ব দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবর্তন করছে যার ফলে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। অন্যদিকে, উপজাতীয় সমাজ ও আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশে জাতিগত দ্বন্দ্ব সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আজও ক্রিয়াশীল।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ
Causes of Social Change in Bangladesh

www.swapno.in

বহুবিধ উপাদানের দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হলেও কখনও কখনও একক উপাদান তত্ত্বকে বড় করে দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা জানি যে, সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যায় না। বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাহ্যত আমরা মনে করতে পারি যে, দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কারণগুলো ব্যতীত আরো অনেক কারণ রয়েছে যেমন, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলো বিশেষভাবে সমাজের পরিবর্তন সাধন করছে।

আমাদের দেশের ভৌগোলিক আয়তনের চেয়ে আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশী। আমাদের দেশ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। আমাদের অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন সাধন করতে হলে সাথে শিল্পায়ন ও যান্ত্রিক কলকারখানার উন্নতি সাধন অপরিহার্য।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমাদের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের সমাজ কাঠামোয় রূপান্তর আছে। তাছাড়া, বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রসারিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন, নিত্য-নতুন ফ্যাশন ও রুচির পরিবর্তন এসবকে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি বলা যেতে পারে।

কাজেই আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি শিল্পায়ন, নগরায়ন রাজনৈতিক ও জৈবিক কারণ কার্যকর রয়েছে। প্রায়ই দেখা গেছে যে, সমাজবিজ্ঞানীরা উপরিউক্ত যেকোন একটি কারণকে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী বলে দাবী করেছেন। আধুনিক কালে প্রায় সব দেশেই কমবেশী দেখা যাচ্ছে যে, সমাজকে তথা রাষ্ট্র ও পরিবারকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে।

অনুশীলন - ১ (Activity 1) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী পাঁচটি উপাদানের নাম লিখুন ঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুশীলন - ২ (Activity 2) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

www.swapno.in

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের তিনটি কারণ লিখুন ঃ

১.
২.
৩.

সারাংশ

সামাজিক পরিবর্তন বলতে সাধাণত সমাজ কাঠামোর পুনর্গঠন বা রূপান্তরকে বুঝায়। তবে যে রূপান্তর দ্বারা সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ ক্রিয়ার ব্যবধান ঘটে না সে রূপান্তরকে পরিবর্তন বলা যায় না। সামাজিক পরিবর্তনের মুলে রয়েছে কিছু কারণ। মুখ্য কারণগুলো হল - ভৌগোলিক, জৈবিক, জনসংখ্যা, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক,শিল্প ও প্রযুক্তি বিপ্লব এবং মহৎব্যক্তির ভূমিকা ইত্যাদি।

পঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। রসের মতে পরিবর্তন বলতে আমরা কি বুঝি?
ক) মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন
খ) সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন
গ) সাংস্কৃতিক পরিবর্তন
ঘ) মূল্যবোধের পরিবর্তন

২। সামাজিক পরিবর্তনকে ধারাবাহিক প্রগতি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন?
ক) ফ্রান্সিস বেকন খ) এল. টি. হব হাউজ
গ) রজার্স ঘ) সরোকিন

৩। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ কি?
ক) জনসংখ্যা খ) অর্থনৈতিক
গ) ভৌগোলিক ঘ) সাংস্কৃতিক

৪। রবার্ট বিয়ারষ্টেড তাঁর গ্রন্থে সামাজিক পরিবর্তনের কয়টি কারণ উল্লেখ করেছেন।
ক) ৭টি খ) ৮টি
গ) ৯টি ঘ) ১০টি

www.swapno.in

সামাজিক বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতি ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

১। বিবর্তনের সংজ্ঞা, প্রাথমিক ধারণা ও পর্যায়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
২। উন্নয়নের সংজ্ঞা, প্রাথমিক ধারণা ও মাপকাঠি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
৩। প্রগতির সংজ্ঞা, প্রাথমিক ধারণা ও মানদন্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন।
৪। পরিবর্তনের সাথে বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতি এ তিনটি প্রত্যয়ের সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সমাজবিজ্ঞান তার জন্মলগ্ন থেকেই সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের দর্শনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। অন্যদিকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজের দ্রুত ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার সাথে ও ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী এই পরিবর্তনকে বিভিন্নভাবে ব্যখ্যা করেছেন। তবে তাঁরা তাঁদের রচনাবলীতে পরিবর্তন, (Change) বিবর্তন (Evolution), উন্নয়ন (Development) এবং প্রগতির (Progress) কোন সুস্পষ্ট ধারণা দেন নি। তাঁদের রচনায় এসব প্রত্যয়কে অনেকটা অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও বা বলা হয়েছে এসব প্রত্যয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অবশ্য পরবর্তীকালে সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের ব্যাখ্যায় বিবর্তন, উন্নয়ন, এবং প্রগতি নামক প্রত্যয়সমূহের যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তবে পরিবর্তন (Change) প্রত্যয়কে সবচেয়ে নিরপেক্ষ (Nutral) শব্দ (Term) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বিবর্তন (Evolution)

> ল্যাটিন শব্দ Volvo থেকে ইংরেজি Evolution শব্দের উৎপত্তি। ঐ মূল ল্যাটিন শব্দটির অর্থ উন্নত হওয়া বা উন্নত করা (to develop অথবা উন্মোচন বা ভাঁজ খোলা (To unfold)। অতএব Evolution এর বাংলা প্রতিশব্দ বিবর্তন বা বিকাশ হতে পারে।

ল্যাটিন শব্দ Volvo থেকে ইংরেজি Evolution শব্দের উৎপত্তি। ঐ মূল ল্যাটিন শব্দটির অর্থ উন্নত হওয়া বা উন্নত করা (to develop অথবা উন্মোচন বা ভাঁজ খোলা (To unfold)। অতএব Evolution এর বাংলা প্রতিশব্দ বিবর্তন বা বিকাশ হতে পারে। বিশেষ করে বিবর্তন প্রত্যয়টি কোন জীবদেহের অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধিকে (growth) বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এভাবে আমরা বলি যে, একটি গাছ বা কোন একটি প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথবা বলা চলে যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর মনের বিকাশ বা উন্নতি ঘটছে।

> মার্কস সমাজকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হল ঃ ১) আদিম সম্যবাদী সমাজ, ২) দাসপ্রথা, ৩) সামন্তবাদ, ৪) পুঁজিবাদ এবং ৫) সমাজতন্ত্র এবং ৬) আধুনিক সাম্যবাদ।

সাধারণত বিভিন্ন সমাজ অবস্থার স্বাভাবিক রূপান্তরকে বোঝাবার জন্য সমাজতত্ত্ববিদরা বিবর্তন প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করে থাকেন। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু সমাজ রাতারাতি রূপান্তরিত হয় না। বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমাজতত্ত্ববিদরা সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন, ডুর্কীম (Durkheim) সমাজকে যান্ত্রিক ও জৈবিক সংগতিতে বিভক্ত করেছেন। বার্নস (Bornes) সমাজ ব্যবস্থাকে আদিম, পশুচারণ, কৃষি এবং শিল্প পর্যায়ে বিভক্ত করছেন। অপরদিকে, মার্কস সমাজকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হল ঃ ১) আদিম সাম্যবাদী সমাজ, ২) দাসপ্রথা, ৩) সামন্তবাদ, ৪) পুঁজিবাদ, ৫) সমাজতন্ত্র এবং ৬) আধুনিক সাম্যবাদ। নৃবিজ্ঞানী Morgan সমাজ ব্যবস্থাকে বন্যদশা (Savagery), বর্বর দশা (Barbarism) এবং সভ্যতা (Civilization) এ তিন ভাগে বিভক্ত

www.swapno.in

করেছেন। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ বোঝাবার জন্য সমাজতত্ত্ববিদরা বিবর্তন প্রত্যয়টি প্রয়োগ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী বাঙালী ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার বলেন, " ইতিহাসের প্রথম কথাই হইল পরিবর্তন। মানুষের জীবনযাত্রা চিরকাল একভাবে চলে না, সামাজিক কোন ব্যবস্থা নানা কারণে দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকতে পারে বটে। কিন্তু তাহারও আরম্ভ ছিল এবং শেষ আসিবে। এই কথা সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ সংগঠনের সকল সম্বন্ধেই খাটে। কোনও প্রথা তাই অনাদি বা অনন্ত হইতে পারেনা। মানুষের ইতিহাস প্রবাহমান স্রোতের মতন। সেখানে চিরস্থির বা সনাতন কিছু নেই। বৈজ্ঞানিকেরা এই ধারণাকে এভলিশন বা ক্রমবিকাশ নাম দিয়েছেন। সমাজের এই বিবর্তন সাধারণত মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু মাঝে মাঝে সমাজের বিবর্তনের হার খুবই দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক বিবর্তনকে অনেকেই উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু মার্কস (Marx) প্রমাণ করেছেন যে, বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে বিবর্তন হয়। "সুশোভন সরকারের ভাষায় সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের স্রোত সাধারণত ধীরে ধীরে বহিয়া চলে। কিন্তু যুগান্তরের সময় হঠাৎ বিপুল বেগে যাহা ঘটে তাহাকে আমরা বিপ্লব নাম দিয়ে থাকি। চিরস্থিতির ধারণা পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিকরা যখন এভলিশনের আশ্রয় লইলেন তখন বৈপ্লবিক বদলের কথাটা অনেকেই স্বীকার করেন নাই তবে মার্কসবাদ বিপ্লবকেও প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে স্থান দিয়েছেন।"

সমাজবিস্তারে সামাজিক বিবর্তন সংক্রান্ত ধারণাটি জীব-জগতের বিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্ব থেকে। গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ জীববিজ্ঞান থেকে সমাজতত্ত্ববিদরা বিবর্তন প্রত্যয়টিকে সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহার করেন। যে সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনকে জীব জগতের পরিবর্তনের সাথে তুলনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইংল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার অন্যতম। স্পেনসার 'Social Statics' নামক গ্রন্থে ব্যাপকভাবে সমাজকে প্রাণীদেহের সাথে তুলনা করেছেন।

স্পেনসার (Spencer) তার বিভিন্ন গ্রন্থে বিবর্তন প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করেছেন। তার মতে সহজ সরল অবস্থা থেকে একটি জটিল অবস্থায় সমাজের পরিবর্তন হয় স্পেনসারের বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক নাজমুল করিম বলেন, " সমাজ কাঠামোতে ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছে। স্পেনসার দেখিয়েছেন, কি করে একটি মুরগরি ডিম ছানাতে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ একটি মুরগীতে রূপন্তরিত হচ্ছে। সমাজের বিবর্তনও অনুরূপ। ডিমের গড়নের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, এটি একটি অতি সাধারণ সংগঠন। এর কেন্দ্রে হলুদ অংশ ও তাকে আবেষ্টন করে আছে শ্বেত তরল পদার্থ, যাকে বলা হয় এলবুমীন। ডিমের এই উভয় অংশকে আবৃত করে আছে অপেক্ষাকৃত একট শক্ত খোসা। ডিমকে তা দেওয়া হলে বেরোয় মুরগরি বাচ্চা। মুরগীর বাচ্চার গড়ন ডিমের তুলনায় কত জটিল। এর মাথা, চোখ, কান, পা, পাখা, হৃৎপিন্ড, অন্ত্রনালী, রক্তচলাচল ব্যবস্থা ইত্যাদি অসংখ্য কত কি। স্পেনসার বলেন যে, অনুরূপভাবে সমাজও অতি সহজ কাঠামো থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে জটিল কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে।"

স্পেনসার (Spencer) তার বিভিন্ন গ্রন্থে বিবর্তন প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করেছেন। তার মতে সহজ সরল অবস্থা থেকে একটি জটিল অবস্থায় সমাজের

প্রাণীদেহের সাথে সমাজের বিবর্তনের যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে তাকে অনেক আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ সমালোচনা করেছেন। যেমন, সমাজতত্ত্ববিদ অগবার্ণ (Ogburn) তার 'Social Change' নামক গ্রন্থে যদিও সামাজিক বিবর্তনের। ধারণাটিকে সরাসরি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন সংক্রান্ত সূত্র সন্ধান করার প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সমাজতত্ত্ববিদ অগবার্ণ সামাজিক বিবর্তনের ধারণাটিকে যদিও সরাসরি অস্বীকার করেননি, কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন সংক্রান্ত সূত্র সন্ধান করার প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

www.swapno.in

'বিবর্তন' হচ্ছে জীববিজ্ঞান ব্যবহৃত একটি শব্দ যার অর্থ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন সাধন। প্রাণীতত্ত্ববিদ চার্লস ডারউইন তাঁর 'Origin of the Species' নামক গ্রন্থে জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, জীব জগতে মাধ্যমেই বিবর্তন ঘটেছে। তিনি প্রাণীজগতের বিকাশকে বিবর্তন বলেছেন। অনেক সমাজবিজ্ঞানীই সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডারউইনের সূত্র 'বির্বতন' সূত্রকে গ্রহণ করেছেন।

ডারউইনের মতবাদকে সমর্থন করে লুউইগ গ্লোমপ্লোজি (Ludwig Gumplowich) মনে করেন যে, সমাজ জীবন বিবর্তনের ধারায় চলে এসেছে। তিনি 'বিবর্তন' শব্দকে আমূল পরিবর্তন' বলে মনে করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, প্রাকৃতিক জগৎ সহজতর স্তর থেকে জটিলতর স্তরে যাওয়ার মূলে রয়েছে বিবর্তন। এছাড়া, আমেরিকার প্রথম সারির সমাজবিজ্ঞানীগণ ডারউইনের বিবর্তনবাদকে অনুসরণ করে সমাজের ক্রমোন্নতির ব্যাখ্যা করেছেন।

বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী স্যার ই.বি টাইলর (Tylor) তাঁর 'Primitive Culture' নামক গ্রন্থে বিবর্তন শব্দটিকে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের বিকাশ বিশ্লেষণে লক্ষ্য করেছেন যে, কোন সমাজই রাতারাতি পরিবর্তিত হয়নি। কোন উপাদানের বিলুপ্তির সাথে সাথে অন্য উপাদানের উদ্ভব ঘটছে। তারা এটাকেই 'বিবর্তন' বলেছেন। মূলত ডারউইন বলতে যা বুঝিয়েছেন সে ধারণার আশ্রয় নিয়েছেন অনেক সমাজবিজ্ঞানী যেমন- হার্বার্ট স্পেনসার, লুডউইগ গ্লোমপ্লোজি টাইলর এবং এল.এইচ মর্গান।

ম্যাকাইভার বিবর্তন বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন উপাদানের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে।

আর এস ম্যাকাইভার R.M. MacIver বিবর্তন বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন উপাদানের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে। এটা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিবর্তন হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় (Automatic), অসচেতন (anconscious) এবং অপরিকল্পিত (Unplanned) একটি প্রক্রিয়া। কেননা, কোন উপাদানের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় যে গুণই থাকুক না কেন তার পূর্ণ বিকাশই হলো বিবর্তন। এখানে এটাও বলা যায় যে, প্রতিকূল পরিবেশ না থাকলে সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান গুণের বিকাশ বিলম্ব হলেও ঘটবেই।

নৃবিজ্ঞানী মর্গান সমাজব্যবস্থার বিকাশধারাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা- বন্যদশা, বর্বরদশা ও

সামাজিক বিবর্তন বিষয়ে ফরাসী সমাজতত্ত্ববিজ্ঞানী এমিল ডুর্খবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে সমাজ বিবর্তন হচ্ছে 'যান্ত্রিক' পর্যায় থেকে 'জৈবিক পর্যায়ে উত্তরণ। অর্থাৎ মানব সমাজের প্রথম পর্যায়ে সামাজিক সংহতি ছিল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমবিভক্তির বিকাশ ঘটে এবং তখন থেকেই সামাজিক সংগতি দুর্বল হতে শুরু করে এবং সমাজে জৈবিক সংহতির সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমেরিকার নৃবিজ্ঞানী মর্গান সমাজব্যবস্থার বিশালধারাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা- বন্যদশা, বর্বর দশা ও সভ্যতা। সভ্যতাকে মর্গান আবার দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, একটি প্রাচীন ও অপরটি আধুনিক। উল্লেখ্য, তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রত্যেকটিকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ নিয়ে মতভেদ থাকলেও সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে সবাই ঐক্যমত্য পোষণ করেন। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতি নীতি, মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান ও মানুষের আচরণ পদ্ধতির সেরূপ পরিবর্তন ঘটেছে। অতীতের একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে বর্তমানের একটি প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক

www.swapno.in

সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে মতভেদ থাকলেও সমাজের বিবর্তন ঐক্যমত্য পোষণ করেন।

আলোচনা করলেই সে সম্পর্কে সুষ্ঠ ধারণা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কারণসমূহ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উন্নয়ন (Development)

উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। এর সাথে জড়িত রয়েছে সার্থকতা ও কর্মের মূল্যায়ন।

উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। এর সাথে জড়িত রয়েছে সার্থকতা ও কর্মের মূল্যায়ন। সাধারণভাবে উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝে থাকি প্রগতি। কিন্তু যখন উন্নয়ন শব্দটি উচ্চারিত হয় তখন অনুন্নয়নের কথাও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। আবার যখন উন্নয়নকে বিশ্লেষণ করি তখন এর অর্থ দাঁড়ায় কোন কাজের পরিপূর্ণ বিকাশ বা ফল; যেমন, আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলে থাকি 'কাজের উন্নতি', 'স্বাস্থ্যের উন্নতি' ও 'দেশের উন্নতি' ইত্যাদি।

সমাজবিজ্ঞানে 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টির প্রয়োগ নিয়ে বেশ খানিকটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় আয় আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেলে বা মানুষের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভাল হলে অর্থনীতিবিদরা সেটিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হিসাবে গণ্য করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও উন্নয়ন প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণে উন্নয়ন প্রত্যয়টির প্রয়োগ নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এর অন্যতম কারণ রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেই সমাজের উন্নয়ন হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কেননা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (যেমন, ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক) পরিবর্তনকে, ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা, পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়ন শব্দগুলো কখনো অভিন্ন অর্থে আবার কখনো ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রত্যয়গুলোর যথার্থ প্রয়োগ নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা যে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হন- সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী টি.বি বটোমোরের উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায় "In the earlier sociological theories the notions of change evolution development and progress are sometimes conduced or combined in a single concept in other cases a distinction is made between them but they are treated as logically related terms" অর্থাৎ পরিবর্তনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে 'বিবর্তন' অধিকতর সঠিক নয় 'উন্নয়ন' ও 'প্রগতি' নামক প্রত্যেকটি প্রত্যয়কে সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

সামাজিক প্রপঞ্চকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে 'বিবর্তন' শব্দটি যেভাবে সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, 'উন্নয়ন' শব্দটি এর চেয়ে কোন অংশ অধিকতর সঠিক নয়। বটোমোর (Bottomore) এ সম্পর্কে বলেন "The term development is however no more precise than the term evolution in its application to social phenomena."

উল্লেখ্য, Oxford English Dictionary তে 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "Development means a gradual unfolding a fuller working out of the details of any thing; the growth of what is in the germ" এধরনের সংজ্ঞার মাধ্যমে আমরা জীবাণু ও শিশুর উন্নতি বুঝে থাকি। কিন্তু একই অর্থে 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে আমরা সামাজিক 'উন্নয়ন' বোঝাবার জন্য ব্যবহার করতে পারি না। এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে, সমাজবিজ্ঞানীরা 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন? সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে মোটামুটি সঠিকভাবে 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টি ব্যবহার করা সম্ভব। বটোমোরের মতে এসব হল ঃ ১)

www.swapno.in

জ্ঞানের বিকাশ (Growth of Knowledge) এবং ২) কারিগরি ও অর্থনৈতিক দক্ষতা মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা অর্জন।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, প্রথমদিকে 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে সমাজতত্ত্ববিদরা এ প্রত্যয়টিকে ভিন্নভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণে দু'ধরনের সমাজকে বোঝাবার জন্য এ বিশেষ প্রত্যয়টি ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রথমত, শিল্পায়িত সমাজ; অন্যদিকে, যে সকল সমাজ এখনো মুখ্যত গ্রামীণ, কৃষিভিত্তিক ও দরিদ্র। দ্বিতীয়ত, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক সমাজ শিল্পায়িত সমাজে পরিবর্তিত হচ্ছে সে প্রক্রিয়াকে বোঝাবার জন্য 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করা হয়। 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টির প্রয়োগ সময়ের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত। কোনো এক বিশেষ সময়ের সামাজিক অবস্থাকে বোঝাবার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা 'উন্নয়ন' শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকেন। আজকের পাশ্চাত্যে কোন সামাজিক অবস্থাকে বোঝাবার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা 'উন্নয়ন' শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকেন? কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে ঐ বিশেষ সামাজিক অবস্থাকে বোঝাবার জন্য উন্নয়ন প্রত্যয়ের যথাযথ প্রয়োগ নাও হতে পারে। অন্য কথায়, উন্নয়ন প্রত্যয়টির প্রয়োগ স্থিতিশীল নয় বরং গতিশীল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কোনো একটি সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অগ্রগতি হলে 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টির ব্যবহার করা যেতে পারে।

> মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কোনো একটি সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় অগ্রগতি হলে 'উন্নয়ন' প্রত্যয়টি ব্যবহার করা যেতে পারে।

জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিবর্তনবাদের সূত্রানুসারে সমাজবিজ্ঞানীরা 'উন্নয়নের' কতকগুলো মাপকাঠি ব্যবহার করেন এবং সেসব দিয়ে কোন দেশের উন্নতি পরিমাপ করেন। সাধারণত, সামাজিক 'উন্নয়ন পরিমাপ করতে দেখা হয় যে,

> সাধারণ, সামাজিক 'উন্নয়ন পরিমাপ করতে দেখা হয় যে,
> ১। সামাজিক সংহতি দৃঢ়তর হচ্ছে কিনা।
> ২। সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শাখা প্রশাখার মধ্যে দক্ষতা ও কর্ম ক্ষমতার উন্নতি ঘটছে কিনা।
> ৩। সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা বিরাজ করছে কিনা।

১. সামাজিক সংহতি দৃঢ়তর হচ্ছে কিনা।
২. সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শাখা প্রশাখার মধ্যে দক্ষতা ও কর্ম ক্ষমতার উন্নতি ঘটছে কিনা।
৩. সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা বিরাজ করছে কিনা।

এছাড়া সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্যগতমান, জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা, সকলের মঙ্গলের জন্য উৎপাদিত ধনের বন্টন ও উপভোগ, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ এবং প্রযুক্তির উত্তরোত্তর অগ্রগতির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা- এসবই সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা হয়।

সামাজিক উন্নয়নের যে সব মাপকাঠি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেসব বস্তুত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে। পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের মাপকাঠি হবে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, রাজনৈতিক উন্নয়নের (Political development) বলা যায়। রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের স্থলে অভিজাততন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের স্থলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা একধরনের রাজনৈতিক উন্নয়ন, আবার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী সচেতনতার বিকাশ ঘটিয়ে তথা সুপ্ত শ্রেণীচেতনা (class in itself) থেকে রাজনৈতিকভাবে শ্রেণী চেতনার (class for itself) বিকাশ সাধন করে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাভূত করে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক উন্নয়ন।

www.swapno.in

আসলে বস্তুগত সংস্কৃতির উন্নতির সাথে অবস্তুগত সংস্কৃতির খাপ খাইয়ে নিতে পারা (অর্থাৎ Culture lag এর সমস্যা দূর করা) এবং সমাজে শোষণের অবসান, বৈষম্যের মাত্রা কমিয়ে আনা এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানব কল্যাণে (যুদ্ধ বিগ্রহে বা ধ্বংস কার্যে নয়) ব্যবহার করাকেই প্রকৃত উন্নয়ন বলে অভিহিত করা যায়।

প্রগতি (Progress)

উন্নয়ন, বিবর্তন, পরিবর্তন ও প্রগতি নামক প্রত্যয়গুলো একটির সাথে আরেকটি এমনভাবে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত যে এদের একটিকে নিয়ে আলোচনা করতে হলে অন্যটিকে বাদ দেওয়া যায় না। সামাজিক বিবর্তনের ধারণা যেমন সামাজিক প্রগতির সাথে যুক্ত, তেমনি সামাজিক প্রগতির ধারণা মূলত ইতিহাসের দর্শনের সাথে সম্পর্কিত।

কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নেরই নাম প্রগতি। অন্য কথায়, মানুষের জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার এবং পরিকল্পনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি বিশেষ অবস্থা থেকে আরেকটি বিশেষ অবস্থায় সামাজিক উত্তরণকে প্রগতি বলা যায়।

প্রগতি বলতে কি বোঝায় সে প্রশ্নের উত্তর সমাজবিজ্ঞানীরা অন্বেষণ কাঙ্খিত উন্নয়নেরই নাম প্রগতি। অন্য কথায়, মানুষের জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার এবং পরিকল্পনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি বিশেষ অবস্থা থেকে আরেকটি বিশেষ অবস্থায় সামাজিক উত্তরণকে প্রগতি বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে যদি পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা যায় তবে সেটি প্রগতি বলে গণ্য হবে। বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও ও একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে অপর একটি নতুন সমাজের রূপ লাভ করতে পারে। বিজ্ঞান বিবর্তনের মাধ্যমে একটি নতুন সমাজব্যবস্থায় পৌছানো বলা যায় না। কেননা এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য পূর্ব থেকে কোন লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে না এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন পরিকল্পনাও গৃহীত হয় না।

সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁত (August Comte) মানব চিন্তার ক্রমবিবর্তনকে প্রগতি বলেছেন। তাঁর মতে মানবচিন্তার তিনটি স্তর হল ধর্ম-কেন্দ্রিক, অধিবিদ্যাগত এবং দৃষ্টবাদী (Theological metphysical and positive) স্তর। মানুষ পর্যায়ক্রমে ধর্ম-কেন্দ্রিক ও অধিবিদ্যাগত চিন্তার পর্যায় পার হয়ে বর্তমানে দৃষ্টিবাদী স্তরে উপনীত হয়েছে। এটা সামাজিক প্রগতি নির্দেশক।

ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) জীবদেহের সাথে সমাজদেহের তুলনা করেছেন এবং উভয়ই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে সমাজ সর্বদা উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই তিনি 'বিবর্তন'কে 'প্রগতি' হিসাবে বিবেচনা করেছেন।

এভাবে সমাজবিজ্ঞানীরা প্রগতির নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে সাধারণ কাঙ্ক্ষিত সামাজিক উন্নয়নকেই সামাজিক প্রগতি বলা হয়। বিভিন্ন দার্শনিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, সামাজিক চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক তাঁদের নিজস্ব দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে কাঙ্খিত সামাজিক উন্নয়নের প্রতি দিক নির্দেশ করেছেন। কোথাও এই কাঙ্ক্ষিত সূচিত হয়েছে, কোথাও হয় নি। যেখানে তা হয়েছে সেখানে সামাজিক প্রগতি অর্জিত হয়েছে বলা যায়।

কোন সমাজের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং আদর্শের ভিত্তিতেই তার সামাজিক প্রগতি যাচাই করা হয়।

কোন সমাজের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং আদর্শের ভিত্তিতেই তার সামাজিক প্রগতি যাচাই করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক উদ্দেশ্য এবং আদর্শের সফল বাস্তবায়ন হলেই তাকে সামাজিক প্রগতি বলে গণ্য করা যাবে। তবে উদ্দেশ্য এবং আদর্শ যদি বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণমুখী না হয় তা

www.swapno.in

হলে তা হবে অবৈজ্ঞানিক এবং এ ধরনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সামাজিক প্রগতির দিক নির্দেশ করে না।

সমাজ দার্শনিকরা যেমন যুগে যুগে সমাজের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তেমনি তারা নিজেদের মূল্যবোধও আরোপ করেছেন। St. Augustine তাঁর ('city of God' নামক গ্রন্থে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেছেন। সেরূপ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর সমকালীন সমাজে প্রচলিত অন্যায়ের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে একটি 'আদর্শ রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্লেটোর গ্রীক সমাজে 'আদর্শ রাষ্ট্রে' তিনটি বিশেষ শ্রেণী থাকবে এবং এদের কাজও নির্ধারিত থাকবে। প্লেটো প্রাচীন গ্রীক সমাজে ন্যায়বিচার-প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন যা কোনদিন বাস্তবায়িত হয় নি। 'আদর্শ রাষ্ট্র' শুধু তাঁর সংলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একইভাবে টমাস মুর তার 'Utopia' নামক গ্রন্থে তাঁর সমসাময়িক সমাজের, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরেন এবং কাল্পনিকভাবে এ সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করেন। এছাড়া আধুনিক সমাজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল "Scientific Outlook" নামক গ্রন্থে প্লেটোর মতো অনাগত ভবিষ্যত, সমাজের কথা চিন্তা করেছেন। যদিও এসকল সমাজ দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীর কল্পনাপ্রসূত চিন্তা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করেনি তবু এসবের সামাজিক মূল্য অপরিসীম। কারণ এ সকল কাল্পনিক চিন্তা ভাবনা সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার পক্ষে খুবই সহায়ক বলে বিবেচনা করা হয়।

> যেহেতু জীবজগৎ ও সমাজ জগতের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে সে কারণে জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত মাপকাঠি দিয়ে সামাজিক প্রগতিকে পরিমাপ করার চেষ্টা চলে আসছে।

শুধুমাত্র জীবজগতই বিবর্তিত হচ্ছে তা নয়, সমাজজীবনও বিবর্তিত হচ্ছে। এ জন্য জীবদেহের সাথে সমাজদেহের তুলনা করা হয়েছে। যে-সকল সমাজতত্ত্ববিদ সমাজের সাথে জীবদেহের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে স্পেনসার (Spencer) অন্যতম। বেশ কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী যেমন Giddings, Gilling and Blackmar সামাজিক প্রগতি পরিমাপ করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেহেতু জীবজগৎ ও সমাজ জগতের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই রয়েছে সেহেতু জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত মাপকাঠি দিয়ে সামাজিক প্রগতিকে পরিমাপ করার প্রয়াস চলে আসছে। অবশ্য সামাজিক প্রগতিকে এভাবে যাচাই করা কতটা যুক্তিযুক্ত সে সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। একটি মাত্র মাপকাঠি দিয়ে সামাজিক প্রগতি পরিমাপ করতে গেলে তার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, কোনো একটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (gross Natonal Product) একটি বিশেষ সময়ে বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু তাতে করে সমাজের সকল সদস্যের আর্থিক উন্নতি নাও হতে পারে। বাড়তি সম্পদ যদিও শুধুমাত্র স্বল্প সংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তাহলে নিশ্চয়ই সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হয় না। সুতরাং শুধুমাত্র উৎপাদন বা সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক প্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, বরং উৎপাদিত সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমেই আর্থিক ও সামাজিক প্রগতি অর্জন করা যেতে পারে।

সামাজিক প্রগতি পরিমাপের মাপকাঠিও সামাজিক উদ্দেশ্য ও আদর্শের উপর নির্ভর করতে পারে এবং তা সমাজ ও কালভেদে ভিন্নরকম হতে পারে। তবে সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত (১) সামাজিক সংহতি অর্জন; (২) সমাজের বিভিন্ন শাখার দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার উন্নয়ন; এবং (৩) সমাজের সকল অংশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধিকে সামাজিক প্রগতি পরিমাপের মৌল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন।

www.swapno.in

পরিবর্তন (Change)

পরিবর্তন বলতে এখানে মূলত সামাজিক পরিবর্তনকেই বুঝানো হয়েছে। যদিও এ পাঠের পূর্বে সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে তবু এখানে বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির সাথে পরিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

> যদিও 'বিবর্তন', ও 'প্রগতি' প্রত্যয়দুটি একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটিকে আরেকটি, থেকে বাদ দেওয়া যায় না, তবু মনে করা হয় যে, বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির মাধ্যমেই সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তন বলতে প্রধানত সমাজ কাঠামো তবে ক্রিয়ার পরিবর্তনকে বুঝায়। কারণ সামাজিক ক্রিয়া ও সমাজ কাঠামো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমাজ পরিবর্তনশীল। বিবর্তন উন্নয়ন ও প্রগতির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে। যদিও 'বিবর্তন', ও 'প্রগতি' প্রত্যয়দুটি একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটিকে আরেকটি, থেকে বাদ দেওয়া যায় না, তবু মনে করা হয় যে, বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির মাধ্যমেই সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

অনুশীলন ১ (Activity 1) **সময় ঃ ৩ মিনিট**

মর্গানের মতে সমাজ বিবর্তনের তিনটি পর্যায়ের লিখুন ঃ

১.

২.

৩.

অনুশীলন ২ (Activity 2) **সময় ঃ ৫ মিনিট**

সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপের তিনটি মাপকাঠি উল্লেখ করুন ঃ

১.

২.

৩.

সারাংশ

বিবর্তন, উন্নয়ন, প্রগতি ও পরিবর্তন প্রত্যয়গুলো একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এদের যে কোন একটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে গেলে অন্যটিকে বাদ দেওয়া যায় না। বিবর্তন মূলত একটি প্রক্রিয়া যা কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। উন্নয়ন বলতে সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে বুঝায়। তবে উন্নয়নকে পরিমাপ করা যায়। মানুষের জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার এবং পরিকল্পনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি বিশেষ অবস্থা থেকে আরেকটি বিশেষ অবস্থায় সামাজিক উত্তরণকে প্রগতি বলা যায়। তবে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও

www.swapno.in

আদর্শের ভিত্তিতেই সামাজিক প্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতির মধ্য দিয়েই সমাজের মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। বিবর্তন শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষা হতে?

ক) ল্যাটিন খ) গ্রীক
খ) বাংলা গ) আরবী

২। মার্কস সমাজের বিবর্তনকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন ?

ক) ৪টি খ) ৫টি
গ) ৬টি ঘ) ৭টি

৩। উন্নয়ন বলতে মূলত কি বুঝায়?

ক) পরিবর্তন খ) প্রগতি
গ) বিবর্তন ঘ) কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন

৪। উন্নয়নের মূল লক্ষ্য কি ?

ক) বিবর্তন খ) বৈষ্যমের অবসান
গ) মানব কল্যাণ ঘ) সমাজকল্যাণ

৫। প্রগতি কি?

ক) বাঞ্চিত পরিবর্তন খ) অবাঞ্চিত পরিবর্তন
গ) যথাযথ ব্যবহার ঘ) সাংস্কৃতিক বিষয়

৬। সামাজিক প্রগতি যাচাইয়ের ভিত্তি দু'টি কি কি ?

ক) বিবর্তন ও উন্নয়ন খ) সামাজিক অবস্থা
গ) সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ঘ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

www.swapno.in

www.swapno.in

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবর্তনের সংজ্ঞা দিন। সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ লিখুন।

২। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। বিবর্তনের সংজ্ঞা দিন। "সমাজবিজ্ঞানের বিবর্তন সংক্রান্ত ধারণা জীব বিজ্ঞানের বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব হতে গৃহীত হয়েছে" উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন।

৪। উন্নয়নের সংজ্ঞা দিন। "সমাজবিজ্ঞানের বিবর্তন সংক্রান্ত ধারণা জীববিজ্ঞানের বিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্ব হতে গৃহীত হয়েছে" - উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন।

৫। প্রগতি কাহাকে বলে? সমাজবিজ্ঞানীগণ প্রগতির যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৬। পরিবর্তনের সাথে বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ১ ঃ (১) খ, (২) ক, (৩) গ, (৪) ক।

পাঠ ২ ঃ (১) ক, (২) খ, (৩) ঘ, (৪) গ, (৫) ক, (৬) গ।

www.swapno.in

গ্রন্থপঞ্জী

১। Popenoe, David 1986 — **Sociology**, New Jersey : Prentice-Hall.

২। Robertson, Ian 1980 — **Sociology**, N. Y. Work pub. Inc.

৩। Schaefer, R. T. 1983 — **Sociology**, N.Y. McGraw Hill Book. Co.

৪। Scott, W.P 1988 — **Dictionary of Sociology** Delhi : Goyl SaaB

৫। Spencer, Metta 1979 — **Foundations of Modern Sociology** New Jersey : Prentice Hall, Inc.

৬। কোয়েনিগ স্যামুয়েল, — সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা বইবিতান, বঙ্গানুবাদ, তৃতীয় প্রকাশ : ১৯৯৭ পুনর্মুদ্রণ, রংগলাল সেন।

৭। নাজমুল করিম, এ, কে. ১৯৭২ — **সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ** ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

যৌক্তিকতা (Retionale)

সমাজবিজ্ঞান যেহেতু সমাজ কাঠামো তথা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্পর্কে পঠন পাঠান ও গবেষণা করে সেহেতু সমাজবিজ্ঞান পাঠে যে কোন কৌতুহলী পাঠক একজন আত্মসচেতন ও শ্রেণী সচেতন সদস্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সমাজবিজ্ঞান পাঠে যে কোন সমাজ তথা সমাজের সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের দ্বার উম্মোচিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজবিজ্ঞান পাঠে সমাজের শ্রেণীবিন্যাস শ্রেণীগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজের উৎপাদন যন্ত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক তাদের ভূমিকা অবদান এবং অধিকার সম্পর্কে জানা যায়।

তৃতীয়ত, সমাজবিজ্ঞান সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য এবং সামাজিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনা প্রদান করে। যে কোন রকমের সমাজ সংস্কার তথা সামাজিক সমস্যা দূর করতে প্রয়োজন সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান।

চতুর্থত, সমাজ সর্বদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল সমাজের গতি প্রকৃতি ও পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে ধারণা থাকলে আমরা ব্যাক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি।

পঞ্চমত, সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে আমরা দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে পারি। এতে পারস্পরিকভাবে আদান-প্রদান বাড়ে। ব্যবহারিক জীবনে জ্ঞানের লেনদেন বৃদ্ধি পায় এবং মানবিক সম্পর্কের উন্নতি হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান ভিত্তিক অধ্যয়ন। সমাজ ও সমাজ জীবনের সার্বিক দিক সম্পর্কে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। সর্বোপরি, সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় তথা মানুষের যাবতীয় মানবিক আচরণ সম্পর্কে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য এবং এই উপলদ্ধী থেকেই জাতীয় শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এইচ এস সি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য এ কোর্স বইটি মড্যুলার পদ্ধতিতে রচনা করা হয়েছে।

www.swapno.in

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান

এইচ এস সি প্রোগ্রাম
সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

ইউনিট ১ ঃ সমাজবিজ্ঞান ঃ ভূমিকা
পাঠ ১ ঃ সমাজবিজ্ঞান ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা
পাঠ ২ ঃ সমাজবিজ্ঞান ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ
পাঠ ৩ ঃ সমাজবিজ্ঞান ঃ পরিধি ও বিষয়বস্তু
পাঠ ৪ ঃ সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব

ইউনিট ২ ঃ সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক
পাঠ ১ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান
পাঠ ২ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
পাঠ ৩ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি
পাঠ ৪ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস
পাঠ ৫ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান
পাঠ ৬ ঃ সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ

ইউনিট ৩ ঃ সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহ
পাঠ ১ ঃ সমাজ
পাঠ ২ ঃ সম্প্রদায়
পাঠ ৩ ঃ সংঘ
পাঠ ৪ ঃ প্রতিষ্ঠান; সংজ্ঞা ও ধারণা
পাঠ ৫ঃ দল

ইউনিট ৪ ঃ সমাজের মৌলিক উপাদান
পাঠ ১ ঃ সমাজ জীবনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব
পাঠ ২ ঃ সমাজ জীবনে জৈবিক উপাদান তথা বংশগতির প্রভাব
পাঠ ৩ ঃ সমাজ জীবনে সংস্কৃতি তথা কৃৎকৌশলের প্রভাব
পাঠ ৪ ঃ সামাজিক উপাদানের প্রভাব

ইউনিট ৫ ঃ মানুষের উৎপত্তি, বিবর্তন ও নরগোষ্ঠী
পাঠ ১ ঃ মানুষের উৎপত্তি ও বিবর্তন
পাঠ ২ ঃ নরগোষ্ঠীর ধারণা ও শ্রেণীবিভাগ
পাঠ ৩ ঃ ককেশীয় নরগোষ্ঠী
পাঠ ৪ ঃ মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী
পাঠ ৫ ঃ নিগ্রো নরগোষ্ঠী

ইউনিট ৬ ঃ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাসমূহ ঃ সমুদ্রতীরবর্তী ও নদী তীরবর্তী
পাঠ ১ ঃ সমুদ্র তীরবর্তী গ্রীক সভ্যতা
পাঠ ২ ঃ সমুদ্র তীরবর্তী রোমান সভ্যতা
পাঠ ৩ ঃ মেসোপটেমীয় নদী তীরবর্তী সভ্যতা
পাঠ ৪ ঃ নদী তীরবর্তী মিশরীয় সভ্যতা
পাঠ ৫ ঃ নদী তীরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা
পাঠ ৬ ঃ নদী তীরবর্তী চৈনিক সভ্যতা

ইউনিট ৭ ঃ পরিবার
পাঠ ১ ঃ পরিবারের ধারণা ও সংজ্ঞা
পাঠ ২ ঃ পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
পাঠ ৩ ঃ মর্গান ও ওয়েষ্টার মার্কের তত্ত্ব
পাঠ ৪ ঃ পরিবারের প্রকারভেদ ও কার্যাবলী
পাঠ ৫ ঃ বিবাহের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ
পাঠ ৬ ঃ পরিবারের সাথে বিবাহের সম্পর্ক

www.swapno.in

ইউনিট ৮ ঃ সম্পত্তি
পাঠ ১ ঃ সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও বিবর্তন
পাঠ ২ ঃ সম্পত্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ
পাঠ ৩ ঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার

ইউনিট ৯ ঃ রাষ্ট্র
পাঠ ১ ঃ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও ধারণা
পাঠ ২ ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
পাঠ ৩ ঃ সমাজ, সরকার ও রাষ্ট্র

ইউনিট ১০ ঃ সংস্কৃতি
পাঠ ১ ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা
পাঠ ২ ঃ উপাদানসমূহ
পাঠ ৩ ঃ লোকসংস্কৃতি, বিশ্বাস ও লোকাচার
পাঠ ৪ ঃ সমাজ জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব
পাঠ ৫ঃ সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে সম্পর্ক

ইউনিট ১১ ঃ সামাজিক স্তর বিন্যাস ও সমাজ কাঠামো
পাঠ ১ ঃ সামাজিক স্তরবিন্যাস ঃ সংজ্ঞা, ধারণা ও উপাদান
পাঠ ২ ঃ দাসপ্রথা
পাঠ ৩ ঃ এস্টেট
পাঠ ৪ ঃ জাতি-বর্ণ
পাঠ ৫ ঃ সামাজিক শ্রেণী ও পদমর্যাদা
পাঠ ৬ ঃ সমাজ কাঠামো

ইউনিট ১২ ঃ সামাজিক বিবর্তন
পাঠ ১ ঃ সমাজের ক্রমবিকাশ ঃ মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ধারণা
পাঠ ২ ঃ আদিম সাম্যবাদ ও দাস সমাজ
পাঠ ৩ ঃ সামন্তবাদ
পাঠ ৪ ঃ পুঁজিবাদ
পাঠ ৫ ঃ সমাজতন্ত্র

ইউনিট ১৩ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
পাঠ ১ ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা
পাঠ ২ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ

ইউনিট ১৪ ঃ সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ
পাঠ ১ ঃ সামাজিক প্রক্রিয়া ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা
পাঠ ২ ঃ সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ
(উপযোজন, আত্তীকরণ, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব)

ইউনিট ১৫ ঃ সামাজিক পরিবর্তন
পাঠ ১ ঃ সামাজিক পরিবর্তন ঃ সংজ্ঞা, ধারণা ও কারণ
পাঠ ২ ঃ সামাজিক বিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতি ঃ সংজ্ঞা ও ধারণা

www.swapno.in

www.swapno.in

প্রশ্নপত্রের নমুনা ও মান বণ্টন

নমুনা প্রশ্ন - সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

বিষয় কোড ঃ HSC - 1806

সময় ঃ ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান ঃ ১০০

[দ্রষ্টব্য ঃ ডান পার্শ্বের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ক বিভাগ হতে যে কোন পাঁচটি এবং খ বিভাগ হতে যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন।]

ক বিভাগ - রচনামূলক

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন ১৫×৫ = ৭৫

১। সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন। সমাজবিজ্ঞানের সাথে নৃ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২। সামাজিক প্রতিষ্ঠান কি? প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৩। দল বলতে কি বুঝায়? মুখ্য ও গৌণ দলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

৪। সমাজবিজ্ঞান কিভাবে ভৌগলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫। সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে সেন্ট সাইমন ও আগাস্ট কোঁৎ-এর মতবাদ সংক্ষেপে লিখুন।

৬। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর আবাসভূমি এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

৭। মানুষের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করুন।

৮। নদী তীরবর্তী যে কোন একটি প্রাচীন সভ্যতার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিন।

৯। পরিবারের সংজ্ঞা দিন। পরিবারের সাথে বিবাহের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

খ বিভাগ - রচনামূলক

নিম্নের যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন : ৫×৫ = ২৫

১। সমাজের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২। ম্যাকাইভার ও জিসবার্ট প্রদত্ত সংঘের সংজ্ঞা দু'টো লিখুন।

৩। 'আদিম সমাজ ছিল সরল-সহজ ও শ্রেণীহীন' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৪। সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী মৌলিক উপাদানসমূহ কি?

৫। জীবাশ্মবিজ্ঞান বলতে কি বুঝায়?

৬। নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিন।

৭। গ্রীক সমাজ ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

৮। প্রচীন রোমান স্যভতার পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থার বিবরণ দিন।

৯। 'মানব সমাজে প্রথম মাতৃতান্ত্রিক পরিবার গঠিত হয়েছিল'- এ উক্তিটির পক্ষে দুটি যুক্তি দেখান।

১০। বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

www.swapno.in

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র
মানবণ্টন

রচনামূলক প্রশ্ন

১০টি সাধারণ প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	ইউনিট ১ ও ২ মিলে ১টি বড় প্রশ্ন হবে। ইউনিট ৩ ও ৪ মিলে ১টি বড় প্রশ্ন হবে। ইউনিট ৫, ৬ ও ৭ থেকে ১টি করে ইউনিট ৮ ও ৯ মিলে একটি, ইউনিট ১০ থেকে ১টি, ইউনিট ১১ ও ১২ মিলে ১টি, ইউনিট ১৩ ও ১৫ থেকে ১টি করে বড় প্রশ্ন থাকবে।	১৫×৫ = ৭৫

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১০টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন থাকবে।	যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	৫×৫ = ২৫

www.swapno.in